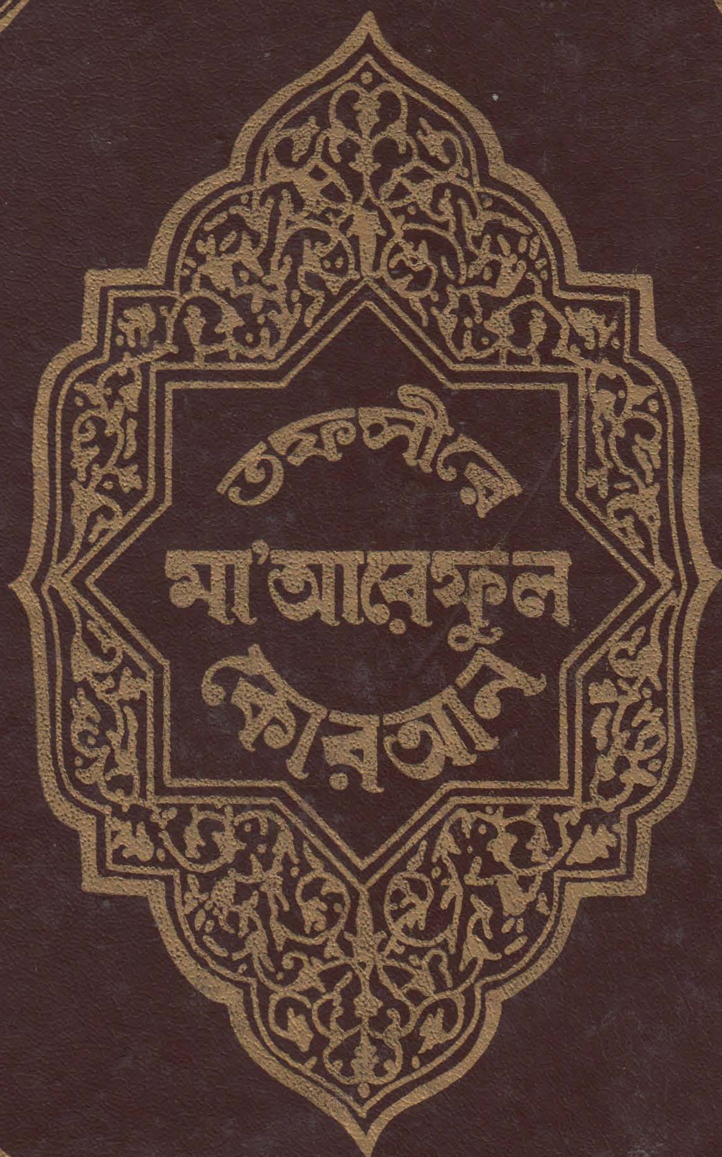


তৃতীয় খণ্ড

তফসীরে

মা'আরেফুল কোরআন

তৃতীয় খণ্ড

[সূরা মায়িদা থেকে সূরা আ'রাফ]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

অনুবাদ
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (তৃতীয় খণ্ড)
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত

ইফা প্রকাশনা : ৬৮৭/৯
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0133-4

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৮০

দশম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১১
মাঘ ১৪১৭
সফর ১৪৩২

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৫৮.০০ টাকা

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN. 3rd Vol : Bangla version by Maulana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Ma'reful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068

February 2011

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundaton.org.bd

Price : Tk 258.00 ; US Dollar : 9.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানি কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের সুবিশাল ভাণ্ডার এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্‌সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্‌সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের নয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর দশম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'। উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) নিজে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফতী ছিলেন বিধায় তাঁর বক্তব্যগুলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত, গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল। ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ ওসমান গণী (ফারূক) প্রমাদগুলো সংশোধন করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর দশম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রথম সংস্করণে অনুবাদকের আরয

আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের বঙ্গানুবাদ তৃতীয় খণ্ডের মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হলো। আট খণ্ডে সমাপ্ত এই সুবৃহৎ তফসীর গ্রন্থটির আয়াসসাধ্য অনুবাদের কাজ আল্লাহ্র রহমতে বহু আগেই সমাপ্ত হলেও বাংলা-আরবীর মিশ্রিত মুদ্রণ কার্য এক দুর্লংঘ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য আল্লাহ্র অপরিসীম কৃপায় অল্প সময়ের ব্যবধানেই পরপর তিনটি খণ্ডের অনুবাদ আগ্রহী পাঠকগণের খেদমতে পেশ করে আমরা ধন্য হয়েছি।

'মা'আরেফুল-কোরআন' বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার ন্যায় বিরাট একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ, বিশেষত ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম, সচিব জনাব মুহাম্মদ সাদেক উদ্দীন, প্রশাসক জনাব মেজর (অবঃ) এরফান উদ্দীন এবং প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুরের আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতা স্মরণযোগ্য। পাঠকবর্গের প্রতি আবেদন, তাঁরা যেন এ বিরাট কাজের সাথে যাঁরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবারই ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য দো'আ করেন।

তৃতীয় খণ্ড অনুবাদ, সম্পাদনা ও মুদ্রণের ব্যাপারে আমাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আযীয, জনাব মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী এবং জনাব মাওলানা সৈয়দ জহিরুল হক সাহেবান। এঁদের সবার প্রতিই আমি কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ।

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ

সূরা মায়েদা

মদীনায় অবতীর্ণ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا

مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) হে মু'মিনগণ ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যাহা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে উহা ব্যতীত। কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী নির্দেশ দেন।

শানে নযুল ঃ এটি সূরা মায়েদার প্রথম আয়াত। সূরা মায়েদা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এটি শেষ দিককার সূরা। এমনকি, কেউ কেউ একে কোরআন মজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা)-এর থেকে বর্ণিত আছে, সূরা মায়েদা যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে 'আযবা' নামীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। সাধারণত ওহী অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওযন ও চাপ অনুভূত হতো, তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল এমনকি ওযনের চাপে উষ্ট্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিচে নেমে আসেন। কোন কোন রেওয়ায়েতদৃষ্টে বোঝা যায়, এটি ছিল বিদায় হজ্জের সফর। বিদায় হজ্জ নবম হিজরীর ঘটনা। এ হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর হুযুর (সা) প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে হাব্বান 'বাহ্‌রে-মুহীত' গ্রন্থে বলেন ঃ সূরা মায়েদার কিয়দংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দংশ বিদায় হজ্জের সফরে অবতীর্ণ হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে আবূ ওবায়দাহ্ হযরত হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়া ইবনে কায়েস বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

المائدة من اخر القران تنزيلا فاحلوا حلالها وحرّموا حرامها .

অর্থাৎ "সূরা মায়েদা কোরআন অবতরণের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যা হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্য হালাল এবং যা হারাম করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্য হারাম মনে করো।'

ইবনে-কাসীর এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি একবার হজ্জের পর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ জুবায়ের! তুমি কি সূরা মায়েদা পাঠ কর ? তিনি আরয করলেন ঃ জী হ্যাঁ, পাঠ করি। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এটি কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা। এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে তা অটল। এগুলো রহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকো।

সূরা মায়েদাতেও সূরা নিসার মত মাস'আলা-মাসায়েল, লেনদেন, পারস্পরিক চুক্তি অঙ্গীকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান অভিন্ন। কেননা, এ দু'টি সূরায় প্রধানত মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ যথা-তওহীদ, রিসালত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়েদা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা, এ দুটি সূরায় প্রধানত বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেনদেন ও বান্দার হকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, ইয়াতীমের হক, পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি-অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ 'হে মু'মিনগণ, তোমরা ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ কর।' এ কারণেই সূরা মায়েদার অপর নাম সূরা ওকূদ। অর্থাৎ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা। -(বাহ্রে-মুহীত)

চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি, বিশেষ করে, এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন আমর ইবনে হাযম (রা)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করনে, তখন সে ফরমানের শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মু'মিনগণ (তোমাদের ঈমানের দাবি এই যে) ! স্বীয় অঙ্গীকারসমূহ (যা ঈমান প্রসঙ্গে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে করেছ) পূর্ণ কর। (অর্থাৎ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন কর। কেননা, ঈমানের কারণে এগুলো আপনা-আপনি জরুরী হয়ে পড়েছে। সুতরাং এখন তা পূর্ণ করতে হবে, নতুবা জরুরী হওয়ার কোন মানে নেই)। তোমাদের জন্য সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু (যেগুলো সেসব জন্তুর সমতুল্য, যেগুলোর হালাল হওয়া ইতিপূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আন'আমে

জানা গেছে, যেমন, উট, ছাগল, গরু) হালাল করা হয়েছে। যেমন– হরিণ, বন্য গরু ইত্যাদি। এগুলো হিংস্র ও শিকারী না হওয়ার দিক দিয়ে উট, ছাগল ও গরুরই সমতুল্য। তবে শরীয়তের অন্যান্য প্রমাণ, হাদীস ইত্যাদির দ্বারা যেসব চতুষ্পদ জন্তুর হারাম হওয়া জানা গেছে, সেগুলো বাদে। যেমন–গাধা, খচ্চর ইত্যাদি। এ সব ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি সমস্ত গৃহপালিত ও বন্য চতুষ্পদ জন্তুই হালাল)। কিন্তু যা তোমাদের প্রতি (...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ আয়াতে) বিবৃত হবে। (সেগুলো চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত এবং হাদীস ইত্যাদি দ্বারা হারামকৃত জন্তু বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও হারাম। অবশিষ্ট সবই তোমাদের জন্য হালাল।) কিন্তু (এগুলোর মধ্যে) যেগুলো শিকারযোগ্য সেগুলোকে ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় (অথবা হেরেমে অবস্থানকালে) হালাল মনে করবে না। (উদাহরণত হজ্জ ও ওমরার ইহ্‌রাম বাঁধলে হেরেমের বাইরে থাকলেও শিকার করা হালাল নয়। অথবা হেরেমের অভ্যন্তরে অবস্থান করে ইহ্‌রাম বাঁধা হোক বা না হোক শিকার করা হারাম)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন নির্দেশ দেন। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাই নির্দেশের উপযোগিতা। তিনি যে জন্তুকে ইচ্ছা করেন চিরকালের জন্য অপারকতার সময় ছাড়া হারাম করে দেন এবং যে জন্তুকে ইচ্ছা করেন চিরকালের জন্য হালাল করে দেন। এছাড়া যে জন্তুকে ইচ্ছা করেন, এক অবস্থায় হালাল করে দেন এবং অন্য অবস্থায় হারাম করে দেন। সর্বাবস্থায় তাঁর নির্দেশ পালন করা তোমাদের কর্তব্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যায় হাজারো পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ ! স্বীয় চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এতে প্রথমে يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ রয়েছে তা সাক্ষাৎ ঈমানের দাবি। এরপর বলা হয়েছে ঃ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ – عقود শব্দটির عقد শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عقد বলা হয়। এভাবে عقود-এর অর্থ হয় عهود অর্থাৎ চুক্তি ও অঙ্গীকার।

খ্যাতনামা তফসীরবিদ ইবনে-জারীর উপরিউক্ত অর্থে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের 'ইজমা' (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাস্‌সাস বলেন ঃ দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার বাধ্যবাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই عهد, عقد ও معاهد বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরিউক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে কর।

এখন দেখতে হবে, আয়াতে চুক্তি বলে কোন্ ধরনের চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে ? এ ব্যাপারে তফসীরবিদদের বাহ্যত বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাযিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব

অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

তফসীরবিদ ইবনে সা'আদ ও যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন : এখানে ঐসব চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পর একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেন : এখানে ঐসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বোঝানো হয়েছে, যা জাহিলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। মুজাহিদ, রবী, কাতাদাহ্ প্রমুখ তফসীরবিদও একথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। অতএব, উপরিউক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই عقود শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কোরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেন : যত প্রকার চুক্তি আছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন : এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। এক–পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণত ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার। দুই–নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ যিম্মায় কোন বস্তুর মানত মানা অথবা কসমের মাধ্যমে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেওয়া। তিন–মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সেসব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেনদেন, বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যেসব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলাও প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। 'বৈধ' শব্দটি প্রয়োগ করার কারণ এই যে, শরীয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারও জন্য বৈধ নয়।

অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে উপরিউক্ত ব্যাপক আইনের খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ–যেসব জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بهيمة (নির্বোধ প্রাণী) বলা হয়। কেননা, মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مبهم তথা দুর্বোধ্য থেকে যায়। ইমাম শা'রানী বলেন : সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে بهيمة বলার কারণ এটা নয় যে, তাদের বুদ্ধি নেই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়, বরং প্রকৃত সত্য হলো এই যে, কোন প্রাণীই মূলত বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোন বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে স্তরের পার্থক্য অবশ্যই আছে। এগুলোর মধ্যে ততটুকু বুদ্ধি নেই, যতটুকু মানুষের মধ্যে আছে। এ কারণেই মানুষ বিভিন্ন বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট হয়েছে, কিন্তু জন্তুরা আদিষ্ট হয়নি। অবশ্য নিজ নিজ প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জন্তু, এমন কি বৃক্ষ এবং প্রস্তরকেও বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়েছেন। এ কারণেই প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতার গুণগান করে। বলা

হয়েছে ঃ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ —বুদ্ধি না থাকলে এগুলো স্বীয় সৃষ্টিকর্তার পরিচয় কিভাবে লাভ করতো এবং কেমন করেই বা তাঁর পবিত্রতা জপ করতো ?

ইমাম শা'রানীর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, বুদ্ধিহীনতার কারণে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি জীব-জন্তুর কাছে অস্পষ্ট থাকে বলেই এগুলোকে بهيمة বলা হয় না, বরং এর কারণ এই যে, তাদের ভাষা মানুষ বুঝে না। তাদের কথা মানুষের কাছে অস্পষ্ট। মোটকথা, প্রত্যেক প্রাণীকেই بهيمة বলা হয়। কেউ কেউ বলেন : চতুষ্পদ প্রাণীদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

انعام শব্দটি نعم-এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত জন্তু। যেমন-উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আন'আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে انعام বলা হয়। بهيمة শব্দের ব্যাপকতাকে انعام শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, আট প্রকার গৃহপালিত জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عقود শব্দ প্রয়োগ করে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বোঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল সেই অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ তা'আলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দাদের কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য উট, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা এগুলোকে যবেহ্ করে খেতে পার।

তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশটি যথাযথ সীমার ভেতরে রেখে মেনে চল। অগ্নি-উপাসক ও মূর্তি-পূজারীদের মত সর্বাবস্থায় এসব জন্তুকে যবেহ্ করা হারাম মনে করো না। এতে খোদায়ী প্রজ্ঞায় আপত্তি এবং খোদায়ী নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। অপরদিকে অন্যান্য মাংসভোজী সম্প্রদায়ের মত বল্গাহীনভাবে যে কোন জন্তুকে আহার্যে পরিণত করো না। বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন আনুযায়ী হালাল জন্তুসমূহের গোশ্ত ভক্ষণ কর এবং হারাম জন্তু থেকে বেঁচে থাক। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলাই বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তিনি প্রত্যেক জন্তুর স্বরূপ বৈশিষ্ট্য এবং ভক্ষণকারী মানুষের মধ্যে তার সম্ভাব্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বস্তুকেই মানুষের জন্য হালাল করেছেন, যা খেলে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য ও আত্মিক চরিত্রের উপর কোনরূপ মন্দ প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। তিনি নোংরা ও অপবিত্র জন্তুর গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এগুলো মানব-স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক অপকারী অথবা এতে মানব চরিত্র বিনষ্ট হয়। এ কারণেই বর্ণিত ব্যাপক নির্দেশ থেকে কিছু জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ। অর্থাৎ সেসব জন্তু ছাড়া যেগুলোর অবৈধতা কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। যেমন-মৃত জন্তু, শূকর ইত্যাদি। দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ অর্থাৎ চারপেয়ে জন্তু ও বনের শিকার তোমাদের জন্য হালাল। কিন্তু তোমরা যখন হজ্জ অথবা ওমরার ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় থাক, তখন শিকার করা অপরাধ ও গুনাহ্। আয়াতের উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছে করেন, নির্দেশ দেন। তা মেনে চলতে কারও টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এতে

সম্ভবত এ রহস্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে কিছু সংখ্যক জন্তু যবেহ করে খাওয়ার অনুমতি প্রদান অন্যায় নয়। যে প্রভু এসব প্রাণী সৃজন করেছেন তিনিই পূর্ণ জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সাথে এ আইন রচনা করেছেন। তিনিই কতিপয় নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের খাদ্য করেছেন। মাটি বৃক্ষ ও তরুলতার খাদ্য, বৃক্ষ জীব-জন্তুর খাদ্য এবং জীব-জন্তু মানুষের আহার্য। মানুষের চাইতে সেরা জীব পৃথিবীতে নেই। কাজেই মানুষ কারো খাদ্য হতে পারে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ
وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا
عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

(২) হে মু'মিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হেরেমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐসব লোককে, যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা ইহ্রাম থেকে বের হয়ে আস, তখন শিকার কর ; যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদের বাধা দান করেছিল, সে সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও আল্লাহ্ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।

যোগসূত্র ঃ সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতে চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি অঙ্গীকার ছিল আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত হালাল ও হারাম মেনে চলা সম্পর্কিত। আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে এ অঙ্গীকারের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দফা বর্ণিত হচ্ছে। এক—আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং অসম্মান প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ। দুই—স্বজন ও ভিন্নজন, শত্রু ও মিত্র সবার সাথে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার করা এবং অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে অন্যায় করার নিষেধাজ্ঞা।

কয়েকটি ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের হেতু। প্রথমে ঘটনাগুলো জেনে নেওয়া দরকার, যাতে আয়াতের বিষয়বস্তু পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হোদায়বিয়ার ঘটনা। এর বিস্তারিত বিবরণ কোরআনের অন্যত্র বর্নিত হয়েছে। হিজরতের ষষ্ঠ বছরে

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে ওমরাহ্ পালন করতে মনস্থ করেন। সেমতে তিনি সহস্রাধিক ভক্ত সমভিব্যাহারে ওমরার ইহ্রাম বেঁধে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি মক্কাবাসীদের সংবাদ দেন যে, আমরা কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নয়; শুধু ওমরাহ্ পালন করার জন্য আগমন করেছি। আমাদের মক্কা প্রবেশের অনুমতি দাও। মক্কার মুশরিকরা অনুমতি প্রদানে সম্মত হলো না এবং কঠোর ও কড়া শর্তাবলীর অধীনে এরূপ চুক্তি সম্পাদন করলো যে, আপাতত সবাই ইহ্রাম খুলে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবে। আগামী বছর নিরস্ত্র অবস্থায় আগমন করবে এবং মাত্র তিনদিন অবস্থান করে ওমরা পালন করে মক্কা ত্যাগ করবে। এছাড়া আরও এমন কয়েকটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো, যা মেনে নেওয়া বাহ্যত মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও আত্মসম্মানের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে সবাই মদীনায় ফিরে গেলেন। অতঃপর সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে পুনরায় চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে এ ওমরাহ্ কাযা করা হয়। মোটকথা, হোদায়বিয়ার ঘটনা এবং উপরিউক্ত অবমাননাকর শর্তাবলী সাহাবায়ে-কিরামের অন্তরে মক্কার মুশরিকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কার মুশরিক হাতীম ইবনে হিন্দ পণ্যদ্রব্য নিয়ে মদীনায় আগমন করে। পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার পর সে সঙ্গী লোকজন ও জিনিসপত্র মদীনার বাইরে রেখে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং কপটতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করে। তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে মুসলমানরা তার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ না করে। কিন্তু তার আসার আগেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মুসলমানদের বলে দিয়েছিলেন যে, আজ আমার কাছে এক ব্যক্তি আসবে। সে শয়তানের ভাষায় কথা বলবে। হাতীম ফিরে যাবার পর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ লোকটি কুফর নিয়ে এসেছিল এবং প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে ফিরে গেছে। সে দরবার থেকে বের হয়ে সোজা মদীনার বাইরে পৌঁছল এবং মদীনাবাসীদের বিচরণরত উট-ছাগল হাঁকিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সাহাবায়ে-কিরাম এ সংবাদ অবগত হয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন, কিন্তু ততক্ষণে সে নাগালের বাইরে চলে যায়। এরপর হিজরতের সপ্তম বছরে যখন সাহাবায়ে-কিরাম রাসূল (সা)-এর সাথে ওমরার কাযা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, তখন দূর থেকে 'লাব্বাই কা' ধ্বনি শুনে দেখলেন, সেই হাতীম ইবনে হিন্দ মদীনাবাসীদের কাছ থেকে চোরাই করা জন্তু-জানোয়ার নিয়ে ওমরাহ্ উদ্দেশ্যে মক্কা যাচ্ছে। তখন সাহাবায়ে-কিরামের মনে ইচ্ছা জাগে যে, আক্রমণ করে এর কাছ থেকে জন্তু-জানোয়ারগুলো ছিনিয়ে নেন এবং এর ভবলীলা এখানেই সাঙ্গ করে দেন।

তৃতীয় ঘটনা এই যে অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা মুকাররমা বিজিত হয় এবং প্রায় সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার মুশরিকদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়াই মুক্ত করে দেন। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আপন কাজ করতে থাকে। এমনকি, জাহিলিয়াত যুগের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরা পালন করতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে-কিরামের মনে হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনা জাগরিত হয়। তাঁরা ভাবতে থাকেন– এরা সম্পূর্ণ বৈধ ও সত্য পন্থায় ওমরা পালন

করতে আমাদের বাধাদান করেছিল, আমরা তাদের অবৈধ ও ভ্রান্ত পন্থায় ওমরা ও হজ্জ পালনের সুযোগ দেবে কেন ? আমরা তাদেরকে আক্রমণ করে জানোয়ার কেড়ে নেব এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেব।

তাফসীরবিদ ইবনে জারীর ইকরিমা ও সুদ্দীর বর্ণনার মাধ্যমে এসব ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তোমাদের নিজ দায়িত্ব। কোন শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কারণে এ দায়িত্বে ত্রুটি করার অনুমতি নেই। নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহও বৈধ নয়। কুরবানীর জন্তুকে হেরেমে পৌঁছতে না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়াও জায়েয নয়। যেসব মুশরিক ইহ্রাম বেঁধে নিজ ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, যদিও কুফরের কারণে তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, তথাপি আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর সংরক্ষণ ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের বাধা দান করা যাবে না। এছাড়া, যারা ওমরা করতে তোমাদের বাধা দিয়েছিল, তাদের শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে তাদের মক্কা প্রবেশে অথবা হজ্জব্রত পালনে বাধাদান করা বৈধ হবে না। কেননা, এভাবে তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে তোমাদের পক্ষ থেকেও অন্যায় হয়ে যাবে। এটা ইসলামে বৈধ নয়। এবার আয়াতের পূর্ণ তফসীর দেখুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মু'মিনগণ, অবমাননা করো না আল্লাহ্ তা'আলার (ধর্মীয়) নিদর্শনাবলীর (অর্থাৎ যেসব বস্তুর আদব রক্ষার্থে আল্লাহ তা'আলা কিছু নির্দেশ দান করেছেন, সেসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তৎপ্রতি বে-আদবী করো না। উদাহরণত হেরেম ও ইহ্রামের আদব এই যে, এতে শিকার করতে পারবে না। অতএব, শিকার করা বে-আদবী ও হারাম হবে)। এবং সম্মানিত মাসসমূহের (অবমাননা করো না অর্থাৎ এসব মাসে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না)। এবং হেরেমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুর (অবমাননা করো না। অর্থাৎ এগুলোকে ছিনিয়ে নিও না) এবং ঐসব জন্তুর (অবমাননা করো না) যেগুলোর (গলায় এরূপ চিহ্নিতকরণের জন্য) কণ্ঠাভরণ রয়েছে (যে এগুলো আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত-হেরেম শরীফে যবেহ্ করা হবে) এবং ঐসব লোকের (অবমাননা করো না) যারা বায়তুল-হারাম (অর্থাৎ কাবাগৃহ) অভিমুখে যাচ্ছে এবং স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির কামনা করে। (অর্থাৎ এসব বস্তুর আদব রক্ষার্থে কাফিরদের সাথেও ফাসাদে জড়িত হয়ো না) এবং (পূর্বোল্লিখিত আয়াতে যে ইহ্রামের আদব রক্ষার্থে শিকার হারাম করা হয়েছিল, তা শুধু ইহ্রাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নতুবা) তোমরা যখন ইহ্রাম থেকে বের হয়ে আস, তখন (অনুমতি আছে) শিকার কর (তবে হেরেমের অভ্যন্তরে শিকার করো না)। এবং (পূর্বে যেসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তাতে) যারা (হোদায়বিয়ার বছরে) পবিত্র মসজিদ থেকে (অর্থাৎ পবিত্র মসজিদে যেতে) তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, (অর্থাৎ মক্কায় কাফির সম্প্রদায়) সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে (শরীয়তের) সীমালংঘনে প্রবৃত্ত না করে (অর্থাৎ তোমরা উল্লিখিত নির্দেশসমূহের যেন বিরুদ্ধাচরণ

না করে বস) এবং সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌-ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর (উদাহরণত উল্লিখিত নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রে অপরকেও উৎসাহিত কর) এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সহায়তা করো না। (উদাহরণত কেউ উল্লিখিত নির্দেশসমূহের বিরোধিতা করলে তোমরা তার সাহায্য করো না)। আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় কর (এতে বিধি-নিষেধ মেনে চলা সহজ হয়ে যায়।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা (নির্দেশ অমান্যকারীদের) কঠোর শাস্তিদাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ .

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ আল্লাহ্‌ নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। এখানে شـعـائر শব্দটি شـعـيـرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে شعائر اسلام তথা ইসলামের নিদর্শনাবলী বলা হয়। যেমন নামায, আযান, হজ্জ, সুন্নতী দাড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু হযরত হাসান বসরী ও আতা (র) থেকে বর্ণিত বাহরে-মুহীত ও রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই পরিষ্কার সহজবোধ্য। ইমাম জাসসাস এ ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পর্কিত সব উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাখ্যাটি এই, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অর্থ সব শরীয়ত এবং ধর্মের নির্ধারিত ওয়াজিব, ফরয ও এগুলোর সীমা। আলোচ্য আয়াতে لَا تُحِلُّوْا شَـعَـائِرَ اللّٰهِ বলার সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর এক অবমাননা এই যে, মূলতই এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। প্রথমত এই যে, এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়ত এই যে, এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়ত এই যে, নির্ধারিত সীমালংঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্দান্তরে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوْبِ —অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের আল্লাহ্‌-ভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

বলা হয়েছে ঃ

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا.

অর্থাৎ পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। পবিত্র মাস হচ্ছে শাওয়াল, যিলকদ, যিলহজ্জ ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা শরীয়তের আইনে অবৈধ

ছিল। সাধারণ আলিমদের মতে পরবর্তীকালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া হেরেমে কুরবানী করার জন্তু, বিশেষত যেসব জন্তুর গলায় কুরবানীর চিহ্ন স্বরূপ কণ্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে, এদের হেরেম পর্যন্ত পৌঁছতে না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়া। দ্বিতীয় এই যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। যেমন--আরোহণ করা অথবা দুগ্ধ লাভ করা ইত্যাদি। আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে।

এছাড়া ঐসব লোকেরও অবমাননা করো না, যারা হজ্জের জন্য পবিত্র মসজিদের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালনকর্তার কৃপা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা অর্থাৎ পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিও না।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا—অর্থাৎ প্রথম আয়াতে ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকার করতে পারবে।

উল্লিখিত আয়াতে প্রত্যেক মানব ও পালনকর্তার মধ্যকার চুক্তির কয়েকটি অংশ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রথমে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে হজ্জ সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর কিছু বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমনকারী যাত্রী সাধারণ ও তাদের সাথে আনীত কুরবানীর জন্তুদের গতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর চুক্তির দ্বিতীয় অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا.

অর্থাৎ যে সম্প্রদায় হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিয়ো না যে, তোমরা তাদের কা'বাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ্জ করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে যুলুম। আর ইসলাম যুলুমের উত্তরে যুলুম করতে চায় না। বরং ইসলাম যুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয়। তারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছিল। এখন এর প্রত্যুত্তর এরূপ হওয়া সমীচীন নয় যে, মুসলমারাও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তাদেরকে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম থেকে বাধা প্রদান করবে।

কোরআন পাকের শিক্ষা এই যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে শত্রু-মিত্র সব সমান। তোমাদের শত্রু যতই কঠোর হোক, সে তোমাদের যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক, তার ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করা তোমাদের কর্তব্য।

এটা ইসলামের বৈশিষ্ট্য যে, সে শত্রুদের অধিকারও সংরক্ষণ করে এবং তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তর অন্যায় দ্বারা নয়; বরং ন্যায়বিচার দ্বারা দিতে শিক্ষা দেয়।

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কোরআনী মূলনীতি ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ .

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য। এতে কোরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ বিশ্বের গোটা রক্ষা-ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসাবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরি করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোন মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো-লাখো মানুষের মুখাপেক্ষী। তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব জীবনের জন্যই জরুরী নয়—মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরও এ সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। বরং এর পরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফিরাত ও ইসালে-সওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ সামর্থ্য দ্বারা বিশ্বচরাচরের জন্য এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্য যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্য দিন-মজুরের মুখাপেক্ষী। ব্যবসায়ী গ্রাহকদের মুখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গৃহনির্মাতার মুখাপেক্ষী। যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকতো এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসতো! এমতাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার দশাও তাই হতো; যা এ জগতে সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্ম বণ্টন কোন সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজকাল সারাবিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস-আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্যবিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান

আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। তারা সে কারবারকেই নিজ নিজ জীবনের লক্ষ করে নিয়েছে।

هر یکے را بہر کارے ساختند

میل اورا در دلش اند اختند !

যদি কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অথবা কোন সরকার কর্ম বণ্টন করতো এবং কোন দলকে ছুতারের কাজের জন্য, কাউকে কর্মকারের কাজের জন্য, কাউকে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য, কাউকে পানির জন্য এবং কাউকে খাদ্য সংস্থানের জন্য নিযুক্ত করতো, তবে কোন ব্যক্তি এ নির্দেশ পালনের জন্য দিনের শান্তি ও রাতের নিদ্রা নষ্ট করতে সম্মত হতো।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানবকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার অন্তরে সে কাজের আগ্রহ ও স্পৃহা জাগরিত করে দিয়েছেন। ফলে সে কোনরূপ আইনগত বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সে কাজকেই জীবনের একমাত্র করণীয় কাজ বলে মনে করে। এর দ্বারাই সে জীবিকা অর্জন করে। এ অটুট ব্যবস্থার ফলশ্রুতি এই যে, মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপত্র কয়েকটি টাকা খরচ করলেই অনায়াসে অর্জিত হয়ে যায়। রাঁধা খাদ্য, সেলাই করা পোশাক, নির্মাণ করা আসবাপত্র, তৈরি করা গৃহ ইত্যাদি সবকিছু একজন মানুষ কিছু পয়সা ব্যয় করেই অর্জন করতে পারে। এ ব্যবস্থা না থাকলে একজন কোটিপতি মানুষ সমস্ত সম্পদ লুটিয়ে দিয়েও একদানা শস্য অর্জন করেত পারতো না। আপনি হোটেলে অবস্থান করে যে বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার আটা আমেরিকার, ঘি পাঞ্জাবের, গোশত সিন্ধু প্রদেশের, মসলা বিভিন্ন দেশের, থালা-বাসন ও আসবাবপত্র বিভিন্ন দেশের, খেদমতগার বেয়ারা-বাবুর্চি বিভিন্ন শহরের। তারা সবাই আপনার সেবায় নিয়োজিত। যে লোকমাটি আপনার মুখে পৌঁছে, তাতে লাখো যন্ত্রপাতি, জন্তু-জানোয়ার ও মানুষ কাজ করেছে। এর পরেই তা আপনার মুখরোচক হতে পেরেছে। আপনি ভোরবেলায় ঘর থেকে বের হন। তিন চার মাইল দূরে যেতে হবে। আপনার এতটুকু শক্তি অথবা সময় নেই, আপনি নিকটবর্তী কোন স্থানে ট্যাক্সি, রিকশা অথবা বাস দাঁড়ানো দেখতে পাবেন-যার লোহা অস্ট্রেলিয়ার, কাঠ বার্মার, যন্ত্রপাতি আমেরিকার, ড্রাইভার সীমান্ত প্রদেশের এবং কন্ডাক্টর যুক্ত প্রদেশের। চিন্তা করুন, এ কোন কোন জায়গায় সাজ-সরঞ্জাম, কোন কোন জায়গায় মানুষ আপনার সেবার জন্য দণ্ডায়মান! আপনি কয়েকটি পয়সা দিয়ে তাদের সবার খেদমত হাসিল করতে পারেন। কোন সরকার তাদের বাধ্য করেছে এবং কোন ব্যক্তি আপনার জন্য এগুলো সরবরাহ করতে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে ? বলা বাহুল্য, এগুলো আল্লাহ্র ব্যবস্থারই ফল। অন্তরের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে এ আইন জারি করে দিয়েছেন।

আজকাল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে আল্লাহ্র এ ব্যবস্থা পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। কে কি করবে, তা নির্ধারণ করা সরকারের দায়িত্ব। এজন্য তাদেরকে সর্বপ্রথম জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মানবীয় স্বাধীনতা হরণ করতে হয়েছে। ফলে হাজারো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং হাজারো মানুষকে বন্দী করা হয়েছে। অবশিষ্ট মানুষগুলোকে কঠিন উৎপীড়ন ও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মেশিনের কলকব্জার মত ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে কোন

জায়গায় কোন বস্তুর উৎপাদন বেড়ে গেলেও তা মানুষের মানবতা ধ্বংস করেই বেড়েছে। অতএব, সওদাটি যে সস্তা নয়, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আল্লাহ্র ব্যবস্থায় একদিকে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন এবং অপরদিকে আল্লাহ্র বন্টনের কারণে বিশেষ বিশেষ কাজ করতে বাধ্যও। এ বাধ্যবাধকতা যেহেতু স্বভাবজাত, এ কারণে কেউ একে জোর-জবরদস্তি মনে করতে পারে না। কঠোরতর পরিশ্রম এবং নিকৃষ্টতম কাজের জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার এবং চেষ্টা সহকারে তা অর্জন করার লোক সর্বত্র ও সর্বকালে পাওয়া যায়। কোন সরকার যদি তাদের এ কাজে বাধ্য করা শুরু করে, তবে তারা পালাতে থাকবে।

মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন দিকও রয়েছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্য পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যস্থাপনাকে তছনছও করে দিতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি--যা নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গল্য-মঙ্গল, ভালমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভবও ছিল না। এখন অপরাধ, হত্যা, লুণ্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়, বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা স্বীয় হিফাযতের জন্য বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে--যাতে এক দল অথবা এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য জাতি আক্রমণোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে।

জাতীয়তা বন্টন ঃ আবদুল করীম শাহরাস্তানী প্রণীত 'মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ প্রথম দিকে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বেশি ছিল না তখন বিশ্বের চার দিকের ভিত্তিতে চারটি জাতীয়তা জন্মলাভ করে ঃ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর। প্রত্যেক দিকে বসবাসকারীরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে করতে থাকে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হতে থাকে। এইভাবে যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন প্রত্যেক দিকের লোকদের মধ্যে বংশ-গোত্রের ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এ বংশ ও গোত্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর ভিত্তিতেই যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতো। বনু হাশেম এক জাতি, বনু তামীম অন্য জাতি এবং বনু খোযাআহ্ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত হতো। হিন্দুদের মধ্যে আজ পর্যন্ত উচ্চ জাত ও নীচ জাতের ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে।

আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, অন্যদের রক্তধারাকেও তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা বংশগত ও গোত্রগত জাতীয়তা এবং বিভাগকে নিশ্চিহ্ন করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানব জাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পৃথক পৃথক জাতি দাঁড় করে দিয়েছে। আজ প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে গেছে। এমনকি, মুসলমানরাও এ যাদুর পরশ থেকে মুক্ত নয়। আরবী, তুর্কী, ইরাকী, সিন্ধির বিভাগই নয়, বরং

তাদের মধ্যের ভাগ্যফলকেও ভাগ করে মিসরী, সিরীয়, হেজাযী, নজদী এবং পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধি, হিন্দী ইত্যাদি পৃথক পৃথক জাতি জন্মলাভ করেছে। ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই সরকারী কাজ-কারবার পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ জনগণের শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ এর ভিত্তিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে।

জাতীয়তা ও কোরআনী শিক্ষা ঃ কোরআন পাক মানুষকে আবার ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সূরা নিসার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা সব মানুষ এক পিতামাতার সন্তান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্-আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কোরআনের এ শিক্ষা اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই) ঘোষণা করে আবিসিনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গকে লাল তুর্কী ও রোমীর ভাই এবং অনারব নীচ জাতের মানুষকে কোরায়শী ও হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এভাবে রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে, তারা এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই আবূ জাহ্‌ল ও আবূ লাহাবের পারিবারিক সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও সুহায়েব রোমীর সম্পর্ককে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছে।

—"হাসান বসরা থেকে, বেলাল হাবশা থেকে এবং সুহায়েব রোম থেকে এলেন, অথবা মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবূ জাহ্‌ল, এটা কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার!" এমনকি, কোরআন পাক ঘোষণা করেছে ঃ

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছ—কিছু কাফির হয়ে গেছ এবং কিছু মু'মিন। বদর, ওহুদ, আহযাব ও হোনায়নের যুদ্ধে কোরআনের এ বিভক্তি কার্যক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার তরবারির নিচে এসে গিয়েছিল। বদর, ওহুদ ও খন্দকের ঘটনাবলী এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

هزار خویش که بیگانه از خدا باشد
فدائی یك تن بیگانه که اشنا باشد

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার এই যুক্তিসঙ্গত ও বিশুদ্ধ মূলনীতিই কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করেছে ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

—অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতিতে পরস্পরে সহযোগিতা কর—পাপকর্ম ও সীমালংঘনে সহযোগিতা করো না।

চিন্তা করুন, উল্লিখিত আয়াতে কোরআন পাক একথা বলেনি যে, মুসলমান ভাইদের সহযোগিতা কর এবং অন্যের করো না। বরং মুসলমানের সহযোগিতার যে আসল ভিত্তি অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌ভীতি—তাকেই সহযোগিতার বুনিয়াদ করা হয়েছে। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায় কার্যে তারও সাহায্য করো না। বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে বিশুদ্ধ সাহায্য—যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ انصر اخاك ظالمًا او مظلومًا —অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য কর—সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত। সাহাবায়ে-কিরাম ছিলেন কোরআনের রঙে রঞ্জিত। তাঁরা বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ্, অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ আমরা বুঝি, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে সাহায্য করার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখ। এটাই তাকে সাহায্য করা।

কোরআন পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও আল্লাহ্-ভীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার উপরই মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার-উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে بر ও تقوى দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। بر শব্দের অর্থ সাধারণ তফসীরকারদের মতে فعل الخيرات অর্থাৎ, সৎকর্ম এবং تقوى শব্দের অর্থ ترك المنكرات অর্থাৎ মন্দ কাজ বর্জন। اثم শব্দের অর্থ যে কোন পাপকর্ম—অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা ইবাদত সম্পর্কিত। عدوان শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা। এখানে অর্থ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা।

সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌ভীতিতে সাহায্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) الدال على الخير كفاعله —অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু সওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত। —(ইবনে-কাসীর)

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হিদায়েত ও সৎকর্মের প্রতি আহবান জানায়, তার আহ্বানে যত লোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান সওয়াব পাবে। এতে তাদের সওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম অথবা পাপের প্রতি আহ্বান করে, তার আহবানে যত লোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গুনাহ্ তারও হবে। এতে তাদের গুনাহ হ্রাস করা হবে না।

ইবনে-কাসীর বর্ণিত তিবরানীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থে বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকরি ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কারণ, এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রূহুল-মা'আনীতে فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا

الْمُجْرِمِيْنَ—আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কিয়ামতের দিন ডাক দেওয়া হবে অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কোরআন ও সুন্নাহ্র এ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মীরূপে খাড়া করে দিয়েছিল এবং অপরাধ ও উৎপীড়ন দমনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলেছিল, যারা আল্লাহ্ভীতির কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে; এ বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছে। আজকালও কোন দেশে যুদ্ধের আশংকা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নিবারণের জন্য জনগণকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান-প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এটা জানা কথা যে, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলন হয় না, বরং এ-কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয়। আজকালকার সাধারণ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে بر ও تقوى তথা সৎকর্ম ও আল্লাহ্ভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং اثم ও عدوان তথা পাপ এবং অত্যাচারের সকল পথ উন্মুক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম, ন্যায় ও অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদূর অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সব দেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি রোজ রোজ বেড়েই চলেছে। বলা বাহুল্য, এর কারণ দু'টি ঃ এক প্রচলিত সরকারগুলো কোরআনী ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বীয় জীবনে تقوى ও بر অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ্ভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করে—যদিও এর ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আক্ষেপ! তারা যদিও একবার পরীক্ষার জন্যই এ তিক্ত ঢোক গিলে ফেলতো এবং আল্লাহ্র কুদরতের তামাশা দেখতো যে, কিভাবে তাদের এবং জনগণের জীবনে সুখ, শান্তি, আরাম ও আনন্দের স্রোতধারা নেমে আসে!

দুই. জনগণ মনে করে নিয়েছে যে, অপরাধপ্রবণতা দমন করা একমাত্র সরকারের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও অপরাধ দমন করার উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। জনগণের বোঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর। এটা কোরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং আলোচ্য আয়াত وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ—এ বর্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

(৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ্ করেছ সেটা ছাড়া। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ্ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়—এ সব গুনাহ্র কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব, তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে পছন্দ করলাম। অতএব, যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে ; কিন্তু কোন গুনাহ্র প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের জন্য (এ সব জন্তু ইত্যাদি) হারাম করা হয়েছে, মৃত জন্তু, (যা যবেহ্ করা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়াই মরে যায়) এবং রক্ত (যা প্রবাহিত হয়) এবং শূকরের মাংস (শূকরের অন্যান্য অংশও) এবং যে জন্তু (নৈকট্য লাভের অভিপ্রায়ে) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য নামে উৎসর্গকৃত হয় এবং যা কণ্ঠরোধে মারা যায় এবং যা আঘাত লেগে মারা যায় এবং উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায় (উদাহরণত পাহাড় থেকে পড়ে অথবা কূপে পড়ে) এবং যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু (ধরে) ভক্ষণ করতে থাকে এবং (এ কারণে মারা যায়) কিন্তু (কণ্ঠরোধে মৃত থেকে নিয়ে হিংস্র জীব ভক্ষণ পর্যন্ত বর্ণিত জন্তুসমূহের মধ্য থেকে) যেটাকে তোমরা (প্রাণ বের হওয়ার পূর্বে) শরীয়তের নিয়মানুযায়ী যবেহ্ করতে পার (তা তোমাদের জন্য হালাল হবে) এবং (এছাড়া হারাম করা হয়েছে) যে জন্তু (আল্লাহ্ ছাড়া) অন্যের যজ্ঞবেদীতে যবেহ্ করা হয় (যদিও অন্যের নামে উৎসর্গ করা না

হয় কেননা, বদনিয়তের উপরই হারাম হওয়া নির্ভরশীল। বদনিয়ত কখনও কথায় প্রকাশ পায় ; যেমন অন্যের নামে উৎসর্গ করে দিলে, আবার কখনও কাজে প্রকাশ পায় ; যেমন অন্যের যজ্ঞবেদীতে যবেহ্ করলে) এবং (গোশ্‌ত ইত্যাদি) যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এসব গুনাহ্ (এবং হারাম)। অদ্য (অর্থাৎ এখন) কাফিররা তোমাদের ধর্ম থেকে (অর্থাৎ ইসলাম পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এরূপ ধারণা থেকে) নিরাশ হয়ে গেছে (কেননা, ইসলাম মাশাআল্লাহ্ খুব প্রসার লাভ করেছে)। অতএব তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) ভয় করো না (যে, তোমাদের দীনকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে) এবং আমাকে ভয় কর (আর্থাৎ আমার বিধি-বিধান অমান্য করো না) আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে (সর্ব প্রকারে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম (শক্তির দিক দিয়েও। ফলে কাফিররা নিরাশ হয়ে গেছে এবং বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির দিক দিয়েও) এবং (এ পূর্ণাঙ্গ করার মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম (ধর্মীয় অবদানও—ফলে বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে এবং জাগতিক অবদানের ক্ষেত্রেও শক্তি অর্জিত হয়েছে।) এবং আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হওয়ার জন্য (চিরতরে) মনোনীত করলাম। অর্থাৎ ইসলামই কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের দীন থাকবে। একে রহিত করে অন্য ধর্ম মনোনীত করা হবে না। সুতরাং তোমাদের উচিত আমার অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ ধর্মে পুরোপুরি কায়েম থাকা)। অতএব, (উল্লিখিত বস্তুগুলো যে হারাম, তা জেনে নেওয়ার পর আরও জেনে নাও যে,) যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে (এবং এ কারণে উল্লিখিত হারাম বস্তু খেয়ে ফেলে) কিন্তু কোন গুনাহ্র প্রতি প্রবণতা না থাকে (অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায় না এবং আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যেও খায় না। সূরা বাকারায় এ বিষয়বস্তুটি غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে) তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, (যদি প্রয়োজনের পরিমাণ অনুমান করতে ভুল হয় এবং এক আধ লোকমা বেশিও খেয়ে ফেলে) করুণাময় (কেননা, অপারক অবস্থায় ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি-বিধান ও মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাস'আলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্তু সম্পর্কিত। যেসব জন্তুর মাংস মানুষের জন্য শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর ; যেমন দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর, যেমন চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, কোরআন পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর মাংসে কোন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নেই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের জন্য মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বোঝানো হয়েছে, যা যবেহ ব্যতীত কোন রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এ ধরনের মৃত জন্তুর মাংস চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও।

তবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন—একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিডডী। —(মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা, দারে কুতনী,বায়হাকী)

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত। কোরআনের অন্য আয়াতে اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا বলায় বোঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা-ই হারাম ; সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিডডীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

তৃতীয় বস্তু শূকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে। মাংস বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বোঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ, ঐ জন্তু যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদিও যবেহ্র সময়ও অন্যের নাম নেওয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশরিকরা মূর্তিদের নামে যবেহ্ করতো। অধুনা কোন কোন মূর্খ লোক পীর-ফকীরের নামে যবেহ্ করে। যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে ; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে, তাই সাধারণ ফিকহ্বিদরা একেও وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াত দৃষ্টে হারাম বলেছেন।

পঞ্চমতম منخنقة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে।

ষষ্ঠ–موقوذة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচণ্ড আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারাল অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও موقوذة এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

منخنقة এবং ميتة উভয়টি موقوذة তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাহিলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েয মনে করা হতো। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়, তবে খেতে পারি কি না ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তীরের যে অংশ ধারাল নয়, যদি সেই অংশের আঘাতে শিকার মরে যায়, তবে তা موقوذة-এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে না। আর যদি ধারাল অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার। ইমাম জাস্সাস 'আহ্কামুল-কোরআন' গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরূপ শিকার হালাল হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে।

যে শিকার বন্দুকের গুলিতে মরে যায়, ফিকহ্বিদগণ সেটাকেও موقوذة-এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলতেন ঃ المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة। –অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তুকে হত্যা করা হয়, তা-ই موقوذة অতএব হারাম। (জাস্সাস)। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) শায়েফী, মালেকী প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত।—(কুরতুবী)

সপ্তম–متردية অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন পাহাড়, টিলা, উঁচু দালান অথবা কূপে পড়ে মরে যায়। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ যদি তুমি পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান কোন শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আঘাতে সে

নিচে পড়ে গিয়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না। কারণ, এতে সম্ভাবনা আছে যে, শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে নিচে পড়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় তা مُتَرَدِّيَة-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোন পাখীকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পানিতে পড়ে যায় তবে সেটা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে! —জাস্‌সাস)

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) এ বিষয়বস্তুটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। —(জাস্‌সাস)

অষ্টম–نَطِيحَة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমন রেলগাড়ী, মটর ইত্যাদির নিচে এসে মরে যায় অথবা কোন জন্তুর শিং-এর আঘাতে মরে যায়।

নবম–ঐ জন্তু হারাম, যেটি কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়।

উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ–অর্থাৎ এসব জন্তুর মধ্যে কোনটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ্ করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে।

এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা, মৃত ও রক্তকে যবেহ্ করার সম্ভাবনা নেই এবং শূকর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম। এ দুটোকে যবেহ্ করা না করা–উভয়ই সমান। এ কারণে হযরত আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীরা এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যক্তিক্রম প্রথমোক্ত চারটির ব্যাপারে নয়–পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তদবস্থায়ই বিসমিল্লাহ্ বলে যবেহ্ করে দেওয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে।

দশম--ঐ জন্তু হরাম, যাকে নুছুবের উপর যবেহ্ করা হয়। 'নুছুব' ঐ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কা'বা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহিলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশ্যে জন্তু কুরবানী করত। এটাকে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত।

জাহিলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সর্বপ্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিল। কোরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে।

একাদশ–اسْتِقْسَامُ بِالْأَزْلَامِ হারাম। ازلام শব্দটি زلم এর বহুবচন। এর অর্থ ঐ তীর, যা জাহিলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্য সাতটি তীর ছিল। তন্মধ্যে একটিতে نعم (হ্যাঁ) একটিতে لا (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কা'বাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। খাদিম তূন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। 'হাঁ' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে এলে মনে করা হতো যে, কাজটি উপকারী।

পক্ষান্তরে 'না' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তুসমূহের মাংস বন্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরীক হয়ে উট ইত্যাদি যবেহ করে তার মাংস প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বন্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে ভাগ করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশি মাংস পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বন্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলিমরা বলেন ঃ ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে যেমন ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, শকুন বিদ্যা ইত্যাদি সব استقسام بالازلام এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

استقسام بالازلام শব্দটি কখনও জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে গুটিকা নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। কোরআন পাক একে ميسر নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণেই হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ ও শা'বী বলেন ঃ আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হতো, পারস্য ও রোমেও তেমনি দাবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হতো। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে অংশ নির্ধারণের ন্যায় এগুলোও হারাম। —(মাযহারী)

ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বন্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ ذَالِكُمْ فِسْقٌ —অর্থাৎ এ বন্টন পদ্ধতি পাপাচার ও পথভ্রষ্টতা। এরপর বলা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ.

অর্থাৎ অদ্য কাফিরেরা তোমাদের দ্বীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহ্কে ভয় কর।

এ আয়াতটি হিজরতের দশম বছরের বিদায় হজ্জের আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলমানদের করতলে ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামী আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে : ইতিপূর্বে কাফিররা মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষাকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনা করতো। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নেই। এ কারণে মুসলমানরা যেন তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বীয় পালনকর্তার আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

এ আয়াতটি অবতরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এ দিনটি সারা বছরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল শুক্রবারে । এর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে আরাফাতের 'জবলে-রহমত' (রহমতের পাহাড়)-এর কাছে। এ স্থানটিই আরাফার দিনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময় আসরের পর-যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষত শুক্রবার দিনে। অনেক রেওয়ায়েত দৃষ্টে এ

দিনের এ সময়েই দোয়া কবূলের মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে। আরাফার দিনে আরও বেশি বৈশিষ্ট্য সহকারে দোয়া কবূলের সময়।

হজ্জের জন্য মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবায়ে-কিরাম উপস্থিত। রাহ্‌মাতুল্লিল-আলামীন সাহাবায়ে কিরামের সাথে জবলে-রহমতের নিচে স্বীয় উষ্ট্র আযবার পিঠে সওয়ার। সবাই হজ্জের প্রধান রোকন অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত।

এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের ছত্রছায়ায় উল্লিখিত পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সাহাবায়ে-কিরাম বর্ণনা করেন। যখন হযরত রাসূলে করিম (সা)-এর উপর ওহীর মাধ্যমে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুভার সহ্য করতে না পেরে উষ্ট্রী ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এ আয়াত কোরআনের শেষ দিককার আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। বলা হয় যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত এর পর নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন।। কেননা, দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জ তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে হযরত রাসূলে করিম (সা) ওফাত পান।

এ আয়াত যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি এর বিষয়বস্তুও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জন্য বিরাট সুসংবাদ, অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর বহন করে। এর সারমর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দীন ও আল্লাহ্‌র নিয়ামতের চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা ষোল কলায় পূর্ণ করে দেওয়া হলো। হযরত আদম (আ)-এর আমল থেকে যে সত্য ধর্ম ও আল্লাহ্‌র নিয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থানুযায়ী এ নিয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেওয়া হচ্ছিল আজ যেন সেই ধর্ম ও নিয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হলো।

এতে যেমন সব নবী ও রাসূলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৌভাগ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনি সাথে সাথে সব উম্মতের বিপরীতে তাঁর উম্মতেরও বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমূলক মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

এ কারণেই একবার কতিপয় ইহুদী আলিম হযরত ফারুক (রা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ আপনাদের কোরআনে এমন একটি আয়াত আছে, যা ইহুদীদের প্রতি অবতীর্ণ হলে তারা অবতরণের দিনটিকে ঈদ উৎসব হিসাবে উদ্‌যাপন করত। ফারুকে আযম প্রশ্ন করলেন ঃ আপনাদের ইঙ্গিত কোন্ আয়াতটির প্রতি ? তারা উত্তরে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি পাঠ করলেন।

হযরত ফারুকে আযম (রা) বললেন ঃ হ্যাঁ আমরা জানি এ আয়াতটি কোন্ জায়গায়, কোন্ দিনে অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এ দিনটি আমাদের জন্য একসাথে দু'টি ঈদের দিন। একটি আরাফা ও অপরটি জুমআ।

ঈদ ও উৎসবপর্ব উদ্‌যাপনের ইসলামী মূলনীতি ঃ ফারুকে আযম রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ উত্তরে একটি ইসলামী মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। এ মূলনীতিটি বিশ্বের সব জাতি ও ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। বিশ্বের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই নিজ নিজ অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। এসব দিন তাদের কাছে ঈদ অথবা উৎসবপর্বের মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে থাকে।

কোথাও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম অথবা মৃত্যু অথবা সিংহাসনারোহণ দিবস পালন করা হয় এবং কোথাও কোন বিশেষ দেশ অথবা শহর বিজয় অথবা কোন মহান ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি দিবস পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ইসলামে ব্যক্তিপূজার স্থান নেই। ইসলাম মূর্খতা যুগের যাবতীয় রীতিপ্রথা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্মৃতি পরিত্যাগ করে মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করার নীতি অবলম্বন করেছে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে 'খলীলুল্লাহ্' উপাধি দান করা হয়েছে। কোরআন পাক— وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ বলে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা ও তাতে তাঁর সাফল্যের প্রশংসা করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর জন্ম অথবা মৃত্যু বিদস উদ্‌যাপন করা হয়নি এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ) ও তদীয় জননীর জন্ম ও মৃত্যু দিবস অথবা কোন স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়নি।

হ্যাঁ, তাঁর কাজকর্মের মধ্যে যেসব বিষয় ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, সেগুলোর শুধু স্মৃতিই সংরক্ষিত রাখা হয়নি, বরং সেগুলোকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ধর্মের অঙ্গ তথা ফরয-ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। কুরবানী, খতনা, সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়াদৌড়ি, মিনার তিন জায়গায় কঙ্কর নিক্ষেপ—এগুলো সবই তাঁদের ক্রিয়াকর্মের স্মৃতি যা তাঁর আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে স্বীয় নফ্‌সের কামনা-বাসনা ও স্বভাবজাত দাবি পিষ্ট করে সম্পাদন করেছিলেন। এসব ক্রিয়াকর্ম প্রতি যুগের মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য প্রিয়তম বস্তুকে উৎসর্গ করে দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

এমনিভাবে ইসলামের যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন তাঁর জন্মমৃত্যু অথবা ব্যক্তিগত কোন সাফল্যের স্মৃতিতে দিবস পালন করার পরিবর্তে তাঁর ক্রিয়াকর্মের দিবস পালন করা হয়েছে। তাও আবার কোন বিশেষ ইবাদতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন শবে-বরাত , রমযানুল মুবারক, শবে ক্বদর, আরাফা দিবস, আশুরা দিবস ইত্যাদি। ঈদ মাত্র দুইটি—তাও খাঁটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচলিত করা হয়েছে। প্রথম ঈদ পবিত্র রমযানের শেষে এবং হজ্জের মাসগুলোর প্রারম্ভে এবং দ্বিতীয় ঈদ পবিত্র হজ্জব্রত সমাপনান্তে রাখা হয়েছে।

মোটকথা, হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর উপরোক্ত উত্তর থেকে বোঝা যায় যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ন্যায় আমাদের ঈদ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনুগামী নয় যে, যেদিনই কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হবে, সেদিনকেই আমরা ঈদ দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করব। প্রাচীন জাহিলিয়াতের যুগে এ প্রথাই প্রচলিত ছিল। আজকালকার আধুনিক জাহিলিয়াতও এ প্রথাটিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি অন্যান্য জাতির অনুকরণে মুসলমানরাও এতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মদিবসে 'ঈদে-মীলাদ' উদ্‌যাপন করে। তাদের দেখে কিছু সংখ্যক মুসলমান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মদিবসে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে একটি নতুন ঈদ উদ্ভাবন করেছে। এ দিবসে বাজারে মিছিল বের করা, তাতে বাজে ও অশালীন কর্মকাণ্ড করা এবং রাতে আলোকসজ্জা করাকে তারা ইবাদত মনে করে থাকে। অথচ সাহাবী, তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী মনীষীদের কাজেকর্মে এর কোন মূল খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রকৃত সত্য এই যে, যেসব জাতি প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ও বিস্ময়কর কীর্তির দিক দিয়ে কাঙাল, তাদের মধ্যে এসব দিবস পালনের রীতি প্রচলিত হতে পারে। সবেধন নীলমণির মত তাদের দু'চারটি ব্যক্তিত্ব এবং তাদের বিশেষ কীর্তিকেই স্মৃতিদিবস হিসাবে পালন করাকে তারা জাতীয় গৌরব বলে মনে করে।

ইসলামে এরূপ দিবস পালনের প্রথা চালু হলে এক লক্ষ্য চব্বিশ হাজারেরও অধিক পয়গম্বর রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই শুধু জন্ম নয়--বিস্ময়কর কীর্তিসমূহেরও দীর্ঘ তালিকা রয়েছে—এসবেরও দিবস পালন করা উচিত। পয়গম্বরদের পর শেষ নবী (সা)-এর পবিত্র জীবনালেখ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি দিনই অক্ষয় কীর্তিতে ভাস্বর হওয়ার কারণে তা পালন করা দরকার। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত যেসব প্রতিভা ও কীর্তির কারণে তিনি সমগ্র আরবে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, সেগুলো কি স্মৃতি উদ্‌যাপনের যোগ্য নয়? এরপর রয়েছে কোরআন অবতরণ, হিজরত, বদর যুদ্ধ, ওহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, হুনায়ন, তাবুক ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য যুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে একটিও এমন নয় যে, তার স্মৃতি উদ্‌যাপন না করলে চলে। এমনিভাবে তাঁর হাজার হাজার মো'জিযাও স্মৃতি উদ্‌যাপনের দাবি রাখে। সত্য বলতে কি, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে হযরত (সা)-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর পবিত্র জীবনের প্রত্যেক দিন নয়— প্রত্যেক মুহূর্তই স্মৃতি উদ্‌যাপনের যোগ্যতা রাখে।

হযরত (সা)-এর পর তাঁর প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবী রয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁর অনুপম জীবনযাত্রার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁদের স্মৃতি উদ্‌যাপন না করলে তা অবিচার হবে না কি? একবার এ প্রথা চালু হয়ে পড়লে সাহাবায়ে কিরাম মুসলিম মনীষীবৃন্দ, আল্লাহর ওলীগণ, ওলামা ও মাশায়েখ—যাঁদের সংখ্যা কয়েক কোটি হবে, স্মৃতি উদ্‌যাপনের তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া অবিচার ও অকৃতজ্ঞতা হবে না কি? পক্ষান্তরে যদি স্থিরীকৃত হয় যে, সবারই স্মৃতি দিবস উদ্‌যাপন করা হবে, তবে সারা বছরের একটি দিনও স্মৃতি উদ্‌যাপন থেকে মুক্ত থাকবে না। বরং প্রতিদিনের প্রতি ঘন্টায় কয়েকটি স্মৃতি ও কয়েকটি ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এ প্রথাকে জাহিলিয়াতের প্রথা আখ্যা দিয়ে বর্জন করেছেন। হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর উক্তিতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এবার আলোচ্য আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য শুনুন ঃ এতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর উম্মতকে তিনটি বিশেষ পুরস্কার প্রদানের সুসংবাদ দিয়েছেন ঃ এক. দীনের পূর্ণতা, দুই. নিয়ামতের সম্পূর্ণতা এবং তিন. ইসলামী শরীয়ত নির্বাচন।

দীনের পূর্ণতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআনের ভাষ্যকার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ আজ সত্য দীনের যাবতীয় ফরয-সীমা, বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পূর্ণ করে দেওয়া হলো। এখন এতে কোনরূপ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা এবং হ্রাস করার সম্ভাবনা বাকি নেই। (রূহুল- মা'আনী) এ কারণেই এ আয়াত অবতরণের পর কোন নতুন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। যে কয়েকখানি আয়াত এরপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা হয় উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের বিষয়বস্তু সম্বলিত, না-হয় পূর্ববর্ণিত বিধি-বিধানের তাকীদ সম্বলিত।

তবে ইজতিহাদের মূলনীতি অনুসরণ করে মুজতাহিদ ইমামরা যদি নতুন নতুন ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে বিধি-বিধান প্রকাশ করেন, তবে তা উপরোক্ত বর্ণনার পরিপন্থী নয়। কেননা কোরআন পাক যেমন বিধি-বিধানের সীমা, ফরয ইত্যাদি বর্ণনা করেছে, তেমনি ইজতিহাদের মূলনীতির ভিত্তিতে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব বিধি-বিধান প্রকাশ করা হবে, তা একদিক দিয়ে কোরআনেরই বর্ণিত বিধি-বিধান। কেননা, এগুলো কোরআন বর্ণিত মূলনীতির অধীন।

সারকথা দীনের পূর্ণতার অর্থ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী এই যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধানকে পূর্ণাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এতে কোনরূপ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা নেই এবং রহিত হয়ে কম হওয়ারও আশংকা নেই। কেননা, এর পরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের সাথে সাথে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর ওহী ছাড়া কুরআনের কোন নির্দেশ রহিত হতে পারে না। তবে ইজতিহাদের মূলনীতির অধীনে মুজতাহিদ ইমামদের পক্ষ থেকে যে বাহ্যিক পরিবর্ধন হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে পরিবর্ধন নয় ; বরং কুরআনী বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা মাত্র।

নিয়ামত সম্পূর্ণ করার অর্থ মুসলমানদের প্রাধান্য ও উত্থান এবং বিরুদ্ধবাদীদের পরাভূত ও বিজিত হওয়া। মক্কা বিজয়, মূর্খতা যুগের কু-প্রথার অবলুপ্তি এবং সে বছর হজ্জে কোন মুশরিকের যোগদান না করার মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রকাশ লাভ করে।

এখানে কোরআনের ভাষায় এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, আয়াতে دين এর সাথে اكمال। শব্দটি এবং نعمت এর সাথে اتمام। শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ اكمال ও اتمام। উভয়টিকে বাহ্যত সম-অর্থবোধক মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের অর্থের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, যা 'মুফরাদাতুল-কোরআন' গ্রন্থে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ কোন বস্তুর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে বলা হয় اكمال। ও تكميل এবং এক বস্তুর পর অন্য বস্তুর আবশ্যকতা ফুরিয়ে গেলে তাকে বলা হয় اتمام। সুতরাং اكمال دين এর সারমর্ম এই যে, এ জগতে আল্লাহ্‌র আইন ও ধর্মের বিধি-বিধান প্রেরণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা আজ পূর্ণ করে দেওয়া হলো এবং اتمام نعمت। এর অর্থ এই যে, এখন মুসলমানরা কারও মুখাপেক্ষী নয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রাধান্য, শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন, যদ্বারা তারা সত্য ধর্মের বিধি-বিধানকে কার্যকরভাবে জারি ও প্রয়োগ করতে পারে।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে دين-কে মুসলমানদের দিকে সম্বন্ধ করে دينكم বলা হয়েছে এবং نعمت-কে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করে نعمتى বলা হয়েছে। এর

কারণ এই যে, دين বা ধর্ম মুসলমানদের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে এবং نعمت সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পূর্ণত্ব লাভ করে। (ইবনে কাইয়্যেম--তফসীর আল-কাইয়্যেম)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এ কথাও ফুটে উঠেছে যে, অদ্য দীনের পূর্ণতা লাভের অর্থ এই নয় যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ধর্ম অপূর্ণ ছিল। বাহ্রে-মুহীত গ্রন্থে কাফফাল মরওয়াযীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক নবী ও রাসূলের ধর্মই তাঁর যমানা হিসাবে পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ ছিল। অর্থাৎ যে যুগে যে পয়গম্বরের প্রতি কোন শরীয়ত বা ধর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ যুগ ও ঐ জাতি হিসাবে সে ধর্মই ছিল পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে পূর্ব থেকেই এ কথা ছিল যে, এ জাতি ও এ যুগের জন্য যে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ, পরবর্তী যুগ ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের জন্য সে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হবে না ; বরং এ ধর্মকে রহিত করে অন্য ধর্ম ও শরীয়ত প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এর ব্যতিক্রম। এ শরীয়ত সর্বশেষ যুগে নাযিল হওয়ার কারণে সবদিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন বিশেষ যুগ, বিশেষ ভূখণ্ড অথবা বিশেষ জাতির সাথে এর সম্পর্ক নেই। বরং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ, প্রত্যেক ভূখণ্ড ও প্রত্যেক জাতির জন্য এটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় পুরস্কার এই যে, এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগত নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করেছেন, যা সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যাতে পারলৌকিক মুক্তি সীমাবদ্ধ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রদত্ত ইসলাম ধর্ম একটি বড় অবদান এবং এ ধর্মটিই সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ। এরপর নতুন কোন ধর্ম আগমন করবে না এবং এতে কোনরূপ সংযোজন-বিয়োজনও করা হবে না।

এ কারণেই আয়াতটি অবতরণের সময় সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু হযরত ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আপনি এ নশ্বর পৃথিবীতে আর বেশিদিন অবস্থান করবেন না। কেননা, দীন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাসূলের প্রয়োজনও মিটে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার এ বক্তব্যের সত্যতা সমর্থন করেন। (ইবনে কাসীর, বাহ্রে-মুহীত) সেমতে পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে যে, এর মাত্র একাশি দিন পর হযরত (সা) ইহজগৎ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ—আয়াতের শেষাংশের এ বাক্যটি শুরু ভাগে বর্ণিত হারাম জন্তুসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ বাক্যের উদ্দেশ্য একটি সাধারণ নিয়ম থেকে একটি বিশেষ অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিলে যদি উল্লিখিত হারাম বস্তুর কিছু অংশ খেয়ে জঠর জ্বালা নিবৃত্ত করে, তবে তার কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু এর জন্য শর্ত এই যে, উদর পূর্তি করা ও স্বাদ উপভোগ করাই যেন উদ্দেশ্য না হয়। বরং যতটুকুতে ক্ষুধার অস্থিরতা দূর হয় ততটুকুই খাওয়া উচিত।

আয়াতে غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ—বাক্যাংশের উদ্দেশ্য তাই যে, এ খাওয়ার ব্যাপারে গুনাহ্র দিকে ঝুঁকে পড়া উচিত নয় ; বরং শুধু ক্ষুধার অস্থিরতা দূর করার উদ্দেশ্য থাকা উচিত।

অবশেষে فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে ইশারা করা হয়েছে যে, এসব হারাম জন্তু ক্ষুধার তাড়নার সময়ও হারামই থাকে, তবে অস্থিরতার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ؗ فَكُلُوْا مِمَّاۤ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ④

(৪) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্য হালাল ? বলে দিন ঃ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্য এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে হালাল ও হারাম জন্তুর বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কেই একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিকারী কুকুর ও বাজপাখী দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আয়াতে তারই উত্তর বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, (কুকুর ও বাজপাখীর শিকার করা জন্তুর মধ্যে) কোন্ কোন্‌টি তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে ? (অর্থাৎ যেসব শিকার করা জন্তু যবেহ করলে হালাল হয়ে যায়, কুকুর ও বাজপাখী দ্বারা শিকার করলেও কি সেগুলো সব হালাল থাকে, না তন্মধ্যে কিছু বিশেষ জন্তু হালাল থাকে, না কোন অবস্থাতেই হালাল থাকে না? আর যেসব জন্তু হালাল হয়, সেগুলোর জন্যও কোন শর্ত আছে কি না ?) আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ তোমাদের জন্য সব হালাল জন্তু (অর্থাৎ শিকার জাতীয় যেসব জন্তু পূর্ব থেকে হালাল, কুকুর ও বাজপাখী দ্বারা শিকার করলেও সেগুলো সবই) হালাল রাখা হয়েছে। (এটি প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর। অতঃপর দ্বিতীয় অংশের উত্তর এই যে, কুকুর ও বাজপাখীর শিকার হালাল হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। তা এই যে,) যেসব শিকারী জন্তুকে (উদাহরণত কুকুর, বাজ ইত্যাদিকে) তোমরা (বিশেষভাবে--যা পরে বর্ণিত হচ্ছে) প্রশিক্ষণ দান কর (এটি প্রথম শর্ত) এবং তোমরা তাদের শিকারের লক্ষ্যে প্রেরণ কর (এটি দ্বিতীয় শর্ত) এবং তাদের (যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা পূর্বে বলা হয়েছে) ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ্ তা'আলা

তোমাদের (শরীয়তে) শিক্ষা দিয়েছেন। (এ প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি এই যে, কুকুরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে—যাতে সে শিকার ধরে নিজে না খায় এবং বাজপাখীকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে—যাতে ডাকা মাত্রই সে শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে থাকলেও তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে। এটি প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রথম শর্ত।) অতএব, এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খাও। (এটি তৃতীয় শর্ত। এর লক্ষণাদি প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। অতএব কুকুর যদি নিজে শিকারকে খেতে থাকে অথবা বাজপাখী ডাকে ফিরে না আসে, তবে বুঝতে হবে যে, জন্তুটি যখন মালিকের বশ হয়নি,তখন শিকারও মালিকের জন্য করেনি, বরং নিজে খাওয়ার জন্য করেছে) এবং (যখন শিকারের প্রতি শিকারী জন্তুকে প্রেরণ করতে থাকে, তখন) তার (অর্থাৎ জন্তুর উপর প্রেরণ করার সময়) আল্লাহ্‌র নামও লও (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে প্রেরণ কর---এটি চতুর্থ শর্ত) এবং (সব ব্যাপারে) আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। উদাহরণত শিকারে এমনভাবে মনোনিবেশ করো না যাতে নামায ইত্যাদির ব্যাপারেও উদাসীন হয়ে পড় কিংবা এতদূর লোভী হয়ো না যে, হালাল হওয়ার শর্তের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই শিকার করা জন্তু খেয়ে ফেল।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরে শিকারী কুকুর, বাজ ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্য চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। শিকার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন যে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে--নিজে খাওয়া শুরু করবে না। বাজপাখীর বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরত আসার জন্য ডাক দেওয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে--যদিও তখন কোন শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে থাকে। শিকারী জন্তু এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বোঝা যাবে যে, সে আপনার জন্য শিকার করে ; নিজের জন্য নয়। এমতাবস্থায় এগুলোর ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে গণ্য হবে। যদি শিকারী জন্তু কোন সময় এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে কিংবা বাজপাখী আপনার ডাকে ফেরত না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা খাওয়াও বৈধ নয়।

দ্বিতীয়. আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের পেছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ শর্তটি مكلبين শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এটি تكليب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ কুকুরকে শিক্ষা দেওয়া। এরপর সাধারণ শিকারী জন্তুকে শিক্ষা দেওয়ার পর শিকারের দিকে প্রেরণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। জালালাইন-এর গ্রন্থকার مكلبين শব্দের ব্যাখ্যায় ارسال। শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ শিকারের দিকে প্রেরণ করা। তফসীরে কুরতুবীতেও এ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় শর্ত এই যে, শিকারী জন্তু নিজে শিকারকে খাবে না; বরং আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ শর্ত এই যে, শিকারী কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলতে হবে। বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আপনার হাতে পৌঁছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে, যবেহ্ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তবে যবেহ ব্যতীত হালাল হবে না।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে একটি পঞ্চম শর্তও রয়েছে। তা এই যে, শিকারী জন্তু শিকারকে আহতও করতে হবে। جوارح শব্দে এ শর্তের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

যে সব বন্য জন্তু করতলগত নয়, উপরোক্ত মাস'আলা তাদের বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কোন বন্য জন্তু কারও করতলগত হয়ে গেলে, নিয়মিত যবেহ্ করা ব্যতীত হালাল হবে না।

উপসংহারে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শিকার করা জন্তু হালাল করেছেন ঠিক, কিন্তু শিকারের পেছনে লেগে নামায ও শরীয়তের অন্যান্য জরুরী নির্দেশের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই বৈধ নয়।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۡ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ
مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ ٥

(৫) আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো। আহ্লে-কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্য হালাল সতীসাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতীসাধবী নারী, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে যখন তোমরা মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্য, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আজ (তোমাদের প্রতি যেমন ধর্মীয় চিরস্থায়ী পুরস্কার অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের ধর্মকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে, তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য জাগতিক পুরস্কারও তোমাদের দান করা হয়েছে যে,) তোমাদের জন্য হালাল বস্তুসমূহ (যা ইতিপূর্বে হালাল করা হয়েছিল,

চিরকালের জন্য) হালাল রাখা হলো (অর্থাৎ তা আর কখনও রহিত হবে না) এবং যারা (তোমাদের পূর্বে ঐশী) গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে, (অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টান) তাদের যবেহ্ করা জন্তু (ও) তোমাদের জন্য হালাল এবং (এর হালাল হওয়া এমনি নিশ্চিত, যেমন) তোমাদের যবেহ্ করা জন্তু তাদের জন্য হালাল এবং সতীসাধ্বী মহিলারাও যারা মুসলমান (তোমাদের জন্য হালাল) এবং (মুসলমান মহিলাদের হালাল হওয়া যেমন নিশ্চিত, তেমনি) তোমাদের পূর্বে যারা (ঐশী) গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে সতীসাধ্বী মহিলাও (তোমাদের জন্য হালাল) যখন তোমরা তাদের বিনিময় প্রদান কর। (অর্থাৎ মোহরানা দেওয়া শর্ত না হলেও ওয়াজিব। উল্লিখিত যেসব মহিলা হালাল করা হয়েছে, তা) এভাবে যে, তোমরা (তাদের) স্ত্রী কর (অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর। এর শর্তাবলী শরীয়তে সুবিদিত) প্রকাশ্যে ব্যভিচার করবে না এবং গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হবে না। (এসব শরীয়তের বিধি-বিধান। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয)। এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয়ে অবিশ্বাস করবে (উদাহরণত অকাট্য হালাল বস্তুর হালাল হওয়া এবং অকাট্য হারাম বস্তুর হারাম হওয়াকে অবিশ্বাস করবে) তার (প্রত্যেক সৎ) কর্ম বিনষ্ট (ও বৃথা) হবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সুতরাং হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে কর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতে গৃহপালিত জন্তু-ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদির হালাল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে নয় প্রকার হারাম জন্তুর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের বিবরণে প্রথম বাক্যেই গোটা অধ্যায়ের সারমর্ম এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে হালাল ও হারাম হওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ এর একটি মাপকাঠি ও মূলনীতি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ — অর্থাৎ আজ তোমাদের জন্য সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হলো। 'আজ' বলে ঐ দিনকে বোঝানো হয়েছে যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ দশম হিজরীর বিদায় হজ্জের আরাফার দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্য হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হলো। এ নির্দেশ রহিত হওয়ার সম্ভবনা শেষ হয়ে গেছে। কেননা, অচিরেই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এ আয়াতে طيبات অর্থাৎ পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ — অর্থাৎ আল্লাহ্ হালাল করেন তাদের জন্য طيبات এবং হারাম করেন خبائث এখানে طيبات এর বিপরীতে خبائث ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

অভিধানে طيبات পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে خبائث নোংরা ও ঘৃণার্হ বস্তুসমূহকে বলা হয়। কাজেই আয়াতের এ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোংরা, ঘৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, জগতে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া-পরা, নিদ্রা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই মানুষকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। এ কারণেই অসচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ আখ্যা লাভেরই যোগ্য নয়।

কোরআন পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে ঃ بَلْ هُمْ اَضَلُّ অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট। যখন চরিত্র সংশোধনের উপর মানবের মানবতা নির্ভরশীল,তখন যেসব বস্তু মানব চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব চরিত্রের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যখন মানবচরিত্র প্রভাবান্বিত হয় তখন যে বস্তু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চরিত্র অবশ্যই প্রভাবান্বিত হবে। এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদির আমদানী যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চিতরূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

এ কারণেই কোরআন পাক বলে ঃ يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا —এখানে সৎকর্মের জন্য হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতীত।

বিশেষ করে মাংস মানব দেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুতরাং যে মাংস চরিত্র বিনষ্ট করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অধিকতর জরুরী। এমনিভাবে সে মাংস থেকেও বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক দিয়ে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কেননা, এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরীয়ত যেসব বস্তুকে নোংরা ও ঘৃণার্হ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপেই মানুষের দেহ কিংবা আত্মা অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধ্বংস করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বস্তু দ্বারা মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। মোটকথা اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ বাক্যটিতে হালাল ও হারাম হওয়ার দর্শন এবং মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে।

এখন কোন্ কোন্ বস্তু طيبات অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও কাম্য এবং কোন্ কোন্ বস্তু خبائث অর্থাৎ নোংরা, ক্ষতিকর ও ঘৃণার্হ, তা সুস্থ রুচিজ্ঞানের আগ্রহ ও অনীহার উপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই যেসব জন্তুকে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে, প্রতি যুগের সুস্থ স্বভাব মানুষই সেগুলোকে নোংরা ও ঘৃণার্হ মনে করে এসেছে। যেমন মৃত জন্তু, রক্ত ইত্যাদি। তবে মাঝে মাঝে মূর্খতাসুলভ রীতিনীতি সুস্থ স্বভাবের উপর প্রবল হয়ে যায়। ফলে ভাল ও মন্দের

পার্থক্য লোপ পায় অথবা কোন কোন বস্তুর নোংরামিও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যাপারে পয়গম্বরদের সিদ্ধান্ত সবার জন্য অকাট্য দলীলস্বরূপ। কেননা মানুষের মধ্যে পয়গম্বরই সর্বাধিক সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে তাদরেকে সুস্থ স্বভাব দ্বারা ভূষিত করেছেন। স্বয়ং তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের চারদিকে ফেরেশতাদের পাহারা বসিয়েছেন। ফলে তাঁদের মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র কোন ভ্রান্ত পরিবেশ দ্বারা দূষিত হতে পারে না। তাঁরা যেসব বস্তুকে নোংরা আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে নোংরা এবং যে সব বস্তুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

অতএব নূহ্ (আ)-এর আমল থেকে শেষ নবী (সা)-এর আমল পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বর মৃত জন্তু ও শূকর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রতি যুগের সুস্থ-স্বভাবসম্পন্ন মনীষীরা এগুলোকে নোংরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে করেছেন।

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (র) 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগা' গ্রন্থে বলেন,--ইসলামী শরীয়তে হারামকৃত জন্তুগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে সেগুলো দুটি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার জন্তু সৃষ্টিগত ও স্বভাবগতভাবে নোংরা ও অপবিত্র এবং দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর যবেহ্ পদ্ধতি ভ্রান্ত, ফলে সেটাকে যবেহ্ করা জন্তুর পরিবর্তে মৃত বলেই সাব্যস্ত করা হবে।

সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে নয়টি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। তন্মধ্যে শূকর প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট আটটি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাক وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ। বলে সংক্ষেপে সব নোংরা ও অপবিত্র জন্তু হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অতঃপর শূকরের মাংস, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুর নাম পরিষ্কার উল্লেখ করেছে। অবশিষ্ট নোংরা ও অপবিত্র বস্তুসমূহের বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি জন্তু বিশেষের خَبِيث তথা নোংরা হওয়ার আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ কোন জাতিকে শাস্তি হিসাবে কোন জন্তুর আকৃতিতে বিকৃত ও রূপান্তরিত করা হলে বোঝা যায় যে, জন্তুটি স্বভাবগতভাবে নোংরা। ফলে যারা আল্লাহ্র গযবে পতিত, তাদেরকে সেসব জীবের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণত কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ অর্থাৎ কোন কোন জাতিকে শাস্তি হিসাবে শূকর ও বানরের আকৃতিতে বিকৃত করা হয়েছে। অতএব বোঝা যায় যে, এই দুই প্রকার জন্তু স্বভাবগতভাবেই নোংরা শ্রেণীভুক্ত। নিয়মিত যবেহ করলেও এগুলো হালাল হবে না। এছাড়া অনেক জন্তু এমনও আছে, ক্রিয়াকর্ম ও লক্ষণাদি দ্বারা সেগুলোর নোংরা হওয়ার বিষয় প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে। উদাহরণত হিংস্র জন্তু। অন্যান্য জন্তুকে ক্ষত-বিক্ষত করা, ছিঁড়ে-খামছে ভক্ষণ করা এবং নির্মমতাই এদের কাজ।

এ কারণেই একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাঘ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন ঃ কোন মানুষ একে খেতে পারে কি ? এমনিভাবে অনেক জন্তু রয়েছে কষ্ট দেওয়া এবং বিভিন্ন বস্তু ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া তাদের অভ্যাস। যেমন সাপ, বিচ্ছু, টিকটিকি, মাছি, চিল, বাজ ইত্যাদি।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সাধারণ নীতি হিসাবে বর্ণনা করেন যে, দাঁত দ্বারা ছিড়ে খাঁয় এমন প্রত্যেক হিংস্র জন্তু যেমন সিংহ, বাঘ ইত্যাদি এবং নখ দ্বারা শিকার করে এমন প্রত্যেক পাখী যেমন বাজ, চিল ইত্যাদি সবই হারাম। এছাড়া ইঁদুর, মৃতভোজী জন্তু, গাধা ইত্যাদির স্বভাব হচ্ছে হীনতা, নিকৃষ্টতা ও অপবিত্রতার সাথে জড়িত হওয়া। এসব জন্তুর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষতিকর হওয়া প্রত্যেক সাধারণ সুস্থ স্বভাব ব্যক্তিই অনুভব করতে সক্ষম।

মোটকথা এই যে, ইসলমী শরীয়ত যেসব জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তন্মধ্যে এক প্রকার জন্তুর মধ্যেও প্রকৃতিগতভাবে নোংরামি পরিলক্ষিত হয়নি। দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর মাঝে প্রকৃতিগতভাবে কোন নোংরামি নেই; কিন্তু জন্তু যবেহ্ করার যে পদ্ধতি আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন, সেটাকে সে পদ্ধতিতে যবেহ্ করা হয়নি। এখন এর ধরন বিভিন্ন হতে পারে ঃ এক. মূলত যবেহ্ করা হয়নি। যেমন হেঁচকা টানে মেরে ফেলা, আঘাত করে মারা ইত্যাদি। দুই. যবেহ্ করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্র নামের পরিবর্তে অন্যের নাম নিয়ে। তিন. কারও নাম নেওয়া হয়নি এবং যবেহ্ করার সময় ইচ্ছকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়নি। এরূপ যবেহ্ শরীয়তে ধর্তব্য নয়, বরং যবেহ্ ব্যতীত মেরে ফেলারই শামিল।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মানুষ আল্লাহ্প্রদত্ত নিয়ামত পানাহার করে। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার ছাড়া অন্য কোন বস্তু পানাহারের সময় এরূপ বাধ্যবাধকতা নেই যে, 'আল্লাহু আকবার' অথবা 'বিস্মিল্লাহ্' বলেই পানাহার করতে হবে--নতুবা হালাল হবে না। বড়জোর প্রত্যেক বস্তু পানাহারের সময় 'বিস্মিল্লাহ্' বলা মোস্তাহাব। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ তখন আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করলে জন্তুটি মৃত ও হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর রহস্য কি?

চিন্তা করলেই পার্থক্যটি ফুটে উঠে। প্রাণীদের প্রাণ এক দিক দিয়ে সব সমান। তাই এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করবে এবং যবেহ করে খেয়ে ফেলবে, বাহ্যত তা বৈধ হওয়া সমীচীন নয়। এখন যাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এটি একটি বিরাট নিয়ামত বলতে হবে। অতএব, জন্তু যবেহ্ করার সময় কল্পনায় এ নিয়ামতের উপলব্ধি ও শোকর আদায়কে জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। খাদ্যশস্য, দানা, ফল ইত্যাদি এর বিপরীত। এগুলো সৃজিতই হয়েছে যাতে মানুষ এগুলোকে কেটে-পিষে স্বীয় প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাই, শুধু বিস্মিল্লাহ্ বলা মোস্তাহাব পর্যায়ে রাখা হয়েছে-- ওয়াজিব বা জরুরী করা হয়নি।

এর আরও একটি কারণ এই যে, মুশ্রিকরা জন্তু যবেহ্ করার সময় দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করতো। এ কথা জাহিলিয়াত যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ইসলামী শরীয়ত তাদের এই কাফিরসুলভ প্রথাকে একটি চমৎকার ইবাদতে রূপান্তরিত করে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করাকে জরুরী সাব্যস্ত করেছে। ভ্রান্ত নামের পরিবর্তে বিশুদ্ধ নাম প্রস্তাব করাই ছিল এ মুশরিকসুলভ প্রথা মিটাবার প্রকৃষ্ট পন্থা। নতুবা প্রচলিত প্রথা ও অভ্যাস পরিত্যক্ত হওয়া ছিল সুকঠিন।

এ পর্যন্ত আয়াতের প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যা বর্ণিত হলো। দ্বিতীয় বাক্য এই ঃ

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ‐

অর্থাৎ আহ্‌লে-কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহ্‌লে-কিতাবদের জন্য হালাল।

এক্ষেত্রে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে 'খাদ্য' বলতে যবেহ্ করা জন্তুকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবুদ্দারদা, ইবরাহীম, কাতাদাহ্, সুদ্দী, যাহ্হাক, মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে। (রুহুল-মা'আনী, জাস্সাস) কেননা, অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহ্‌লে-কিতাব, মূর্তি উপাসক, মুশরিক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে যবেহ্ করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোন লোকের কাছ থেকে, যে কোন বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলমানের জন্য খাওয়া হালাল। অতএব, আলোচ্য বাক্যের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের যবেহ্ করা জন্তু আহ্‌লে-কিতাবদের জন্য হালাল।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় আহ্‌লে-কিতাব কারা ? কিতাব বলে কোন্ কিতাবকে বোঝানো হয়েছে ? আহ্‌লে-কিতাব হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করাও জরুরী কিনা ? এটা জানা কথা যে, এ স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোন লিখিত পাতাকে বোঝানো হয়নি, বরং যে কিতাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমন করেছে, তাই বোঝানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই যে, এখানে ঐসব ঐশী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে,, যেগুলো আল্লাহ্‌র কিতাব হওয়া কোরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত। যেমন তওরাত, ইঞ্জীল, যবূর, মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি এসব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সেগুলোকে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বলে মনে করে, তারাই আহ্‌লে-কিতাব। পক্ষান্তরে যা আল্লাহ্‌র কিতাব বলে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নিশ্চিত বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেরূপ কোন কিতাবের অনুসারীরা আহ্‌লে-কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন মক্কার মুশরিক, অগ্নি উপাসক, মূর্তি পূজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। এতে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় ইহুদী ও খ্রিস্টান জাতিই আহ্‌লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাসী।

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে 'সাবেয়ীন'। তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত। যেসব আলিমের মতে যারা দাঊদ (আ)-এর যবুরের প্রতি ঈমান রাখেন, তাঁরা তাদেরও আহ্‌লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আর যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যবুর কিতাবের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই, এরা তারকা উপাসক জাতি, তাঁরা এদের মূর্তি ও অগ্নি উপাসকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মোটকথা, নিশ্চিতরূপে যাদের আহ্‌লে কিতাব বলা যায় তারা হলো ইহুদী ও খ্রিস্টান জাতি। তাদের যবেহ্ করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের যবেহ্ করা জন্তু তাদের জন্য হালাল।

এখন দেখতে হবে, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের আহ্‌লে-কিতাব মনে করার জন্য এরূপ কোন শর্ত আছে কি না যে, প্রকৃত তওরাত ও ইঞ্জীল অনুযায়ী বিশুদ্ধ আমল করতে হবে, না বিকৃত

তওরাত ও ইঞ্জীলের অনুসারী এবং ঈসা ও মরিয়ম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্তকারীরাও আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হবে ? কোরআন পাকের অসংখ্য বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আহ্লে-কিতাব হওয়ার জন্য কোন ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী হওয়ার দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট--যদিও অনুসরণ করতে গিয়ে হাজারো পথভ্রষ্টতায় পতিত থাকে।

কোরআন পাক যাদের আহ্লে-কিতাব বলে আখ্যায়িত করেছে তাদের সম্পর্কে বারবার এ কথাও উল্লেখ করেছে যে, এরা নিজেদের ঐশী গ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করে— يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ এবং এ কথাও বলেছে যে, ইহুদীরা হযরত ওযায়র (আ)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র সাব্যস্ত করেছে।

قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ بْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ۔

এতদসত্ত্বেও যখন কোরআন তাদের আহ্লে-কিতাব বলেই আখ্যা দেয়, তখন বোঝা গেল যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহুদীবাদ ও খ্রিস্টবাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করবে, ততক্ষণ তারা আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত--বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত হোক এবং আমল যতই মন্দ হোক না কেন।

ইমাম জাস্সাস 'আহ্কামুল-কোরআন' গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্তা পত্রের মাধ্যমে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেন যে, এখানে এমন কিছু লোক বসবাস করে, যারা তওরাত পাঠ করে এবং ইহুদীদের শনিবারকে পবিত্র দিবস মনে করে, কিন্তু কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে ? হযরত ফারুকে আযম (রা) উত্তরে লিখে পাঠালেন ঃ তাদেরকে আহ্লে-কিতাবেরই একটি দল বলে মনে করতে হবে।

ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা নাস্তিক, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয় ঃ আজকাল ইউরোপে বিরাট সংখ্যক ইহুদী ও খ্রিস্টান রয়েছে, যারা শুধু আদম শুমারীর দিক দিয়েই ইহুদী ও খ্রিস্টান বলে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না ' তওরাত ও ইঞ্জীলকে আল্লাহ্র গ্রন্থ বলে মনে করে না এবং মূসা ও ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র নবী ও পয়গম্বর বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এটা জানা কথা যে, এরূপ ব্যক্তি আদম শুমারীর নামের কারণে আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

খ্রিস্টানদের সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেছেন যে, তাদের যবেহ করা জন্তু হালাল নয়। কেননা, খ্রিস্টধর্মের মধ্য থেকে একমাত্র মদ্যপান ব্যতীত আর কোন কিছুতেই তারা বিশ্বাসী নয়। তাঁর উক্তি এরূপ ঃ

روي ابن الجوزی بسنده عن علی (رض) قال لا تأكلوا من ذبائح نصاری بنی تغلب فانهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيئ الاشربهم الخمر ــ ورواه الشافعي بسند صحيح عنه۔

"ইবনুল-জওযী বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আলী (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, বনী তাগলিবের খ্রিস্টানদের যবেহ্ করা জন্তু খেয়ো না। কেননা, তারা খ্রিস্টধর্ম থেকে মদ্যপান ব্যতীত আর কোন কিছুতেই গ্রহণ করেনি। ইমাম শাফেয়ীও বিশুদ্ধ সনদসহ এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।" (তফসীরে মাযহারী, ৩৪ পৃ., ৩য় খণ্ড, মায়েদা)

বনী তাগলিব সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-এর এ কথাই জানা ছিল যে, তারা বেদীন— খ্রিস্টান নয়, যদিও খ্রিস্টান বলে কথিত হয়। তাই তিনি তাদের যবেহ্ করা জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীর অনুসন্ধান অনুযায়ী তারাও সাধারণ খ্রিস্টানদের মত পুরোপুরিভাবে ধর্মে অবিশ্বাসী নয়। তাই তাঁরা তাদের যবেহ্ করা জন্তুকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন।

وقال جمهور الامة ان ذبيحة كل نصرانى حلال سواء كان من بنى تغلب او غيرهم وكذلك اليهود .

"উম্মতের অধিক সংখ্যক আলিম বলেন ঃ খ্রিস্টানদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল—সে খ্রিস্টান বনী তাগলিবেরই হোক ; অথবা অন্য কোন গোত্রের ও দলের হোক। এমনিভাবে প্রত্যেক ইহুদীর যবেহ্ করা জন্তুও হালাল।" (কুরতুবী, ৭৮ পৃ., ৬ষ্ঠ খণ্ড)

মোটকথা এই যে, যেসব খ্রিস্টান সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র নবী বলে স্বীকার করে না, তারা আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নয়।

'আহ্লে-কিতাবের খাদ্য বলে কি বোঝানো হয়েছে ? طعام শব্দের আভিধানিক অর্থ খাদ্যদ্রব্য। শাব্দিক অর্থে সর্বপ্রকার খাদ্যই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধিক সংখ্যক আলিমের মতে এ স্থলে طعام বলে শুধু আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্ করা মাংসকে বোঝানো হয়েছে। কেননা মাংস ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে আহ্লে-কিতাব ও অপরাপর কাফিরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। শুকনো আহার্য বস্তু গম, ছোলা, চাল, ফল ইত্যাদি প্রত্যেক কাফিরের হাতের খাওয়াও হালাল। এতে কারও দ্বিমত নেই। তবে যেসব খাদ্য মানুষের হাতে প্রস্তুত হয়, সেগুলোর ব্যাপারে যেহেতু কাফিরদের বাসন-কোসন ও হাতের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেহেতু তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। কিন্তু এতে মুশরিক মূর্তিপূজারীর যে অবস্থা, আহ্লে-কিতাবদেরও একই অবস্থা। কারণ, অপবিত্রতার আশংকা উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

মোটকথা, আহ্লে-কিতাব ও অন্যান্য কাফিরের খাদ্যদ্রব্যে শরীয়তানুযায়ী যে পার্থক্য হতে পারে, তা শুধু তাদের যবেহ্ করা মাংসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ কারণে আলোচ্য আয়াতে সর্বসম্মতভাবে আহ্লে-কিতাবদের খাদ্য বলে তাদের যবেহ্ করা জন্তু বোঝানো হয়েছে। তফসীরবিদ কুরতুবী লিখেন ঃ

والطعام اسم يؤكل والذبائح منه وهو ههنا خاص بالذبائح عند

كثير من اهل العلم بالتاويل واما ما حرم من طعامهم فليس بداخل فى عموم الخطاب .

طعام শব্দটি প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যবেহ্ করা মাংসও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতে طعام শব্দটি অধিকাংশ আলিমের মতে বিশেষভাবে যবেহ্ করা জন্তুর ব্যাপারেই বলা হয়েছে। আহ্‌লে-কিতাবদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যেগুলো মুসলমানদের জন্য হারাম করা হয়েছে, সেগুলো আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত নয়। (কুরতুবী, ৭৭ পৃ., ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এরপর ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কিত আরও বিবরণ বর্ণনা করেছেন ঃ

لا خلاف بين العلماء ان ما لا يحتاج الى ذبح كالطعام الذى لا محاولة فيه كالفاكهة والبر - جائز اكله اذ لا يضر فيه تملك احد والطعام الذى تقع فيه المحاولة على ضربين احدهما ما فيه محاولة صنعة لا تعلق لها بالدين كخبزة الدقيق وعصره الزيت ونحوه - فهذا ان تجنب من الذمى فعلى وجه التقذر والضرب الثانى التزكية التى ذكرنا انها هى التى تحتاج الى الدين والنية - فلما كان القياس ان لا تجوز ذبائحهم كما نقول انهم لا صلوة لهم ولا عبادة مقبولة له رخص الله تعالى فى ذبائحهم على هذه الآمة واخرجها النص عن القياس على ما ذكرنا من قول ابن عباس .

"আলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, সেসব খাদ্যদ্রব্য, যেগুলো তৈরি করতে যবেহ্ করতে হয় না—যেমন, ফল, গমের আটা ইত্যাদি–এগুলো খাওয়া জায়েয। কেননা, যে কেউ এগুলোর মালিক হয়, তাতে কোনরূপ ক্ষতি হয় না। তবে ঐসব খাদ্য, যাতে মানুষের কিছু কাজ করতে হয়, সেগুলো দুই প্রকার। যাতে এমন কাজ করতে হয়, যার ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণত আটা দিয়ে রুটি তৈরি করা, যয়তুন থেকে তেল বের করা ইত্যাদি। এগুলো খাওয়া জায়েয। কাফির ও যিম্মীর এমন খাদ্য থেকেও যদি কেউ বেঁচে থাকতে চায়, তবে তা হবে রুচির ব্যাপার। দুই–ঐ খাদ্য, যাতে যবেহ্ করার কাজ করতে হয়। এর জন্য ধর্ম ও নিয়ত প্রয়োজন। যদিও কিয়াসের দাবি ছিল এই যে, কাফিরের নামায ও ইবাদতের মত তার যবেহ্ করার কাজটিও কবুল না হওয়া উচিত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের জন্য বিশেষভাবে তাদের যবেহ করা জন্তু হালাল করে দিয়েছেন। কোরআনের আয়াত বিষয়টি কিয়াসের ইখতিয়ার-বহির্ভূত করে দিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের এ উক্তিই আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।" –(কুরতুবী, ৭৭ পৃ. ৬ষ্ঠখণ্ড) মোটকথা আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদ আলিমদের ঐকমত্যে আহ্‌লে-কিতাবদের খাদ্য বলে খাদ্যকে বোঝানো হয়েছে, যার হালাল

হওয়া ধর্ম ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল—অর্থাৎ যবেহ্ করা জন্তু। এ কারণেই এ খাদ্যের ব্যাপারে আহ্‌লে-কিতাবদের সাথে স্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা তারাও আল্লাহ্‌র প্রেরিত গ্রন্থ ও পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাসের দাবিদার। তবে তারা স্বীয় গ্রন্থে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধন করে এ দাবিকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। ফলে শিরক ও কুফরের আবর্তে পতিত হয়েছে। কিন্তু মূর্তিপূজারী মুশরিকদের অবস্থা এর বিপরীত। তাঁরা কোন ঐশী গ্রন্থ অথবা নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাবিও করে না। তারা যেসব গ্রন্থ ও ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস রাখে, তা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ নয় এবং তাদের নবী ও রাসূল হওয়াও আল্লাহ্ তা'আলার কোন উক্তি দ্বারা প্রমাণিত নয়।

আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ ঃ এটি আলোচ্য বিষয়বস্তুর তৃতীয় প্রশ্ন। এর উত্তর অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এই দেওয়া হয় যে, কাফিরদের মধ্য থেকে আহ্‌লে-কিতাব ইহুদী ও খ্রিস্টানদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল হওয়া এবং তাদের মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দুটি মাস'আলায় তাদের ধর্মমতও ইসলামের হুবহু অনুরূপ। আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে জন্তু যবেহ্ করাকে তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরী মনে করে। এ ছাড়া মৃত জন্তুকেও তারা হারাম মনে করে।

এমনিভাবে ইসলামে যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম, তাদের ধর্মেও তাদের বিয়ে করা হারাম। ইসলামে যেমন বিবাহ প্রচার করা ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হওয়া জরুরী, তেমনি তাদের ধর্মেও এসব বিধি-বিধান জরুরী।

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষ্য এরূপ ঃ

(وطعام اهل الكتاب) قال ابن عباس وابو امامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابراهيم النخعي والسدى ومقاتل بن حيان يعنى ذائحهم حلال المسلمين لانهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم الااسم الله وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس.

"ইবনে আব্বাস, আবূ উমামা, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, আতা, হাসান, মকহুল, ইবরাহীম, সুদ্দী ও মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান (র) আহ্‌লে-কিতাবদের খাদ্যের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাদের যবেহ্ করা জন্তু মুসলমানদের জন্য হালাল। কেননা, তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন নাম নিয়ে যবেহ্ করাকে হারাম মনে করে। তারা জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নাম উচ্চারণ করে না—যদিও তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব আজগুবী বিশ্বাস পোষণ করে, যা থেকে আল্লাহ্‌পাকও পবিত্র।"—(ইবনে কাসীর)

ইবনে-কাসীরের এ বর্ণনা থেকে প্রথমত জানা গেল যে, উল্লিখিত সব সাহাবী ও তাবেয়ীনের মতে আয়াতে আহ্‌লে-কিতাবের খাদ্য বলে তাদের যবেহ্ করা জন্তুকেই বোঝানো হয়েছে এবং এটি যে হালাল, সে বিষয়ে উম্মতের সবাই একমত।

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, তাঁদের মতে আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ এই যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মে অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও যবেহ্ করার মাস'আলাটি ইসলামী শরীয়তের অনুরূপ রয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে যবেহ্ করা জন্তুকে তারাও হারাম মনে করে এবং যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা জরুরী মনে করে। এটা ভিন্ন কথা যে, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মুশরিকসুলভ ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ আর মরিয়ম-তনয় মসীহ্‌কে এক মনে করতে শুরু করেছে। কোরআন পাক নিম্নোক্ত ভাষায় তাদের এ গোমরাহী উল্লেখ করেছে ঃ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ —"নিশ্চিতরূপেই তারা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে ঃ আল্লাহ্ তো মসীহ্ ইবনে মরিয়মই।"

এ আলোচনার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, সূরা বাকারা ও সূরা আন'আমের যেসব আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে যবেহ্ করা জন্তু এবং আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ ছাড়া যবেহ করা জন্তুকে হারাম বলা হয়েছে, সেসব আয়াত যথাস্থানে অপরিবর্তনীয় ও কার্যকর রয়েছে। সূরা মায়েদার যে আয়াতে আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তুকে হালাল বলা হয়েছে, সে আয়াতেও উপরিউক্ত সূরাদ্বয়ের আয়াতসমূহ থেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে না। কেননা, আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তুকে হালাল বলার কারণও তাই যে, তাদের বর্তমান ধর্মেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা জন্তু এবং আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া যবেহ্ করা জন্তু হারাম। বর্তমান যুগেও তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব কপি পাওয়া যায় তাতেও যবেহ্ ও বিয়ের বিধি-বিধান প্রায় তাই যা কোরআন ও ইসলামে আছে। এর বিস্তারিত উদ্ধৃতি পরে উল্লেখ করা হবে।

হ্যাঁ, এটা সম্ভব যে, কিছুসংখ্যক মূর্খ লোক এ ধর্মীয় নির্দেশের বিপরীতে অন্য কোন আমল করবে যেমন অনেক লেখাপড়া না জানা মুসলমানের মধ্যেও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথা অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু এসব কুপ্রথাকে ইসলাম ধর্ম বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। খ্রিস্টানদের মূর্খ জনগণের কর্মপদ্ধতি দেখেই কোন কোন তাবেয়ী বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, খ্রিস্টানরা জন্তু যবেহ করার সময় কি কি করে—কেউ মসীহ্ অথবা উযায়েরের নাম উচ্চারণ করে, কেউ বিসমিল্লাহ্ না বলেই যবেহ্ করে। এরপরও যখন আল্লাহ্ তা'আলা আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল করেছেন, তখন বোঝা গেল যে, এ নির্দেশ সম্বলিত সূরা মায়েদার আয়াত আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তুর পক্ষে সূরা বাকারা ও সূরা আন'আমের আয়াতসমূহকে প্রকারান্তরে রহিতই করে দিয়েছে, যাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে যবেহ্ করাকে হারাম বলা হয়েছে।

কোন কোন বুযুর্গ আলিমের উক্তি থেকে জানা যায় যে, যেসব তাবেয়ী আহ্‌লে-কিতাবদের বিসমিল্লাহ্‌বিহীন যবেহ্ করা জন্তু এবং আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা জন্তুকে

হালাল বলেছেন, তাঁদের মতেও আহ্‌লে-কিতাবদের আসল ধর্মমত ইসলামী ধর্মমত থেকে ভিন্ন নয়। কিন্তু তাদের মূর্খ জনগণই এসব ভুলভ্রান্তি করে। এতদসত্ত্বেও তাঁরা মূর্খ আহলে-কিতাবদেরকে সাধারণ আহলে-কিতাব থেকে পৃথক করে দেখেন নি এবং যবেহ্ ও বিবাহের ব্যাপারে তাদের বেলায়ও ঐ নির্দেশই বলবৎ রেখেছেন, যা তাদের বাপ-দাদা ও আসল ধর্মমত অনুসারীদের বেলায় রেখেছেন। অর্থাৎ মূর্খ খ্রিস্টানদের যবেহ্ এবং তাদের মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয।

ইবনে আরাবী 'আহ্‌কামুল কোরআন' গ্রন্থে লেখেন ঃ আমি ওস্তাদ আবুল ফাতাহ মাকদাসীকে জিজ্ঞেস করলাম, বর্তমান যুগের খ্রিস্টানরা আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করে–উদাহরণত যবেহ্ করার সময় মসীহ্ অথবা উযায়েরের নাম উচ্চারণ করে। এমতাবস্থায় তাদের যবেহ্ করা জন্তু কিরূপে হালাল হতে পারে ? আবুল ফাতাহ্ মাকদাসী বললেন

هم من ابائهم وقد جعلهم الله تعالى تبعا لمن كان قبلهم مع علمه بحالهم.

–"তাদের বিধান তাদের বাপ-দাদার মতই। (বর্তমান যুগের গ্রন্থধারীদের)এ অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার অনুরূপ করে দিয়েছেন। –(আহ্‌কামুল-কোরআন, ইবনে আরাবী, ২২৯ পৃ. ১ম খণ্ড)

মোটকথা, পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে যারা আহ্‌লে-কিতাবদের আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মতেও আহ্‌লে-কিতাবদের আসল মাযহাবে এরূপ জন্তু হারাম। কিন্তু তাঁরা বিভ্রান্ত লোকদেরকেও আসল আহ্‌লে কিতাবদের সাথে এক করে তাদের যবেহ্ করা জন্তুকেও হালাল বলেছেন। পক্ষান্তরে সাধারণ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামরা এ দিকটি লক্ষ্য করেছেন যে, আহ্‌লে-কিতাবদের মূর্খ জনগণ যে আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীতই যবেহ্ করে, তা যেমন ইসলামী বিধানের পরিপন্থি, তেমনি স্বয়ং খ্রিস্টানদের বর্তমান ধর্মমতেরও বিরোধী। এ কারণে ধর্মীয় বিধানের উপর তাদের কর্মের কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়া উচিত। তাঁরা ফয়সালা দিয়েছেন যে, তাদের যবেহ করা জন্তু আয়াতে বর্ণিত 'আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।' সুতরাং তা হালাল হওয়ার কোন কারণ নেই। তাদের ভ্রান্ত কর্মের কারণে কোরআনের আয়াতে নস্‌খ তথা রহিতকরণের পথ বেছে নেওয়া কিছুতেই সমীচীন নয়।

এ কারণেই ইবনে জরীর ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়্যান প্রমুখ তফসীরবিদ এ বিষয়ে একমত যে, সূরা বাকারা ও সূরা আন'আমের আয়াতসমূহে কোন নস্‌খ হয়নি এটাই সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মত। ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ মতই বাহ্‌রে-মুহীত গ্রন্থে নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে ঃ

وذهب الى ان الكتابى اذا لم يذكر الله على الذبيحة وذكر غير الله لم تؤكل وبه قال ابو الدرداء وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة – وبه قال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر وما لك وكره النخعى والثورى اكل ما ذبح واهل به لغير الله .

–"তাঁর মাযহাব এই যে, আহ্‌লে-কিতাব যদি যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করে, অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে, তবে তা খাওয়া জায়েয নয়। আবুদ্দারদা, ওবাদা ইবনে সামেত এবং একদল সাহাবী এ কথাই বলেন এবং ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও ইমাম মালেক (র)-এর মতও তাই। নাখ্‌য়ী ও সওরী এরূপ জন্তু খাওয়া মকরূহ্ মনে করেন।" –বাহ্‌রে-মুহীত, ৪৩১ পৃ. ৪র্থ খণ্ড)

মোটকথা, সাহাবী তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, আহ্‌লে-কিতাবদের আসল মাযহাব হচ্ছে, যে জন্তুকে যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম পরিত্যাগ করা হয়, তা হারাম। তাদের এ মাযহাব কোরআন অবতরণের সময়ও অব্যাহত ছিল। এমনিভাবে বিবাহ হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারেও আহ্‌লে-কিতাবদের আসল মাযহাব বর্তমানকাল পর্যন্ত অধিকাংশ বিষয়ে ইসলামী শরীয়তেরই অনুরূপ। এর বিপরীতে আহ্‌লে-কিতাবদের মধ্যে যা কিছু দেখা গেছে, তা মূর্খ লোকদের ভুলভ্রান্তি–তাদের ধর্মমত নয়।

বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত আজকালকার তওরাত ও ইঞ্জীল থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিসমূহ দেখুন। বর্তমান যুগের ইহুদী ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত বাইবেলের প্রাচীন আহাদনামায় যবেহ্ সম্পর্কে এসব বিধি-বিধান রয়েছে ঃ

১. যে জন্তু আপনা-আপনি মরে যায় এবং যে সব জন্তুকে অন্য কোন হিংস্র প্রাণী ছিঁড়ে ফেলে, তার চর্বি অন্য কাজে লাগালে লাগাতে পার, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা খেতে পাবরে না। (আহবার, ২৪)

২, যে কোন পন্থা-প্রক্রিয়ায় মনের আগ্রহে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বরকত অনুযায়ী যবেহ্ করে মাংস খেতে পারবে, কিন্তু তোমরা রক্ত কখনও খেয়ো না। –(ইস্তিস্না, ১২-১৫)

৩. তোমরা দেবদেবীর নামে কুরবানীর মাংস, রক্ত, কণ্ঠরোধে জীব-জন্তু হত্যা করা এবং হারাম কর্ম থেকে বিরত থাক।–(আহ্‌দনামা জাদীদ কিতাব 'আমাল ১-২৯)

৪. খ্রিস্টানদের প্রধান পোপ পলিস ক্রিন্থিউনের নামে প্রথম পত্রে লিখেন ঃ বিধর্মীরা যেসব কুরবানী করে তা শয়তানের জন্য করে, আল্লাহ্‌র জন্য নয়। আমি চাই না যে, তুমি শয়তানের অংশীদার হও। তুমি খোদাওয়ান্দের পিয়ালা ও শয়তানের পিয়ালা দুটি থেকেই পান করতে পারবে না। –(ক্রিন্থিউন ১০-২০-৩০)

৫. 'আ'মলে হাওয়ারিয়্যীন' গ্রন্থে আছে, আমি এ মীমাংসা লিখেছিলাম যে, তারা শুধু দেবদেবীর কুরবানীর মাংস থেকে এবং কণ্ঠরোধে জীব হত্যা হারাম কর্ম থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখবে। –(আ'মাল ২১-২৫)

এগুলো হচ্ছে আজকালকার বাইবেল সোসাইটিসমূহের মুদ্রিত তওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি। এতে বিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরও হুবহু কোরআনের বিধি-বিধানের অনুরূপ এ বিষয়বস্তুগুলো অবশিষ্ট রয়েছে। কোরআনের আয়াত এই ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ‏.

অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, যে জীব আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা হয়, কণ্ঠরোধে নিহত জন্তু, আঘাতজনিত কারণে মৃত জন্তু, উচ্চস্থান থেকে পতনে মৃত জন্তু, শিং-এর আঘাতে মৃত জন্তু, হিংস্র প্রাণীর ভক্ষণ করা মৃত জন্তু-তবে যদি তোমরা যবেহ্ করে পাক করে নিতে পার এবং ঐ জন্তু যা দেবদেবীর যজ্ঞবেদীতে যবেহ্ করা হয়। (আল-মায়েদাহ্, ৩)।

এ আয়াতে উল্লিখিত সকল প্রকার জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তওরাত ও ইঞ্জীলের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতেও শূকরের মাংস ছাড়া প্রায় সবগুলোকেই হারাম বলা হয়েছে। শুধু আঘাত লেগে, উচ্চস্থান থেকে পতনে এবং শিং-এর আঘাতে মৃত জন্তু উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু এগুলো সবই প্রায় আপনা-আপনি মৃত অথবা কণ্ঠরোধে মৃত জন্তুরই অন্তর্ভুক্ত।

এমনিভাবে কোরআন পাক জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার প্রতি জোর দিয়েছে। كُلُوْا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ এবং যে জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় না, তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে ঃ لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বাইবেলের উপরোক্ত ২ নং উদ্ধৃতিতেও এর প্রতি জোর বোঝা যায় যে, জন্তুকে আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবেহ্ করতে হবে। এমনিভাবে বিবাহের ব্যাপারেও আহ্লে-কিতাবদের ধর্মমত অধিকাংশ বিষয়ে ইসলামেরই অনুরূপ।

দেখুন আহবার ৬-১৮-১৯ পর্যন্ত। এখানে হারাম মহিলাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ঐসব মহিলা, যাদেরকে কোরআন হারাম করেছে। এমনকি, جمع بين الاختين অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম এবং হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়াও বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া বাইবেলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্তিপূজারী ও মুশরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ। প্রচলিত তওরাতের ভাষা এরূপ ঃ

"তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তাদের পুত্রদের স্বীয় কন্যা দান করবে না এবং স্বীয় পুত্রদের জন্য তাদের কন্যা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা আমার অনুসরণ থেকে আমার পুত্রদের বিমুখ করে দেবে-যাতে তারা অন্য উপাস্যের উপাসনা করে।—(ইস্তিস্না, ৭--৩-৪)

সারকথা ঃ কোরআনে আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু এবং তাদের মহিলাদের বিবাহ হালাল এবং অন্যান্য কাফিরের যবেহ্ করা জন্তু ও তাদের মহিলাদের বিবাহ হারাম করার কারণই এই যে, এ দুইটি বিষয়ে আহলে-কিতাবদের প্রকৃত ধর্মমত আজ পর্যন্তও ইসলামী আইনের অনুরূপ। এর বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের মধ্যে যা কিছু দেখা যায়, তা নিছক ভুলভ্রান্তি-ধর্মমত নয়। এ কারণেই সাধারণ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদদের মতে সূরা বাকারা, সূরা আন'আম ও সূরা মায়েদার আয়াতসমূহে কোন বিরোধ অথবা নসখ নেই। যেসব আলিম ও তাবেয়ী ভ্রান্ত জনগণের কর্মকেও আহ্লে-কিতাবদের কাতারে শামিল করেছেন এবং সূরা বাকারা ও সূরা

আন'আমের আয়াতে নস্‌খের উক্তি অবলম্বন করেছেন, তাদের এ মতের ভিত্তি এই যে, খ্রিস্টানরা বলে ঃ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ অর্থাৎ মসীহ ইবনে মরিয়মই তো আল্লাহ্। অতএব, তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলেও তার অর্থ মসীহ ইবনে মরিয়মই হয়। তাই যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা ও মসীহ্‌র নাম উচ্চারণ করা উভয়ই সমান। এ কারণে তাঁরা আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইবনে আরাবী আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে এ ভিত্তিটি ফুটিয়ে তুলেছেন। —(প্রথম খণ্ড, ২২৯ পৃ.)

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের সাধারণ আলিমরা এ ভিত্তি গ্রহণ করেন নি। ইবনে-কাসীর ও বাহ্‌রে-মুহীতের বরাতসহ একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তফসীরে মাযহারীর গ্রন্থকার বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ

والصحيح المختار عندنا هو القول الاوّل - يعنى ذبائح اهل الكتاب تاركًا للتسمية عامدًا او على غير اسم اللّٰه تعالىٰ لا يوكل ان عليه ذالك يقينًا او كان غالب حالهم ذالك وهو محل النهى عن اكل ذبائح نصارى بنى العرب ومحمل قول على (رض) لا تأكلو من ذبائح نصارى بنى تغلب فانّهم لم يتمسكوا من النصر انية بشيئٍ الا بشربهم الخمر فلعل عليًا علم من حالهم انهم لا يسمون اللّٰه عند الذبح او يذبحون على غير اسم اللّٰه هكذا حكم نصارى العجم ان كان عادتهم الذبح على غير اسم اللّٰه تعالىٰ غالبًا لا يوكل ذبيحتهم ولا شك ان النصارى فى هذا الزمان لا يذبحون بل يقتلون بالوقذ غالبًا فلا يحل طعامهم .

অর্থাৎ প্রথমোক্ত উক্তিই আমাদের মতে বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। অর্থাৎ আহ্‌লে-কিতাবদের ঐ জন্তু হালাল নয়, যা যবেহ করার সময় ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহ্‌র নাম ছেড়ে দেওয়া হয়, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা হয়। যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এ জন্তুটি যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি, অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে অথবা যদি তাদের সাধারণ অভ্যাসই এরূপ হয়, তবেই তা হালাল নয়। যেসব আলিম আরবের খ্রিস্টানদের যবেহ্ করা জন্তু নিষেধ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও তাই। এমনিভাবে হযরত আলী (রা)-এর উদ্দেশ্যই তাই, যিনি বনী তাগলিবের খ্রিস্টানদের যবেহ্ করা জন্তু নাজায়েয বলেছেন। কারণ, তারা খ্রিস্টধর্ম থেকে মদ্যপান ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেনি। হযরত আলী (রা)- হয়ত একথা নিশ্চিতরূপে জেনে থাকবেন যে, বনী তাগলিব যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না অথবা অন্যের নাম উচ্চারণ করে। অনারব খ্রিস্টানদের বেলায়ও একই কথা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করাই যদি তাদের সাধারণ অভ্যাস হয়, তবে তাদের যবেহ করা জন্তু অবৈধ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আজকালকার খ্রিস্টানরা যবেহ্ করে না ; বরং সাধারণত আঘাত করে হত্যা করে। কাজেই তাদের যবেহ করা জন্তু হালাল নয়।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে এ বিস্তারিত আলোচনার কারণ এই যে, এ ক্ষেত্রে মিসরের প্রখ্যাত আলিম মুফতী আবদুহু চরম পদস্খলনের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যা যে কোরআন, সুন্নাহ্ ও সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি 'তফসীর আল-মানার' গ্রন্থে এক্ষেত্রে দু'টি ভুল করেছেন।

এক. তিনি সারা বিশ্বের কাফির, অগ্নি-উপাসক, হিন্দু, শিখ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে আহলে কিতাবের অর্থ এত দিগন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছেন যে, সমগ্র কোরআনে বর্ণিত আহলে কিতাব কাফির ও আহলে-কিতাব নয় এমন কাফিরের বিভাগ ও বিভেদ সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অস্তিত্বহীন পয়ে পড়েছে।

দুই. পূর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুলটি এই যে, তিনি আহ্লে-কিতাবদের খাদ্যের অর্থে তাদের যাবতীয় খাদ্য হালাল করে দিয়েছেন। তারা জন্তু যবেহ্ করুক বা না করুক আল্লাহর নাম উচ্চারণ করুক বা না করুক,—সর্বাবস্থায় তারা যেভাবে জন্তুকে খায়, সেভাবেই খাওয়া মুসলমানদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন।

তাঁর এ ফতোয়া মিসরে প্রকাশিত হলে স্বয়ং মিসরের এবং সারা বিশ্বের খ্যাতনামা আলিমরা একে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন। এর উপর বিস্তর কথিকা ও পুস্তিকা লেখা হয়। চতুর্দিক থেকে মুফতী আবদুহুকে মুফতীর পদ থেকে অপসারণের দাবি জানানো হয়। এদিকে মুফতী সাহেবের শিষ্যবর্গ ও কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্যঘেঁষা ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার প্রেমিক পত্র-পত্রিকায় আলোচনার জাল বিস্তার করতে থাকে। কারণ, এ ফতোয়াটিতে তাদের চলার পথের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ছিল এবং ইউরোপের খ্রিস্টান ও ইহুদীদের এমনকি নাস্তিকদের সর্বপ্রকার খাদ্য তাদের জন্য হালাল সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ইসলামের এটিও একটি মো'জেযা যে, শরীয়ত-বিরোধকথা যতবড় আলিমের মুখ থেকেই বের হোক না কেন, সাধারণ মুসলমানরা তাতে সন্তুষ্ট হয় না। এ ব্যাপারেও তাই হয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানরা একে পথভ্রষ্টতা আখ্যা দিয়েছে। ফলে ব্যাপারটি তখনকার মত চাপা পড়ে যায়। কিন্তু বর্তমান যুগের ধর্মদ্রোহীদের উদ্দেশ্যেই হচ্ছে ইসলামের এমন একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করা—যা পাশ্চাত্যের সব বাজে ও মিথ্যা সভ্যতাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে এবং নতুন বংশধরদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে সহায়ক হয়। এ কারণে তারা এমন ভঙ্গিতে উপরোক্ত আলোচনার অবতারণা শুরু করেছে, যেন তারাই এ বিষয়বস্তুর উদ্ভাবক। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তারা সবাই মুফতী আবদুহুর ফতোয়ার অনুকরণ করছে। এ কারণে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

আলহামদুলিল্লাহ, যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ততটুকু আলোচনা হয়ে গেছে।

এস্থলে দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, মুসলমানদের খাদ্য আহলে-কিতাবদের জন্য জায়েয-আলোচ্য বাক্যের এ দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্য কি ? কেননা, আহলে-কিতাবরা কোরআনের বাণীতে বিশ্বাসই করে না। এমতাবস্থায় তাদের জন্য কোনটি হালাল-কোনটি হারাম. কোরআনে তা বর্ণনা করার উপকারিতা কি ?

বাহরে-মুহীত প্রভৃতি তফসীরে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে এ নির্দেশটিও মুসলমানদের জন্য বর্ণনা করাই লক্ষ্য যে, তোমাদের যবেহ করা জন্তু তাদের জন্য হালাল।

কাজেই তোমরা যদি তা থেকে কোন অমুসলমান আহলে-কিতাবকে খাইয়ে দাও তবে তাতে কোন গুনাহ নেই। অর্থাৎ স্বীয় কুরবানীর কিছু অংশ কোন আহলে-কিতাব ব্যক্তিকেও দিতে পারে। বস্তুত মুসলমানদের যবেহ করা জন্তু তাদের জন্য হারাম হলে তা তাদেরকে খাওয়ানো মুসলমানদের জন্য জায়েয হতো না। অতএব, বাহ্যত আহলে-কিতাবদের উদ্দেশ্যে নির্দেশটি বর্ণিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে মুসলমানদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

তফসীরে রূহুল মা'আনীতে সুদ্দীর বরাত দিয়ে এ বাক্যের আরও একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আহলে-কিতাব ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মমতে সাজা হিসাবে কতক হালাল জন্তু অথবা তার অংশ বিশেষ হারাম করা হয়েছিল। এ কারণে সে জন্তু অথবা তার অংশ বিশেষ বাহ্যত আহলে-কিতাবদের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু আলোচ্য বাক্যটি ব্যক্ত করেছে যে, যে জন্তু তোমাদের জন্য হালাল—যদিও আহলে-কিতাবরা একে হালাল মনে নাও করে—যদি তাদের হাতে যবেহ করা এরূপ জন্তু পাওয়া যায়, তবে তাও মুসলমানদের জন্য হালালই হবে। وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ বর্ণনা অনুযায়ীও পরিণামে বাক্যটির সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে হয়ে গেছে।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, যবেহ করার ব্যাপারে ও বিবাহের ব্যাপারে পার্থক্য এই যে, যবেহ করা জন্তু উভয় পক্ষ থেকেই হালাল। আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্য হালাল এবং মুসলমানদের যবেহ করা জন্তু আহলে-কিতাবদের জন্য হালাল, কিন্তু মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারটি এরূপ নয়। আহলে-কিতাবদের মহিলাকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হালাল বটে, কিন্তু আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমান মহিলাদের বিবাহ হালাল নয়।

তৃতীয় বিষয় এই যে, যদি কোন মুসলমান কখনও ধর্মত্যাগী হয়ে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে-কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, বরং সে হবে ধর্মত্যাগী। তার যবেহ করা জন্তু সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এমনিভাবে যে মুসলমান ইসলামের কোন একটি জরুরী ও অকাট্য বিষয় অস্বীকার করার কারণে ধর্মত্যাগী বলে সাব্যস্ত হয়, সে কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশ্বাসের দাবি করলেও ধর্মত্যাগী এবং তার যবেহ করা জন্তু হালাল নয়। অবশ্য অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যদি স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে-কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার যবেহ করা জন্তু হালাল বলে গণ্য হবে।

আয়াতের তৃতীয় বাক্য হচ্ছে:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَخْدَانٍ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য মুসলমান সতীসাধ্বী মহিলাদেরকে বিবাহ করা হালাল। এমনিভাবে আহলে-কিতাবদের সতীসাধ্বী মহিলাদেরকেও বিবাহ করা হালাল।

এখানে উভয় স্থলে مُحْصَنَاتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধান ও সাধারণ বাচনভঙ্গিতে এর অর্থ দুটি। এক, স্বাধীন ও মুক্ত–এর বিপরীতে ক্রীতদাসী। দুই. সতীসাধ্বী মহিলা। আভিধানিক দিক দিয়ে এখানে উভয় অর্থই বোঝানো যেতে পারে।

এ স্থলে তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে محصنات শব্দের অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত মহিলা। অতএব বাক্যের সারমর্ম এই যে, আহলে-কিতাবদের স্বাধীন মহিলা মুসলমানদের জন্য হালাল—ক্রীতদাসী হালাল নয়।—(মাযহারী)

কিন্তু অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী আলিমের মতে محصنات এর অর্থ সতীসাধ্বী মহিলা। আয়াতের অর্থ এই যে, মুসলমান সতীসাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করা যেমন জায়েয তেমনি আহ্‌লে-কিতাবদের সতীসাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করাও জায়েয। –(আহকামুল কোরআন, জাস্‌সাস, মাযহারী)

কিন্তু অধিক সংখ্যক আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সতীসাধ্বী মহিলা হালাল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যারা সতীসাধ্বী নয়, তাদের বিবাহ করা হারাম। বরং এর উদ্দেশ্য উত্তম ও উপযুক্ত বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা। অর্থাৎ মুসলমান মহিলাকেই বিবাহ কর কিংবা আহ্‌লে-কিতাব মহিলাকে–সর্বক্ষেত্রে সতীসাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার চেষ্টা থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও পাপাচারিণী মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কাজ নয়। –(মাযহারী)

অতএব, এ বাক্যের বিষয়বস্তু হলো এই যে, মুসলমানের জন্য কোন মুসলমান মহিলাকে অথবা আহলে-কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল। তবে উভয় অবস্থাতে সতীসাধ্বী মাহিলাকে বিবাহ করার প্রতি লক্ষ্য থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও অবিশ্বাসযোগ্য মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। এতএব, এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এক্ষেত্রে 'আহলে-কিতাব' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় আহ্‌লে-কিতাব নয়–এমন অমুসলিম মহিলাকে সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ করা হারাম প্রমাণিত হলো।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান যুগে যে সব অমুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র ইহুদী ও খ্রিস্টান জাতিদ্বয়ই আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায় হতে পারে, তাদের ছাড়া বর্তমান কালের আর কোন সম্প্রদায়ই আহলে-কিতাব নয়। অগ্নি উপাসক অথবা মূর্তিপূজক হিন্দু অথবা শিখ, আর্য, বৌদ্ধ ইত্যাদি সবাই এ শ্রেণীভুক্ত। কেননা, একথা বর্ণিত হয়েছে যে, যারা এমন কোন গ্রন্থে বিশ্বাস করে এবং তা অনুসরণের দাবি করে, যার ঐশী গ্রন্থ ও প্রত্যাদেশ হওয়া কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত, তারাই আহ্‌লে-কিতাব। বলা বাহুল্য তওরাত ও ইঞ্জীলই এমন কিতাব এবং এ কিতাবদ্বয়ের অনুসারী কিছু কিছু সম্প্রদায় বর্তমান জগতে বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া যবুর ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা জগতে কোথাও বিদ্যমান নেই এবং এগুলোর অনুসরণ করে বলে কেউ দাবিও করে না। বর্তমান যুগে 'বেদ' 'গ্রন্থসাহেব' 'যরথুস্ত্র' ইত্যাদিও পবিত্র কিতাব বলে কথিত হয়। কিন্তু কোরআন ও সুন্নায় এগুলোর ওহী ও ঐশী গ্রন্থ হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবত যবুরও ইবরাহিমী সহীফার বিকৃত রূপ, যা কালচক্রে বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিপিটক, বেদ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে– এরূপ নিছক সম্ভাবনাই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণে সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হলো যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে একমাত্র ইহুদী ও খ্রিস্টান মহিলাদের সাথেই মুসলমানদের বিয়ে হালাল। অন্য কোন ধর্মাবলম্বী মহিলার সাথে, যতক্ষণ সে মুসলমান না হয়, ততক্ষণ মুসলমানের বিয়ে হারাম।

কোরআনের আয়াত وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ–এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এই যে, কোন মুশরিক মহিলাকে ততক্ষণ বিয়ে করো না, যতক্ষণ সে মুসলমান না হয়। আহলে-কিতাব ছাড়া বর্তমান জগতের সব সম্প্রদায়ই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, এ ব্যাপারে কোরআন মজীদে দু'টি আয়াত রয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে ঃ মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কোন মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করা হারাম। অপরটি সূরা মায়েদার আলোচ্য বাক্য–যাতে বলা হয়েছে যে, আহলে-কিতাবদের মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয।

তাই অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী উভয় আয়াতের মর্ম এই সাব্যস্ত করেছেন যে, নীতিগতভাবে অমুসলিম মহিলার সাথে মুসলমানের বিবাহ না হওয়া উচিত। কিন্তু সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে আহলে-কিতাব মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে ইহুদী ও খ্রিস্টান মহিলাদের ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের মহিলার সাথে মুসলমান হওয়া ব্যতীত মুসলমানের বিয়ে হতে পারে না।

এখন রইল ইহুদী ও খ্রিস্টান মহিলাদের ব্যাপার। কোন কোন সাহাবীর মতে এ বিয়েও জায়েয নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের মতও তাই। কেউ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি সুস্পষ্ট وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ অর্থাৎ 'মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে করো না।' তারা মরিয়ম–তনয় ঈসাকে অথবা অন্য কাউকে আল্লাহ্ ও পালনকর্তা সাব্যস্ত করে। এর চাইতে বড় শিরক আর কোনটি তা আমার জানা নেই। –(আহকামুল-কোরআন, জাস্সাস)

একবার মায়মুন ইবনে মহ্রান হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা যে দেশে বসবাস করি, সেখানে অধিকাংশই আহ্লে-কিতাব। আমরা তাদের মেয়েদের বিয়ে করতে এবং তাদের যবেহ করা জন্তু খেতে পারি কি ? হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর উত্তরে উপরোক্ত আয়াত দুটি পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। একটিতে মুশরিক মহিলাদের বিয়ে করা হারাম বলা হয়েছে এবং অপরটিতে আহ্লে-কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা হালাল বর্ণিত হয়েছে।

মায়মুন ইবনে মহ্রান বললেন ঃ কোরআন পাকের এ দুটি আয়াত আমিও পাঠ করি এবং জানি। আমার প্রশ্ন এই যে, উভয় আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আমার জন্য শরীয়তের নির্দেশ কি ? উত্তরে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর পুনর্বার আয়াত দুটি পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বললেন না। মুসলিম আলিমরা এর অর্থ এই ধরেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর আহ্লে-কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না।

কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে আহ্লে-কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে হালাল হলেও এ বিয়ের ফলে নিজের জন্য, সন্তান-সন্ততির জন্য বরং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে যেসব অনিষ্ট ও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেবে, তার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতেও আহ্লে-কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা মাকরূহ তথা অনুচিত।

জাস্সাস আহ্কামুল-কোরআন গ্রন্থে শাকীক ইবনে সালামার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) মাদায়েন পৌছে জনৈকা ইহুদী স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণ করেন। হযরত ফারুকে আযম (রা) সংবাদ পেয়ে তাঁকে পত্র লিখে বললেন ঃ স্ত্রীলোকটিকে তালাক দিয়ে দাও। হযরত হোযায়ফা উত্তরে লিখলেন যে, সে কি আমার জন্য হারাম ? খলীফা উত্তরে লিখে পাঠালেন যে, আমি হারাম বলি না, কিন্তু ইহুদী স্ত্রীলোকেরা সাধারণভাবে সতীসাধ্বী নয়। তাই আমার আশঙ্কা যে, এ পথে তোমাদের পরিবারেও না অশ্লীলতা ও ব্যভিচার অনুপ্রবেশ করে। 'কিতাবুল আসার' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান এ ঘটনাকে ইমাম আবূ হানীফার অভিমত বলে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ দ্বিতীয় বার হযরত ফারুকে আযম (রা) হোযায়ফাকে যে পত্র লেখেন তার ভাষা ছিল এরূপ ঃ

اعزم عليك ان لا تضع كتابى حتى تخلى سبيلها فانى اخاف ان يقتديك المسلمون فيختاروا نساء اهل الذمة لجمالهن وكفى بذالك فتنة لنساء المسلمين .

অর্থাৎ তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, পাঠান্তে এ পত্র রাখার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দাও। আমার আশঙ্কা হয় অন্য মুসলমানরাও না আবার তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ! ফলে তারা রূপ ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যিম্মী আহ্লে-কিতাব মহিলাদের মুসলমান মহিলাদের বিপরীতে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করবে। মুসলামন মহিলাদের জন্য এর চাইতে বড় বিপদ আর কিছু হবে না।—কিতাবুল আছার, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৬।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র) বলেন ঃ হানাফী মাযহাবের ফিকহ্বিদরা এ মতই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এ বিয়েকে হারাম বলেন না ; কিন্তু পারিপার্শ্বিক অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণে মকরূহ মনে করেন। আল্লামা ইবনে হুমাম 'ফতহুল-কাদীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেন শুধু হোযায়ফা নন, তাল্হা এবং কা'ব ইবনে মালেকও এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হন। তাঁরাও সূরা মায়েদার আয়াতদৃষ্টে আহ্লে-কিতাব মহিলাদের পাণি গ্রহণ করেন। খলীফা ফারুকে-আযম (রা) সংবাদ পেয়ে তাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং তালাক দানের নির্দেশ দেন।—(মাযহারী)

ফারুকে-আযমের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। কোন ইহুদী ও খ্রিস্টান মহিলা মুসলমানের সহধর্মিণী হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে–সে যুগে এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। তাদের মধ্যে ব্যভিচার থাকলে তদ্বারা আমাদের পরিবার কলুষিত হয়ে পড়বে কিংবা তাদের রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে মানুষ তাদেরকে অগ্রাধিকার দেবে : ফলে মুসলমান মহিলারা বিপদে পতিত হবে–এটিই ছিল তখনকার যুগের একমাত্র আশঙ্কা। কিন্তু ফারুকে-আযমের দূরদর্শী দৃষ্টি অতটুকু অনিষ্টকে সামনে রেখেই উপরোক্ত সাহাবীদের তালাক দানে বাধ্য করেছিলেন। যদি আজকালকার চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সম্মুখে থাকত তবে অনুমান করুন, একে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা কি কর্মপন্থা অবলম্বন করতেন ? প্রথমত আজকাল যারা আদমশুমারীর খাতায় নিজেকে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান নামে লিপিবদ্ধ করায়, তাদের অনেকেই বিশ্বাসের দিক

দিয়ে খ্রিস্টবাদ ও ইহুদীবাদকে অভিশাপ মনে করে। তারা যেমন তাওরাত ও ইঞ্জীলে বিশ্বাস করে না, তেমনি হযরত ঈসা (আ) ও মুসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল মনে করে না। বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা পুরোপুরি নাস্তিক। শুধু জাতিগত অথবা প্রথাগতভাবে নিজেকে ইহুদী বা খ্রিস্টান বলে।

এমতাবস্থায় তাদের স্ত্রীলোক মুসলমানের জন্য কিছুতেই হালাল নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তারা স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করে, তবুও তাদেরকে মুসলমান পরিবারে স্থান দেওয়া গোটা পরিবারের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্বংস ডেকে আনার শামিল। এই যুগে এ পথে ইসলাম ও মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে অনেক চক্রান্ত হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, একটি মেয়ে গোটা একটা মুসলিম জনগোষ্ঠী বা মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংস করে দিয়েছে। এগুলো এমন বিষয় যে, কোন সচেতন মানুষই অন্যদেরকে এরূপ সুযোগ দিতে পারে না।

মোটকথা, কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে-কিরামের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আজকালকার তথাকথিত আহ্‌লে-কিতাব স্ত্রীলোকদের বিয়ে করা থেকে বিরত থাকাই মুসলমানদের উচিত। আয়াতের শেষাংশে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আহ্‌লে-কিতাব স্ত্রীলোকদের রাখতেই চাও, তবে নিয়মিত বিয়ে করে স্ত্রী হিসাবে রাখ। তাদের মোহর ইত্যাদি প্রাপ্য পরিশোধ কর। তাদেরকে পরিচারিকা হিসাবে রাখা এবং ব্যভিচারে ব্যবহার করা হারাম।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ
وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ
وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ
جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ
مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ
لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑥ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ز
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑦

(৬) হে মু'মিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য ওঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই সহ ধৌত কর এবং পদযুগল গিঁটসহ ; আর তোমাদের মাথাসমূহ মাসেহ কর। যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না, কিন্তু তোমাদের পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান—যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭) তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে ঃ আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের জাগতিক জীবন ও পানাহার সম্পর্কি কিছু বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইবাদত সম্পর্কিত কিছু বিধি-বিধান বর্ণিত হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসীগণ ! যখন তোমরা নামাযে দণ্ডায়মান হও (অর্থাৎ নামায পড়ার ইচ্ছা কর এবং তখন যদি ওযু না থাকে) তখন (ওযু করে নাও, অর্থাৎ) স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুইসহ ধৌত কর এবং মাথায় (ভিজা) হাত মুছে ফেল এবং পদযুগলকে গিঁটসহ (ধৌত কর) এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে (নামাযের পূর্বে) সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও (এবং পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হয়) অথবা প্রবাসে থাক (এবং পানি পাওয়া না যায়, একথা পরে বর্ণিত হচ্ছে। এটি হচ্ছে ওযরের অবস্থা) অথবা (রোগ ও প্রবাসের ওযর নেই ; বরং এমনিতেই ওযু অথবা গোসল নষ্ট হয়ে যায়, এভাবে যে, উদাহরণত) তোমাদের কেউ (প্রস্রাব অথবা পায়খারার) ইস্তিঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে আসে (যদ্দরুন ওযু নষ্ট হয়ে যায়) অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর (যদ্দরুন গোসল ফরয হয়ে যায়। এবং) অতঃপর (এসব অবস্থায়) তোমরা পানি (ব্যবহারের সুযোগ) না পাও (ক্ষতিকর হওয়া কিংবা পানি পাওয়া যে কোন কারণেই হোক) তবে (সর্বাবস্থায়) তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মুছে ফেল ঐ মাটির উপরে (হাত মেরে)। আল্লাহ্ তা'আলা (এসব বিধি-বিধান নির্ধারণ করে) তোমাদেরকে কোনরূপ অসুবিধায় ফেলতে চান না (বরং তোমাদের অসুবিধা না হোক, তাই চান। সেমতে উল্লিখিত বিধি-বিধানে বিশেষভাবে এবং শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধানে সাধারণভাবে যে সহজ দিক ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তা সবারই জানা)। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান। (তাই পবিত্রতার রীতিনীতি ও পদ্ধতিই প্রবর্তন করেছেন এবং কোন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হন নি যে, সেটি না হলে পবিত্রতাই সম্ভবপর হবে না। উদাহরণত যদি পানিকেই একমাত্র পবিত্রকারী বস্তু হিসাবে

সাব্যস্ত করা হতো তবে পানি পাওয়া না গেলে পবিত্রতা অর্জিত হতে পারত না। শারীরিক পবিত্রতা তো বিশেষভাবে পবিত্রতার বিধি-বিধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং আন্তরিক পবিত্রতা সব ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আয়াতে বর্ণিত 'পবিত্রকরণ' বাক্যে উভয় পবিত্রতাই শামিল। এসব বিধি-বিধান না থাকলে কোন পবিত্রতাই অর্জিত হতো না)। এবং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান–(এ কারণে পূর্ণ বিধি-বিধান দান করেছেন –যাতে সর্বাবস্থায় শারীরিক ও আন্তরিক পবিত্রতা অর্জন করতে পার, যার ফল হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য এবং এ সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্ববৃহৎ নিয়ামত)। যাতে তোমরা (এ দানের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে আদেশ পালন করাও একটি)। এবং তোমরা আল্লাহ্র সে নিয়ামতকে, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে স্মরণ কর। (তন্মধ্যে বড়) নিয়ামত হচ্ছে এই যে, তোমাদের সাফল্যের নিয়ম-কানুন তোমাদের জন্য শরীয়তসিদ্ধ করে দিয়েছেন) এবং তাঁর ঐ অঙ্গীকারকেও (স্মরণ কর) যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা (তা নিজের জন্য জরুরীও করে নিয়েছিলে। অর্থাৎ অঙ্গীকার নেওয়ার সময় তোমরা) বলেছিলে ঃ আমরা (এসব বিধি-বিধান) শুনলাম এবং মেনে নিলাম (কেননা, ইসলাম গ্রহণের সময় প্রত্যেকেই এই বিষয়ে অঙ্গীকার করে) এবং আল্লাহ্কে (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন। (তাই যে কাজই কর তাতে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসও থাকা দরকার। কপটসুলভ আদেশ পালন যথেষ্ট নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এ সব বিধি-বিধানে প্রথমত তোমাদেরই উপকার, তদুপরি তোমরা তা নিজের যিম্মায় জরুরীও করে নিয়েছ। এ ছাড়া বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে ক্ষতিও আছে–এসব কারণে আদেশ পালন করা জরুরী হয়েছে। এ পালনও আন্তরের সাথে হওয়া উচিত। নতুবা পালন না করার মতই গণ্য হবে)।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ز
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ط اعْدِلُوا قف هُوَ أَ
قْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ز وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

(৮) হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই আল্লাহ্ভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা যা

কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (১০) যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে তারা দোযখী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসীগণ ! আল্লাহ্ তা'আলার (সন্তুষ্টির) জন্য (বিধি-বিধানের) পূর্ণ অনুবর্তী এবং সাক্ষ্যদানের (প্রয়োজন হলে) সাক্ষ্যদাতা হও এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে (তাদের ব্যাপারে) সুবিচার না করতে প্ররোচিত না করে। (অবশ্যই প্রত্যেক ব্যাপারে) সুবিচার কর। (অর্থাৎ সুবিচার করা) আল্লাহ্ ভীতির নিকটবর্তী। (অর্থাৎ এর কারণে মানুষ আল্লাহ্-ভীরুতার গুণে গুণান্বিত হয়।) এবং (আল্লাহ্-ভীতি তোমাদের প্রতি ফরয। তাই নির্দেশ এই যে) আল্লাহ্ তা'আলাকে (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় কর। (এটিই আল্লাহ্-ভীতির স্বরূপ। সুতরাং যে সুবিচারের উপর আল্লাহ্-ভীতি নির্ভরশীল, তাও ফরয)। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং আদেশ অমান্যকারীদের সাজা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছন। আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তারাই দোযখে বসবাসকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত তিনটি আয়াতের মধ্য থেকে প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু প্রায় এসব শব্দেই সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ—বলা হয়েছিল এবং এখানে—كُوْنُوْا قَوَّمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ বলা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে শব্দ আগে পিছে করার একটি সূক্ষ্ম কারণ 'বাহরে-মুহীত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই ঃ

স্বভাবত দুটি কারণেই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে প্ররোচিত করে। এক, নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। দুই. কোন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা নিসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

এ কারণেই সূরা নিসার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ ন্যায়বিচারে অধিষ্ঠিত থাক যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বাক্যের পর বলা হয়েছে ঃ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারে পশ্চাৎপদ হতে উদ্বুদ্ধ না করে।

অতএব সূরা নিসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরও পরওয়া করো না। যদি ন্যায়বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায় তবুও তাতে কায়েম থাক। সূরা মায়েদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন

কোন শত্রুর শত্রুতার কারণে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে।

এ কারণে সূরা নিসার আয়াতে قِسْطٌ অর্থাৎ 'ইনসাফ'কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ–এবং সূরা মায়েদার আয়াতে لِلّٰهِ-কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ অবশ্য উভয় আয়াত পরিণামের দিক দিয়ে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্য দণ্ডায়মান হবে, সে আল্লাহ্র জন্যই দণ্ডায়মান হবে এবং সে সুবিচারই করবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা হতে পারে যে, এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তো আল্লাহ্র জন্যই। তাই এখানে قسط শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সুবিচারের বিপক্ষে কারও প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহ্র জন্য হতে পারে না। সূরা মায়েদায় শত্রুদের সাথে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে لِلّٰهِ শব্দটি অগ্রে এনে মানব স্বভাবকে ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র জন্য দণ্ডায়মান হয়েছ। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে শত্রুদের সাথেও ন্যায়বিচার কর।

মোটকথা, এই যে, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদার উভয় আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক. শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাক। আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারও শত্রুতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। দুই. সত্য সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না–যাতে বিচারকবর্গ সত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

সত্য সাক্ষ্য দিতে ত্রুটি না করার প্রতি কোরআন পাক অনেক আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গীতে জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ অর্থাৎ সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী। এতে প্রমাণিত হয় যে, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য এবং সাক্ষ্য গোপন করা কঠোর গুনাহ্।

কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধাদান করে, কোরআন পাক তার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। বিষয়টি এই যে, সাক্ষীকে বারবার আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং অনর্থক নানা ধরনের হয়রানিরও সম্মুখীন হতে হয়। এতে সাধারণ লোক সাক্ষীর তালিকাভুক্ত হওয়াকে সাক্ষাৎ বিপদ বলে মনে করে। নিজের কাজ-কারবার তো নষ্ট হয়ই; তদুপরি অর্থহীন যাতনাও ভোগ করতে হয়।

এ কারণেই কোরআন পাক সত্য সাক্ষ্য দেওয়াকে অপরিহার্য কর্তব্য সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ অর্থাৎ মোকদ্দমার বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ও সাক্ষ্যদাতার কোন ক্ষতি করা যাবে না।

আজকালকার আদালত ও মোকদ্দমাসমূহের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অকুস্থলের সত্য সাক্ষী খুব কমই পাওয়া যায়। সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার ভয়ে জ্ঞানী ও ভদ্র ব্যক্তিরা

কোথাও দুর্ঘটনার আঁচ পেলে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বানোয়াট সাক্ষীর দ্বারা মামলা দাঁড় করানো হয়। এর ফল তাই দাঁড়ায়, বাস্তবে যা আমরা আজকাল দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে থাকি। শতকরা দশ-পাঁচটি মোকদ্দমারও ন্যায় এবং সুবিচার-ভিত্তিক রায় হতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতকে দোষ দেওয়া যায় না। কারন, তারা প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দিতে বাধ্য।

সাধারণত এ মারাত্মক ভুলটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যদি সাক্ষীদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করা হতো এবং তাদেরকে বারবার পেরেশান করা না হতো, তবে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী কোন সত্যবাদী লোক সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই, যে পুলিশ মোকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত করে, সে-ই বারবার ডেকে সাক্ষীকে এমনভাবে পেরেশান করে দেয় যে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কোন মোকদ্দমার সাক্ষী না হওয়ার জন্য ছেলেদেরকেও ওসীয়ত করে যেতে বাধ্য হয়। এরপর যদি মোকদ্দমা আদালতে পৌঁছে, তবে তারিখের পর তারিখ পড়তে থাকে। প্রতি তারিখেই নিরপরাধ সাক্ষীকে হাজিরা দেওয়ার সাজা ভোগ করতে হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকাররূপে আইনের এ দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের আদালতসমূহকে নোংরা করে রেখেছে। হিজায ও অপর কতিপয় দেশে প্রচলিত প্রাচীন সাদাসিধা বিচার পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মোকদ্দমার প্রাচুর্য নেই অন্যদিকে তেমনি সাক্ষীদের পক্ষে সাক্ষ্যদানও কষ্টকর নয়।

মোটকথা এই যে, সাক্ষ্যদান পদ্ধতি ও বিচার-পদ্ধতিকে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলা হলে এর বরকত আজও দেখা যেতে পারে। কোরআন একদিকে ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত লোকদের উপর সত্য সাক্ষ্যদান অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে, অপরদিকে সাক্ষীদেরকে অকারণে উত্ত্যক্ত না করতে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে জবানবন্দী নিয়ে ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছে।

পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিফিকেট ও নির্বাচনের ভোটদান সবই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ঃ পরিশেষে এখানে আর একটি বিষয় জানা জরুরী। তা এই যে, আজকাল শাহাদত তথা সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা-মোকদ্দমায় কোন বিচারের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 'শাহাদত' শব্দটি আরও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণত যদি ডাক্তার কোন রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকরি করার যোগ্য নয়, তবে এটিও একটি শাহাদত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য হয়ে কবীরা গুনাহ্ হবে।

এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেওয়া একটি শাহাদত। যদি ইচ্ছা-পূর্বক কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশি নম্বর দেওয়া হয়, তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে।

উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যে, তারা সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ না হয়, তবে সার্টিফিকেট ও সনদে স্বাক্ষরদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে।

এমনিভাবে আইন সভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেওয়াও এক প্রাকার সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং সততা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য।

এখন চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কজন এমন আছেন, যাদের বেলায় এ সাক্ষ্য সত্য ও বিশুদ্ধ হতে পারে ? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হার-জিতের খেলা মনে করে রেখেছে। এ কারণে কখনও পয়সার বিনিময়ে ভোটাধিকার বিক্রয় করা হয়। আবার কখনও চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনও সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়।

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধার্মিক মুসলমানও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে গিয়ে কখনও চিন্তা করে না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেওয়ার দ্বিতীয় একটি দিক রয়েছে—যাকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। কোরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি উত্তম ও সত্য সুপারিশ করবে, তাকে সুপারিশকৃত ব্যক্তির পুণ্য থেকে অংশ দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে।

এর ফলশ্রুতি এই যে, এ প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব ভ্রান্ত ও অবৈধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ ভোটপ্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্য উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু ও ওকালতি যদি ভোটদাতার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সে-ই পেত, তবে এর জন্য সে নিজেই দায়ী হতো, কন্তি এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা, এ ওকালতি এমন সব অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরীক। কাজেই কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের জন্য ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে গোটা জাতির অধিকার খর্ব করার পাপও ভোটদাতার কাঁধে বসবে।

মোটকথা, আমাদের ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। এক. সাক্ষ্যদান, দুই. সুপারিশ করা এবং তিন. সম্মিলিত অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। এ তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, ধর্মভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোটদান করা যেমন বিরাট সওয়াবের কাজ এবং এর সুফল যেমন ভোটদাতাও প্রাপ্ত হয়, তেমনি অযোগ্য ও অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মন্দ সুপারিশ

এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে।

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সৎ ও ধর্মভীরু কিনা, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান ভোটারের অবশ্য কর্তব্য। শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যবশত অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ
أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۚ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي
مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

(১১) হে মু'মিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং মু'মিনদের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত। (১২) আল্লাহ্ বনী-ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ্ বলে দিলেন ঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ্ দূর করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাবো, যাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফির হয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসীগণ ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতকে স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় (অর্থাৎ কোরাইশ কাফিররা—ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে) এরূপ চিন্তায় লিপ্ত ছিল যে, তোমাদের প্রতি (এমনভাবে) হস্ত প্রসারিত করবে (যেন তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হস্ত তোমাদের প্রতি (এতটুকু) চলতে দিলেন না (এবং অবশেষে তোমাদেরই জয়ী করলেন। সুতরাং এ নিয়ামতটি স্মরণ কর) এবং (নির্দেশ প্রতিপালনে) আল্লাহ্কে ভয় কর (এটিই উক্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা)। আর (ভবিষ্যতেও) বিশ্বাসীদের আল্লাহ্র উপর ভরসা করা উচিত। (যিনি পূর্বে তোমাদের সব কাজ ঠিক করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও পরকাল পর্যন্ত আশা রাখ اتَّقُوا اللّٰهَ বলে ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং ভরসা করার আদেশ করে আশা দিয়েছেন। এ দুটিই আদেশ প্রতিপালনে সহায়ক।) আর আল্লাহ্ তা'আলা (হযরত মূসার মাধ্যমে) বনী-ইসরাইলের কাছ থেকে (-ও) অঙ্গীকার নিয়েছিলেন (সত্বরই এই বর্ণনা আসবে) এবং (এসব অঙ্গীকার জোরদার করার জন্য) আমি তাদের মধ্য থেকে (তাদের গোত্রের সংখ্যা অনুযায়ী) বার জন্য সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম (যাতে তারা অধীনস্থদের প্রতি অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য জোর দিতে থাকে) এবং (অঙ্গীকারের উপর আরও জোর দেওয়ার জন্য তাদেরকে) আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা (-ও) বলে দিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। (তোমাদের ভালমন্দ সব কিছুর খবর রাখব। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে অঙ্গীকার নিয়েছেন, অতঃপর এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার উপর জোর দিয়েছেন। এ অঙ্গীকারের সার বিষয়বস্তু ছিল এই যে,) যদি তোমরা নামায কায়েম করতে থাক, যাকাত দিতে থাক, আমার সব পয়গম্বরের প্রতি (যারা ভবিষ্যতেও নতুন নতুন আগমন করবেন) বিশ্বাস স্থাপন করতে থাক, (শত্রুদের বিপক্ষে) তাদের সাহায্য করতে থাক এবং (যাকাত ছাড়া সৎকার্যেও ব্যয় করে) আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম পন্থায় (অর্থাৎ আন্তরিকতার সাথে) ঋণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ্ দূর করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে (বেহেশতের) এমন উদ্যানে প্রবিষ্ট করাবো, যার (প্রাসাদসমূহের) তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে এবং যে ব্যক্তি এরপরও (অর্থাৎ অঙ্গীকার নেওয়ার পরও) অবিশ্বাস করে, সে নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মায়েদার পূর্বোল্লিখিত সপ্তম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তাদের তা মেনে নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেনঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ -

অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য এবং শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার। এর পারিভাষিক শিরোনাম কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"

উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অঙ্গীকারের অধীন। এর পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি প্রধান দফা-অর্থাৎ শরীয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ক্ষমতারোহণের পর শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। এ কারণেই اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বলে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটিকেও আবার اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বাক্য দ্বারা শুরু করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরোক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শক্তি, উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কলাকৌশলকে সফল হতে দেন নি।

এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বারবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের হত্যা, লুণ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে ব্যর্থকাম করে দেন। বলা হয়েছে ঃ একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চিন্তায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফিরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তফসীরবিদরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণত মুসনাদে-আবদুর রাজ্জাকে হযরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত আছে ঃ

কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এক জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন। বিস্তৃত ময়দানের বিভিন্ন অংশে সাহাবীরা বিশ্রাম নিতে লাগলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে তার নিচে শুয়ে পড়লেন। শত্রুদের মধ্য থেকে জনৈক বেদুঈন সুযোগ বুঝে তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে প্রথমেই তরবারিটি হাত করে ফেলল। অতঃপর তাঁর দিকে তরবারি উঁচিয়ে বলল ঃ এখন আমার কবল থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) চকিতে উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা। আগন্তুক আবার তার বাক্য পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও নিশ্চিন্তে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা। কয়েকবার এরূপ বাক্য বিনিময় হওয়ার পর অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে আগন্তুক তরবারি কোষবদ্ধ করতে বাধ্য হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের ডেকে ঘটনা শোনালেন। আগন্তুক বেদুঈন তখনও তাঁর পাশেই উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না। (ইবনে কাসীর)

কোন কোন সাহাবী থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বগৃহে দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে যথাসময়ে এ সংবাদ দিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। (ইবনে-কাসীর)

হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক মোকাদ্দমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী-নুযায়রের ইহুদীদের বস্তিতে যান। তারা তাঁকে একটি প্রাচীরের নীচে

বসতে দিয়ে কথাবার্তায় ব্যাপৃত রাখে। অপর দিকে আমর ইবনে জাহ্‌শ নামক এক দুরাত্মাকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পেছন দিক থেকে উপরে উঠে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাঁর উপর গড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে তাদের সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করেন। ইবনে-কাসীর)

এসব ঘটনায় কোন বৈপরীত্য নেই--সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের অদৃশ্য হিফাযতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ

اتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ। এতে প্রথমত বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত লাভ করা একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য নয়, বরং সাহায্য ও অদৃশ্য হিফাযতের আসল কারণ হচ্ছে তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। যে কোন জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোন সময় যে কোন স্থানে এ দু'টি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হিফাযত ও সংরক্ষণ করা হবে। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی -

"বদরের পরিবেশ সৃষ্টি কর। ফেরেশতারা এখনও তোমার সাহায্যার্থে আসমান থেকে কাতারে কাতারে অবতরণ করতে পারেন।"

আলোচ্য বাক্যটিকে পূর্ববর্তী আয়াত সমষ্টির সাথেও সংযুক্ত করা যায়, যাতে চরম শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, এহেন ঘোর শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহার ও উদারতার শিক্ষা বাহ্যত একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তি এবং শত্রুদের দুঃসাহসী করে তোলার নামান্তর। তাই এ বাক্যে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ্ ভীরু ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী হও তবে এ উদারতা ও সদ্ব্যবহার তোমাদের জন্য মোটেই ক্ষতিকর হবে না, বরং তা শত্রুদের বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহসী করার পরিবর্তে তোমাদের প্রভাবাধীন ও ইসলামের নিকটবর্তী করার কারণ হবে। এ ছাড়া আল্লাহ্-ভীতিই মানুষকে অঙ্গীকার মেনে চলতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে বাধ্য করতে পারে। যেখানে আল্লাহ্-ভীতি নেই, সেখানে অঙ্গীকারের দশা তা-ই হয়, যা আজকাল সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এ কারণে পূর্ববর্তী যে আয়াতে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে আয়াতের শেষাংশে وَاتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বাক্যটি আবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া সম্পূর্ণ আয়াতে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য শুধু বাহ্যিক সমরোপকরণের উপর মোটেও নির্ভরশীল নয়, বরং তাদের আসল শক্তি তাক্‌ওয়া ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার মধ্যেই নিহিত।

আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তাদের তা পালন করার কারণে ইহকাল ও পরকালে বিরাট সাফল্য দানের কথা উল্লেখ করার পর এর বিপরীত দিকটি ফুটিয়ে তোলার জন্য দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে অন্যান্য উম্মতের কাছ

থেকেও এ ধরনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে তারা বিভিন্ন রকমের আযাবে পতিত হয়। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাইলের কাছ থেকেও একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। সে অঙ্গীকার নেওয়ার প্রকৃতি ছিল এরূপ বনী ইসরাইলের সর্বমোট বারটি পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে সর্দার নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক সর্দার এ দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, আমি এবং আমার গোটা পরিবার এ অঙ্গীকার মেনে চলব। এভাবে বার জন সর্দার সমগ্র বনী ইসরাইলের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাদের দায়িত্ব ছিল এই যে, তারা নিজেরাও অঙ্গীকার মেনে চলবে এবং নিজ নিজ পরিবারকে মেনে চলতে বাধ্য করবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে ইসলামের আসল মূলনীতি হচ্ছে এই ঃ

بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی
که در این راه فلان بن فلان چیزے نیست

হে জামী ! প্রেমের পথের অনুসারী হও এবং বংশ-পরিচয় ভুলে যাও। এ পথে 'অমুকের পুত্র অমুক' এ পরিচয়ের কোনই মূল্য নেই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করেন যে, ইসলামে আরব-আনারব, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ এবং উচ্চ-নীচ জাতের কোন মূল্য নেই। যে-ই ইসলামে প্রবেশ করে, সে-ই মুসলমানদের ভাই হয়ে যায়। বংশ, বর্ণ, দেশ, ভাষা ইত্যাদি জাহিলিয়াত যুগের স্বাতন্ত্র্যের মূর্তিকে ইসলাম ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রশাসনিক ব্যাপারাদিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেও পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করা হবে না।

এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এক পরিবারের সদস্যবর্গ স্বীয় পরিবারের জানাশুনা ব্যক্তির উপর অন্যের তুলনায় অধিক ভরসা করতে পারে। এ ব্যক্তিও তাদের পূর্ণ মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে তাদের মনোভাব ও ভাবাবেগের প্রতি অধিক লক্ষ্য দিতে পারে। এ রহস্যের উপর ভিত্তি করেই বনী ইসরাইলের বারটি পরিবারের কাছ থেকে যখন অঙ্গীকার নেওয়া হয়, তখন প্রত্যেক পরিবারের একেকজনকে দায়িত্বশীল সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

এই প্রশাসনিক উপযোগিতা ও পূর্ণ প্রশান্তির প্রতি তখনও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল যখন বনী ইসরাইল পানির অভাবে দারুণ দুর্বিপাকে পড়েছিল। তখন মূসা (আ)-এর দোয়া ও আল্লাহ্র নির্দেশে একটি পাথরের গায়ে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে আল্লাহ্ তা'আলা পাথর থেকে বার পরিবারের জন্য পৃথক পৃথক বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দেন।

সূরা আ'রাফে এ বিরাট অনুগ্রহের বিষয়টি এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا — আমি তাদের বারটি পরিবারকে বার দলে বিভক্ত করে দিয়েছি এবং فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا — অতঃপর পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে গেল। (প্রত্যেক পরিবারের জন্য পৃথক পৃথক)। বলতে কি, বার সংখ্যাটিই অভিনব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মদীনার কিছুসংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তিনি বয়াতের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তখন সে অঙ্গীকারেও মদীনার বার জন সর্দার দায়িত্ব গ্রহণ করে বয়াত করেছিলেন। তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন আউস গোত্রের এবং নয়জন খাযরাজ গোত্রের। —(ইবনে-কাসীর)

বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে সামুরার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মানুষের কাজকর্ম ও আইন-শৃঙ্খলা ততক্ষণই ঠিকমত চলবে, যতক্ষণ বার জন খলীফা তাদেরকে নেতৃত্ব দেবেন। ইবনে-কাসীর এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন ঃ এই হাদীসের কোন শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এই বারজন খলীফা একের পর এক অব্যাহত গতিতে আগমন করবেন। বরং তাঁদের মধ্যে ব্যবধানও হতে পারে। সেমতে চারজন খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, ওমর ফারূক, ওসমান গনী ও আলী মুর্তাযা রাযিআল্লাহু আনহুম একের পর এক আগমন করেন। অতঃপর মাঝখানে কয়েক বছর ব্যবধানের পর আবার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযকে সর্বসম্মতিক্রমে পঞ্চম যথার্থ খলীফা গণ্য করা হয়।

মোটকথা, বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বার পরিবারের বার জন সর্দারকে দায়িত্বশীল করে বললেন ঃ إِنِّي مَعَكُمْ। আমি তোমাদের সাথে আছি। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা অঙ্গীকার মেনে চল এবং অপরকেও মেনে চলতে বাধ্য করার সংকল্প গ্রহণ কর, তবে আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। এরপর আলোচ্য আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফা, বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ এবং তাদের উপর আযাব নেমে আসার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

অঙ্গীকারের দফা উল্লেখ করার আগে إِنِّي مَعَكُمْ। বলে দু'টি বিষয় বলে দেওয়া হয়েছে। এক. যদি তোমরা অঙ্গীকারে অটল থাক, তবে আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে এবং তোমরা প্রতিপদে তা প্রত্যক্ষ করবে। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা সর্বত্র তোমাদের সাথে আছেন এবং অঙ্গীকারের দেখাশোনা করছেন। তোমাদের কোন ইচ্ছা, চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্ম তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি তোমাদের নির্জনতার রহস্যও জানেন এবং শোনেন। তিনি তোমাদের মনের নিয়ত ও ইচ্ছা সম্পর্কেও জ্ঞাত রয়েছেন। অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তোমরা তাঁর কবল থেকে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। এরপর অঙ্গীকারের দফাসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামায কায়েম করা ও পরে যাকাত দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, নামায ও যাকাত ইসলামের পূর্বে হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপরও ফরয ছিল। কোরআনের অন্যান্য ইঙ্গিত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে এবং প্রত্যেক শরীয়তে সর্বদাই এগুলো ফরয ছিল। অঙ্গীকারের তৃতীয় দফা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সব পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং পথ প্রদর্শনেরই কাজে তাঁদের সাহায্য-সহায়তা করা।

বনী ইসরাইলের মধ্যে অনেক রাসূল আগমন করেছিলেন। এ কারণে বিশেষভাবে এ বিষয়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদির স্থান মর্যাদার দিক দিয়ে নামাযও যাকাতের অগ্রে, কিন্তু কার্যত যা করণীয় ছিল, তাকেই অঙ্গীকারের আগে রাখা হয়েছে। রাসূল তো পরেই আসবেন, তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও সাহায্য করাও পরেই হবে। এ কারণে এগুলোকে পেছনে রাখা হয়েছে।

অঙ্গীকারের চতুর্থ দফা হচ্ছে এই ঃ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্কে ঋণদান কর—উত্তম ঋণ। উত্তম ঋণের অর্থ ঐ ঋণ, যা আন্তরিকতা সহকারে দান করা হয় যাতে কোন জাগতিক স্বার্থ জড়িত না থাকে এবং আল্লাহ্র পথে প্রিয় বস্তু দান করা। অকেজো ও বেকার বস্তু দান না করাও উত্তম ঋণের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাকে ঋণদান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, ঋণকে আইনত, সাধারণের প্রথাগত এবং চরিত্রগত দিক দিয়ে অবশ্য পরিশোধযোগ্য মনে করা হয়। এমনিভাবে এরূপ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে হবে যে, এর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া যাবে।

স্বতন্ত্রভাবে ফরয যাকাত উল্লেখ করার পর এখানে উত্তম ঋণ উল্লেখ করাতে বোঝা যায় যে, উত্তম ঋণ বলে অন্যান্য সদকা-খয়রাতকে বোঝানো হয়েছে। এতে আরও বোঝা যায় যে, শুধু যাকাত প্রদান করেই মুসলমান আর্থিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায় না। যাকাত ছাড়াও কিছু আর্থিক দায়িত্ব বহন করা তার উপর জরুরী। কোথাও মসজিদ না থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা এবং সরকার ধর্মীয় শিক্ষার ব্যয় বহন না করলে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা মুসলমানদের কর্তব্য। পার্থক্য এতটুকু যে, যাকাত ফরযে আইন আর এগুলো হলো ফরযে-কেফায়া।

ফরযে-কেফায়ার অর্থ এই যে, সমাজের কিছু লোক অথবা কোন দল এসব প্রয়োজন মিটিয়ে দিলে অন্য সব মুসলমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে। আর যদি কেউ এসব প্রয়োজন না মিটায়, তবে সবাই গুনাহ্গার হয়। আজকাল দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদ্রাসাসমূহের যে দুরবস্থা তা একমাত্র তারাই জানে, যারা দীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। মুসলমানরা জানে যে, যাকাত প্রদান করা তাদের উপর ফরয, তা জানা সত্ত্বেও কম সংখ্যকই পুরোপুরি হিসাব করে পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, এরপর তাদের কোন আর দায়িত্ব নেই। তারা মসজিদ এবং মাদ্রাসার প্রয়োজনেই যাকাতের অর্থ পেশ করে। অথচ যাকাত ছাড়াই এসব ফরয মুসলমানদের দায়িত্বে আরোপিত। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত এবং অন্যান্য আরও অনেক আয়াত বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

অঙ্গীকারের প্রধান প্রধান দফা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, তোমরা অঙ্গীকার মেনে চললে প্রতিদানে তোমাদের অতীত সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তোমাদের চিরস্থায়ী শান্তি ও আরামের জান্নাতে রাখা হবে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি কেউ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা অবলম্বন করে, তবে সে স্বচ্ছ ও সরল পথ ছেড়ে স্বেচ্ছায় ধ্বংসের গহবরে নিপতিত হয়।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ
يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ
وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (১৩) وَمِنَ الَّذِيْنَ
قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا
بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ ۭ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (১৪)

(১৩) অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা আমার কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন-না-কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। (১৪) যারা বলে ঃ আমরা নাসারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তারা যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল ! অতঃপর আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কিন্তু বনী ইসরাইল উপরোক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং ভঙ্গ করার পর বিভিন্ন শাস্তিতে পতিত হয়। যেমন, কদাকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি থেকে তারা যে দূরে সরে পড়ল) শুধু তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে আমি তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে (অর্থাৎ রহমতের ফল থেকে) দূরে নিক্ষেপ করলাম (লা'নত তথা অভিশাপের প্রকৃত অর্থ তাই)। এবং (এই অভিশাপেরই অন্যতম ফল এই যে,) আমি তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিলাম (ফলে তাদের অন্তরে সত্য কথার কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না এবং এই কঠোরতারই অন্যতম ফল এই যে,) তারা (অর্থাৎ তাদের আলিমরা আল্লাহ্র) কালামকে তার (শব্দের অথবা অর্থের) স্থান থেকে পরিবর্তন করে (অর্থাৎ শাব্দিক ও আর্থিক উভয় প্রকার পরিবর্তন করে)। এবং (এই পরিবর্তন করার ফল এই হয়েছে যে, তওরাতে) তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তার একটি বড় অংশ (যা পালন করলে তাদের লাভ হতো) বিস্মৃত হয়েছে। (কারণ, মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালতকে সত্য বলে বিশ্বাস করা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুকেই তারা বেশির ভাগ পরিবর্তন করেছিল। এ বিশ্বাসের চাইতে বড় অংশ আর কি হবে ? মোটকথা, তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ফলে অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে এবং অভিশাপের ফলে

অন্তর কঠোর হয়েছে এবং অন্তর কঠোর হওয়ার ফলে তওরাতের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেছে এবং পরিবর্তন করার ফলে উপদেশের বিরাট অংশ বিস্মৃত হয়েছে ; আর এই ধারাবাহিকতার (এতটুকুতেই শেষ নয়; বরং অবস্থা এই যে,) আপনি প্রায়ই (অর্থাৎ সর্বদা ধর্মের ক্ষেত্রে) কোন-না-কোন (নতুন) বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন যা তাদের কাছ থেকে প্রকাশ পায়—তাদের সামান্য কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া (যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল)। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন (অর্থাৎ যতদিন শরীয়তসম্মত প্রয়োজন দেখা না দেয়, ততদিন তাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন (এবং বিনা প্রয়োজনে লাঞ্ছিত না করা সৎকর্ম)। এবং যারা (ধর্মের সাহায্যের দাবি করে) বলে যে, আমরা নাসারা, আমি তাদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার (ইহুদীদের মত) নিয়েছিলাম; অতএব তারাও (ইঞ্জীল ইত্যাদিতে) তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, আর তার একটা বড় অংশ (যা পালন করলে তারা লাভবান হতো, কিন্তু) বিস্মৃত হলো। (কেননা, তারা যে বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে, তা হচ্ছে একত্ববাদ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান। এ বিষয়ে তারাও আদিষ্ট হয়েছিল এবং এটি যে বড় অংশ তা অস্পষ্ট নয়। তারা যখন একত্ববাদ ত্যাগ করে বসল) তখন আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি (এটি হচ্ছে জাগতিক সাজা) এবং অতিসত্বর (পরকালে এটিও নিকটবর্তীই) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্ম তাদের সম্পর্কে অবহিত করবেন (অতঃপর শাস্তি দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাইল দুর্ভাগ্যবশত এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন আযাবে নিক্ষেপ করেন।

বনী ইসরাইলের প্রতি কুকর্ম ও অবাধ্যতার ফলে দুই প্রকার আযাব নেমে আসে। এক. বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আযাব। যেমন রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ, প্রস্তর বর্ষণ, ভূমি উল্টিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো কোরআন পাকের অনেক আয়াতে বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

দুই. আত্মিক আযাব। অর্থাৎ অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। তাতে চিন্তা-ভাবনা ও বোঝার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরও পাপে লিপ্ত হতে থাকে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً অর্থাৎ "আমি বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম।" ফলে এখন এতে কোন কিছুর সংকুলান রইল না। রহমত থেকে দূরে সরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা মুতাফ্ফিফীনে ران শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা ঃ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

—অর্থাৎ "কোরআনী আয়াত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের কারণে মরিচা পড়ে গেছে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক হাদীসে বলেন ঃ মানুষ প্রথমে যখন কোন পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি দাগ পড়ে। এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কাল দাগ লেগে গেলে তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুপরি পাপ কাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গুনাহ্র কারণে একটি কাল দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর কাল দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তার অন্তরের অবস্থা ঐ পাত্রের মত হয়ে যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং কোন জিনিস রাখলে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসে—পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফরে কোন সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় না। তখন তার অন্তর لايعرف معروفاولاينكر منكرا —কোন পুণ্য কাজকে পুণ্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না। বরং ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে সওয়াব মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। এটা হচ্ছে তার পাপের নগদ সাজা—যা সে ইহাকালেই লাভ করে। কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন ঃ

ان من جزاء الحسنة بعد ها-وان من جزاء السيئة بعد ها-

অর্থাৎ পুণ্য কাজের একটি তাৎক্ষণিক প্রতিদান এই যে, এরপর সে আরও পুণ্য কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে। এমনিভাবে পাপ কাজের একটি তাৎক্ষণিক সাজা এই যে, এক পাপের পর অন্তর আরও পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে বোঝা যায় যে, পুণ্য কাজ পুণ্য কাজকে এবং পাপ কাজ পাপ কাজকে আকর্ষণ করে।

বনী ইসরাইলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহ্র রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র কালামকে তারা স্বস্থান থেকে সরিয়ে দেয় অর্থাৎ আল্লাহ্র কালামকে পরিবর্তন করে। কখনও শব্দে, কখনও অর্থে এবং কখনও তিলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ প্রকারগুলো কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খ্রিস্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে। -(তফসীরে-ওসমানী)

এ আত্মিক সাজার ফলশ্রুতি এই যে, وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ —অর্থাৎ তদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তদ্দারা লাভবান হওয়ার কথা ভুলে গেল। এরপর আল্লাহ্ বলেন ঃ তাদের এ সাজা এমনভাবে তাদের গলার হার হয়ে গেল যে, وَلَاتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ আপনি সর্বদাই তাদের কোন-না-কোন প্রতারণার বিষয় অবগত হতে থাকবেন اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ অল্প কয়েকজন ছাড়া। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) প্রমুখ। এঁরা পূর্বে আহ্লে-কিতাব ছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ পর্যন্ত বনী ইসরাইলের যেসব কুকীর্তি ও অসচ্চরিত্রতা বর্ণিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করতে পারতেন এবং তাদেরকে কাছে আসতেও নিষেধ করতে পারতেন। তাই আয়াতের শেষ বাক্যে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে ঃ- فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ —অর্থাৎ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের কুকীর্তি মার্জনা করুন। তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের এসব অবস্থা সত্ত্বেও আপনি স্বভাবগত চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত হবেন না। অর্থাৎ ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবেন না তথা তাদের কঠোরতা ও অচেতনতার কারণে যদিও ওয়ায এবং উপদেশও কার্যকরী হওয়ার আশা সুদূরপরাহত, তথাপি উদারতা ও সচ্চরিত্রতা এমন পরম পাথর, যার পরশে অচেতনদের মধ্যেও চেতনা সঞ্চারিত হতে পারে। তারা সচেতন হোক বা না হোক, আপনার নিজ চরিত্র ও ব্যবহার ঠিক রাখা জরুরী। সদ্ব্যবহার আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন। এর দৌলতে মুসলমানরা অবশ্যই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى —পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ ও শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াতে খ্রিস্টানদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা খ্রিস্টানদের অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে—যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আজকালকার খ্রিস্টানদের পরস্পর ঐক্যবদ্ধ দেখে আয়াতের সত্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। উত্তর এই যে, আয়াতে প্রকৃত খ্রিস্টানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ধর্মকর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টানদের তালিকাভুক্ত নয়—যদিও জাতিগতভাবে তারা নিজেদের খ্রিস্টান নামেই অভিহিত করে। এখন খ্রিস্টানদের মধ্যে যদি ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকে, তবে তা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, ধর্মের ভিত্তিতেই বিভেদ ও বিদ্বেষ হতে পারত। যখন তাদের ধর্মই নেই, তখন বিভেদ কিসের। যারা ধর্মগত দিক দিয়ে খ্রিস্টান, আয়াতে তাদের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ খ্রিস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ সর্বজনবিদিত।

বায়যাভীর টীকায় 'তাইসীর' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রিস্টানদের মধ্যে আসলে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে। এক. নিস্তরিয়া। এরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে। দুই. ইয়াকুবিয়া। এরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র সাথে এক মনে করে। তিন. মালকাইয়া। এরা ঈসা (আ)-কে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

যেখানে মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত বড় মতানৈক্য, সেখানে পারস্পরিক শত্রুতা অপরিহার্য।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا
مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ۗ
قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ يَّهْدِيْ

بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ
الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ
فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ
وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ
لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

(১৫) হে আহ্‌লে-কিতাবগণ ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করছেন। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। (১৬) এর দ্বারা আল্লাহ্ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন। (১৭) নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে মসীহ্ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয় তবে বল—যদি আল্লাহ্ মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি, যে আল্লাহ্র কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে ? নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে সবকিছুর উপর আল্লাহ্ তা'আলারই আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (১৮) ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান

করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহ্রই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আহ্লে-কিতাব সম্প্রদায় (অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টান) তোমাদের কাছে আমার রাসূল মুহাম্মদ (সা) আগমন করেছেন (তাঁর জ্ঞানগত উৎকর্ষ এরূপ যে,) কিতাবের যেসব বিষয় (বস্তু) তোমরা গোপন করে ফেল, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় (যা প্রকাশে শরীয়তের কোন উপযোগিতা থাকে—বাহ্যিক জ্ঞানার্জন না করা সত্ত্বেও খাঁটি ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে) তোমাদের সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন এবং (তাঁর জ্ঞানগত ও চরিত্রগত উৎকর্ষ এই যে, তোমরা যা যা গোপন করেছিলে, তার মধ্য থেকে) অনেক বিষয় (জানা সত্ত্বেও শালীনতা প্রদর্শনার্থে প্রকাশ করেন না; বরং) মার্জনা করেন। (কারণ, এগুলো প্রকাশে শরীয়তের কোন উপযোগিতা নেই, বরং তাতে শুধু তোমাদের লাঞ্ছনাই প্রকাশ পায়। এ জ্ঞানগত উৎকর্ষ তাঁর নবী হওয়ার প্রমাণ এবং চরিত্রগত উৎকর্ষ এর সমর্থক। এতে বোঝা গেল যে, অন্যান্য মু'জিযার প্রতি দৃষ্টিপাত না করলেও স্বয়ং তোমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যবহার তাঁর নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। এ রাসূলের মাধ্যমেই) তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং (তা হচ্ছে) একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা—যারা তাঁর সন্তুষ্টির কামনা করে—তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার পথ শিক্ষা দেন—সে পথ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস ও কর্ম। কেননা, প্রকৃতপক্ষে জান্নাতেই পুরোপুরি নিরাপত্তা লাভ সম্ভব। এ নিরাপত্তা হ্রাস পাওয়া ও বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত)। এবং তাদেরকে স্বীয় তৌফিক দ্বারা (কুফর ও পাপের) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমান ও ইবাদতের জ্যোতির দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরকে (সর্বদা) সরল পথে কায়েম রাখেন। নিশ্চয়ই তারা কাফির যারা বলে মসীহ্ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল—যদি আল্লাহ্ তা'আলা মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (যাকে তোমরা হুবহু আল্লাহ্ মনে কর) ও তাঁর জননী (হযরত মরিয়ম) এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে (মৃত্যু দ্বারা) ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কেউ আছে কি, যে আল্লাহ্র কবল থেকে বিন্দুমাত্রও তাদেরকে বাঁচাতে পারে ? (অর্থাৎ এতটুকু তো তোমরাও জান যে, তাঁদেরকে ধ্বংস করার শক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আছে। কাজেই অন্যের হাতে যার প্রাণ, সে কিরূপে আল্লাহ্ হতে পারে ? এতে মসীহ্ উপাস্য— এ বিশ্বাস ভ্রান্ত হয়ে গেল) এবং (যিনি সত্যিকার আল্লাহ্ এবং সবার উপাস্য অর্থাৎ) আল্লাহ্ তা'আলা (তাঁর শান এই যে,) তাঁরই বিশেষ আধিপত্য রয়েছে নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তাতে, তিনি যে বস্তুকে (যেভাবে) ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানরা (উভয়েই) বলে ঃ আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। (উদ্দেশ্যটা যেন এই যে, আমরা যেহেতু পয়গম্বরদের বংশধর, এ কারণে আল্লাহ্র কাছে আমাদের বিশেষ মর্যাদা

রয়েছে। আমরা পাপ করলেও তিনি অতটুকু অসন্তুষ্ট হন না, যতটুকু অন্যে করলে হন। যেমন পুত্রের অবাধ্যতা দেখে পিতার মনে ততটুকু দুঃখ লাগে না, যতটুকু অন্যের অবাধ্যতা দেখে লাগে। তাদের এ অমূলক ধারণা খণ্ডন করার জন্য হযরত (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে,) আপনি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস করুন, তবে তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে (আখিরাতে) কেন শাস্তি প্রদান করবেন ? (তোমরাও এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখ, যেমন ইহুদীরা বলত ঃ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً। —অর্থাৎ আমরা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করলেও গুণাগুণতি কয়েকদিন ভোগ করব। স্বয়ং মসীহ্ (আ)-এর উক্তি কোরআনে বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ্র সাথে অংশীদার করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। খ্রিস্টানদেরই স্বীকারোক্তির অনুরূপ।

মোটকথা, তোমরা নিজেরাও যখন পরকালের শাস্তি স্বীকার কর, তখন বল, কোন পিতা আপন পুত্র অথবা প্রিয়জনকে শাস্তি দেয় কি ? সুতরাং নিজেদেরকে আল্লাহ্র সন্তান বলা ভ্রান্ত।

এখানে এরূপ সন্দেহ করা অমূলক যে, মাঝে মাঝে পিতাও সংশোধনের উদ্দেশ্যে পুত্রকে শাস্তি দেন। অতএব শাস্তি দেওয়া পুত্র হওয়ার পরিপন্থী নয়। এর উত্তর এই যে, পিতার শাস্তি চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে— যাতে পুত্র ভবিষ্যতে এরূপ কাজ না করে। পরকাল চরিত্র সংশোধনের স্থান নয়। পরকাল কর্মজগৎ নয়— প্রতিদানের জগৎ। সেখানে ভবিষ্যতে কোন কাজ করার অথবা কোন কাজে বাধা দানের সম্ভাবনা নেই। তাই সেখানে যে শাস্তি হবে, তা খাঁটি শাস্তি। এ শাস্তি সন্তান অথবা প্রিয়জন হওয়ার নিশ্চিত পরিপন্থী। অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তাতে আল্লাহ্ তা'আলারই আধিপত্য এবং তাঁর দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন (তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয় নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে খ্রিস্টানদের একটি উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে — যা তাদের এক দলের ধর্মবিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ হযরত মসীহ (আ) (মা'আযাল্লাহ) হুবহু আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন করা হয়েছে, তাতে খ্রিস্টানদের সব দলের একত্ববাদ বিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ (আ)-এর খোদার সন্তান হওয়া সংক্রান্ত বিশ্বাসই হোক অথবা তিন খোদার অন্যতম খোদা হওয়ার বিশ্বাসই হোক।

এস্থলে হযরত মসীহ ও তাঁর জননীকে উল্লেখ করার মধ্যে দু'টি রহস্য থাকতে পারে। এক. আল্লাহ্ তা'আলার সামনে মসীহ (আ)-এর অক্ষমতা যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর খিদমত ও হিফাযত তাঁর কাছে প্রানের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকে রক্ষা করতে পারেন না। দুই. এতে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসও খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মরিয়মকে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

এস্থলে হযরত মসীহ্ ও মরিয়মের মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কোরআন অবতরণের সময় হযরত মরিয়মের মৃত্যু ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল না ; বাস্তবেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এর এক কারণ تغليب অর্থাৎ আসলে হযরত মসীহ (আ)-এর মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর জননীর মৃত্যুকেও একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে—যদিও তাঁর মৃত্যু আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আমি মরিয়মকে যেমন মৃত্যু দান করেছি, তেমনি হযরত মসীহ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মৃত্যুও আমারই হাতে। يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ বাক্যে খ্রিস্টানদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণকেও খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহকে খোদা মনে করার আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধু মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতামাতা উভয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেন।

আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন, مَثَلُ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ আয়াতে এ সন্দেহই নিরসন করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্র সাধারণ নিয়মের বাইরে মসীহ (আ)-কে সৃষ্টি করা তার খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারেন।

লক্ষণীয় যে, হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। তিনিই স্রষ্টা, প্রভু ও ইবাদতের যোগ্য। অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়।

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖۖ فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴿١٩﴾

(১৯) হে আহ্লে-কিতাবগণ ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেন নি। অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আহ্লে-কিতাব সম্প্রদায় ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল [মুহাম্মদ (সা)] আগমন করেছেন, যিনি তোমাদের (শরীয়তের বিষয়াদি) পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন— এমন সময় যে,

পয়গম্বরদের (আগমনের) পরম্পরা (বহুদিন থেকে বন্ধ ছিল এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পয়গম্বরদের আগমন পরম্পরা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে সেসব বিলুপ্ত হয়ে শরীয়তগুলোর পুনরুত্থান সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তখন একজন পয়গম্বরের আগমন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। এহেন সময়ে তাঁর আগমনকে একটি বড় নিয়ামত ও আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের দান বলে মনে করা উচিত) যাতে তোমরা (কিয়ামতের দিন) এরূপ বলতে না পার (যে, ধর্মের কাজে ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমার্হ। কেননা,) আমাদের কাছে (এমন কোন রাসূল, যিনি) সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক (হবেন এবং যার দ্বারা আমরা ধর্মের জ্ঞান ও কর্মে অনুপ্রাণিত হতাম) আগমন করেন নি। (কিন্তু, এখন আর এরূপ বাহানার অবকাশ নেই। কেননা, তোমাদের কাছে) সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)] এসে গেছেন (এখন যদি তাঁকে মেনে না চল, তবে নিজ পরিণামের কথা ভেবে দেখ)। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বকিছুর উপর পূর্ণ শক্তিমান। (যখন ইচ্ছা রহমতবশত স্বীয় পয়গম্বরদের প্রেরণ করেন এবং যখন ইচ্ছা রহস্যবশত তাঁদের আগমন বন্ধ রাখেন। এতে কারও এমন মনে করার অধিকার নেই যে, দীর্ঘদিন যাবত যখন পয়গম্বরদের আগমন বন্ধ রয়েছে, তখন আর কোন পয়গম্বর আসতে পারবেন না। কেননা, পয়গম্বরদের আগমন দীর্ঘদিন বন্ধ রাখার বিষয়টি ছিল আল্লাহ্র রহস্যের ব্যাপার। তিনি নবীদের আগমন বন্ধ ও শেষ করে দেওয়ার ঘোষণা তখন পর্যন্ত করেন নি। বরং বিগত সব পয়গম্বরের মাধ্যমে এ সংবাদই দিয়েছিলেন যে, শেষ যমানায় একজন বিশেষ রাসূল বিশেষ শান ও বিশেষ গুণাবলীসহ আগমন করবেন। তাঁর মাধ্যমেই নবুয়ত সমাপ্তি লাভ করবে। এ ঘোষণা মোতাবেকই শেষ নবী মুহাম্মদ [সা] আগমন করেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ — فترت —এর শাব্দিক অর্থ মন্থর হওয়া, অনড় হওয়া এবং কোন কাজকে বন্ধ করে দেওয়া। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদরা فترت-এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পয়গম্বরদের আগমন পরম্পরা কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকা। হযরত ঈসার পর শেষ নবী (সা)-এর নবুয়ত লাভের সময় পর্যন্ত যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তাই فترت-এর যমানা।

فترت-এর যমানা কতটুকু ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গম্বরদের আগমন একাধিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনও বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী ইসরাইলের মধ্য থেকেই এক হাজার পয়গম্বর এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী ইসরাইল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও অনেক পয়গম্বর আগমন করেছিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত লাভের মাঝখানে মাত্র পাঁচশ' বছরকাল পয়গম্বরদের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকেই فترت তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনও এত দীর্ঘ সময় পয়গম্বরদের আগমন বন্ধ ছিল না। —(কুরতুবী)

হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল এবং হযরত ঈসা ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল, সে সম্পর্কে আরও বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, যাতে সময়ের পরিমাণ কমবেশি বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এতে আসল উদ্দেশ্যে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

ইমাম বুখারী হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ঈসা ও শেষ নবী (সা)-এর মাঝখানে সময় ছিল ছয়'শ বছর। এ সময়ের মধ্যে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হন নি। বুখারী ও মুসলিমের বরাত দিয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ انا اولى الناس بعيسى অর্থাৎ আমি ঈসা (আ)-এর সবচাইতে নিকটবর্তী। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে ليس بيننا نبى অর্থাৎ আমাদের মাঝখানে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হন নি।

সূরা ইয়াসীনে যে তিনজন 'রাসূলের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অর্থেই তাঁদেরকে 'রাসূল' বলা হয়েছে।

বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক, কিন্তু তাঁর নবুয়তকাল ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্বে—পরে নয়।

অন্তর্বর্তীকালের বিধান ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে কোন রাসূল, পয়গম্বর অথবা তাদের কোন প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের শরীয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শিরক ছাড়া অন্য কোন কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আযাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অন্তর্বর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কি না।

অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ বলেন ঃ তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়, যদি তারা নিজেদের ঐ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থায় হযরত ঈসা অথবা মূসা (আ)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শিরকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা একত্ববাদ কোন পয়গম্বরের পথপ্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ তা জেনে নিতে পারে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদী ও খ্রিস্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালে তাদের কাছে কোন রাসূল আগমন না করলেও তাওরাত ও ইঞ্জীল তাদের মধ্যে বিধ্যমান ছিল। তাদের আলিম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় "আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক পৌছেনি" বলে তাদের ওযর পেশ করার কোন যুক্তি ছিল কি ? উত্তর এই যে, হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর আমল পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কিসসা-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তা থাকা-না-থাকা সমান ছিল।

ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলিমের বর্ণনা অনুযায়ী তাওরাতের আসল কপি কারও কাছে কোন অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থী নয়।

শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত ঃ "আমার রাসূল মুহাম্মদ (সা) দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন" —আলোচ্য আয়াতে আহ্‌লে-কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তাঁর আগমনকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নিয়ামত মনে করা। কেননা, পয়গম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এখন তোমাদের জন্য তা আবার খোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে, তাঁর আগমন এমন এক যুগে ও এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোন আলো ছিল না। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানব আল্লাহ্‌র সাথে পরিচয় হারিয়ে মূর্তিপূজায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহিলিয়াতের যুগে এহেন পথভ্রষ্ট জাতির সংশোধন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংসর্গের কল্যাণে ও নবুয়তের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যে এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য জ্ঞান-গরিমা, কর্মপ্রেরণা, সচ্চরিত্রতা, লেনদেন, সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবুয়ত ও তাঁর পয়গম্বরসুলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোন চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রও দুর্লভ, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় মুমূর্ষ রোগী শুধু আরোগ্য লাভই করে না, বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের শ্রেষ্ঠত্বে কারও মনে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিক অন্ধকার বিরাজ করছিল, তখন তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে যে, অতীত যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব সব মু'জিযা একদিকে রেখে একা এ মু'জিযাটিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ
فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ
ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا
قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا۟
مِنْهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ

عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ۬ وَعَلَى

اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ

اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ

الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ

فِى الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

(২০) যখন মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছিলেন। তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেন নি। (২১) হে আমার সম্প্রদায় ! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (২২) তারা বলল ঃ হে মূসা ! সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। (২৩) আল্লাহ্-ভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বললঃ যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন, তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহ্র উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৪) তারা বলল ঃ হে মূসা! আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়েই যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। (২৫) মূসা বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা ! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। (২৬) বললেন ঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম করা হলো। তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের না দুঃখ করবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর সে সময়টির কথাও (স্মরণযোগ্য), যখন মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে প্রথম (জিহাদের প্রতি উৎসাহদানের ভূমিকায়) বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায় !

তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন। [যেমন হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, স্বয়ং হযরত মূসা, হযরত হারূন (আ) প্রমুখ। কোন সম্প্রদায়ে পয়গম্বর হওয়া নিঃসন্দেহে একটি জাগতিক ও ধর্মীয় সম্মান। আর এ নিয়ামতটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক।] এবং (বাহ্যিক নিয়ামত এই দিয়েছেন যে,), তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন (সেমতে এই মুহূর্তে ফিরাউনের দেশ অধিকার করে রয়েছ) এবং তোমোদেরকে (কিছু কিছু এমন জিনিস দান করেছেন, যা বিশ্ব জগতের আর কাউকে দান করেন নি। যেমন, সমুদ্রে পথ দেওয়া, শত্রুকে অভিনব পন্থায় নিমজ্জিত করা, যদ্দরুন চরম লাঞ্ছনা ও কষ্টের কবল থেকে তোমরা অকস্মাৎ শান্তির স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে গিয়েছ। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তোমাদেরকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। এ ভূমিকার পর তাদেরকে সম্বোধন করে আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন ঃ) হে আমার সম্প্রদায় (এসব নিয়ামত ও অনুগ্রহের দাবি এই যে, তোমরা আল্লাহ্-নির্দেশিত এ জিহাদে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হও এবং) সেই পবিত্র ভূমিতে (অর্থাৎ সিরিয়ার রাজধানীতে জিহাদের উদ্দেশ্যে) প্রবেশ কর (যেখানে আমালেকা সম্প্রদায় ক্ষমতাসীন রয়েছে)। যা আল্লাহ্ তোমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন (তাই ইচ্ছা করলেই তোমরা জয়লাভ করবে) এবং পশ্চাতে (দেশের দিকে) প্রত্যাবর্তন করো না; অন্যথায় তোমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (ইহকালেও এবং পরকালেও। পরকালের ক্ষতি এই যে, জিহাদের ফরয পরিত্যাগ করার কারণে গুনাহ্‌গার হয়ে যাবে)। তারা বলল ঃ হে মূসা! সেখানে তো একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা সেখানে কখনও পা রাখব না, যে পর্যন্ত না তারা (কোনরূপে) সেখান থেকে বের হয়ে যায়। হাঁ, যদি তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যায়, তবে নিশ্চিতই আমরা যেতে প্রস্তুত রয়েছি। [মূসা (আ)-এর উক্তি সমর্থন করার জন্য] ঐ দুই ব্যক্তি (এবং) যারা (আল্লাহ্) ভীরুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (এবং) যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন (এভাবে যে, তারা অঙ্গীকারে অটল ছিলেন এসব কাপুরুষকে বোঝাবার জন্য বললেন ঃ তোমরা তাদের উপর (আক্রমণ করে এই শহরের) দ্বার পর্যন্ত চল। যখন তোমরা নগর দ্বারে পা রাখবে, তখনই জয়ী হয়ে যাবে। অর্থাৎ দ্রুত জয়লাভ করতে পারবে। শত্রুরা ভয়ে পলায়ন করুক অথবা সামান্য মুকাবিলা করতে হোক) এবং আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি রাখ, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (অর্থাৎ শত্রুর বিরাট শক্তির প্রতি দৃষ্টি দিও না। কিন্তু এসব উপদেশের কোন প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা গেল না, বরং এ ব্যক্তিদ্বয়কে তারা সম্বোধনেরও যোগ্য মনে করল না; বরং মূসা আলায়হিস সালামকে চরম ধৃষ্টতা সহকারে) বলতে লাগল ঃ হে মূসা ! (আমাদের একই কথা,) আমরা কখনও সেখানে পা রাখব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। (যদি যুদ্ধ করার এতই সাধ থাকে), তবে আপনি ও আপনার আল্লাহ্ চলে যান এবং উভয়ে গিয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখান থেকে নড়ছি না। মূসা (আ) (খুবই বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে) দোয়া করতে লাগলেন ঃ হে পালনকর্তা ! (আমি কি করব—তাদের উপর আমার হাত নেই) হাঁ, নিজের উপর এবং নিজ ভাইয়ের উপর অবশ্য (পুরোপুরি) ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের (ভ্রাতৃদ্বয়ের) মধ্যে এবং এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে (উপযুক্ত) ফয়সালা করে দিন। (অর্থাৎ যার অবস্থা যা চায়, তাই তাকে প্রদান করুন) ইরশাদ হলো,

(উত্তম ! আমার ফয়সালা এই যে,) এদেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের করায়ত্ত হবে না (এবং তারা স্বগৃহেও যেতে পারবে না —পথই পাবে না।) এমনিভাবেই (চল্লিশ বছর পর্যন্ত) ভূপৃষ্ঠে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। [হযরত মূসা (আ) এ ধারণাতীত ফয়সালা শুনে স্বভাবতই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ, তিনি আরও লঘু সিদ্ধান্তের আশা করেছিলেন। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো ঃ হে মূসা, এ উদ্ধত সম্প্রদায়ের জন্য আমি যে ফয়সালা দিয়েছি তাই উপযুক্ত।] অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের (এ দুরবস্থার) জন্য (মোটেই) বিষণ্ন হবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী এক আয়াতে সেই অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের আনুগত্যের ব্যাপারে বনী ইসরাইলের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এর সাথে সাথে তাদের সাধারণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকরণ, অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো এবং মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাইল ফিরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মিসরের আধিপত্য লাভ করল তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই সঙ্গে তাদেরকে আরো কিছু নিয়ামত এবং তাদের পৈতৃক দেশ সিরিয়াকেও তাদের অধিকারে প্রত্যর্পণ করতে চাইলেন। সেমতে মূসা আলায়হিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র ভূমি সিরিয়ায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হলো। সাথে সাথে তাদেরকে আগাম সুসংবাদও দেওয়া হলো যে, এ জিহাদে তারাই বিজয়ী হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন, যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী ইসরাইল স্বভাবগত হীনতার কারণে আল্লাহ্‌র বহু নিয়ামত তথা ফিরাউনকে নিমজ্জিত করা, মিসর অধিকার করা ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেও এক্ষেত্রে অঙ্গীকার প্রতিপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হলো না। তারা সিরিয়ার জিহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ করে বসে রইল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নাযিল করলেন। পরিণতিতে তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। বাহ্যত তাদের চতুষ্পার্শ্বে কোন বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত-পাও শিকলে বাঁধা ছিল না, বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা স্বদেশে অর্থাৎ মিসরে ফিরে যাবার জন্য প্রতিদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পথও চলত, কিন্তু বিকেলে তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, যেখান থেকে সকালে রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত মূসা ও হারুন (আ)-এর ওফাত হয়ে যায় এবং বনী ইসরাইল তীহ্ প্রান্তরেই উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরাফিরা করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হিদায়েতের জন্য অন্য একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন।

এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী ইসরাইলের অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন পয়গম্বরের নেতৃত্বে সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের জন্য জিহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদাও পূর্ণতা লাভ করে। এ হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার কোরআনের ভাষায় বিস্তারিত ঘটনা শুনুন ঃ

হযরত মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বায়তুল-মুকাদ্দাস ও সিরিয়া দখল করার আল্লাহ্র নির্দেশ শোনাবার পূর্বে পয়গম্বরসুলভ বিচক্ষণতা ও উপদেশদানের পরিপ্রেক্ষিতে বনী ইসরাইলকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বলেন ঃ

اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاۤءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۔

অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামতকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নিয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কেউ পায়নি।

এতে তিনটি নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমটি একটি আধ্যাত্মিক নিয়ামত ; অর্থাৎ তাঁর সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বহু সংখ্যক পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন। এর চাইতে বড় পারলৌকিক সম্মান আর কিছু হতে পারে না। তফসীরে মযহারীতে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাইলের মত এত অধিক সংখ্যক পয়গম্বর অপর কোন উম্মতে হয়নি।

হাদীসবিদ ইবনে আবী হাতেম আ'মাশের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা করেন যে, বনী ইসরাইলদের শেষ পর্বে যা হযরত মূসা আলায়হিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, তাতেই এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হন। আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে জাগতিক ও বাহ্যিক। অর্থাৎ তাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে দেওয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী ইসরাইল সুদীর্ঘ কাল থেকে ফিরাউন ও ফিরাউন বংশীয়দের ক্রীতদাসরূপে দিনরাত অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। আজ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন ও তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে বনী ইসরাইলকে তার রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, পয়গম্বরদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ جعل فيكم انبياء অর্থাৎ তোমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে অনেককে পয়গম্বর করেছেন। এর অর্থ এই যে, সমগ্র জাতি পয়গম্বর ছিল না। বাস্তব সত্যও তাই। পয়গম্বর অনেকের মধ্যে কয়েকজনই হন। অবশিষ্ট গোটা জাতি তাদের উম্মত ও অনুসারী হয়। কিন্তু এখানে জাগতিক রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وجعلكم ملوكا অর্থাৎ তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছেন। ملوكا শব্দটি ملك এর বহুবচন। সাধারণ পরিভাষায় এর অর্থ অধিপতি, বাদশাহ্, রাজা। একথা সবাই জানে যে, গোটা জাতি যেমন নবী ও পয়গম্বর হয় না, তেমনি কোন দেশে গোটা জাতি বাদশাহ্ বা রাজা হয় না। বরং জাতির এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি শাসনকার্য পরিচালনা করে। অবশিষ্ট জাতি তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের সবাইকে বাদশাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর একটি কারণ বয়ানুল কোরআনের কোন বুযুর্গের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কোন জাতির মধ্য থেকে কেউ বাদশাহ্ হলে সাধারণ পরিভাষায় তার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যকে গোটা জাতির দিকে সম্বন্ধ করা হয়। উদাহরণত ইসলামের মধ্য যুগের বাদশাহ্দের রাজত্বকে বনী

উমাইয়া ও বনী আব্বাসের রাজত্ব বলা হয়। এমনিভাবে ভারতবর্ষে গযনবী বংশের রাজত্ব, ঘোরী বংশের রাজত্ব, মোঘল বংশের রাজত্ব, অতঃপর ইংরেজদের রাজত্বকে সমগ্র জাতির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই যে জাতির একজন বাদশাহ্ হয়, সে জাতির সবাইকে বাদশাহ্ বলে দেওয়া হয়।

এই বিশেষ বাচনভঙ্গি অনুযায়ী কোরআন পাক সমগ্র বনী ইসরাইলকে রাজ্যাধিপতি বলে দিয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্র। জনগণই স্বীয় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার অধিকারী এবং জনগণই সম্মিলিত মত দ্বারা তাঁকে অপসারণও করতে পারে। তাই দেখার ক্ষেত্রে যদিও একজন রাষ্ট্রপ্রধান হন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণই।

দ্বিতীয় কারণটি ইবনে-কাসীর ও তফসীরে মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্ববর্তী কোন মনীষী থেকে বর্ণিত রয়েছে। তা হলো এই যে, ملك শব্দটির অর্থ শুধু রাজাই নয়, বরং আরও ব্যাপক। গাড়ি, বাড়ি ও নওকর-চাকরের অধিকারী স্বাচ্ছন্দ্যশীল ব্যক্তিকেও ملك বলা হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে তখন বনী ইসরাইলের প্রত্যেক ব্যক্তিই ملك ছিল। তাই তাদের সবাইকে ملوك বলা হয়েছে।

তৃতীয় নিয়ামত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার নিয়ামতের সমষ্টি। বলা হয়েছে ঃ وَاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ তোমাদেরকে এমন সব নিয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেন নি। অভ্যন্তরীণ সম্মান, নবুয়ত এবং রিসালতও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া বাহ্যিক রাজত্ব এবং অর্থ-সম্পদও এরই মধ্যে পরিগণিত। প্রশ্ন হতে পারে, কোরআনের উক্তি অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায় অন্য সব উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কোরআনের উক্তি كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এবং كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا প্রভৃতি বাক্য এবং অসংখ্য হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। উত্তর এই যে, আয়াতে বিশ্বজগতের ঐ সব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা মূসা (আ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমগ্র বিশ্বের কেউ ঐ সব নিয়ামত পায়নি, যা বনী ইসরাইল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের কোন উম্মত যদি আরও বেশি নিয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বর্ণিত মূসা (আ)-এর উক্তিটি ঐ নির্দেশ বর্ণনার ভূমিকা, যা পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভাগ্যে লিখেছেন।

পবিত্র ভূমি বলে কোন্ ভূমি বোঝানো হয়েছে ঃ এ প্রশ্নে তফসীরবিদদের উক্তি বাহ্যত ভিন্ন ভিন্ন। কারও মতে বায়তুল-মুকাদ্দাস, কারও মতে কুদ্স শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন ঃ আরিহা শহর--যা জর্দান নদী ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে বিশ্বের একটি প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। হযরত মূসা (আ)-এর আমলে এ শহরের অত্যাশ্চর্য জাঁকজমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, এ শহরের এক হাজার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছিল। প্রতি অংশ এক হাজার করে বাগান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, পবিত্র ভূমি বলে দামেশ্ক ও ফিলিস্তিনকে এবং কারও মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ বলেন--সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। কা'ব আহবার বলেন, আমি আল্লাহ্র কিতাবে (সম্ভবত তৌরাতে) দেখেছি যে, সমগ্র সিরিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং এতে আল্লাহ্র অনেক প্রিয় বান্দা রয়েছেন। পয়গম্বরদের জন্মস্থান ও বাসস্থান হওয়ার কারণে একে পবিত্র ভূমি বলা হয়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) লেবাননের পাহাড়ে আরোহণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন--ইবরাহীম! এখান থেকে দৃষ্টিপাত কর। যে পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি পৌঁছবে, আমি তার সবটুকুকে পবিত্র ভূমি করে দিলাম। ইবনে কাসীর ও মাযহারী তফসীর গ্রন্থ থেকে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সর্বশেষ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। তবে নর্ণনায় কেউ সিরিয়ার অংশ বিশেষকে এবং কেউ সমগ্র সিরিয়াকে বর্ণনা করেছেন।

قَالُوْا يَامُوْسٰى-এর আগে আল্লাহ্ তা'আলা মুসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাইলকে আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সিরিয়া দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, সিরিয়ার ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সত্ত্বেও বনী ইসরাইল স্বীয় সর্বজনবিদিত ঔদ্ধত্য ও বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হলো না, বরং মূসা (আ)-কে বলল হে মূসা! এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে। যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। হ্যাঁ, যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা সেখানে যেতে পারি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, আলী ইবনে আবী তালহা প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তখন সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দৈহিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ ও ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট ছিল। তাদের সাথে জিহাদ করে বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মূসা আলায়হিস সালাম ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেওয়া হয়েছিল।

মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছা। জর্দান নদী পার হয়ে বিশ্বের প্রাচীনতম শহর আরিহায় পৌঁছে তিনি শিবির স্থাপন করলেন। বনী ইসলাইলদের দেখা-শোনার জন্য বার জন সর্দার নির্বাচন করার কথা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মূসা (আ) এই বার জন সর্দারকে শত্রুদের অবস্থা ও রণাঙ্গনের হাল-হাকীকত জেনে আসার জন্য সম্মুখে প্রেরণ করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে শহরের বাইরে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হয়। সে একাই বার জনকে গ্রেফতার করে বাদশাহ্র সামনে উপস্থিত করে বলল ঃ এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। শাহী দরবারে পরামর্শ হলো যে, এদেরকে হত্যা করা হোক অথবা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা

হোক। অবশেষে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো—যাতে তারা স্বজাতির কাছে পৌঁছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমালেকা জাতির শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বর্ণনা করে। ফলে আক্রমণ তো দূরের কথা, ভীত হয়ে এদিকে মুখ করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলে।

এ স্থলে অধিকাংশ তফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে নাতিদীর্ঘ কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমালেকা সম্প্রদায়ের উল্লিখিত ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে আওজ ইবনে ওনুক। এসব রেওয়ায়েতে তার অদ্ভুত আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসকে এমন অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উদ্ধৃত করাও কঠিন।

ইবনে-কাসীর বলেন ঃ আওজ ইবনে ওনুকের যেসব কিস্সা এসব ইরাইলী রেওয়ায়েতে স্থান পেয়েছে, সেগুলো কোন বুদ্ধিমানের কাছে গ্রহণীয় নয় এবং শরীয়তেও এগুলোর কোন বৈধতা নেই—এ সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। আসল ব্যাপার এতটুকু যে, আমালেকা সম্প্রদায় ছিল আদ সম্প্রদায়ের উত্তর পুরুষদের একটি অংশ। আদ সম্প্রদায়ের ভয়াবহ আকার-আকৃতির কথা স্বয়ং কোরআন পাক বর্ণনা করেছে। তাদের বিশালাকৃতি ও শক্তি-সাহস প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের এক ব্যক্তি বনী ইসরাইলের বার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

মোটকথা, বনী ইসরাইলের বারজন সর্দার আমালেকাদের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে আরিহায় স্বজাতির কাছে ফিরে এল। তারা মূসা (আ)-এর কাছে এ বিস্ময়কর জাতি ও তাদের অবিশ্বাস্য শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বর্ণনা করল। হযরত মূসা (আ) এসব কাহিনী শুনে এতটুকুও ভীত হলেন না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের বাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন। আকবর এলাহাবাদীর ভাষায় ঃ

مجھ کو بے دل کردے ایسا کون ہے
یاد مجھ کو انتم الا علون ہے

হযরত মূসা (আ) তো তাদের শৌর্য-বীর্যের অবস্থা শুনে স্বস্থানে পাহাড়ের মত দৃঢ়তা সহকারে জিহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্তু বনী ইসরাইলকে নিয়েই সমস্যা। তারা যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে, তবে নিশ্চিতই ভরাডুবি। তাই তিনি বারজন সর্দারকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অবস্থা বনী ইসরাইলের কাছে ব্যক্ত করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হলো না। তারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবের কাছে তা ব্যক্ত করে দিল। শুধু ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্না নামক দু'ব্যক্তি মূসা (আ)-এর নির্দেশ পালন করে তা কারও কাছে প্রকাশ করল না।

বারজনের মধ্যে দশজনই যদি গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেয়, তবে তা গোপন থাকার কথা নয়। ফলে এমন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সথে বনী ইসরাইলরা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তারা বলতে লাগল ঃ ফিরাউনের সম্প্রদায়ের মত সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া এর চাইতে অনেক ভাল ছিল। সেখান থেকে উদ্ধার করে এনে আমাদেরকে এখানে নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন করা হয়েছে। এসব অবস্থার পটভূমিকায় বনী ইসরাইল বলেছিল ঃ

يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا.

অর্থাৎ হে মূসা! এ শহরে একটি দুর্ধর্ষ জাতি বসবাস করে। তাদের মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই যতক্ষণ তারা সেখানে আছে, ততক্ষণ আমরা সেখানে যাওয়ার নামও নেব না। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যে দুই ব্যক্তি ভয় করত এবং যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত দান করেছিলেন, তারা এসব কথাবার্তা শুনে বনী ইসরাইলকে উপদেশছলে বলল ঃ তোমরা আগেই ভয়ে করছ কেন? একটু পা বাড়িয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের ফটক পর্যন্ত পৌঁছ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এতটুকুতেই তোমরা বিজয়ী হয়ে যাবে এবং শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে বর্ণিত এ দু'ব্যক্তি হচ্ছে বারজনের মাঝে সেই দুই সর্দার, যারা মূসা (আ)-এর নির্দেশক্রমে আমালেকার অবস্থা গোপন রেখেছিলেন অর্থাৎ ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্না।

কোরআন পাক এ স্থলে তাদের দু'টি গুণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। এক الَّذِينَ يَخَافُونَ অর্থাৎ যারা ভয় করত। কাকে ভয় করত, আয়াতে তার উল্লেখ নেই। এতে করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব-চরাচরে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভয় করার যোগ্য পাত্র। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তাঁরই কব্জায়। তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না এবং সামান্য ক্ষতিও করতে পারে না। নির্দিষ্ট একটি সত্তাই যখন ভয় করার একমাত্র যোগ্য, তখন তা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় গুণ এই ঃ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যার মধ্যে যে গুণ ও আত্মিক সৌন্দর্য রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও দান। নতুবা বারজন সর্দারের মধ্যে দশজনই বাহ্যিক শক্তি তথা হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ এবং আভ্যন্তরীণ শক্তি তথা জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনা সর্বোপরি মূসা (আ)-এর সংসর্গ লাভ করা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু তাঁরা দুজনই সত্যের পথে অটল রইলেন। এতে বোঝা যায় যে, আসল হিদায়েত মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তি, চেষ্টা ও কর্মের অনুগামী নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলারই নিয়ামত। তবে এ নিয়ামত লাভের জন্যে চেষ্টা ও কর্ম পূর্বশর্ত।

অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে জ্ঞানবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সতর্কতা দান করেছেন, এসব শক্তির জন্য তার গর্ব করা উচিত নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই সুমতি ও হিদায়েত প্রার্থনা করা দরকার। সাধক রূমী চমৎকার বলেছেন ঃ

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه
جز شکسته می نگیرد فضل شاه

মোটকথা, তাঁরা উভয়েই স্বীয় দলকে উপদেশ দিলেন যে, আমালেকাদের বাহ্যিক শৌর্য বীর্য দেখে ভীত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বায়তুল মুকাদ্দাসের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তারাই জয়ী হবে। ফটক পর্যন্ত পৌঁছার পর তারা জয়লাভ করবে—তাদের এ ধারণার কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁরা আমালেকা সম্প্রদায়কে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন

যে, এরা দেহের দিক দিয়ে বিরাটকায় ও শক্তিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মনের দিক দিয়ে অপরিপক্ক। আক্রমণের সংবাদ শুনে টিকে থাকতে পারবে না। এছাড়া মূসা (আ)-এর মুখে আল্লাহ্-প্রদত্ত বিজয়ের সুসংবাদ তাঁরা শুনেছিলেন। এ সুসংবাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের ফলেও তাঁদের মনে উপরোক্ত ধারণা জন্মলাভ করতে পারে।

কিন্তু বনী ইসরাইল যেখানে পয়গম্বরের কথার প্রতিই কর্ণপাত করল না, সেখানে তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জওয়াবই আরও বিশ্রী ভঙ্গীতে পুনরাবৃত্তি করল ঃ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰهُنَا قَاعِدُونَ অর্থাৎ আপনি ও আপনার আল্লাহ্ উভয়ে গিয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। বনী ইসরাইল বিদ্রূপের ভঙ্গীতে একথা বললে তা পরিষ্কার কুফর হতো অতঃপর তাদের সাথে মূসা (আ)-এর অবস্থান করা, তীহ্ প্রান্তরে দোয়া করা ইত্যাদি সম্ভবপর হতো না, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এ কারণে তফসীরবিদরা উপরোক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেন--আপনি যান এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আপনার আল্লাহ্ই আপনার সাহায্য করবেন, আমরা সাহায্য করতে অক্ষম। এ অর্থের দিক দিয়ে বনী ইসরাইলের জওয়াব কুফরের পরিধি অতিক্রম করে যায়—যদিও কথাটি অত্যন্ত বিশ্রী ও পীড়াদায়ক। এ কারণেই তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বদর যুদ্ধে নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মুসলমানদের মোকাবিলায় এক হাজার সশস্ত্র জওয়ানের বাহিনী প্রস্তুত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দৃশ্য দেখে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। এতে সাহাবী হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম! আমরা কস্মিন কালেও এ কথা বলব না, যা মূসা (আ)-কে তাঁর স্বজাতি বলেছিল ঃ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰهُنَا قَاعِدُونَ বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সাহাবীদের মধ্যে জোশ ও উদ্দীপনার ঢেউ খেলতে লাগল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) প্রায়ই বলতেন ঃ মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের এ কীর্তির জন্য আমি ঈর্ষান্বিত। আফসোস! এ সৌভাগ্য যদি আমি লাভ করতে পারতাম!

সারকথা এই যে, এহেন নাজুক মুহূর্তে বনী ইসরাইল মূসা (আ)-কে মূর্খজনোচিত উত্তর দিয়ে সব প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করল।

জাতির চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং মূসা (আ)-এর অপরিসীম দৃঢ়তা ঃ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي। বনী ইসরাইলের পূর্ববর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলী এবং তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ও মূসা (আ)-এর আচার-আচরণ পর্যালোচনা করার পর যদি বনী ইসরাইলের উপরোক্ত বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়, তবে বাস্তবিকই বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। যে বনী ইসরাইল বহু শতাব্দী ধরে ফিরাউনের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকে নানাবিধ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও নির্যাতন ভোগ করেছিল, হযরত মূসা (আ)-এর শিক্ষার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের চোখের সামনে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম

শক্তি সামর্থ্যের কতই না হৃদয়গ্রাহী ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছিল। ফিরাউন ও ফিরাউনের পারিষদবর্গ নিজেদের আহূত দরবারে মূসা ও হারূন (আ)-এর হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিল। যে যাদুকরদের উপর তাদের ভরসা ছিল, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর গুণ গাইতে থাকে। এরপর খোদায়ীর দাবিদার ফিরাউন ও সুরম্য শাহী প্রাসাদে বসবাসকারী পারিষদবর্গ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার অপরাজেয় শক্তি কিভাবে সমুদয় রাজপ্রাসাদ ও আসবাবপত্রকে মুহূর্তের মধ্যে খালি করিয়ে নিয়েছিল! কিভাবে বনী ইসরাইলের দৃষ্টির সম্মুখে ফিরাউনকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছিল! কিভাবে অলৌকিক পন্থায় বনী ইসরাইলকে সমুদ্রের পরপারে পৌঁছে দিয়েছিল এবং কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের গোটা সামাজ্য এবং তার অজস্র ও অগণিত অর্থ-সম্পদ কোনরূপ যুদ্ধ ও রক্তপাত ব্যতিরেকেই বনী ইসরাইলকে দান করেছিলেন! অথচ এসব অর্থ-সম্পদের জন্যই ফিরাউন একদিন সগর্বে বলত : اليس لى ملك مصر و هذه الانهار تجرى من تحتى। মিসর সাম্রাজ্য আমার নয় কি এবং এসব নদনদী আমারই তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় না কি?

উপরোক্ত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্ তা'আলার অজেয় শক্তি-সামর্থ্য বনী ইসরাইলের চোখের সামনে প্রকাশ পায়। মূসা (আ) তাদেরকে প্রথমে অমনোযোগিতা ও অজ্ঞানতা থেকে অতঃপর ফিরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে কতই না হৃদয়বিদারক কষ্ট সহ্য করেছেন! এ সবের পর যখন তাদেরকেই আল্লাহ্র সাহায্য ও অনুগ্রহের ওয়াদাসহ সিরিয়ায় জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তারাই চরম হীনম্মন্যতার পরিচয় দিয়ে বলতে থাকে : اذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ বিশ্বের কোন শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক বুকের উপর হাত রেখে বলুক, এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির পর জাতির এ ধরনের আচরণ দেখে তার ধৈর্যের বাঁধ অটুট থাকবে কি? কিন্তু এখানে রয়েছেন আল্লাহ্র স্থির-প্রতিজ্ঞ পয়গম্বর যিনি পাহাড় হয়ে আপন সাধনায় মগ্ন!

তিনি জাতির উপর্যুপরি অঙ্গীকার ভঙ্গে বিরক্ত হয়ে স্বীয় পালনকর্তার দরবারে এতটুকুই বললেন : اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ। অর্থাৎ নিজের ও নিজের ভ্রাতা ছাড়া কারও উপর আমার ক্ষমতা নেই। এমতাবস্থায় আমালেকা জাতির বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ জয় করা যায়! এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে কমপক্ষে দু'জন সর্দার ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্না মূসা (আ)-এর প্রতি আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা জাতিকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার ব্যাপারে মূসা (আ)-এর সাথে পূর্ণ সহযোগিতাও করেছিলেন। এক্ষণে মূসা (আ) তাদের কথা উল্লেখ না করে শুধু নিজের ও হারূন (আ)-এর কথা উল্লেখ করলেন। এর কারণ ছিল বনী ইসরাইলেই অবাধ্যতা। শুধু হারূন (আ) পয়গম্বর বিধায় নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁর সত্যপন্থী হওয়া ছিল নিশ্চিত। কিন্তু উপরোক্ত সর্দারদ্বয় নিষ্পাপ ছিলেন না। তাই চরম দুঃখ ও ক্ষোভের মুহূর্তে তিনি নিশ্চিত সত্যপন্থীর কথা বলেছেন।

হযরত মূসা (আ) দোয়া করলেন : فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ অর্থাৎ আমরা উভয় এবং আমাদের জাতির মধ্যে আপনিই ফয়সালা করে দিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর

তফসীর অনুযায়ী এ দোয়ার সারমর্ম এই যে, তারা যে শাস্তির যোগ্য, তাদেরকে তাই দিন এবং আমাদের জন্য যা উপুক্ত তা আমাদেরকে দান করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা এ দোয়া কবূল করে বললেন ঃ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً – يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ সিরিয়ার পবিত্র ভূমি তাদের জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত হারাম ও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। এখন তারা সেখানে যেতে চাইলেও যেতে পারবে না। শুধু তাই নয়, তারা স্বদেশ মিসরে ফিরে যেতে চাইলেও যেতে পারবে না, বরং এ প্রান্তরেই অন্তরীণ হয়ে থাকবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তির জন্য পুলিশ, হাতকড়া, জেলখানার দুর্ভেদ্য প্রাচীর লৌহকপাটের প্রয়োজন নেই, তিনি কাউকে অন্তরীণ করতে চাইলে উন্মুক্ত প্রান্তরেও করতে পারেন। কারণ, সমগ্র সৃষ্টজগতই তাঁর অধীন। তিনি যখন কাউকে বন্দী করার জন্য সৃষ্টজগতের প্রতি নির্দেশ জারি করেন, তখন সমগ্র আলোবাতাস, ময়দান, ভূ-পৃষ্ঠ ও বাসস্থান তার জেলদারোগা হয়ে যায় ঃ

خاک وبا دواب واتش بنده اند

با من وتو مرده با حق زنده اند

সে মতে বনী ইসরাইল মিসর ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি ছোট্ট প্রান্তরে অন্তরীন হয়ে পড়ে। হযরত মুকাতিলের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্রান্তরের পরিধি দৈর্ঘ্যে ৯০ মাইল, প্রস্থে ২৭ মাইল। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর আয়তন ৩০x১৮ মাইল। হযরত মুকাতিল বলেন—তখন বনী ইসরাইলের জনসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। আল্লাহ্ তা'আলা এত জনবহুল জাতিকে এ ছোট্ট প্রান্তরে বন্দী করে দিলেন। কোনরূপে এ প্রান্তর থেকে বের হয়ে মিসরে ফিরে যেতে অথবা সামনে অগ্রসর হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তারা নিষ্ফল প্রচেষ্টায় অতিবাহিত করে দেয়। তারা প্রত্যহ সকালে রওয়ানা হতো। পথ চলতে চলতে যখন বিকেল হয়ে যেত, তখন দেখতে পেত সকালে যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল, সারাদিন ঘুরে সেখানেই পৌঁছে গেছে।

তফসীরবিদ আলিমগণ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতিকে সাজা দিলে তা তাদের কু-কর্মের সাথে সম্পর্ক রেখেই দেন। এ অবাধ্য জাতি বলেছিল ঃ إِنَّا هَٰهُنَا قَاعِدُونَ —আমরা এখানেই বসে থাকব। আল্লাহ্ তা'আলা সাজা হিসেবে তাদেরকে ৪০ বছর সেখানে বসিয়ে রাখলেন। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাইলের উপস্থিত বংশধর, যারা অবাধ্যতায় অংশ নিয়েছিল, ৪০ বছরে তারা সবাই একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। পরবর্তী বংশধরের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা ৪০ বছর পূর্তির পর মুক্ত হয়ে বায়তুল-মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিল। অন্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উপস্থিত বংশধরের মধ্যেও কিছু লোক ৪০ বছর পর অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, আল্লাহ্র এক ওয়াদা ছিল এই كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ (আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সিরিয়া দেশ লিখে দিয়েছেন)। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। বনী ইসরাইলের উপস্থিত বংশধরদের নাফরমানীর কারণে محرمة عليهم اربعين سنة চল্লিশ বছর পর্যন্ত পবিত্র ভূমির দখল লাভ করা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়।

অবশেষে তাদের বংশে যারা নতুন জন্মগ্রহণ করে তাদের হাতে এদেশ বিজিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করে।

তীহ্ প্রান্তরে হযরত মূসা এবং হারূন (আ)-ও স্বজাতির সাথে ছিলেন। কিন্তু জাতির জন্য এটি ছিল কয়েদখানা এবং তাঁদের জন্য আল্লাহ্র নিয়ামতের বিকাশ কেন্দ্র।

এ কারণেই চল্লিশ বছরের সাজার মেয়াদেও আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর বরকতে বনী ইসরাইলকে নানাবিধ নিয়ামতে ভূষিত করেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে সূর্যের খরতাপে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে মূসা (আ)-এর দোয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর মেঘমালার ছত্রছায়া প্রদান করেন। তারা যে দিকে যেত, মেঘমালা তাদের সাথে সাথে ছায়াদান করে যেতে থাকত। পানির অভাবে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে এক খণ্ড পাথর দান করলেন। পাথরটি সর্বত্র তাদের সাথে সাথে থাকত। পানির প্রয়োজন হলেই মূসা (আ) স্বীয় লাঠির দ্বারা পাথরের গায়ে আঘাত করতেন। অমনি তা থেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যেত। ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য আসমানী খাদ্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করা হতো। রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একটি আলোর মিনার স্থাপন করে দিলেন। এর উজ্জ্বল রৌশনীতে তারা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করত।

মোটকথা, তীহ্ প্রান্তরে শুধু সাজাপ্রাপ্তরাই ছিল না। বরং আল্লাহ্ তা'আলার দু'জন প্রিয় পয়গম্বর এবং প্রিয় বান্দা ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্নাও ছিলেন। তাঁদের কল্যাণে বন্দীদশাতেও বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা 'রাহীমুররুহামা' সর্বাধিক দয়াশীল। বনী ইসরাইলের ব্যক্তিবর্গও সম্ভবত এসব অবস্থা দেখে তওবা করে থাকবে, যার প্রতিদানে তারা এসব নিয়ামত লাভ করেছে।

বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ চল্লিশ বছরের মেয়াদে সর্বপ্রথম হারূন (আ)-এর ওফাত হয়। এর এক বছর অথবা ছ মাস পর হযরত মূসা (আ)-এর ওফাত হয়ে যায়। তাঁদের পর বনী ইসরাইলের হিদায়েতের জন্য ইউশা ইবনে নূন পয়গম্বররূপে আদিষ্ট হন। চল্লিশ বছর পূর্তির পর বনী ইসরাইলের অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁরই নেতৃত্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের জিহাদে রওয়ানা হয়। আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা অনুযায়ী তাঁদের হাতে সিরিয়া বিজিত হয় এবং অপরিমিত ধন-দৌলত হস্তগত হয়।

উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ অর্থাৎ অবাধ্য জাতির জন্য আপনি বিষণ্ন হবেন না। এর কারণ এই যে, পয়গম্বররা স্বভাবগতভাবে উম্মতের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। উম্মত সাজাপ্রাপ্ত হলে তাতে তাঁরাও দুঃখিত ও প্রভাবিত হন। তাই মূসা (আ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের শাস্তির কারণে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ

اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ

مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ
لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي
وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ
لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا
يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا
أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ
النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

২৭) আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শোনান। যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল ঃ আল্লাহ্ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করি। আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল—যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। সে বলল, আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করি! অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল। এ কারণেই আমি বনী ইসরাইলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে , যে

কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম), আপনি আহ্‌লে কিতাবকে (হযরত) আদম (আ)-এর পুত্রদ্বয়ের (অর্থাৎ হাবিল ও কাবিলের) সংবাদ যথাযথভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দিন, (যাতে তাদের সৎলোকদের সাথে সম্বন্ধশীল হওয়ার দর্প চূর্ণ হয়ে যায় ঃ نحن ابناء الله 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র' উক্তি দ্বারা এ দর্প ফুটে ওঠে। ঘটনাটি তখন ঘটেছিল), যখন তারা উভয়ে (আল্লাহ্‌র নামে) এক একটি কুরবানী নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের (অর্থাৎ হাবিলের কুরবানী) গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের (অর্থাৎ কাবিলের) কুরবানী গৃহীত হয়নি। (কেননা যে বিষয়ের মীমাংসার জন্য এ কুরবানী নিবেদন করা হয়েছিল, তাতে হাবিল ছিল ন্যায় পথে। তাই তার কুরবানীটিই গৃহীত হয়। অপরপক্ষে কাবিল ন্যায় পথে ছিল না। তাই তার কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়। এরূপ না হলে কোন মীমাংসাই হতো না। এবং সত্য ধামাচাপা পড়ে যেত। যখন) সে (অর্থাৎ কাবিল এতেও হেরে গেল, তখন ক্রোধান্বিত হয়ে) বলতে লাগলঃ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। অপরজন (অর্থাৎ হাবিল) উত্তর দিল ঃ (তোমার পরাজয় তো তোমার অন্যায় পথে থাকার কারণেই। এতে আমার কি দোষ? কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মভীরুদের আমলই গ্রহণ করেন। (আমি ধর্মভীরুতা অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলেছি। তিনি আমার উৎসর্গ গ্রহণ করেছেন। তুমি ধর্মভীরুতা পরিহার করেছ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। তিনি তোমার উৎসর্গ কবূল করেন নি। তুমি নিজেই বিচার কর--এতে দোষ তোমার, না আমার? এরপরও যদি তুমি তাই চাও তবে তুমি জান। আমার দৃঢ় সংকল্প এই যে,) যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হাত বাড়াও তবুও আমি কিছুতেই তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হাত বাড়াব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করি (অর্থাৎ তোমাকে হত্যা করার বাহ্যত একটি বৈধ কারণ মওজুদ আছে। তা এই যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও। কিন্তু আমি এ বৈধতার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ দেখিনি। তাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। এ কারণে তোমাকে হত্যা করা সাবধানতার খেলাফ মনে করি। এ সন্দেহের উপর ভিত্তি করেই আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। কিন্তু তোমার অবস্থা অন্যরূপ। যদিও আমাকে হত্যা করার কোন বৈধ কারণ নেই; বরং বারণ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তুমি আমাকে হত্যা করার দুঃসাহস করছ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করছ না) আমি ইচ্ছা করি, যেন (আমার দ্বারা কোন পাপ কাজ না হয়—তুমি আমার প্রতি যত অন্যায়ই কর না কেন। যাতে) আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথাতেই চাপিয়ে নাও, অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। (কাবিল তো পূর্বেই হত্যার সংকল্প করে ফেলেছিল। এখন যখন শুনল যে, প্রতিরক্ষারও

চেষ্টা করবে না, তখনই দয়া বিগলিত হওয়াই উচিত ছিল ; কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে আরও) তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করল। অতঃপর সে তাকে হত্যাই করে ফেলল। ফলে সে (হতভাগা) ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (জাগতিক ক্ষতি এই যে, স্বীয় বাহুবল ও প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা হারাল এবং পারলৌকিক ক্ষতি এই যে, হত্যার পাপের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। হত্যার পর মৃতদেহ কি করা হবে এবং এ রহস্য কিভাবে গোপন থাকবে—সে বিষয়ে কাবিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। যখন কিছুই বুঝতে পারল না, তখন) আল্লাহ্ তা'আলা (অবশেষে) একটি কাক (সেখানে) পাঠিয়ে দিলেন। সে (চঞ্চু এবং থাবা দ্বারা) মাটি খনন করছিল (এবং খনন করে অপর একটি মৃত কাককে গর্তে ফেলে দিয়ে তার উপর মাটি নিক্ষেপ করছিল) যাতে (কাক) তাকে (অর্থাৎ কাবিলকে) শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার (হাবিলের) মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে ; (কাবিল এ ঘটনা দেখে মনে মনে খুবই অনুতপ্ত হলো যে, একটি কাকের সমান বুদ্ধিও আমার মধ্যে নেই। সে নিরতিশয় অনুতপ্ত হয়ে) বলতে লাগল ঃ আফসোস, আমি কি এতই অক্ষম যে, কাকের তুল্যও হতে পারিনি এবং স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ গোপন করতে পারিনি। অতঃপর সে (এ দুরবস্থার জন্য) খুবই লজ্জিত হলো। এ (ঘটনার) কারণেই (যদ্দ্বারা অন্যায় হত্যার অনিষ্ট বোঝা যায়) আমি (শরীয়তের সব আদিষ্টদের প্রতি সাধারণভাবে এবং) বনী ইসরাইলের প্রতি (বিশেষভাবে এ নির্দেশ) লিখে দিয়েছি (অর্থাৎ বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি) যে, (অন্যায় হত্যা এতবড় পাপ যে), যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির) বিনিময় ছাড়া অথবা পৃথিবীতে কোন (অনিষ্টও) গোলযোগ ছাড়া (অনর্থক) কাউকে হত্যা করবে, (কোন কোন দিক দিয়ে তা এতবড় গুনাহ্ হবে যে,) সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। (কোন কোন দিক এই যে, গুনাহ্ করার দুঃসাহস করে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, জগতে প্রতিহত্যার যোগ্য হয়েছে এবং আখিরাতে দোযখের উপযুক্ত হয়েছে। এসব বিষয় একজনকে হত্যা করলে যেমন, এক হাজার জনকে হত্যা করলেও তেমনি, যদিও তীব্রতা ও তীব্রতরতায় পার্থক্য রয়েছে। আয়াতে দুটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করার কারণ এই যে, অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা নাজায়েয নয়। এমনিভাবে হত্যা বৈধ হওয়ার অন্যান্য কারণও এর অন্তর্ভুক্ত যেমন ডাকাতি। পরবর্তী আয়াতে তা বর্ণিত হবে এবং হরবী ব্যক্তির কুফর, যা জিহাদের বিধি-বিধানে বর্ণিত হয়েছে—এসব কারণেও হত্যা করা জায়েয ; বরং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিব)। এবং (একথাও লিখে দিয়েছি যে, অন্যায়ভাবে হত্যা করা যেমন বিরাট পাপ, তেমনি কাউকে অন্যায় হত্যা থেকে বাঁচানোর সওয়াবও তেমনি বিরাট)। যে ব্যক্তি কারও জীবন রক্ষা করে, (সে এমন সওয়াব পাবে), সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করল। (অন্যায় হত্যা বলার কারণ এই যে, শরীয়তের আইনে যাকে হত্যা করা জরুরী, তার সাহায্য করা অথবা সুপারিশ করা হারাম। জীবন রক্ষা করার এ বিধান লিপিবদ্ধ করার কারণেও হত্যাজনিত পাপের তীব্রতা প্রকট হয়ে পড়েছে। কারণ, জীবন রক্ষা যখন এমন প্রশংসনীয়, তখন জীবন নাশ করা অবশ্যই নিন্দনীয় না হয়ে পারে না। অতএব, عطف দ্বারা একে من اجل ذالك-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা শুদ্ধ হয়েছে এবং বনী ইসরাইলকে এ বিষয়বস্তু

লিখে দেওয়ার পর) আমার অনেক পয়গম্বরও (নবুয়তের) প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে তাদের কাছে এসেছেন (এবং প্রায় প্রায়ই এ বিষয়বস্তুর প্রতি জোর দিয়েছেন) বস্তুত এরপরও (অর্থাৎ জোর দেওয়ার পরেও) তাদের অনেকেই পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করতে থাকে (তাদের উপর এসবের কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি; এমনকি কেউ কেউ স্বয়ং পয়গম্বরদের হত্যা করেছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাবিল ও কাবিলের কাহিনী ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন--আপনি আহ্‌লে-কিতাবদেরকে অথবা সমগ্র উম্মতকে আদম আলায়হিস সালামের পুত্রদ্বয়ের সত্য কাহিনী বর্ণনা করে শুনিয়ে দিন।

কোরআন মজীদে অভিনিবেশকারী মাত্রই জানে যে, কোরআন পাক কোন কিস্‌সা-কাহিনী অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোন ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও অতীত ঘটনাবলী এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোর উপর শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল। এসব উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাকের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে এবং অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে না ; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়।

হযরত আদম আলায়হিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞরীতির ভিত্তিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখন প্রথমে আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে আসল কাহিনী শুনুন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসলাইলের প্রতি জিহাদের নির্দেশ এবং তাতে তাদের কাপুরুষতা ও ভীরুতা বর্ণনা করা হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য কাহিনীতে অন্যায় হত্যার অনিষ্ট ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করে জাতিকে মিতাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সত্যের সমর্থনে এবং মিতাচার থেকে পেছনে হটা যেমন ভুল, তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়া ইহকাল ও পরকালকে বরবাদ করার শামিল।

প্রথম আয়াতে ابْنَىْ اٰدَمَ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। সাধারণত প্রত্যেক মানুষই আদমী এবং আদম সন্তান। সেমতে প্রত্যেককেই ابْنَىْ اٰدَمَ বা আদম সন্তান বলা যায়। কিন্তু সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এখানে ابْنَىْ اٰدَمَ বলে হযরত আদমের ঔরসজাত পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিলকে বোঝানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্য ঃ তাদের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ তাদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিশুদ্ধ ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী শুনিয়ে দিন। এতে بِالْحَقِّ শব্দ দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনায় খুবই সাবধানতা প্রয়োজন এবং এতে কোনরূপ মিথ্যা, জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ থাকা এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হওয়া উচিত নয়। (ইবনে কাসীর)

কোরআন পাক শুধু এখানেই নয়, বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ। দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ঃ قَوْلَ الْحَقِّ এসব জায়গায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে حق শব্দ ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, ঘটনাবলী বর্ণনায় সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। জগতে রেওয়ায়েত ও বর্ণনার ভিত্তিতে যেসব অনিষ্ট দেখা দেয়, সাধারণত সেগুলোর মূল কারণ ঘটনাবলী বর্ণনায় অসাবধানতা। সামান্য শব্দ ও ভঙ্গির পরিবর্তনে ঘটনার স্বরূপ বিকৃত হয়ে যায়। এ অসাবধানতার কারণেই পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধর্ম ও শরীয়ত বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী কতিপয় ভিত্তিহীন ও অচিন্তিত গল্প-গুজবের সমষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে। আয়াতে بِالْحَقِّ শব্দ যোগ করে এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া এ শব্দ দ্বারা কোরআন পাকের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহ্যত নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও হাজারো বছর পূর্বেকার ঘটনাবলী যেভাবে বিশুদ্ধ ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ আল্লাহ্র ওহী ও নবুয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে ?

এ ভূমিকার পর কোরআন পাক পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে ঃ

اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ـ

আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারও নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে 'কুরবান' বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কুরবান ঐ জন্তুকে বলে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়।

হযরত আদম আলায়হিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কুরবানীর ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সর্বস্তরের আলিমদের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। ঘটনাটি এই ঃ যখন আদম ও হাওয়া (আ) পৃথিবীতে আসেন এবং সন্তান ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা—এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভগিনী ছাড়া হযরত আদমের আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আ)-এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিণী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত কন্যাটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত

কুশ্রী কন্যা কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জেদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। হযরত আদম (আ) তাঁর শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আব্দার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ তোমরা উভয়েই আল্লাহর জন্য নিজ নিজ কুরবানী পেশ কর। যার কুরবানী পরিগৃহীত হবে, সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। হযরত আদম আলায়হিস সালামের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কুরবানীই গৃহীত হবে।

তৎকালে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা অবতীর্ণ হয়ে কুরবানীকে ভস্মীভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানী অগ্নি ভস্মীভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হতো।

হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানীটিকে ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না। এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল ঃ لَأَقْتُلَنَّكَ অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।

হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছাও ফুটে উঠেছিল। সে বলল ঃ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম এই যে, তিনি আল্লাহ্ভীরু পরহিযগার কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন করলে তোমার কুরবানীও গৃহীত হতো। তুমি তা করনি, তাই কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কি? এ বাক্যে হিংসুটের হিংসার প্রতিকারও বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ হিংসাকারী যখন দেখে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে, যা সে প্রাপ্ত হয়নি, তখন একে নিজ কর্মদোষ ও গুনাহের ফলশ্রুতি মনে করে গুনাহ থেকে তওবা করা উচিত। অন্যের নিয়ামত অপনোদনের চেষ্টা করা উচিত নয়। তাতে উপকারের পরিবর্তে অপকারই হবে বেশি। কারণ, আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়া আল্লাহ্ভীতির উপর নির্ভরশীল।

সৎকর্ম গৃহীত হওয়া আন্তরিকতা ও আল্লাহ্-ভীতির উপর নির্ভরশীল ঃ এখানে হাবিল ও কাবিলের কথোপকথনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে যে, সৎকর্ম ও ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ্ভীতির উপর নির্ভরশীল। যার মধ্যে আল্লাহ্ভীতি নেই, তার সৎকর্মও গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই পূর্ববর্তী আলিমরা বলেছেন ঃ আলোচ্য আয়াত ইবাদতকারী ও সৎকর্মীদের জন্য চাবুক স্বরূপ। এজন্যই হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) অন্তিম মুহূর্তে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আপনি তো সারা জীবন সৎকর্ম ও ইবাদতে মশগুল ছিলেন। এখন কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা একথা বলছ, আর

আমার কানে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাক্য প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ঃ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ আমার কোন ইবাদত গৃহীত হবে কি না তা আমার জানা নেই।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ যদি আমি নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার কোন সৎকর্ম গ্রহণ করেছেন, তবে এটা হবে আমার জন্য একটি বিরাট নিয়ামত। এ নিয়ামতের বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী স্বর্ণে পরিণত হয়ে আমার অধিকারে এসে গেলেও আমি তাকে কিছুই মনে করব না।

হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আমার একটি নামায আল্লাহ্র কাছে কবূল হয়েছে, তবে আমার জন্য এটি হবে সমগ্র বিশ্ব ও তার অগণিত নিয়ামতের চাইতেও উত্তম।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) কোন এক ব্যক্তিকে পত্র মারফত নিম্নোক্ত উপদেশাবলী প্রেরণ করেন ঃ

আমি জোর দিয়ে বলছি যে, তুমি আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন কর। এছাড়া কোন সৎকর্ম গৃহীত হয় না। আল্লাহ্ভীরু ছাড়া কারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় না এবং এটি ছাড়া কোন কিছুর সওয়াবও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ের উপদেশদাতা অনেক ; কিন্তু একে কার্যে পরিণত করে--এরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ ভীতির সাথে ছোট সৎকর্মও ছোট নয়। যে সৎকর্ম গৃহীত হয়ে যায়, তাকে কেমন করে ছোট বলা যায়!

অপরাধ ও শাস্তির কতিপয় কোরআনী বিধি ঃ

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

(৩৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে

তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৩৪) কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে ; জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং (এ সংগ্রামের অর্থ এই যে,) দেশময় অনর্থ (অশান্তি) সৃষ্টি করে বেড়ায় [অর্থাৎ রাহাজানি-ডাকাতি করে, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়তের আইনে অভয় দিয়েছেন এবং যে আইন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে ; অর্থাৎ মুসলমান ও যিম্মির বিরুদ্ধে। এ কারণেই একে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে সংগ্রাম করা বলা হয়েছে। কেননা, ডাকাত আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন ভঙ্গ করে। যেহেতু রাসূলের মাধ্যমে আইন প্রকাশ পেয়েছে, তাই রাসূলের সম্পর্কও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, যারা ডাকাতি করে] তাদের শাস্তি হলো এই যে, (এক অবস্থায়) তাদেরকে হত্যা করা হবে। (সে অবস্থা এই যে, ডাকাতরা শুধু কাউকে হত্যা করেছে—অর্থ-সম্পদ নেয়নি)। অথবা (অন্য অবস্থা হলে) শূলীবিদ্ধ করা হবে। (সে অবস্থা এই যে, ডাকাতরা অর্থ-সম্পদও নিয়েছে, হত্যাও করেছে) অথবা (তৃতীয় অবস্থা হলে) তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে (অর্থাৎ ডান হাত, বাম পা) কেটে দেওয়া হবে। (এ অবস্থা এই যে, শুধু অর্থ সম্পদ নিয়েছে--কাউকে হত্যা করেনি) অথবা (চতুর্থ অবস্থা হলে) দেশ থেকে (অর্থাৎ দেশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার অধিকার) থেকে বহিষ্কার (করে জেলে প্রেরণ করা) করা হবে। (এ অবস্থাটি এই যে, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ অথবা হত্যা কিছুই করেনি ; বরং ডাকাতির প্রস্তুতি নিতেই গ্রেফতার হয়ে গেছে)। এটি (অর্থাৎ উপরোক্ত শাস্তি তো) তাদের জন্য দুনিয়াতে কঠোর লাঞ্ছনা (এবং অপমান) এবং তাদের আখিরাতে (যে) শাস্তি হবে (তা পৃথক)। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতার করার পূর্বে তওবা করে নেয়, (এমতাবস্থায়) জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা (স্বীয় পাওনা) ক্ষমা করে দেবেন (এবং তওবা করায় তাদের প্রতি) করুণা করবেন। (অর্থাৎ উল্লিখিত শাস্তি হদ্ এবং আল্লাহ্র পাওনা হিসেবে দেওয়া হবে--যা বান্দা ক্ষমা করলে ক্ষমা হবে না—কিসাস ও বান্দার পাওনা হিসেবে নয়--যা বান্দা ক্ষমা করলে ক্ষমা হয়ে যায়। সুতরাং গ্রেফতারীর পূর্বে তাদের তওবা প্রমাণিত হলে আল্লাহ্র পাওনা হদ্ থেকে অব্যাহতি পাবে। তবে বান্দার পাওনা বাকি থাকবে। অর্থ-সম্পদ নিয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হত্যা করে থাকলে কিসাস নেওয়া হবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ ও কিসাস মাফ করার অধিকার পাওনাদার ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর থাকবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনী আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হত্যাকাণ্ড এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ডাকাতি ও চুরির শাস্তির মাঝখানে আল্লাহ্-ভীতি ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কোরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানব রচিত দণ্ডবিধির মত কোরআন পাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রত্যেক অপরাধ ও

শাস্তির সাথে আল্লাহ্-ভীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গুনাহ্ থেকে পবিত্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কোরআন পাকের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

শরীয়তের শাস্তি তিন প্রকার ঃ চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরীয়তের পরিভাষায় কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যক। কেননা, এসব পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। 'ভারতীয় দণ্ডবিধি', 'পাকিস্তান দণ্ডবিধি' ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে এরূপ নয়। ইসলামী শরীয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ হুদূদ, কিসাস ও তা'যীরাত অর্থাৎ দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা ও অর্থ জানার পূর্বে প্রথমত একথা জেনে নেওয়া জরুরী যে, এসব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্ট জীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় এবং স্রষ্টারও নাফরমানী করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে 'হক্কুল্লাহ' (আল্লাহ্র হক) এবং 'হক্কুল আব্দ' (বান্দার হক)-দুই-ই বিদ্যমান থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু কোন কোন অপরাধে বান্দার হক এবং কোন কোন অপরাধে আল্লাহ্র হক প্রবল থাকে এবং এ প্রাবল্যের উপর ভিত্তি করেই বিধি-বিধান রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত একথা জানা জরুরী যে, ইসলামী শরীয়ত বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন ততটুকুই দেবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের ইসলামী সরকার যদি শরীয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়েয। বর্তমান শতাব্দীতে তাই হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সব ইসলামী দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে।

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোন শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ্ নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' তথা 'দণ্ড' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলো দু'রকম ঃ এক. যেসব অপরাধে আল্লাহ্র হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়। আর 'হদ'-এরই বহুবচন 'হুদূদ'। দুই. যেসব অপরাধে বান্দার হককে শরীয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয়

'কিসাস'। কোরআন পাক হুদূদ ও কিসাস পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রাসূলের বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সারকথা, কোরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহ্‌র হক হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদূদ' বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে 'কিসাস' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় 'তা'যীর' তথা 'দণ্ড'। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং শরীয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়।

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদূদের বেলায় কোন সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা ক্ষমা করতে পারে না। শরীয়তে হুদূদ মাত্র পাঁচটি ঃ ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ—এ চারটির শাস্তি কোরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্য পানের হদ। এটি সাহাবায়ে-কিরামের ইজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদূদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখিরাতের গুনাহ্ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদূদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হুদূদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুই-ই নাজায়েয। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুদূদের শাস্তি সাধারণত কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না। এ ব্যাপারে শরীয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে ঃ الحدود تندرى بالشبهات—অর্থাৎ হুদূদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে বুঝে নেওয়া উচিত যে, কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে, যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরও বেড়ে যাবে। বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে

দণ্ডগত শাস্তি দেবেন। শরীয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণত দৈহিক ও শারীরিক। এগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বরং বিচারক তাকে অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হবে।

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেওয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেওয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী অন্য দণ্ড দেওয়া হবে।

কিসাসের শাস্তিও হুদূদের মত কোরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদূদকে আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণত যার অর্থ চুরি যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কিসাস এর বিপরীত। কিসাসে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর ইখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কিসাস হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ডও করাতে পারে। জখমের কিসাসও তদ্রূপ।

পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হুদূদ ও কিসাস অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে, বরং বিচারক দণ্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করেন দিতে পারবেন। কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে—এরূপ আশংকা করা ঠিক নয়। কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণ রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্য কোন শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশংকা রোধ করতে পারে।

এ পর্যন্ত হুদূদ, কিসাস, তা'যীরাত প্রভৃতি পরিভাষার অর্থ ও তৎসংক্রান্ত জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হলো। এবার এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও হুদূদের বিবরণ শুনুন। প্রথম আয়াতে যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে সংগ্রাম ও মোকাবিলা করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রথমে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে সংগ্রাম এবং দেশে অনর্থ সৃষ্টি করার অর্থ কি এবং এরা কারা? محاربه শব্দটি حرب মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া। বাচন-পদ্ধতিতে এ শব্দটি سلم অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, حرب এর অর্থ হচ্ছে অশান্তি বিস্তার করা। একথা জানা যে, বিক্ষিপ্ত চুরি, হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনায় জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না, বরং কোন সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী দল ডাকাতি, হত্যা ও লুটতরাজে প্রবৃত্ত হলেই জননিরাপত্তা ব্যাহত হয়। এ কারণেই ফিকহ্‌বিদরা ঐ দল অথবা ব্যক্তিদের এ শাস্তির যোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে

ডাকাতি করে এবং শক্তির জোরে সরকারের আইন ভঙ্গ করতে চায়। শব্দান্তরে তাদেরকে ডাকাত দল অথবা বিদ্রোহী দল বলা যায়। সাধারণ চোর, পকেটমার ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।–(তফসীরে মাযহারী)

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আলোচ্য আয়াতে محاربه অর্থাৎ সংগ্রাম করাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে, অথচ ডাকাত অথবা বিদ্রোহীদের সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হয় জনগণের সাথে। এর কারণ এই যে, কোন শক্তিশালী দল যখন শক্তির জোরে আল্লাহ্ ও রাসূলের আইন ভঙ্গ করতে চায়, তখন বাহ্যত জনগণের সাথে সংঘর্ষ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই হয়ে থাকে। রাষ্ট্রে যখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আইন কার্যকরী থাকবে, তখন এ সংঘর্ষও আল্লাহ্ ও রাসূলের বিপক্ষেই গণ্য হবে।

সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বর্ণিত শাস্তি ঐসব ডাকাত ও বিদ্রোহীদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে আক্রমণ চালিয়ে জননিরাপত্তা ব্যাহত করে এবং প্রকাশ্যে সরকারের আইন অমান্য করার চেষ্টা করে। এর অর্থ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। অর্থ লুণ্ঠন করা, শ্লীলতাহানি ইত্যাদি থেকে শুরু করে হত্যা ও রক্তপাত পর্যন্ত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এ থেকেই مقاتله ও محاربه শব্দদ্বয়ের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। مقاتله শব্দটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অর্থে ব্যবহৃত হয়–তাতে কেউ নিহত হোক বা না হোক এবং অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করা হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে محاربه শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তি সহকারে অশান্তি ছড়ানো এবং নিরাপত্তা ব্যাহত করা।

এ অপরাধের শাস্তি কোরআন পাক স্বয়ং নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং আল্লাহ্র হক অর্থাৎ গভর্নমেন্টবাদী অপরাধ হিসেবে প্রয়োগ করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় একেই 'হদ' বলা হয়। এবার শুনুন ডাকাতি ও রাহাজানির শাস্তি। আয়াতে চারটি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۔

অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। প্রথমোক্ত তিন শাস্তিতে باب تفعيل থেকে مبالغة এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ক্রিয়ার পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতা বোঝায়। ক্রিয়াপদে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের হত্যা অথবা শূলীতে চড়ানো অথবা হস্তপদ কেটে দেওয়া সাধারণ শাস্তির মত নয় যে, যে লোক অপরাধী প্রমাণিত হবে, তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে, বরং এ অপরাধে দলের মধ্য থেকে একজনের করলেও গোটা দলকে হত্যা অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা গোটা দলেরই হস্তপদ কেটে দেওয়া হবে।

এ ছাড়া এতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ শাস্তি কিসাস হিসেবে নয় যে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মাফ করে দিলেই মাফ হয়ে যাবে, বরং তা আল্লাহ্র হক হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা মাফ করলেও তা মাফ হবে না। باب تفعيل থেকে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করার কারণে এ দু'টি ইঙ্গিতই বোঝা যাচ্ছে। –(তফসীরে-মাযহারী)

ডাকাতির এ চারটি শাস্তি, او (অথবা) শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দটি যেমন কয়েকটি বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দান অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি কর্ম বন্টনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী ফিকহ্-বিদদের একটি দল প্রথমোক্ত অর্থ ধরে মত প্রকাশ করেছেন যে, শরীয়তের পক্ষ থেকে শাসক ও বিচারককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ডাকাত দলের শক্তি এবং অপরাধের তীব্রতা ও লঘুতা দৃষ্টে তিনি শাস্তি চতুষ্টয় অথবা যে কোন একটি শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন।

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রা), আতা (রা), দাউদ (র), হাসান বসরী (র), যাহ্হাক (র), নখয়ী (র), মুজাহিদ (র) এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম মালেক (র)-এর মাযহাবও তাই। ইমাম আবূ হানীফা (র), শাফেয়ী (র), আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এবং একদল সাহাবী ও তাবেয়ী او শব্দটিকে কর্ম বন্টনের অর্থে ধরে নিয়ে বলেছেন যে, আয়াতে রাহাজানির বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। এক হাদীস থেকেও তাঁদের এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বুরদা আসলামীর সাথে এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু সে সন্ধি ভঙ্গ করে এবং মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে অগ্রসরমান একটি কাফেলা লুট করে। এ ঘটনার পর জিবরাঈল (আ) রাহাজানির শাস্তি সংক্রান্ত নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করেন। নির্দেশনামায় বলা হয়, যে ব্যক্তি হত্যা ও লুণ্ঠন উভয় অপরাধ করে, তাকে শূলীতে চড়াতে হবে। যে শুধু হত্যা করে তাকে হত্যা করতে হবে। যে শুধু অর্থ লুট করে তার হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করতে হবে। ডাকাত দলের মধ্যে যে মুসলমান হয়ে যায়, তার অপরাধ ক্ষমা করতে হবে। পক্ষান্তরে যে হত্যা ও লুণ্ঠন কিছুই করেনি—শুধু ভীতি প্রদর্শন করে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে, তাকে দেশান্তরিত করতে হবে। যদি ডাকাতদল ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলিম অথবা অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে এবং অর্থ লুণ্ঠন না করে, তবে তাদের শাস্তি হবে ان يقتلوا—অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে তাদের কিছু সংখ্যক লোক হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকলেও তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। আর যদি হত্যা ও অর্থ লুণ্ঠন উভয় অপরাধই সাব্যস্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি হবে يصلبوا অর্থাৎ সবাইকে শূলীতে চড়ানো হবে। এর ধরন হবে এই যে, জীবিতাবস্থায় শূলীতে চড়িয়ে পরে বর্শা ইত্যাদি দ্বারা তার পেট চিরে দেওয়া হবে। যদি ডাকাত দল শুধু অর্থ লুট করে, তবে তাদের শাস্তি হবে ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف অর্থাৎ ডান হাত কব্জি থেকে এবং বাম পা গিঁট থেকে কেটে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রেও যদি কিছু লোক অর্থ লুণ্ঠনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে তবুও সবাইকে শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা, দলের অন্যদের সাহায্য ও সহযোগিতার ভরসায়ই তারা এ কাজ করে। তাই অপরাধে সবাই সমান অংশীদার। যদি ডাকাত দল হত্যা ও লুণ্ঠনের পূর্বেই গ্রেফতার হয়ে যায়, তবে তাদের সাজা হবে او ينفوا من الارض। অর্থাৎ তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

দেশ থেকে বহিষ্কার করার অর্থ একদল ফিকহ্‌বিদের মতে এই যে, তাদেরকে দারুল-ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ যে জায়গায় ডাকাতির আশংকা ছিল, সেখান থেকে বের করে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে হযরত ফারূকে আযম

(রা)-এর ফয়সালা এই যে, অপরাধীকে এখান থেকে বের করে অন্য শহরে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে যেহেতু সে সেখানকার অধিবাসীদেরকেও উত্ত্যক্ত করবে, তাই এ জাতীয় অপরাধীকে জেলখানায় আবদ্ধ রাখতে হবে। অবাধ চলাফেরা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এটাই তার পক্ষে দেশ থেকে বহিষ্কার। ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও এ ফয়সালাই দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, আজকাল এ জাতীয় সশস্ত্র আক্রমণে শুধু লুটতরাজ, হত্যা ইত্যাদি হয় না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি ঘটনাই ঘটে থাকে। কোরআন পাকের وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا বাক্যে এ জাতীয় সব অপরাধই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় সশস্ত্র আক্রমণকারীরা কোন্ শাস্তির যোগ্য ? উত্তর এই যে, এক্ষেত্রে বিচারক শাস্তি চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে অবস্থানুযায়ী যে কোন একটি শাস্তি জারি করবেন। যদি ব্যভিচারের যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ব্যভিচারের হদ জারি করবেন।

এমনিভাবে শুধু কিছু লোককে জখম করে থাকলে জখমের কিসাস জারি করা হবে। —(তফসীরে মাযহারী)

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ۔

দুনিয়াতে প্রদত্ত এ শাস্তি হচ্ছে তাদের জাগতিক লাঞ্ছনা। আখিরাতের শাস্তি হবে আরও কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী। এতে বোঝা যায় যে, তওবা না করলে জাগতিক হুদূদ, কিসাস ইত্যাদি দ্বারা পরকালের শাস্তি মাফ হবে না। হাঁ, সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মনে তওবা করলে পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا আয়াতে একটি ব্যতিক্রমের কথা বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, ডাকাত ও বিদ্রোহী দল যদি সরকারী লোকদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে শক্তি-সামর্থ্য বহাল থাকা অবস্থায় তওবা করে এবং ডাকাতি ও রাহাজানি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে হদ প্রযোজ্য হবে না। এ ব্যতিক্রমটি হুদূদের সাধারণ আইন থেকে ভিন্নধর্মী। কেননা চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি অপরাধে আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর অপরাধী যদি মনে তওবা করলেও হদ মাফ হয় না, যদিও আখিরাতের শাস্তি মাফ হয়ে যায়। কয়েক আয়াত পর চুরির শাস্তি প্রসঙ্গে এ বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা আসবে।

এ ব্যতিক্রমের তাৎপর্য এই যে, একদিকে ডাকাতদের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। এদের একজনের অপরাধে গোটা দলকেই শাস্তি দেওয়া হয়। তাই অপরদিকে ব্যতিক্রমের মাধ্যমে ব্যাপারটিকে হালকা করে দেওয়া হয়েছে যে, তওবা করলে জাগতিক শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এ ছাড়া এতে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও রয়েছে। তা এই যে, একটি শক্তিশালী দলকে বশে আনা সহজ কাজ নয়। তাই তাদের সামনে সত্যোপলব্ধির দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, যাতে তারা তওবার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এ ছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুদণ্ড নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত শাস্তি। ইসলামী আইনের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, এ শাস্তির প্রয়োগ যেন যথাসম্ভব কম হয়। অথচ ডাকাতির ক্ষেত্রে একটি দলকে হত্যা করা জরুরী হয়ে পড়ে। তাই ডাকাতদের সামনে সংশোধনের সুযোগ রাখা

হয়েছে। এ সুযোগের কারণেই আলী আসাদী নামক জনৈক দুর্ধর্ষ ডাকাত ডাকাতি থেকে তওবা করতে সক্ষম হয়েছিল।

আলী আসাদী মদীনার অদূরে একটি সংঘবদ্ধ দল তৈরি করে পথিকদের অর্থ-সম্পদ লুট করত। একদিন কাফেলার মধ্য থেকে জনৈক ক্বারীর মুখে এ আয়াত তার কানে পড়ল ঃ

يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ۔

(হে আমার অনাচারী বান্দারা, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।) সে ক্বারীর কাছে পৌঁছে আয়াতটি পুনরায় পাঠ করতে অনুরোধ করল। পুনর্বার আয়াতটি শুনেই সে তরবারি কোষবদ্ধ করে রাহাজানি থেকে তওবা করল এবং মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তা মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে উপস্থিত হলো। হযরত আবূ হোরায়রা (রা) তার হাত ধরে মারওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত করলেন এবং উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে বললেন ঃ আপনি তাকে কোন শাস্তি দিতে পারবেন না।

সরকার তার তৎপরতায় অতিষ্ঠ ছিল। ফলে তার সুমতি দেখে সবাই সন্তুষ্ট হলো। হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে হারেসা ইবনে বদর বিদ্রোহ ঘোষণা করে হত্যা ও লুটতরাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং কিছুদিন পরই তওবা করে ফিরে এসেছিল, কিন্তু হযরত আলী (রা) তাকে কোনরূপ শাস্তি দেননি।

এখানে স্মর্তব্য যে, হদ মাফ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, বান্দার যেসব হক সে নষ্ট করে, তাও মাফ হয়ে যায়। বরং এরূপ তওবাকারী যদি কারও অর্থ-সম্পদ অপহরণ করে থাকে এবং জীবিত থাকে, তবে তা ফেরত দেওয়া জরুরী এবং কাউকে হত্যা অথবা জখম করে থাকলে তার কিসাস জরুরী। অবশ্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করে দিলে তা ক্ষমা হয়ে যাবে। কারও পার্থিব ক্ষতি করে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দান করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। ইমাম আবূ হানীফা (র)সহ অধিক সংখ্যক ফিকহবিদের মাযহাব তা-ই। এছাড়া বান্দার পাওনা থেকে অব্যাহতি লাভ করা স্বয়ং তওবার একটি অঙ্গ। এটা ছাড়া তওবা পূর্ণ হয় না। তাই কোন ডাকাতকে তওবাকারী বলে তখনই গণ্য করা হবে, যখন সে বান্দার পাওনাও পরিশোধ করে দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ
وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ
كَفَرُوا۟ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُوا۟
بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ

مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا

جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ

تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ

مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

(৩৫) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর-যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৩৬) যারা কাফির, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে-আর এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবূল করা হবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৩৭) তারা দোযখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। (৩৮) যে পুরুষ চুরি করে, এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। এ সাজা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। (৩৯) অতঃপর যে, তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, একান্তভাবে আল্লাহ্‌র হাতেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য! তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় কর (অর্থাৎ গুনাহ্ পরিত্যাগ কর) এবং (ইবাদতের মাধ্যমে) আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণ কর (অর্থাৎ জরুরী ইবাদতের পাবন্দি করতে থাক) এবং (ইবাদতের মধ্য থেকে বিশেষভাবে) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। আশা করা যায় যে, (এভাবে) তোমরা (পূর্ণ) সফলকাম হয়ে যাবে (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জিত হওয়া এবং দোযখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই সফলতা)। নিশ্চয় যারা কাফির, যদি (ধরে নেওয়া যায় যে,) তাদের (প্রত্যেকের) কাছে পৃথিবীর (ভূগর্ভস্থ গুপ্তধন ও ধনাগারসহ) সমুদয় সম্পদ এবং (শুধু তাই নয়) তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে এবং এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও সে সম্পদ তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না (এবং তারা শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না;) বরং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। (শাস্তিতে পতিত হওয়ার পর) তারা দোযখ থেকে (কোন রকমে) বের হয়ে আসার বাসনা করলে (তাদের সে বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না।) তারা তা থেকে বের হতে পারবে না

এবং তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে (অর্থাৎ কোন কৌশলেই শাস্তি ও শাস্তির স্থায়িত্ব টলবে না)।

আর যে পুরুষ চুরি করে এবং (এমনিভাবে) যে নারী চুরি করে, (তাদের সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, হে বিচারকমণ্ডলী, তোমরা) তাদের উভয়ের হাত (কব্জি থেকে) কেটে দাও তাদের (এ) কৃতকর্মের বিনিময়ে। (আর এ বিনিময়) সাজা হিসেবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (নির্ধারিত)। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত (যা ইচ্ছা শাস্তি নির্ধারণ করেন এবং), বিজ্ঞ (তাই উপযুক্ত শাস্তিই নির্ধারণ করেন)। অতঃপর যে ব্যক্তি (শরীয়তের নিয়মানুযায়ী) তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের (অর্থাৎ চুরির) পর এবং (ভবিষ্যতের জন্য) সংশোধিত হয় (অর্থাৎ চুরি ইত্যাদি না করে এবং তওবায় অটল থাকে), তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তার (অবস্থার) প্রতি (অনুকম্পার) দৃষ্টি দেবেন (অর্থাৎ তওবার কারণে বিগত গুনাহ মাফ করবেন এবং তওবায় অটল থাকার কারণে আরও অধিক সুদৃষ্টি দেবেন)। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল (কেননা, তওবাকারীর গুনাহ্ মাফ করে দেন।) অত্যন্ত দয়ালু। (যেহেতু ভবিষ্যতে আরও সুদৃষ্টি দেন। হে সম্বোধিত ব্যক্তি!) তুমি কি জান না (অর্থাৎ সবাই জানে) যে, আল্লাহ্র হাতেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ডাকাতি ও বিদ্রোহের শাস্তি এবং তার বিস্তারিত বিধি উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী তিন আয়াতের পর চুরির শাস্তি বর্ণিত হবে। মাঝখানে তিন আয়াতে আল্লাহ্ভীতি, ইবাদত ও জিহাদের প্রতি উৎসাহদান এবং কুফরী, নাফরমানী ও পাপের ধ্বংসকারিতা বিবৃত হয়েছে। কোরআনের এ বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কোরআন শাসকের ভঙ্গিতে শুধু দণ্ড ও শাস্তির আইন ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অভিভাবকসুলভ ভঙ্গিতে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত থাকার প্রতিও উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ্ ও পরকালের ভয় এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও প্রশান্তিকে কল্পনায় উপস্থিত করে অপরাধীদের অন্তরকে অপরাধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। এ কারণেই অধিকাংশ অপরাধ ও দণ্ডবিধির সাথে সাথে اتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহ্কে ভয় কর) ইত্যাদি বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এখানেও প্রথম আয়াতে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রথমত اتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা, আল্লাহ্র ভয়ই মানুষকে প্রকাশ্য ও গোপন সকল অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে।

দ্বিতীয় وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ অর্থাৎ আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর। وَسِيْلَةٌ শব্দটি وسل ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি ص-س উভয় বর্ণ দিয়ে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, وصل -এর অর্থ যে কোন রূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং وسل এর অর্থ আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা-(ছিহাহ্, জওহরী, মুফরাদাতুল কোরআন,)। তাই وصلة ও وصيلة ঐ বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন করে-তা আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে। পক্ষান্তরে وسيلة ঐ

বস্তুকে বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়। -(লিসানুল-আরব, মুফরাদাতুল কোরআন)। وسيلة শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে হলে ঐ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, সাহাবী ও তাবেয়ীরা ইবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত وسيلة শব্দের তফসীর করেছেন। হাকিমের বর্ণনা মতে হযরত হোযায়ফা (রা) 'ওসীলা' শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর, হযরত আতা (র), মুজাহিদ (র) ও হাসান বসরী (র) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ تقربوا اليه بطاعته والعمل بما يرضيه অর্থাৎ আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। অতএব, আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অন্বেষণ কর।

মুসনাদে আহ্মদ গ্রন্থে বর্ণিত এক সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরের নাম 'ওসীলা'। এর উর্ধ্বে কোন স্তর নেই। তোমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া কর, যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন।

মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন মুয়াযযিন আযান দেয়, তখন মুয়াযযিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্য ওসীলার দোয়া কর।

এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেক ঈমানদারকে ওসীলা অন্বেষণের নির্দেশ বাহ্যত এর পরিপন্থী। উত্তর এই যে, হিদায়েতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মু'মিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি ওসীলার সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লাভ করবেন এবং এর নিম্নের স্তরগুলো মু'মিনরা প্রাপ্ত হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর 'মকতুবাত' গ্রন্থে এবং কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী 'তফসীরে মাযহারী'তে বর্ণনা করেন যে, 'ওসীলা' শব্দটিতে প্রেম ও আবেগের অর্থ সংযুক্ত থাকায় বোঝা যায় যে, মু'মিনের পক্ষে ওসীলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। মহব্বত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা। কেননা, কোরআন বলে فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।) তাই ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র, সামাজিকতা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সুন্নতের যত বেশি অনুসরণ করবে, আল্লাহ্র মহব্বত সে তত বেশি অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহ্র প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত যত বেশি বৃদ্ধি পাবে, নৈকট্যও তত বেশি অর্জিত হবে।

'ওসীলা' শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের তফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্য আল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও সৎকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গম্বর ও সৎকর্মীদের সংসর্গ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এগুলোও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়। এ

কারণেই তাঁদেরকে ওসীলা করে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করা জায়েয। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রা) হযরত আব্বাস (রা)-কে ওসীলা করে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সে দোয়া কবূল করেছিলেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (আ) স্বয়ং জনৈক অন্ধ সাহাবীকে এভাবে দোয়া করতে বলেছিলেন : اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة [আল্লাহ্, আমি রহমতের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ওসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।]-(মানার)

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে আল্লাহ্-ভীতি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে নৈকট্য অন্বেষণের নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। যদিও জিহাদ সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু সৎকর্মসমূহের মধ্যে জিহাদের স্থান যে শীর্ষে—একথা ফুটাবার জন্যে জিহাদকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ وذروة سنامه الجهاد অর্থাৎ ইসলামের শীর্ষস্থান হচ্ছে জিহাদের। এ ছাড়া জিহাদকে এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করার আরও একটি তাৎপর্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে দেশে অনর্থ ও অশান্তি সৃষ্টি করাকে হারাম ও অবৈধ বলে আখ্যা দিয়ে তার জাগতিক ও পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছিল। বাহ্যিক দিক দিয়ে জিহাদকেও দেশে অশান্তি উৎপাদনের নামান্তর বলে মনে হয়। তাই এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, কোন অজ্ঞ ব্যক্তি জিহাদ ও অশান্তির মধ্যে পার্থক্য না-ও বুঝতে পারে। এ কারণে দেশে অশান্তি সৃষ্টির নিষিদ্ধতা ঘোষণার পর জিহাদের নির্দেশ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে এতদুভয়ের পার্থক্যের দিকে فِىْ سَبِيْلِهٖ শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ ডাকাতি, বিদ্রোহ ইত্যাদিতে যে হত্যাকাণ্ড ও অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করা হয় তা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ, কামনা-বাসনা ও হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নিমিত্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জিহাদে হত্যা ও লুণ্ঠন থাকলেও তা শুধু আল্লাহ্র বাণী সমুন্নত করা এবং অত্যাচার ও অবিচার মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়। এতদুভয়ের মধ্যে আসমান-যমীন তফাৎ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে কুফর, শিরক ও গুনাহের মন্দ পরিণাম এমন এক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সামান্য চিন্তা করলেই তা মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন সূচিত করতে পারে এবং মানুষকে এসব ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে।

সাধারণত মানুষ নিজের এবং পরিবার-পরিজনের বাসনা ও প্রয়োজন মেটাবার জন্যই গুনাহে লিপ্ত হয়। কেননা, টাকা-পয়সা ও অর্থ সঞ্চয় ব্যতীত এসব প্রয়োজন মেটে না। তাই সে হালাল ও হারামের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অর্থ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এ নেশার প্রতিকারকল্পে বলেছেন ঃ আজ তোমরা ক্ষণস্থায়ী জীবন ও তার আরামের জন্য যেসব বস্তু অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সহকারে সঞ্চয় কর কিন্তু তারপরও সে সঞ্চয়-স্পৃহার অবসান হয় না। মনে রাখবে, এ অবৈধ লালসার পরিণাম শুভ নয়। কিয়ামতের আযাব যখন সামনে আসবে, তখন মানুষ জগতে সঞ্চিত সমুদয় অর্থ-সম্পদ, আসবাবপত্র সবই বিনিময়ে দিয়েও যদি এ আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তবু তা সম্ভব হবে না। বরং ধরে নাও যদি সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-সম্পদ ও আসবাবপত্র এক ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হয়ে যায়, শুধু

তাই নয় এই পরিমাণ আরও অর্থ-সম্পদ তার হস্তগত হয় এবং সে সবগুলোকে আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিনিময় প্রদান করতে চায়, তবুও তার কাছ থেকে কিছুই কবুল করা হবে না এবং সে আযাবের কবল থেকে মুক্তি পাবে না।

তৃতীয় আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কাফিরদের ক্ষেত্রে এ আযাব হবে চিরস্থায়ী। তারা কখনও তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

চতুর্থ আয়াতে আবার অপরাধের শাস্তির দিকে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে চুরির শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, চুরির শাস্তি পূর্বোল্লিখিত হুদূদেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কোরআন পাক স্বয়ং শাস্তি নির্ধারণ করেছে। এ কারণে এর নাম 'হদ্দে-সারাকাহ্' অর্থাৎ চুরির সাজা। বলা হয়েছে ঃ

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

অর্থাৎ যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞ।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনী বিধি-বিধানে সাধারণত পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয় এবং নারীরাও তারই অন্তর্ভুক্ত থাকে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য বিধি-বিধানে কোরআন ও সুন্নাহ্র রীতি তাই। কিন্তু চুরির ও ব্যভিচারের শাস্তির বেলায় পুরুষ ও নারী উভয়কে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি হচ্ছে হুদূদের। আর সামান্য সন্দেহের কারণে হুদূদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ে। তাই পুরুষদের অধীনস্থ করে মহিলাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি, বরং সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

'সারাকাহ্' তথা চুরির আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কি ? এখানে এ প্রশ্নটিও প্রণিধানযোগ্য। 'কামূসে' বলা হয়েছে ঃ অন্যের মাল তার অনুমতি ব্যতিরেকে হিফাযতের জায়গা থেকে গোপনে নিয়ে যাওয়াকে চুরি বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায়ও একেই চুরি বলা হয়। এ সংজ্ঞাদৃষ্টে চুরি প্রমাণের জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরী ঃ

প্রথমত, মালটি কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হতে হবে, তাতে চোরের মালিকানা অথবা মালিকানার সন্দেহও থাকবে না এবং এমন বস্তুও না হওয়া উচিত, যাতে জনগণের অধিকার সমান; যেমন—জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও তার বিষয়-সম্পত্তি। এতে বোঝা গেল যে, যে বস্তুতে চোরের মালিকানা অথবা মালিকানায় সন্দেহ আছে কিংবা যে বস্তুতে জনগণের কম অধিকার আছে; যেমন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তার বস্তুসমূহ। তা চুরি করলে চুরির হদ প্রযোজ্য হবে না এবং চোরের হাত কাটা যাবে না, বরং বিচারক তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী তাকে অন্য কোন সাজা দেবেন।

দ্বিতীয়ত, মালটি হিফাযতের জায়গায় থাকতে হবে অর্থাৎ তালাবদ্ধ গৃহে অথবা চৌকিদারের প্রহরায় থাকতে হবে। অরক্ষিত স্থান থেকে কোন কিছু নিয়ে গেলে তদ্দরুন হাত কাটা হবে না

এবং মাল সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও হাত কাটা হবে না। তবে গুনাহ্ হবে এবং অন্য কোন শাস্তির যোগ্য হবে।

তৃতীয়ত, বিনানুমতিতে নিতে হবে। যে মাল নেওয়ার অথবা নিয়ে ব্যবহার করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়, সে যদি তা একেবারেই নিয়ে যায়, তবে চুরির হদ জারি হবে না।এবং অনুমতির সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রযোজ্য হবে না।

চতুর্থত, মালটি গোপনে নিতে হবে। কেননা, অপরের মাল প্রকাশ্যেই লুট করলে তা চুরি নয়–ডাকাতি। এর শাস্তি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত শর্তাবলী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের পরিভাষায় যাকে চুরি বলা হয়, তার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর প্রত্যেকটিতে আইনত চুরির হদ তথা হস্ত কর্তন প্রযোজ্য নয়; বরং যে চুরিতে উপরোক্ত শর্তাবলী বর্তমান থাকে শুধু তাতেই হস্ত কর্তন করা হবে। এতদসঙ্গে একথাও জানা যাচ্ছে যে, যে অবস্থায় চুরির আলোচ্য শাস্তি রহিত হয়ে যায়, সেখানে চোর অবাধে ছাড়া পেয়ে যাবে না, বরং বিচারক তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী তাকে বেত্রদণ্ডও দিতে পারেন।

এমনিভাবে এরূপ মনে করাও উচিত নয় যে, যে চুরির কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে চুরির শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না, সে চুরি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও হালাল বলে গণ্য হবে। কেননা, পূর্বেই বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে গুনাহ্ ও পরকালের শাস্তির উল্লেখ নেই–বিশেষ ধরনের জাগতিক শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। কোরআনের অন্য আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, অন্যের মাল মালিকের সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করা হারাম এবং আখিরাতের শাস্তির কারণ।

لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

অর্থাৎ তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ো না।

এখানে আরও উল্লেখ্য এই যে, কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি চুরি এবং ব্যভিচারের ক্ষেত্রে একই রকম। কিন্তু চুরির ব্যাপারে আগে পুরুষ ও পরে নারী এবং ব্যভিচারের ব্যাপারে আগে নারী ও পরে পুরুষ উল্লিখিত হয়েছে। চুরির আয়াতে اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (পুরুষ চোর এবং মহিলা চোর) বলা হয়েছে এবং ব্যভিচারের আয়াতে اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ (ব্যভিচারিণী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ) বলা হয়েছে। তফসীরবিদরা এ ওলট-পালটের অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে যে কারণটি সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী, তা এই যে, চুরির অপরাধ মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের জন্য গুরুতর। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে জীবিকা উপার্জনের যে শক্তি দান করেছেন, তা নারীর মধ্যে নেই। জীবিকার এত সব পথ খোলা থাকা সত্ত্বেও চুরির মত হীন অপরাধে লিপ্ত হওয়া পুরুষের অপরাধকে আরও গুরুতর করে দেয়। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীলোককে স্বাভাবিক লজ্জা-শরম ছাড়াও ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত পরিবেশও দিয়েছেন। এরপরও যদি সে নির্লজ্জতায় মত্ত হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে

সেটা নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধ। এ কারণে চুরির আয়াতে আগে পুরুষ এবং ব্যভিচারের আয়াতে আগে নারী উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে চুরির শাস্তি বর্ণনা করার পর দুটি বাক্য উল্লিখিত হয়েছে ঃ এক, جَزَاءً بِمَا كَسَبَا অর্থাৎ এ শাস্তি হচ্ছে তাদের কৃতকর্মের ফল। দুই. نَكَالاً مِّنَ اللهِ আরবী অভিধানে نكال এমন শাস্তিকে বলা হয়, যা দেখে অন্যেরাও শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং অপরাধ থেকে বিরত হয়। কাজেই আমাদের বাকপদ্ধতিতে نكال এর অর্থ হবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হস্ত কর্তনের কঠোর শাস্তিটি এজন্য যাতে এক চোরের হাত কাটলে সব চোরের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে; ফলে এ হীন অপরাধ বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় শব্দ مِنَ اللهِ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে। তা এই যে, চুরির অপরাধের দুটি দিক আছে। এক. চোর অন্যায়ভাবে অপরের মাল নিয়ে যায়। ফলে মালিকের প্রতি জুলুম করা হয়। দুই. সে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে। প্রথম দিক দিয়ে এ শাস্তিটি হচ্ছে মজলুমের বা মালিকের হক। ফলে সে মাফ করে দিলে মাফ হয়ে যাবে; কিসাসের সব মাস'আলায় এমনিই হয়। দ্বিতীয় দিক দিয়ে এ শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলার হক। ফলে মালের মালিক ক্ষমা করে দিলেও তা ক্ষমা হবে না—যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা না করবেন। শরীয়তের পরিভাষায় একেই হদ বলা হয়। আয়াতে مِنَ اللهِ শব্দ প্রয়োগ করে এ দ্বিতীয় দিকটিই নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি হচ্ছে হদ—কিসাস নয়। অর্থাৎ রাজদ্রোহিতার অপরাধ হিসেবে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কাজেই মালের মালিক ক্ষমা করে দিলেও এ শাস্তি রহিত হবে না।

আয়াতের শেষে وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ বলে একটি সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা আজকাল সবার মুখে মুখে অর্থাৎ শাস্তিটি খুবই কঠোর। কোন কোন অজ্ঞ ও উদ্ধত লোক তো এমনও বলে ফেলে যে, এ শাস্তিটি বর্বর ও মধ্যযুগীয়। (নাউযুবিল্লাহি মিনহু) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কঠোর শাস্তিটি আল্লাহ্ তা'আলার পরাক্রান্ত হওয়ারই ফলশ্রুতি নয়, বরং তাঁর বিজ্ঞতার উপরও বিত্তিশীল। আজকালকার ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা শরীয়তের যেসব শাস্তিকে কঠোর ও বর্বর বলে আখ্যা দেয়, সেগুলোর তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতের শেষ দিকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুকর্ম ও চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত হয় এবং আত্ম-সংশোধন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। পূর্ববর্ণিত ডাকাতির শাস্তির বেলায়ও ক্ষমা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আলোচ্য চুরির শাস্তির পরও ক্ষমার কথা উল্লেখ করা হলো। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ক্ষমার বর্ণনায় একটি বিশেষ পার্থক্য

রয়েছে। এরই ভিত্তিতে উভয় শাস্তির মধ্যে ক্ষমার অর্থ ফিকহ্‌বিদদের মতে ভিন্ন ভিন্ন। ডাকাতির শাস্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিক্রম হিসেবে বলেছেন ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ.

অর্থাৎ যারা সরকারের আয়ত্তে আসার এবং গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, তারা এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু চুরির শাস্তির পর যে ক্ষমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে জাগতিক শাস্তির কোন ব্যতিক্রম হবে না। বরং পরকালের দিক দিয়ে তাদের তওবা গৃহীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব এ তওবার কারণে বিচারক তার শাস্তি মওকুফ করবেন না। হাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তার অপরাধ ক্ষমা করে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন। এ কারণে ফিকহ্‌বিদরা সবাই এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, গ্রেফতারীর পূর্বে ডাকাত তওবা করলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু চোর চুরি করার পর গ্রেফতারীর পূর্বে অথবা পরে তওবা করলেও তার হস্ত কর্তন মাফ হবে না। অবশ্য গুনাহ্ মাফ হয়ে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া এর পরিপন্থী নয়।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ - وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থাৎ আপনি কি জানেন না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে চান শাস্তি দেন আর যাকে চান ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্বন্ধ এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ডাকাতি ও চুরির শাস্তি–হস্তপদ অথবা শুধু হস্ত কর্তনের কঠোর বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব বিধান মানুষের মর্যাদা ও সৃষ্টির সেরা হওয়ার পরিপন্থী। এ সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিশ্ব জাহানের প্রভু। অতঃপর উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সর্বশক্তিমান। মাঝখানে বলেছেন যে, তিনি শুধু শাস্তিই দেন না–ক্ষমাও করেন। তবে এ ক্ষমা ও সাজা বিশেষ তাৎপর্যভিত্তিক হয়ে থাকে। কেননা, তিনি যেমন সবার প্রভু এবং সর্বশক্তিমান, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে। মানবশক্তি যেমন তাঁর শক্তি ও আধিপত্যকে বেষ্টন করতে পারে না, তেমনি তাঁর রহস্যাবলী পূর্ণ বেষ্টন করাও মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের কাজ নয়। তবে মূলনীতি ধরে যারা চিন্তা-ভাবনা করে, তারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হয়–যার ফলে তাদের অন্তরের পিপাসা নিবৃত্ত হয়ে যায়।

ইসলামী শাস্তি সম্পর্কে ইউরোপীয়রা ও তাদের শিক্ষা-সভ্যতার ধ্বজাধারী কিছু সংখ্যক লোকের সাধারণ আপত্তি এই যে, এগুলো অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম। অনেক অপরিণামদর্শী এ কথা বলতেও কুণ্ঠিত হয় না যে, এসব শাস্তি বর্বরোচিত ও সভ্যতা বিবর্জিত।

এ সম্পর্কে প্রথমে দেখা দরকার যে, কোরআন-পাক মাত্র চারটি অপরাধের শাস্তি স্বয়ং নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় এগুলোকে 'হদ' বলা হয়। ডাকাতির শাস্তি ডান হাত ও বাম পা কর্তন করা, চুরির শাস্তি ডান হাত গিঁট থেকে কর্তন করা, ব্যভিচারের শাস্তি কোন কোন অবস্থায় একশত বেত্রাঘাত এবং কোন কোন অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। পঞ্চম 'হদ' মদ্যপানের শাস্তি সাহাবীদের ঐকমত্যে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে। এ পাঁচটি ছাড়া সব অপরাধের সাজা বিচারকের বিবেচনাধীন। তিনি অপরাধী এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন, দেবেন। এ ব্যাপারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শক্রমে শাস্তির সীমা নির্ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিচারকদের তা মেনে চলতে বাধ্য করাও জায়েয। যেমন আজকাল এসেম্বলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজরা নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মোকদ্দমায় রায় দেন। তবে কোরআন ও ইজমা দ্বারা নির্ধারিত উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের শাস্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা এসেম্বলীর নেই। কিন্তু এ পাঁচটির ক্ষেত্রে যদি শরীয়তের নির্ধারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হয় কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর যেসব শর্তের অধীনে 'হদ' জারি করা হয়, সেগুলো পূরণ না হয়, তবে হদ জারি করা হবে না, বরং অন্য কোন দণ্ড দেওয়া হবে। এতদসঙ্গে এ নীতিটিও স্বীকৃত যে, অপরাধীরা সন্দেহের সুযোগ ভোগ করতে পারবে। অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হদ রহিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলেই সাধারণ দণ্ড দেওয়া হবে।

এতে বোঝা গেল যে, উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের মধ্যে অনেক অবস্থায় হদ প্রয়োগ করা যাবে না; বরং বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণ দণ্ডই দেওয়া হবে। সাধারণ দণ্ড শরীয়ত নির্ধারণ করেনি। কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের অনুরূপ এগুলোতে পরিবর্তন ও কমবেশী করা যায়। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে কারও আপত্তি করার অবকাশ নেই। এখন আলোচ্য বিষয় থেকে যাবে, শুধু পাঁচটি অপরাধের শাস্তি এবং এগুলোর বিশেষ বিশেষ অবস্থা। উদাহরণত চুরিই ধরুন এবং দেখুন যে, ইসলামে হস্ত কর্তনের শাস্তি সব চুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং যে চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়, তার একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যের মাল হিফাযতের জায়গা থেকে বিনানুমতিতে গোপনে নিয়ে যাওয়াকেই সংজ্ঞাদৃষ্টে ও সাধারণ পরিভাষায় চুরি বলা হয়–এরূপ অনেক চুরির ক্ষেত্রে চুরির শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। উদাহরণত হিফাযতের জায়গার শর্ত থাকায় সাধারণ জনসমাবেশের স্থান যেমন, মসজিদ, ঈদগাহ, পার্ক, ক্লাব, স্টেশন, বিশ্রামাগার, রেল, জাহাজ ও সাধারণ বৈঠক ঘরে রাখা মাল কেউ চুরি করলে অথবা বৃক্ষের ঝুলন্ত ফল কিংবা মধু চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। বরং রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে যাকে আপনি গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে রেখেছেন সে চাকর, রাজমিস্ত্রী কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধু যাই হোক, সে যদি ঘর থেকে কোন কিছু নিয়ে যায়, তবে প্রচলিত অর্থে যদিও এ কাজটি চুরির অন্তর্ভুক্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির যোগ্য,

এতদসত্ত্বেও তার ক্ষেত্রে হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রযোজ্য নয়। কেননা, সে আপনার বাড়িতে অনুমতিক্রমে প্রবেশ করার কারণে তার বেলায় মালের হিফাযত অসম্পূর্ণ।

এমনিভাবে যদি কেউ কারও পকেট মারে কিংবা হাত থেকে অলংকার অথবা টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়, কিংবা প্রতারণা করে অর্থ হস্তগত করে, কিংবা গচ্ছিত দ্রব্য অস্বীকার করে, এগুলো সর্বসাধারণের পরিভাষায় অবশ্যই চুরির অন্তর্ভুক্ত—কিন্তু এগুলোর শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক এবং তা বিচারকের বিবেচনাধীন—হদ অর্থাৎ হস্ত কর্তন নয়।

এমনিভাবে কাফন-চোরের হাত কাটা হবে না। কারণ, প্রথমত জায়গাটি হিফাযতের নয় এবং কাফন মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন বস্তুও নয়। তবে এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম। এর জন্য বিচারকের রায় অনুসারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে কেউ যদি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শরীকানাধীন মাল অথবা ব্যবসায়ে শরীকানাধীন মাল চুরি করে, যাতে তারও অংশ আছে, তবে তার মালিকানার সন্দেহবশত তার হাত কাটা হবে না, অন্য কোন দণ্ড প্রয়োগ করা হবে।

উপরোক্ত শর্তাবলীর বর্তমানেই অপরাধ পূর্ণতা লাভ করে। এখন প্রমাণ পূর্ণতা লাভ করার জন্যও শর্তাবলী রয়েছে। শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলাম সাক্ষ্য-প্রমাণের বিধি সাধারণ কাজ-কারবার থেকে স্বতন্ত্র ও সতর্কতার সাথে প্রণয়ন করেছে। ব্যভিচারের শাস্তিতে দু'জনের পরিবর্তে চারজন সাক্ষী শর্ত করা হয়েছে, তাও চাক্ষুষ ঘটনা সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাক্ষ্য দিতে হবে। চুরি ইত্যাদিতে দু'জন সাক্ষী যথেষ্ট হলেও এ দু'জনের জন্য সাধারণ সাক্ষ্যের শর্তাবলীর অতিরিক্ত কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণত অন্যান্য ব্যাপারে প্রয়োজনবশত বিচারককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, কোন ফাসিক ব্যক্তি সম্পর্কে বিচারক যদি নিশ্চিত হন যে, সে ফাসিক হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে না, তবে বিচারক তার সাক্ষ্য কবূল করতে পারেন, কিন্তু হুদূদের ক্ষেত্রে বিচারক এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য কবূল করতে পারেন না। সাধারণ কাজ-কারবারে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্যে রায় দেওয়া যায়, কিন্তু হুদূদের বেলায় দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। সাধারণ কাজ-কারবারে ইসলাম তামাদি অর্থাৎ ঘটনার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়াকে কোনরূপ ওযর বলে গণ্য করে না। দীর্ঘদিন পরে সাক্ষ্য দিলেও তা কবূল করা যায়। কিন্তু হুদূদে তাৎক্ষণিক সাক্ষ্য জরুরী। একমাস কিংবা আরও বেশি সময় পর কেউ সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

চুরির হদ প্রয়োগ সম্পর্কে যেসব শর্ত বর্ণিত হয়েছে, তা হানাফী মাযহাবের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'বাদায়ে-উস-সানায়ে' থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

মোটকথা, হদ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন শরীয়তের বিধি অনুযায়ী অপরাধ ও প্রমাণ উভয়টিই পূর্ণতা লাভ করবে। পূর্ণতা এভাবে যে, তাতে কোনরূপ দ্ব্যর্থতা থাকতে পারবে না। এতে বোঝা যায় যে, ইসলাম এসব অপরাধের যেমন কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে, তেমনি এসব শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে চূড়ান্ত সাবধানতার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। হদসমূহের সাক্ষ্য নীতিও সাধারণ কাজ-কারবারের সাক্ষ্যনীতি থেকে ভিন্ন ও চূড়ান্ত সাবধানতার উপর নির্ভরশীল। এতে সামান্য ত্রুটি থাকলেও হদ সাধারণ দণ্ডে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমনিভাবে অপরাধের পূর্ণতায় কোন শর্তের অনুপস্থিতিও হদকে সাধারণ দণ্ডে পর্যবসিত করে দেয়। এর ফলে

কার্যক্ষেত্রে হদের প্রয়োগ খুব কমই হয়ে থাকে। সাধারণ অবস্থায় হদজনিত অপরাধেও সাধারণ দণ্ড প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শতকরা একভাগ ক্ষেত্রে হলেও যখন অপরাধ ও সাক্ষ্যপ্রমাণ উভয়টিই পূর্ণতা লাভ করে, তখন অত্যন্ত কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়, যার ভীতি মানুষের মন-মস্তিষ্ককে ঘিরে ফেলে এবং এ অপরাধের কাছে যেতেও তাদের দেহে কম্পন উপস্থিত হয়। নিঃসন্দেহে এটি অপরাধ দমন ও জন-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায়। বর্তমানে দেশে প্রচলিত দণ্ডবিধি এরূপ নয়। এসব দণ্ডবিধি পেশাদার অপরাধীদের দৃষ্টিতে একটি খেলা বিশেষ, যা তারা মনের আনন্দে খেলে থাকে। তারা জেলখানায় বসে বসে ভবিষ্যতে এ অপরাধটিকে আরও সুন্দর ও সুচারুরূপে করার পরিকল্পনা তৈরি করে। যেসব দেশে ইসলামী হুদূদ প্রয়োগ করা হয়, তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে বাস্তব সত্য সামনে এসে যাবে। আপনি সেসব দেশে অনেক মানুষকে হাত কাটা অবস্থায় দেখবেন না এবং বহু বছর অপেক্ষা করেও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে না। কিন্তু এসব শাস্তির ভীতি তাদের অন্তরে এমনভাবে বসে গেছে যে, কোথাও চুরি, ডাকাতি ও বেহায়াপনার নাম-নিশানাও নেই। সউদী আরবের অবস্থা প্রায় মুসলমানেরই প্রত্যক্ষভাবে জানা আছে। কারণ, হজ্জ ও ওমরা উপলক্ষে সব দেশের সব স্তরের মুসলমানই সেখানে উপস্থিত হয়। সেখানে প্রতিদিন পাঁচবার এ দৃশ্য চোখে পড়ে যে, দোকানপাট খোলা রয়েছে, লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য সাজানো আছে, কিন্তু দোকানের মালিক দোকান বন্ধ না করেই নামাযের সময় হরম শরীফে চলে গেছে। সে সেখানে ধীরেসুস্থে ও নিশ্চিন্তে নামায আদায় করে। তার মনে কখনও এ কল্পনা দেখা দেয় না যে, বোধ হয় দোকানের কোন জিনিস চুরি হয়ে গেছে। এটি এক দু'দিনের ব্যাপার নয়, সারাজীবন এমনিভাবেই অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। জগতের কোন সভ্য দেশে এরূপ করে দেখুন, একদিনে শত শত চুরি ও ডাকাতি হয়ে যাবে। মানব সভ্যতা ও মানবাদিকারের দাবিদারদের অবস্থা আজবই বটে। পেশাদার অপরাধীদের প্রতি তাদের করুণার অন্ত নেই, কিন্তু এসব পেশাদার অপরাধী যাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে রেখেছে, তাদের প্রতি মানবাধিকারবাদীদের মনে কোন দরদ নেই। সত্য বলতে কি, কোন একজন অপরাধীর প্রতি করুণা করা সমগ্র মানবতার প্রতি যুলুম করারই নামান্তর এবং জননিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করার প্রধান কারণ। এ কারণেই রাব্বুল আলামীন–যিনি সৎ, অসৎ, আল্লাহ্-ভীরু, ওলী, কাফির ও পাপিষ্ঠ সবাইকে রিযিক দেন এবং সাপ, বিচ্ছু, সিংহ ও বাঘের মুখেও আহার যোগান, তিনি কোরআনে হুদূদের বিধি-বিধান নাযিল করার সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন ঃ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ–অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুদূদ প্রয়োগ করতে গিয়ে অপরাধীদের প্রতি কখনও দয়াদ্র হওয়া উচিত নয়। অপরদিকে তিনি কিসাসকে মানবজাতির 'জীবন' আখ্যা দিয়েছেন ঃ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ হে বুদ্ধিজীবিগণ, কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত)। যারা ইসলামী হুদূদের বিরোধিতা করে, মনে হয় দুষ্টের দমন তাদের কাম্যই নয়। নতুবা ইসলামের চাইতে বেশি দয়া ও করুণার শিক্ষা কে দিতে পারে ? ইসলাম রণাঙ্গনেও যুদ্ধরত শত্রুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। ইসলামে নির্দেশ রয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, বালক ও বৃদ্ধ সামনে

এসে পড়লে তাদেরকে হত্যা করো না। ধর্মীয় আলিম যদি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয় এবং নিজ পন্থায় ইবাদতে মশগুল থাকে, তবে তাকেও হত্যা করো না।

সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে, ইসলামী শাস্তিসমূহের প্রতিবাদে তাদেরই কণ্ঠ সোচ্চার, যাদের হাত এখন পর্যন্ত হিরোশিমার লক্ষ লক্ষ এমন নিষ্পাপ ও নিরপরাধ মানুষের রক্তে রঞ্জিত যাদের মনে সম্ভবত কখনও যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কল্পনাও জাগেনি। এসব নিহতের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ সবই রয়েছে। হত্যাকারীদের ক্রোধাগ্নি হিরোশিমার ঘটনার পরও নির্বাপিত হয়নি। তারা রোজই অধিকতর মারাত্মক বোমা আবিষ্কার এবং ভূগর্ভে তার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে মশগুল রয়েছে। আমরা এ ছাড়া আর কি বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে স্বার্থপরতার পর্দা তুলে দিন এবং তাদেরকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আইন-কানূনের প্রতি হিদায়েত করুন।

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِ
يْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ
هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ط
يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ج يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا
فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ط وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ
تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ
قُلُوْبَهُمْ ط لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ﴿৪১﴾ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ط فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ج وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ط
وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿৪২﴾
وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ
مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿৪৩﴾ ع

(৪১) হে রাসূল। তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলেঃ আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদী; মিথ্যে বলার জন্য তারা গুপ্তচরবৃত্তি করে। তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে ঃ যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবূল করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে আপনি কিছু করতে পারেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ্ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি। (৪২) এরা মিথ্যা বলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে হারাম ভক্ষন করে। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভাল বাসেন। (৪৩) তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহ্র নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনও বিশ্বাসী নয়।

যোগসূত্র ঃ সূরা মায়েদার তৃতীয় রুকূ থেকে আহ্লে-কিতাবদের আলোচনা চলছিল। মাঝখানে তাদের কিছু কিছু আলোচনা এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিশেষ বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছিল। এখানে পুনরায় আহ্লে-কিতাবদের সম্পর্কেই সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আহ্লে-কিতাবদের মধ্যে ইহুদী ও খ্রিস্টান দুই সম্প্রদায় ছাড়াও আরেকটি সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। এরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ইহুদী, কিন্তু কপটতাপূর্বক মুসলমান হয়েছিল। তারা মুসলমানদের সামনে ইসলাম প্রকাশ করত, অথচ স্বধর্মাবলম্বী ইহুদীদের মধ্যে বসে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করত। আলোচ্য তিনটি আয়াত এ তিন সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ ও অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, এরা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও নির্দেশের বিপরীতে স্বীয় কামনা-বাসনা ও বিচার-বুদ্ধিকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং আল্লাহ্র বিধান ও নির্দেশের মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় বাসনার ছাঁচে ঢেলে নেওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছনা ও অশুভ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদের জন্য কতিপয় মৌলিক বিধান ও নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে।

শানে-নযুল ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদী গোত্রসমূহে সংঘটিত দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত দুটি অবতীর্ণ হয়। একটি ঘটনা ছিল হত্যা ও কিসাস বিষয়ক এবং অপরটি ছিল ব্যভিচার ও তার শাস্তি সংক্রান্ত।

ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন যে, ইসলাম-পূর্বকালে পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বস্তরে অন্যায়-অত্যাচারের রাজত্ব চলছিল। সবল দুর্বলকে এবং উচ্চবিত্তরা নিম্নবিত্তদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখত। সবল-সম্ভ্রান্তের জন্য ভিন্ন আইন চিল। বর্তমানকালেও সভ্যতার দাবিদার অনেক দেশে

কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রচলিত রয়েছে। মানবতার দিশারী রাসূলে-আরবী (সা)-ই এসব স্বাতন্ত্র্য চিরতরে মিটিয়ে দিয়েছেন, মানবাধিকারে সমতা ঘোষণা করেছেন এবং মানব ও মানবতাকে মনুষ্যত্বের সবক দিয়েছেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের পূর্বে মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইহুদীদের দু'টি গোত্র–বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়রের বসতি ছিল। তন্মধ্যে বনী কুরায়যার তুলনায় বনী নুযায়রের শক্তি, শৌর্যবীর্য, অর্থ ও সম্মান বেশি ছিল। ফলে তারা প্রায়ই বনী কুরায়য়ার প্রতি অন্যায় অবিচার করত এবং তারা তা নির্বিবাদে সহ্য করত। এমনকি, তারা বনী কুরায়যাকে এ অবমাননাকর চুক্তি করতেও বাধ্য করল যে, যদি বনী নুযায়রের কোন ব্যক্তি বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে তাদের কিসাস অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ লওয়ার অধিকার থাকবে না ; বরং মাত্র সত্তর ওসক খেজুর রক্ত-বিনিময়স্বরূপ প্রদান করা হবে (আরবী ওজনে ওসক একটি পরিমাণ, যা আমাদের ওজনে প্রায় পাঁচ মণ দশ সেরের সমান)। পক্ষান্তরে বনী কুরায়যার কেউ বনী নুযায়রের কাইকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে এবং বিনিময়ও দিতে হবে। এ রক্ত-বিনিময়ের পরিমাণ হবে বনী নুযায়রের রক্ত-বিনিময়ের দ্বিগুন। অর্থাৎ একশ' চল্লিশ ওসক খেজুর। শুধু তাই নয়, নিহত ব্যক্তি মহিলা হলে তার বিনিময়ে বনী কুযায়যার একজন পুরুষকে হত্যা করা হবে এবং নিহত ব্যাক্তি পুরুষ হলে তার বিনিময়ে বনী কুরায়যার দু'জন পুরুষকে হত্যা করা হবে। বনী নুযায়রের ক্রীতদাসকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে বনী কুরায়যার স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। বনী নুযায়রের কারও এক হাত কাটা হলে বিনিময়ে বনী কুরায়যার দু'হাত এবং এক কানের বিনিময়ে দু'কান কাটা হবে। ইসলামের পূর্বে এ গোত্রদ্বয়ে এ আইনই প্রচলিত ছিল। দুর্বলতাবশত বনী কুরায়যা তা-ই মানতে বাধ্য ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পর মদীনা যখন দারুল ইসলামে পরিণত হলো, এ গোত্রদ্বয় তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং কোন চুক্তি বলেও ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য ছিল না। কিন্তু তারা দূরে থেকেই ইসলামের ন্যায় বিচার ও সাধারণ সহজবোধ্যতা নিরীক্ষণ করত। ইতিমধ্যে বনী কুরায়যার জনৈক ব্যক্তি বনী নুযায়রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। বনী নুযায়র উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী বনী কুরায়যার কাছে দ্বিগুণ রক্ত-বিনিময় দাবি করল। বনী কুরায়যা ইসলামে দীক্ষিত ছিল না এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাদের কোন চুক্তিও ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক ছিল। তারা তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী দৃষ্টে জানত যে, মুহাম্মদ (সা)- শেষ নবী। কিন্তু ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পার্থিব লোভের কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করত না। তারা আরও দেখছিল যে, ইসলাম মানবিক সমতা, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের পতাকাবাহী। তাই বনী নুযায়রের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা একটি আশ্রয় খুঁজে পেল। তারা একথা বলে দ্বিগুণ রক্ত-বিনিময় দিতে অস্বীকার করল যে, আমরা ও তোমরা একই পরিবারভুক্ত, একই দেশের বাসিন্দা এবং একই ইহুদী ধর্মাবলম্বী। আমাদের দুর্বলতা ও তোমাদের জবরদস্তির কারণে এতদিন আমরা যে অসম ও অন্যায় চুক্তি মেনে চলেছি এখন থেকে তা আর মানব না।

এ উত্তর শুনে বনী নুযায়র উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হলো। কিন্তু কতিপয় প্রবীণ লোকের পরামর্শক্রমে স্থির হলো, ব্যাপারটির ফয়সালার জন্য উভয় পক্ষ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরণাপন্ন হবে। বনী কুরায়যা মনে মনে তা-ই চাচ্ছিল।

কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল, মহানবী (সা) বনী নুযায়রের উৎপীড়ন নীতি বহাল রাখবেন না। বনী নুযায়র পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েও গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। তারা মোকদ্দমা উত্থাপিত হওয়ার পূর্বেই কিছু লোককে পাঠিয়ে দিল, যারা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদেরই স্বধর্মাবলম্বী ইহুদী। কিন্তু কপটতাপূর্বক ইসলাম প্রকাশ করে মহানবী (সা)-এর নিকট আসা-যাওয়া করত। বনী নুযায়রের উদ্দেশ্য ছিল, তার মোকদ্দমা ও ফয়সালার পূর্বে এ ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর মনোভাব ও মতবাদ জেনে নেওয়া। তারা গুরুত্ব সহকারে বলে যে, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের পক্ষে রায় দেন, তবে তা মেনে নেব, অন্যথায় মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করব না।

এ ঘটনাটি ইমাম বগভী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদ ও আবূ দাউদে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর সারমর্ম বর্ণিত রয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো ব্যভিচার সংক্রান্ত। ইমাম বগভীর বর্ণনা মতে এ ঘটনাটি ঘটে খায়বরের ইহুদীদের মধ্যে। তওরাত-নির্ধারিত শাস্তি অনুযায়ী উভয়কে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা করা ছিল অপরিহার্য। কিন্তু তারা ছিল উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। ইহুদীরা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাদের শাস্তি লঘু করতে চাইল। তারা জানত যে, ইসলামে মাস'আলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে অনেক নমনীয়তা আছে। তাই তারা মনে করল যে, এ শাস্তির ব্যাপারেও ইসলামের বিধান কঠোর না হয়ে নরমই হবে। সেমতে খায়বরের ইহুদীরা বনী কুরায়যাকে অনুরোধ করল, যাতে তারা মুহাম্মদ (সা)-এর দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে দেয়। অপরাধীদ্বয়কেও তারা সাথে সাথে পাঠিয়ে দিল। তাদেরও উদ্দেশ্য ছিল, যদি তিনি কোন লঘু শাস্তির রায় দেন, তবে মেনে নেয়া হবে, অন্যথায় অস্বীকার করা হবে। বনী কুরায়যা প্রথমে ইতস্তত করল, কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর একথাই স্থির হলো যে, কয়েকজন সর্দার অপরাধীদ্বয়কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যাবে এবং তাঁকে দিয়েই এর ফয়সালা করাবে।

সেমতে কা'ব ইবনে আশরাফ প্রমুখের একটি প্রতিনিধিদল অপরাধীদ্বয়কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল ঃ যদি বিবাহিত পুরুষ ও নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি কি ? মহানবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা ফয়সালা মেনে নেবে কি ? তারা সম্মতি প্রকাশ করল। ঠিক সে মুহূর্তেই ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করলেন যে, তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হবে। তারা এ ফয়সালা শুনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। জিবরাঈল (আ) মহানবী (সা)-কে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন ঃ আমার এ ফয়সালা মানা-না-মানার জন্য ইবনে সূরিয়াকে বিচারক নির্ধারণ কর। অতঃপর জিবরাঈল (আ) ইবনে-সূরিয়ার পরিচয় ও গুণাবলী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে দিলেন। তিনি আগত প্রতিনিধিদলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা ঐ শ্বেতকায় এক চোখ অন্ধ যুবককে চেন কি, যে ফাদাকে বসবাস করে এবং যাকে ইবনে সূরিয়া বলা হয় ? সবাই বলল ঃ চিনি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কিরূপ মনে কর ? তারা বলল ঃ ভূ-পৃষ্ঠে তার চাইতে বড় কোন ইহুদী আলিম নেই। তিনি বললেন তাকে ডেকে আন।

ইবনে সূরিয়ার আগমনের পর রাসূলে করীম (সা) তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বর্ণিত মাস'আলায় তওরাতের নির্দেশ কি ঃ সে বলল ঃ আপনি আমাকে যে সত্তার কসম দিয়েছেন, আমি তারই কসম খাচ্ছি। যদি আপনি কসম না দিতেন এবং মিথ্যা কথা বললে

তওরাত আমাকে পুরিয়ে দেবে—এ আশংকা না থাকত, তবে আমি এ সত্য প্রকাশ করতাম না। সত্য বলতে কি, তওরাতেও এ নির্দেশই রয়েছে যে, অপরাধীদ্বয়কে প্রস্তর মেরে হত্যা করতে হবে।

মহানবী (সা) বললেন ঃ তাহলে তোমরা কি কারণে তওরাতের নির্দেশের বিরুদ্ধা চরণ কর? ইবনে সূরিয়া বলল ঃ আসল ব্যাপার এই যে, আমাদের জনৈক রাজকুমার ব্যভিচারের অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। আমরা তাকে খাতির করে ছেড়ে দিলাম—প্রস্তর মেরে হত্যা করলাম না। কিছুদিন পর একজন সাধারণ লোক এ অপরাধে অভিযুক্ত হয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে চাইল, কিন্তু অপরাধীর পক্ষে একদল লোক বেঁকে বসল। তারা বলল ঃ তাকে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি দিতে হলে আগে রাজকুমারকে দিতে হবে, নতুবা আমরা তার প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করতে দেব না। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, সবার পক্ষে গ্রহণীয় একটি লঘু শাস্তি প্রবর্তন করা দরকার এবং তওরাতের নির্দেশ পরিত্যাগ করা উচিত। সেমতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ব্যভিচারের অপরাধীকে কিছু মারপিট করে মুখে চুনকালী মাখিয়ে মিছিল বের করতে হবে। বর্তমানে এ শাস্তিই প্রচলিত রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে রাসূল (সা), যারা কুফরে (অর্থাৎ কুফর সম্পর্কিত কাজ কর্মে) দৌড়ে গিয়ে পড়ে, (অর্থাৎ অবাধে ও সাগ্রহে কুফর করে) তারা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে (অর্থাৎ আপনি তাদের কুফরী কাজকর্ম দেখে দুঃখিত হবেন না)। তারা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হোক, যারা মুখে (মিছেমিছি) বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। [অর্থাৎ ঈমান আনেনি। অর্থাৎ মুনাফিক দল, যারা এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসেছিল] কিংবা তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হোক যারা ইহুদী। (দ্বিতীয় ঘটনায় তারা হাযির হয়েছিল।) এরা (উভয় শ্রেণীর লোক পূর্ব থেকে ধর্মের বিধান পরিবর্তনকারী আলিমদের মুখে) মিথ্যা কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত, (এবং এসব মিথ্যা কথার সমর্থন অন্বেষণেই এখানে এসে) আপনার কথাবার্তা অন্য সম্প্রদায়ের খাতিরে কান পেতে শোনে, যাদের অবস্থা এই যে, (প্রথমত) তারা আপনার কাছে (অহংকার ও শত্রুতার কারণে স্বয়ং) আসেনি, (বরং অন্যকে পাঠিয়েছে। তাও সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে নয়, বরং স্বীয় পরিবর্তিত বিধানের অনুকূলে যদি কিছু পাওয়া যায় এজন্যে। কেননা, এরা পূর্ব থেকেই) আল্লাহ্‌র কালাম বিশুদ্ধ স্থানে কায়েম হওয়ার পর (শাব্দিক, অর্থগত অথবা উভয় প্রকারে) পরিবর্তন করে। (এ অভ্যাস অনুযায়ীই রক্ত বিনিময় এবং প্রস্তর বর্ষণের নির্দেশকেও মনগড়া প্রথায় পরিবর্তন করে দিয়েছে। এরপর ইসলামী শরীয়ত থেকে এ প্রথার সমর্থন পাওয়ার আশায় এখানে গুপ্তচরদের পাঠিয়েছে। তৃতীয়ত স্বীয় পরিবর্তিত প্রথার অনুকূলে সমর্থন অন্বেষণ করেই ক্ষান্ত নয়, বরং প্রেরিত গুপ্তচরদের) তারা বলে যদি তোমরা (সেখানে গিয়ে) এ (পরিবর্তিত) নির্দেশই পাও, তবে তা কবূল করে নিও (অর্থাৎ তাকে কার্যে পরিণত করার ওয়াদা করো)। আর যদি তোমরা এ (পরিবর্তিত) নির্দেশ না পাও, তবে (তো তা কবূল করতে) বিরত থাকবেই। (অতএব, গুপ্তচর প্রেরণকারী সম্প্রদায়ের দোষ একাধিক—প্রথমত অহংকার ও শত্রুতার কারণে স্বয়ং না আসা, দ্বিতীয়ত সত্যান্বেষণ না করা, বরং সত্যকে বিকৃত করে তার সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করা এবং

তৃতীয়ত অন্যদেরকেও সত্য কবূল করতে বারণ করা। এ পর্যন্ত আগমনকারী ও প্রেরণকারীদের পৃথক পৃথকভাবে নিন্দা করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে সবার নিন্দা করা হচ্ছে-) আর (আসল কথা এই যে,) যার খারাপ (ও পথভ্রষ্ট) হওয়া আল্লাহ্ তা'আলাই চান, (তবে এ সৃষ্টিগত চাওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে পথভ্রষ্টতার সংকল্প করার পরই হয়ে থাকে।) তার জন্য (হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) আল্লাহ্র কাছে তোমার কোন জোর চলতে পারে না (যে, তুমি এ পথভ্রষ্টতাকে রোধ করে দেবে। এ হচ্ছে একটি সাধারণ রীতি। এখন বুঝবে যে,) এরা এমনই যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে (কুফর থেকে) পবিত্র করতে চান না। [কেননা, তারা পবিত্র হওয়ার ইচ্ছাই করে না। তাই আল্লাহ্ সৃষ্টিগতভাবে তাদেরকে পবিত্র করেন না, বরং তাদের পক্ষ থেকে পথভ্রষ্টতার সংকল্পের কারণে সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ্ তাদের খারাপ হওয়া চান। অতএব, কেউ তাদেরকে হিদায়েত করতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, তারা নিজেরাই খারাপ থাকার সংকল্প পোষণ করে এবং সংকল্পের পর তা সৃষ্টি করাই আল্লাহ্র রীতি। আল্লাহ্র এ সৃষ্টিকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। এমতাবস্থায় তাদের ভাল হওয়ার আশা কি ? এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য অতিরিক্ত সান্ত্বনার কারণ রয়েছে। এ সান্ত্বনার বিষয়বস্তু দ্বারাই আলোচনা শুরু করা হয়েছিল।অতএব, কথার শুরুতেও সন্ত্বনা এবং শেষেও সান্ত্বনা দেওয়া হলো। পরবর্তী বাক্যে এসব কর্মের ফল বর্ণনা করা হচ্ছে যে,] তাদের (সবার) জন্য ইহকালেও লাঞ্ছনা রয়েছে এবং পরকালেও তাদের (সবার) জন্য বিরাট শাস্তি অর্থাৎ দোযখ রয়েছে। মুনাফিকদের লাঞ্ছনা এই হয়েছে যে, মুসলমানরা তাদের কপটতা জেনে ফেলেছে। ফলে তাদের সবাইকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। আর ইহুদীদের হত্যা, জেল ও নির্বাসন তো হাদীস সূত্রেই সুবিদিত। পরকালের শাস্তি আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।) এরা (ধর্মের ব্যাপারে) মিথ্যা শ্রবণে অভ্যস্ত- (যেমন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) হারাম (মাল) ভক্ষণকারী। (এ লালসাই তাদেরকে ধর্মীয় বিধি-বিধান মিথ্যা বর্ণনায় অভ্যস্ত করে দিয়েছে। মিথ্যা বর্ণনার বিনিময়ে তারা কিছু নযরানা ইত্যাদি পেত। তাদের অবস্থা যখন এমন, তখন) তারা যদি (কোন মোকদ্দমা নিয়ে) আপনার কাছে (ফয়সালা করাতে) আসে; তবে (যদি আপনার ইচ্ছা) হয় আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। আর যদি আপনি (সিদ্ধান্ত নেন যে,) তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকবেন, তবে (এরূপ আশংকা করবেন না যে, তারা অসন্তুষ্ট হয়ে শত্রুতা সাধন করবে। কেননা,) তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। (কারণ, আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার রক্ষক।) পক্ষান্তরে যদি আপনি (মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে) মীমাংসা করেন, তবে তাদের মধ্যে সুবিচার (অর্থাৎ ইসলামী আইন) অনুযায়ী মীমাংসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (এখন ইসলামী আইনেই সুবিচার সীমাবদ্ধ। এ আইন অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে, তারাই ভালবাসার পাত্র) এবং (আশ্চর্যের বিষয় এই যে,) তারা (ধর্মীয় ব্যাপারে) আপনার মাধ্যমে কিরূপে ফয়সালা করাবে ? অথচ তাদের কাছে তওরাত (বিদ্যমান) রয়েছে, যাতে আল্লাহ্র নির্দেশ লিখিত রয়েছে (যে তওরাত মেনে চলার দাবি তারা করে, প্রথমত সেটাই আশ্চর্যের বিষয়)। অতঃপর (এ কারণে এ বিস্ময় আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায় যে,) এর পেছনে (অর্থাৎ মোকদ্দমা দায়ের করার পেছনে, যখন আপনার রায় শোনে, তখন সে রায় থেকেও) মুখ ফিরিয়ে নেয়। (অর্থাৎ প্রথমত মোকদ্দমা দায়ের করাই আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু এ কথা ভেবে এ বিস্ময় দূর হতে পারত যে, বোধ হয় ইসলামের

সত্যতা তাদের কাছে ফুটে উঠেছে এবং সে জন্যই এসে গেছে। কিন্তু যখন তারা এ রায় মানেনি , তখন বিস্ময় আবার সজীব হয়ে উঠেছে যে, তাহলে কি কারণে তারা মোকদ্দমা দায়ের করল ?) এবং (এ থেকেই জ্ঞানীমাত্র বুঝতে পেরেছে যে,) এরা কখনও বিশ্বাসী নয়। (বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আসেনি-মতলব সাধন করতে এসেছিল মাত্র। রায় না মানা যখন অবিশ্বাসের দলীল তখন এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেদের গ্রন্থ তওরাতের প্রতিও তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস থাকলে তা ত্যাগ করে এখানে আসবে কেন ? মোটকথা, তারা উভয় কূলই হারিয়েছে- যা অস্বীকার করেছে তার প্রতিও বিশ্বাস নেই এবং যার প্রতি বিশ্বাসের দাবি করেছে তার প্রতিও বিশ্বাস নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য তিনখানি আয়াত এবং তৎপরবর্তী কতিপয় আয়াত যেসব কারণ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে ইহুদীরা কখনও স্বজন-প্রীতির বশবর্তী হয়ে এবং কখনও নাম-যশ ও অর্থের লোভে ফতোয়া প্রার্থীদের মনমত ফতোয়া তৈরি করে দিত। বিশেষত অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটি ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি। কোন বড়লোক অপরাধ করলে তারা তওরাতের গুরুতর শাস্তিকে লঘু শাস্তিতে পরিবর্তন করে দিত। তাদের এ অবস্থাটিই আয়াতের এ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِه রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব জীবনব্যবস্থা ইহুদীদের সামনে এল তখন তারা একে একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করতে চাইল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় একদিকে যেমন অনেক নমনীয়তা ছিল, অন্যদিকে তেমনি অপরাধ দমনের জন্য একটি যুক্তিযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাও ছিল। যেসব ইহুদী তওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ জাতীয় মোকদ্দমায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিচারক নিযুক্ত করতে প্রয়াস পেত-যাতে একদিকে ইসলামের সহজ ও নরম বিধি-বিধান দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্যদিকে তওরাত পরিবর্তন করার অপরাধ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা একটি দুষ্কৃতির আশ্রয় নিত। তা এই যে, নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার পূর্বে কোন-না কোন পন্থায় মোকদ্দমার রায় ফতোয়া হিসাবে জেনে নিতে চাইত। উদ্দেশ্য-এ রায় তাদের আকাঙ্ক্ষিত রায়ের অনুরূপ হলে বিচারক নিযুক্ত করবে, অন্যথায় নয়। এ সম্পর্কে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যথেষ্ট মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। তাই আয়াতের প্রারম্ভেই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে,, এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। এর পরিণাম আপনার জন্য শুভই হবে।

অতঃপর আয়াতে অবহিত করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আন্তরিকতার সাথে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করছে না ; তাদের নিয়তে গোলমাল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমার ফয়সালা করুন, নতুবা নির্লিপ্ত থাকুন। আরও বলা হয়েছে যে, আপনি যদি নির্লিপ্ত থাকতে চান, তবে তারা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তু তাই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান তবে, ইনসাফ

ও ন্যায়বিচার সহকারে ফয়সালা করুন। অর্থাৎ নিজ শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। কোরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য রহিত হয়নি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্র আইনের বিরুদ্ধে অন্য কোন আইন, প্রথা ও প্রচলনের অধীনে মোকদ্দমার রায় প্রদান করাকে অন্যায়, পাপাচার ও কুফর আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমের মোকদ্দমা বিধি ঃ এখানে স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদালতে মোকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদীরা ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্থ যিম্মীও ছিল না। তবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদন করেছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে শরীয়ত অনুযায়ী তাদের মোকদ্দমার ফয়সালা করুন। কেননা, তাদের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব ছিল না। তারা যিম্মী হলে এবং ইসলামী আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরয হতো ; নির্লিপ্ত থাকা জায়েয হতো না। কেননা, তাদের অধিকারের দেখাশোনা করা এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে মুসলমান ও যিম্মীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ –অর্থাৎ তারা আপনার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি শরীয়ত অনুযায়ী তার ফয়সালা করে দিন।

এ আয়াতে ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবূ বকর জাসসাস আহকামুল কোরআন গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা ঐসব অমুসলিমের সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা যিম্মী নয় বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের সাথে কোন চুক্তি করেছে। যেমন বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়র। আর দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা যিম্মী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক। এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় আয়াতে অমুসলিমদের মোকদ্দমার নিজ শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মনোবাঞ্ছার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ নির্দেশ ঐসব মোকদ্দমা সম্পর্কেই দেওয়া হয়েছে, যা আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নযুলে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত বিনিময়ের মোকদ্দমা এবং অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার সংক্রান্ত মোকদ্দমা। এ জাতীয় মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একই নিয়ম অর্থাৎ সমগ্র দেশে একই আইন বলবৎ থাকে। একে সাধারণ আইন বলা হয়। সাধারণ আইনে শ্রেণী অথবা ধর্মের কারণে কোনরূপ পার্থক্য হয় না। উদাহরণত চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন শুধু মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং দেশের যে কোন বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অমুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইসলামী আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরী নয়।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদ্যপান ও শূকরের মাংস মুসলমানদের জন্য হারাম করে তার শাস্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমুসলমানদের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি অমুসলমানদের বিয়ে-শাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিয়ে শুদ্ধ ছিল, তিনি তাই বহাল রেখেছিলেন।

হিজরের অগ্নি পূজারী এবং নাজরানা ও ওয়াদিয়ে কুরার ইহুদী ও খ্রিস্টানরা ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী ছিল। মহানবী (সা) জানতেন যে, আগ্নি উপাসকদের ধর্মে মা ও ভগিনীকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মমতে ইদ্দত অতিবাহিত না করে এবং সাক্ষী ব্যতিরেকেও বিবাহ্ শুদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেন নি, বরং তাদের বিবাহ্-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়াদির মীমাংসা তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি এসব ব্যাপারে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে।

তবে যদি তারা উভয় পক্ষ মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামী আইন অনুযায়ীই ফয়সালা করবেন। কেননা, তখন তিনিই উভয় পক্ষের নিযুক্ত বিচারকদের গণ্য হবেন।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ আয়াতে নবী করীম (সা)-কে ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মোকদ্দমাটিই সাধারণ আইনের–যাতে কোন সম্প্রদায়ই আওতা-বহির্ভূত নয় অথবা এর কারণ এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার জন্য আসে। এমতাবস্থায় তাঁর ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তাঁর ঈমান রয়েছে এবং যা তাঁর শরীয়তের নির্দেশ। মোটকথা, আলোচ্য প্রথম আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ বাক্য থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে। এতে রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী (সা)-এর কাছে যে প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল তারা সবাই ছিল মুনাফিক । ইহুদীদের সাথে এদের গোপন যোগসাজশ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনিধিদলের কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফিরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

ইহুদীদের একটি বদভ্যাস ঃ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ–অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যস্ত। তারা আলিম বলে কথিত বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদেরই অন্ধ অনুসারী। তওরাতের নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্ত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কিসসা-কাহিনীই শুনতে থাকে।

আলিমদের অনুসরণ করার বিধি ঃ যারা তওরাত পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলীতে মিথ্যা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে, আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন শাস্তিবাণী

উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি ঐসব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে, যারা তাদেরকে অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এতে মুসলমানদের জন্যও একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে, আলিমদের কাছ থেকে ফতোয়া নেওয়ার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া দরকার। অজ্ঞ জনগণের ধর্মকর্ম করার একমাত্র পথ হচ্ছে আলিমদের ফতোয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। রুগ্ন ব্যক্তি কোন ডাক্তার অথবা হাকীমের কাছে যাওয়ার পূর্বে কি করে ? পরিচিতদের কাছে খোঁজ নেয় যে, এ রোগের জন্য কোন ডাক্তার পারদর্শী। কোন হাকীম বেশি ভাল ? তার কি কি ডিগ্রী আছে ? তার চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিণাম কি ? যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেওয়ার পরও যদি সে কোন ভ্রান্ত ডাক্তার অথবা হাকীমের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পাত্র নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনরূপ খোঁজ-খবর না নিয়েই কোন হাতুড়ে ডাক্তারের ফাঁদে পড়ে এবং পরিণামে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনদের মতে তার আত্মহত্যার জন্য সে নিজেই দায়ী হয়।

জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থাও তাই। যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে কোন আলিমের অনুসরণ এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে, তবে তারা মানুষের কাছেও ক্ষমাযোগ্য হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছেও। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ فان اثمه على من افتى অর্থাৎ এমতাবস্থায় আলিম ও মুফতী ভুল করলে এবং কোন মুসলমান তার ভুল ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করলে, তার গুনাহ তার উপর নয়—বরং আলিম ও মুফতীর উপরই বর্তাবে, যদি সে জেনেশুনে ভুল করে কিংবা সম্ভাব্য চিন্তা-ভাবনায় ত্রুটি করে অথবা প্রকৃতপক্ষে সে আলিম না হয়েও যদি জনগনকে ধোঁকা দিয়ে আলিমের পদ দখল করে বসে থাকে।

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর না নিয়ে শুধু নিজ মতে কোন আলিমের অনুসরণ করে এবং তার উক্তি অনুযায়ী কাজ করে অথচ সংশ্লিষ্ট আলিম অনুসরণের যোগ্য না হয়, তবে এর গুনাহ্ একা তথাকথিত আলিম ব্যক্তিই বহন করবে না, বরং অনুসরণকারীও সমান অপরাধী হবে। এমন লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে ঃ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ অর্থাৎ তারা মিথ্যা কথা শুনায় অত্যন্ত অভ্যস্ত এবং স্বীয় অনুসৃতদের ইল্‌ম, আমল ও ধার্মিকতার খোঁজ-খবর না নিয়েই তাদের অনুসরণে লিপ্ত।

কোরআনে পাক ইহুদীদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদের শুনিয়েছে—যেন তারা এ দোষ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানদের চরম দুরবস্থার অন্যতম কারণ। অথচ তারা বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে খুবই হুঁশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও সুচতর। অসুস্থ হলে অধিকতর যোগ্য ডাক্তার-বৈদ্য খোঁজ করে, মোকদ্দমা হলে নামী-দামী উকিল-ব্যারিস্টার নিয়োগ করে এবং গৃহ নির্মাণ করতে হলে উৎকৃষ্টতর স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এতই উদার যে, কারও দাড়ি-কোর্তা দেখে এবং কিছু কথা-বার্তা শুনেই তাকে অনুসরণযোগ্য আলিম, মুফতী ও পথপ্রদর্শক বলে নির্বাচন করে নেয়। সে নিয়মিত কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে কি না,

বিশেষজ্ঞদের সংসর্গে থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কি না, শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কি না, সাচ্চা বুযুর্গ ও আল্লাহভক্তদের সংসর্গে থেকে কিছু আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মকর্মে মনোযোগী, তাদের একটি বিরাট অংশ মূর্খ ওয়ায়েয ও ব্যবসায়ী পীরের ফাঁদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূরে পড়ে যায়। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান এমন কতিপয় কিসসা-কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রৈপিক কামনা-বাসনার পরিপন্থী নয়। তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট ইবাদত করছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের স্বরূপ হচ্ছে এই ঃ

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ـ

অর্থাৎ তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চরিত্র ও কাজকর্ম পার্থিব জীবনেই লুপ্ত প্রায়, অথচ তারা মনে করেছে যে, চমৎকার ধর্মকর্ম করে যাচ্ছে।

মোটকথা এই যে, কোরআন পাক سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ বাক্যে মুনাফিক ইহুদীদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি বিরাট মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ মূর্খ জনগণের পক্ষে আলিমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য বটে, কিন্তু যথার্থ খোঁজ-খবর না নিয়ে কোন আলিমের অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং অজ্ঞ লোকদের মুখে মিছামিছি কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

ইহুদীদের দ্বিতীয় বদভ্যাস ঃ উপরোক্ত মুনাফিকদের দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ অর্থাৎ এরা বাহ্যত আপনার কাছে একটি ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জানার জন্যও আসে নি। বরং তারা এমন একটি ইহুদী সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, যারা অহংকারবশত নিজে আপনার কাছে আসেনি। এরা শুধু তাদের বাসনা অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জেনে তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা-না-মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। এতে মুসলমানদের জন্য হুঁশিয়ারী রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ জানা এবং তা অনুসরণ করার নিয়তেই আলিমদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা কর্তব্য। নিজ প্রবৃত্তির অনুকূলে নির্দেশ অনুসন্ধান করার নিয়তে মুফতীগণের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা রিপু ও শয়তানের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

ইহুদীদের তৃতীয় বদভ্যাস ঐশী গ্রন্থের বিকৃতি সাধন ঃ ইহুদীরা আল্লাহ্র কালামকে যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভুল অর্থ করত এবং আল্লাহ্র নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্বিবিধ ঃ তওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তৎস্থলে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইহুদীরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল।

এতে মুসলমানদের জন্যও একটি হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। কোরআন পাকের হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন। এতে শাব্দিক পরিবর্তনের

দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না। কেননা লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও লাখো মানুষের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত কালামে কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই ধরা পড়ে যায়। অর্থগত পরিবর্তন বাহ্যত করা যায় এবং কেউ কেউ করেছেও। কিন্তু এর হিফাযতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার গৃহীত ব্যবস্থা এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি সত্যপন্থী দল থাকবে, যারা হবে কোরআন ও সুন্নাহ্র বিশুদ্ধ অর্থের বাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের সকল দুষ্কর্ম ফাঁস করে দেবে।

চতুর্থ বদভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ ঃ দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরও একটি বদভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ অর্থাৎ তারা سحت (সুহ্ত) খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহতের শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেওয়া। এ অর্থেই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ অর্থাৎ তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ্ তা'আলা আযাব দ্বারা তোমাদের মূল্যোৎপাটন করে দেবেন। অর্থাৎ তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে 'সুহ্ত' বলে উৎকোচকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা), ইবরাহীম নখয়ী (র), হাসান বসরী (র), মুজাহিদ (র), কাতাদাহ্ (র) ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহ্ত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহীতাকেই ধ্বংস করে না, সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে, সমাজে ঘুষ চালু হয়ে যায়, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারও জানমাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে 'সুহ্ত' আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও সহীহ্ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।"

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে।--(জাস্সাস)

শরীয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনত জায়েয নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। উদাহরণত যে কাজ করা কোন ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত সে কাজের জন্য কোন পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ। সরকারী কর্মকর্তা ও করণিকগণ চাকরির অধীনে স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য ; এমতাবসস্থায় সে ব্যক্তি যদি সংশ্লিষ্ট কোন লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে তবে তা-ই ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। তারা কারও কাছ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। এখন কোন পাত্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তা-ও ঘুষ। রোযা, নামায, হজ্জ, তিলাওয়াতে-কোরআন ইত্যাদি ইবাদতও মুসলমানের দায়িত্ব। এর জন্য কারও কাছ তেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ হবে। অবশ্য পরবর্তী ফিকাহ্বিদদের ফতোয়া অনুযায়ী কোরআন শিক্ষা দান করা ও নামাযের ইমামতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘুষ গ্রহণ করে ন্যায়সংগত কাজও করে দেয়, তবে সে গুনাহ্গার হবে এবং ঘুষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারও অন্যায় কাজ করে দেয়, সে উপরোক্ত গুনাহ্ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং আল্লাহ্র নির্দেশের বিকৃতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। আল্লাহ্ মুসলমানদের এ থেকে রক্ষা করুন।

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ
ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا
ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟
ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم
بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ৪৪ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ
أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ
بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّـٰلِمُونَ ৪৫ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّ
قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ৪৬
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ
ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ৪৭ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ
ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ

شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ
اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (৪৮) وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ
هُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۗ فَاِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ (৪৯) اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ
حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (৫০)

(৪৪) আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হিদায়েত ও আলো রয়েছে। আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলিমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ আল্লাহ্‌র গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর আর আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। (৪৫) আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কর্ণের বিনিময়ে কর্ণ, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গুনাহ্ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই যালিম। (৪৬) আমি তাদের পেছনে মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি। এতে হিদায়েত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি আল্লাহ-ভীরুদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশবাণী। (৪৭) ইঞ্জীলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী। (৪৮) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ

করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেন নি--যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দ্রুত কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়ে, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। (৪৯) আর আমি আদেশ করছি যে আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন ; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন—যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গুনাহ্র কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। (৫০) তারা কি জাহিলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে ?

যোগসূত্র ঃ আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার সপ্তম রুকূ। এতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমানদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এ বিষয়টিই সূরা মায়েদার প্রথম থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে। বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁর প্রেরিত বিধি-বিধানের পরিবর্তন-পরিবর্ধন--যা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের চিরাচরিত বদভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

এ রুকূতে আল্লাহ্ তা'আলা তওরাতের অধিকারী ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে তাদের এ অবাধ্যতা ও তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে প্রথম দুই আয়াতে সতর্ক করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে 'কিসাস' সম্পর্কে কতিপয় বিধান উল্লেখ করেছেন। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল, তা কিসাস সম্পর্কেই ছিল অর্থাৎ বনী নুযায়র রক্ত বিনিময় ও কিসাসের ব্যাপারে সমতায় বিশ্বাসী ছিল না, বরং বনী কুরায়যাকে নিজেদের চাইতে কম রক্ত-বিনিময় গ্রহণ করতে বাধ্য করত। এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে নিজেদের আইন প্রয়োগ করার জন্য ইহুদীদেরকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং যারা এরূপ করে, তাদেরকে কাফির ও জালিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এরপর তৃতীয় আয়াতে ইঞ্জীলধারী খ্রিস্টানদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে অন্য আইন প্রয়োগ করার কারণে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং যারা এরূপ করে তাদেরকে উদ্ধত ও অবাধ্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে মুসলমানদের এ বিষয়বস্তু সম্পর্কেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আহলে-কিতাবদের এ রোগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে এবং নাম-যশ ও অর্থের লোভে যেন আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পরিবর্তন না করে অথবা আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে স্বরচিত আইন যেন প্রয়োগ না করে।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। তা এই যে, মৌলিক বিশ্বাস ও ইবাদতের ব্যাপারে যদিও সব পয়গম্বর একই পথের অনুসারী, কিন্তু আল্লাহ্র রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক পয়গম্বরকে তাঁর যমানার উপযোগী শরীয়ত দান করা হয়েছে, যাতে অনেক শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্নতর রাখা হয়েছে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক পয়গম্বরকে প্রদত্ত শরীয়ত তাঁর আমলে উপযোগী ও অবশ্য পালনীয় ছিল এবং যখন তা রহিত করে অন্য শরীয়ত আনা হলো, তখন তা-ই উপযোগী ও অবশ্য পালনীয় হয়ে গেছে। এতে শরীয়তসমূহের বিভিন্নতা ও পরিবর্তিত হতে থাকার একটি বিশেষ রহস্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি [মূসা (আ)-এর প্রতি] তওরাত অবতরণ করেছি--যাতে (বিশুদ্ধ বিশ্বাসেরও) নির্দেশ রয়েছে এবং (কর্মগত বিধি-বিধানেরও) বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। (বনী ইসরাঈলের) পয়গম্বরগণ, যাঁরা (লাখো মানুষের অনুসরণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও) আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত ছিলেন, এ (তওরাত) অনুযায়ী ইহুদীদের ফয়সালা দিতেন এবং (এমনিভাবে তাদের) আল্লাহ্ওয়ালা আলিমরাও (এ তওরাত অনুযায়ীই ফয়সালা দিতেন। কারণ, এটিই ছিল তখনকার শরীয়ত)। কেননা তাদেরকে (অর্থাৎ সে আলিমদের) আল্লাহ্র এ গ্রন্থের (উপর আমল করাতে এবং অন্যান্যকে আমল করানোর ব্যাপারে) দেখাশোনা করতে নির্দেশ (পয়গম্বরদের মাধ্যমে) দেওয়া হয়েছিল এবং তারা এর (অর্থাৎ আমল করানোর) অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন (অর্থাৎ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তারা সে নির্দেশ কবূল করেছিলেন। এ কারণে তারা সর্বদাই এ নির্দেশ অনুসরণ করে চলতেন।) অতএব (হে এ যুগের অংশগ্রহণকারী ইহুদী সর্দার ও আলিমকুল। তোমাদের অনুসৃতরা যখন সর্বদাই তওরাত মেনে এসেছেন, তখন) তোমরাও (মুহাম্মদের রিসালতের সত্যায়নের ব্যাপারে–যার নির্দেশ তওরাতেও রয়েছে) লোকদের থেকে (এ) আশংকা করো না (যে আমরা সত্যায়ন করলে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে আমাদের জাঁকজমক বিলীন হয়ে যাবে)। আর (শুধু) আমাকেই ভয় কর (অর্থাৎ সত্যায়ন না করলে আমার শাস্তিকে ভয় কর) এবং আমার নির্দেশাবলীর বিনিময়ে (জাগতিক) স্বল্পমূল্য (যা তোমরা জনগণের কাছ থেকে পেয়ে থাক, গ্রহণ করো না। (কেননা, জাঁকজমক ও অর্থের লিপ্সাই তোমাদেরকে সত্যায়ন না করতে উদ্বুদ্ধ করে)। এবং (স্মরণ রেখো) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, (বরং শরীয়তের ফয়সালা নয়– এমন বিষয়কে শরীয়তের ফয়সালা বলে চালিয়ে দেয়,) সে সম্পূর্ণ কাফির। (হে ইহুদীগণ ! তোমরা বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও স্বীয় বিশ্বাসকে রিসালতে মুহাম্মদিয়ার বিশ্বাসের অনুরূপ এবং কর্মক্ষেত্রেও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা ইত্যাদি নির্দেশ, স্বীয় মনগড়া নির্দেশকে আল্লাহ্র নির্দেশ বলে পথভ্রষ্ট করার দুষ্কর্মে লিপ্ত রয়েছ) এবং আমি এদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) প্রতি তাতে (অর্থাৎ তওরাতে) ফরয করেছিলাম যে, (যদি কাউকে অন্যায়ভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা অথবা আহত করে এবং হকদার যদি দাবি করে, তবে) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (এমনিভাবে অন্যান্য) বিশেষ জখমেরও

বিনিময়ে রয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি (এ কিসাস অর্থাৎ বিনিময় গ্রহণের অধিকারী হয়েও) তা (অর্থাৎ কিসাস ক্ষমা করে দেয়,) তার (অর্থাৎ ক্ষমাকারীর) জন্য (তার গুনাহ্সমূহের) প্রায়শ্চিত্ত (অর্থাৎ গুনাহ্ মোচন) হওয়ার কারণ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ ক্ষমার কারণে সে সওয়াবের অধিকারী হবে)। বস্তুত (ইহুদীরা যেহেতু এসব বিধি-বিধান ত্যাগ করেছিল, তাই পুনরায় বলা হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ যা অবতারণ করেছেন, যারা তদনুযায়ী ফয়সালা করে না (যার অর্থ উপরে বর্ণিত হয়েছে, তারাই পুরোপুরি জুলুম করেছে। অর্থাৎ বড়ই মন্দ কাজ করেছে।) আর আমি এ সবের (অর্থাৎ এসব পয়গম্বরের) পেছনে (যাদের উল্লেখ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ বাক্যে হয়েছে)ঈসা ইবনে মরিয়মকে এ অবস্থায় (পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছি যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করতেন—সকল ঐশী গ্রন্থের সত্যায়ন করা প্রত্যেক রিসালতের অপরিহার্য রীতি।) এবং আমি তাঁকে ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে (তওরাতের মতই বিশুদ্ধ বিশ্বাসেরও) নির্দেশ ছিল এবং (কর্মগত বিধি-বিধানেরও বিস্তারিত বর্ণনা ছিল এবং) তা (ইঞ্জীল) পূর্ববর্তী গ্রন্থ (অর্থাৎ) তওরাতের সত্যায়ন (ও) করত (যা করা প্রত্যেক ঐশী গ্রন্থের জন্য অপরিহার্য।) এবং তা নিছক হিদায়েত ও উপদেশ ছিল আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য। বস্তুত (ইঞ্জীল প্রদান করে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে,) ইঞ্জীলধারীদের উচিত আল্লাহ্ তাতে যা অবতারণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করা এবং (হে এ যুগের খ্রিস্টানরা ! শুনে রাখ,) যারা আল্লাহ্ যা অবতারণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই সম্পূর্ণ দুষ্কর্মী। (ইঞ্জীলও যে রিসালতে-মুহাম্মদীর খবর দিচ্ছে—অতএব তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করছ কেন ?) আর (তওরাত ও ইঞ্জীলের পর) আমি এ (কোরআন নামক) গ্রন্থ আপনার কাছে প্রেরণ করেছি, যা স্বয়ং সত্যতা গুণে গুণান্বিত এবং পূর্ববর্তী যেসব (ঐশী) গ্রন্থ (এসেছে যেমন, তওরাত, ইঞ্জীল, যবূর) সে সবেরও সত্যায়ন করে (যে সেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।) এবং (কোরআন নামক গ্রন্থটি যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত ও পালনীয় এবং এতে উপরোক্ত ঐশী গ্রন্থসমূহের সত্যতার সাক্ষ্যও রয়েছে, তাই এ গ্রন্থ) ঐসব গ্রন্থের (সত্যতার চির) সংরক্ষক। (কেননা, ঐসব গ্রন্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ—এ বিষয়বস্তুটি কোরআনে চিরকাল সংরক্ষিত থাকবে। কোরআন যেহেতু এমন গ্রন্থ,) অতএব তাদের (অর্থাৎ আহলে-কিতাবদের) পারস্পরিক ব্যাপার—দিতে (যদি আপনার এজলাসে উপস্থিত হয়) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সত্য গ্রন্থ এসেছে, তা থেকে সরে গিয়ে তাদের (শরীয়ত বিরোধী) প্রবৃত্তির অনুসরণ (ভবিষ্যতেও) করবেন না ; (যেমন তাদের অনুরোধ ও আবেদন সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আপনি পরিষ্কার অস্বীকার করে এসেছেন। অর্থাৎ আপনার সিদ্ধান্ত খুবই সঠিক। সর্বদা এ সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। হে আহলে-কিতাবগণ ! এ কোরআনকে সত্য জানতে এবং এর ফয়সালা মেনে নিতে তোমরা অস্বীকার করছ কেন ? নতুন ধর্মের আগমন কি কোন আশ্চর্যের বিষয় ? ঐ ধারা তো পূর্ব থেকেই চলে আসছে) তোমাদের প্রত্যেকের (অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের) জন্য (ইতিপূর্বে) আমি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ তরীকত নির্ধারণ করেছিলাম। (উদাহরণত ইহুদীদের শরীয়ত ও তরীকত ছিল তওরাত আর খ্রিস্টানদের শরীয়ত ও তরীকত ছিল ইঞ্জীল। অতএব, উম্মতে-মুহাম্মদীর জন্য যদি শরীয়ত ও তরীকত কোরআনকে নির্ধারণ করা হয়, যার সত্যতা যুক্তির নিরিখে

প্রমাণিত, তবে একে অস্বীকার করছ কেন ?) আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা (সবার জন্য এক তরীকা রাখতে চাইতেন,) তবে (তা করারও শক্তি তাঁর ছিল যে,) তোমাদের সবাই (অর্থাৎ ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের একই শরীয়ত দিয়ে) একই উম্মত করে দিতেন (এবং নতুন শরীয়ত আগমন করত না, যা দেখে তোমরা পলায়নপর)। কিন্তু (স্বীয় রহস্যের কারণে তিনি) এরূপ করেন নি (বরং প্রত্যেক উম্মতের জন্য পৃথক পৃথক তরীকা দিয়েছেন) যাতে তোমাদের (প্রতি যুগে নতুন নতুন) যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের সবার (আনুগত্য প্রকাশের জন্য) পরীক্ষা নেন। (কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নতুন তরীকা দেখলেই পলায়নের মনোভাব ও বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু যারা বিশুদ্ধ বিবেকের অধিকারী এবং ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠাবান, তারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর স্বীয় মনকে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য করে। এটা নিঃসন্দেহে একটা বিরাট পরীক্ষা। অতএব, এজন্য যদি একই শরীয়ত হতো, তবে সে শরীয়তের সূচনাকালে যারা বিদ্যমান থাকত, তাদের পরীক্ষা অবশ্য হয়ে যেত, কিন্তু তাদের অনুগামী ও এ তরীকায় অভ্যস্ত অন্যান্য লোকের পরীক্ষা হতো না। কিন্তু এখন প্রত্যেক উম্মতের পরীক্ষা হয়ে গেছে। আরেক ধরনের পরীক্ষা এই যে, নিষিদ্ধ তরীকার প্রতি মানুষের লোভ সহজাত। একাধিক শরীয়তের আকারে এ পরীক্ষা অধিকতর প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। কারণ এ ক্ষেত্রে রহিত শরীয়তের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়। এ শরীয়তের আকারে গুনাহ্ থেকে নিষেধ করা যেত, কিন্তু এক্ষেত্রে সত্য-অসত্যের প্রশ্ন নেই। তাই পরীক্ষা তেমন প্রাণবন্ত হতো না। প্রত্যেক উম্মতের পূর্ববর্তী লোকরা বিশেষভাবে প্রথম ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। কাজেই উভয় ধরনের পরীক্ষার সমষ্টির সম্মুখীন হয় সবাই-পূর্ববর্তীরাও এবং পরবর্তীরাও। সুতরাং নতুন শরীয়ত আগমনের মধ্যে যখন এ রহস্য নিহিত,) অতএব (বিদ্বেশ ত্যাগ করে) কল্যাণকর বিষয়ের দিকে (অর্থাৎ কোরআনে উল্লিখিত ধর্মীয় বিশ্বাস, সৎকর্ম ও নির্দেশাবলীর দিকে) ধাবিত হও। (অর্থাৎ কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করে তদনুযায়ী জীবন যাপন কর। একদিন) তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের সবাইকে আবহিত করবেন, যে বিষয়ে তোমরা (সত্য দেদীপ্যমান হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে অনর্থক) মতবিরোধ করতে। (তাই এ অনর্থক মতবিরোধ ছেড়ে শত্যকে যা এখন কোরআনেই সীমাবদ্ধ, গ্রহণ করে নাও। আর (যেহেতু সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও আহলে-কিতাবরা আপনার কাছে মনমত মোকদ্দমা মীমাংসা করিয়ে নেওয়ার আবেদন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে, তাই তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য এবং এ কথা শুনিয়ে তাদেরকে চিরতরে নিরাশ করে দেওয়ার জন্য আমি (পুনরায়-) আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের (অর্থাৎ আহলে-কিতাবদের) পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে (যদি তা আপনার এজলাসে উপস্থিত হয়) প্রেরিত এ গ্রন্থ অনুযায়ী মীমাংসা করুন এবং তাদের (শরীয়ত বিরোধী) প্রবৃত্তির (ও ফরমায়েশের ভবিষ্যতেও) অনুসরণ করবে না। (যেমন এ পর্যন্ত করেন নি)। আর তাদের থেকে (অর্থাৎ তাদের এ বিষয় থেকে ভবিষ্যতেও পূর্বের ন্যায়) সতর্ক হোন-যেন তারা আল্লাহ্ প্রেরিত কোন নির্দেশ থেকে আপনাকে বিচ্যুত না করে (এরূপ সম্ভাবনা অবশ্য নেই। তবুও এ ব্যাপারে সজাগ থাকলেও সওয়াব পাওয়া যাবে।) অনন্তর (কোরআন সুস্পষ্ট ও তার ফয়সালা

সত্য হওয়া সত্ত্বেও) যদি তারা (কোরআন থেকে এবং আপনার কোরআনভিত্তিক ফয়সালা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চিত জানুন যে, তাদের কোন কোন অপরাধের জন্য আল্লাহ্ (দুনিয়াতেই) তাদেরকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন। আর কোন কোন অপরাধ হচ্ছে ফয়সালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। কোরআনকে সত্য বলে স্বীকার না করার শাস্তি পরকালে পাবে। কেননা, প্রথম অপরাধ যিম্মি হওয়ার পরিপন্থী এবং দ্বিতীয় অপরাধ ঈমান বিরোধী অপরাধের শাস্তি হয় পরকালে। সেমতে ইহুদীদের ঔদ্ধত্য ও অঙ্গীকার বিরোধিতা যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন তাদেরকে হত্যা, জেল, নির্বাসন ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়। এবং [হে মুহাম্মদ (সা) তাদের এসব কুকাণ্ড দেখেশুনে আপনি অবশ্যই ব্যথিত হবেন, কিন্তু আপনি বেশি চিন্তিত হবেন না ; কেননা] অনেক মানুষই তো (জগতে সর্বদাই) দুষ্কর্মী হয়ে থাকে। তবে কি তারা (কোরআনের ফয়সালা থেকে—যা নিঃসন্দেহ ন্যায়বিচারভিত্তিক মুখ ফিরিয়ে) জাহিলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে। (যা তারা ঐশী শরীয়তের বিপক্ষে নিজেরা রচনা করেছিল ? এ রুকূর পূর্ববর্তী দুটি ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ আয়াতের ভূমিকায় এর উল্লেখ হয়ে গেছে। অথচ সে ফয়সালা ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অর্থাৎ জ্ঞানী হয়ে জ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং অজ্ঞতা কামনা করা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে)। এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা কে উত্তম ফয়সালাকারী হবে ? (বরং তাঁর সমান ফয়সালাকারীও কেউ নেই। সুতরাং আল্লাহ্র ফয়সালা ছেড়ে অন্যের ফয়সালা কামনা করা মূর্খতা নয় তো কি? কিন্তু এ বিষয়টিও) বিশ্বাসী (ও ঈমানদার) সম্প্রদায়ের (ই) মতে। (কেননা, এ বিষয়টি বুঝতে হলে সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধি অপরিহার্য অথচ কাফিরদের মাথায় আর যাই থাক সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধি নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ অর্থাৎ আমি তওরাত গ্রন্থ অবতারণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তওরাতের শরীয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তওরাতের কোনরূপ মর্যাদাহানি করা হচ্ছে না, বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধি-বিধান পরিবর্তন করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। নতুবা তওরাতও আমারই প্রেরিত গ্রন্থ। এতে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতিও রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ

অর্থাৎ তওরাত অবতারণের কারণ ছিল এই যে, যত দিন তাঁর শরীয়তকে রহিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়গম্বর, তাঁদের প্রতিনিধি আল্লাহ্ ওয়ালা ও

আলিমরা সবাই এ তওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তন করবেন। এ বাক্যে পয়গম্বরদের প্রতিনিধিদের দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ رَبَّانِيُّوْنَ এবং দ্বিতীয় ভাগ اَحْبَارْ رَبَّانِیْ শব্দটি رب -এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্ ওয়ালা (আল্লাহ্‌ভক্ত)। احبار শব্দটি حبر -এর বহুবচন। ইহুদীদের বাকপদ্ধতিতে আলিমকে حبر বলা হতো। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌ভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহ্‌র জরুরী বিধি-বিধান সম্পর্কে অবশ্যই আলিমও হবেন। নতুবা ইল্‌ম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং আমল ব্যতীত কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌ভক্ত হতে পারে না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তিই আলিম, যে ইল্‌ম অনুযায়ী আমলও করে। পক্ষান্তরে যে আলিম আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও জরুরী ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকায় না। সে আল্লাহ্ ও রাসূলের দৃষ্টিতে মূর্খের চাইতেও অধম। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভক্তই আলিম এবং প্রত্যেক আলিমই আল্লাহ্‌ভক্ত। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে আল্লাহ্‌ভক্ত ও আলিমকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে একথা ব্যক্ত হয়েছে যে, একটির জন্য অপরটি জরুরী হলেও যার মধ্যে যে দিক প্রবল, সে অনুযায়ীই তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোযোগ বেশির ভাগ ইবাদত, আমল ও যিকিরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতটুকু দরকার ততটুকু ইল্‌ম হাসিল করে ক্ষান্ত হয়, তাকে 'রব্বানী' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ভক্ত বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশিদ, পীর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে জনগণকে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে বেশির ভাগ নিয়োজিত থাকে এবং ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ ছাড়া অন্যান্য নফল ইবাদতে বেশি সময় ব্যয় করে না তাকে حبر বা আলিম বলা হয়।

মোটকথা, এ বাক্যে শরীয়ত ও তরীকত এবং আলিম ও মাশায়েখের মৌলিক অভিন্নতাও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বৃত্তির দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, আলিম-সূফী দুটি সম্প্রদায় বা দুটি দল নয়, বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য। তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা বাহ্যত পৃথক পৃথক বলে মনে হয়।

এরপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ অর্থাৎ এসব পয়গম্বর ও তাঁদের উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ আলিম ও মাশায়েখ তওরাতের নির্দেশাবলী প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তওরাতের হিফাযত তাঁদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলেন এবং তাঁরা এ দায়িত্ব পালনের ওয়াদা অঙ্গীকারও করেছিলেন।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হলো যে, তওরাত একটি ঐশী গ্রন্থ, পথ প্রদর্শক, জ্যোতি আর আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম ও তাঁদের সাচ্চা প্রতিনিধিবর্গ হচ্ছেন মাশায়েখ ও ওলামা, যাঁরা এর হিফাযত করেছেন। অতঃপর বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে তাদের বক্রতা ও বক্রতার আসল

কারণ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছে ঃ তোমরা পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তওরাতের হিফাযত করার পরিবর্তে এর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছ। তওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী (সা)-এর আগমনের সংবাদ এবং ইহুদীদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। আয়াতে তাদের এ মারাত্মক ভ্রান্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ পার্থিব নাম-যশ ও অর্থলিপ্সাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। তোমরা রাসূলে করীম (সা)-কে সত্য নবী জেনেও তাঁর অনুসরণ করতে বিব্রত বোধ করছ। কারণ, এখন তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় বলে গণ্য হও এবং ইহুদী জনগণ তোমাদের পেছনেই চলে। এমতাবস্থায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয় যাবে। এছাড়া বড়লোকদের কাছ থেকে মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে তওরাতের নির্দেশ সহজ করে দেওয়াকে তারা পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার জন্য বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে অথবা শত্রু হয়ে যাবে। তাছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট অর্থকরি গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ প্রেরিত বিধানকে জরুরী মনে করে না এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাফির ও অবিশ্বাসী। এর শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব।

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে তওরাতের বরাত দিয়ে কিসাসের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ٠

অর্থাৎ আমি ইহুদীদের জন্য তওরাতে এ বিধান অবতারণ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ যখমেরও বিনিময় রয়েছে।

বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়রের একটি মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এজলাসে উত্থাপিত হয়েছিল। বনী নুযায়র গায়ের জোরে বনী কুরায়যাকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনী নুযায়রের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়া হবে এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনী নুযায়রের কোন ব্যক্তি বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে কিসাস নয়, শুধু রক্ত বিনিময় দেওয়া হবে। তাও বনী নুযায়রের রক্ত বিনিময়ের অর্ধেক।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ জাহিলিয়াতের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, স্বয়ং তওরাতের কিসাস ও রক্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্য নিজেদের মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এজলাসে উপস্থিত করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ–অর্থাৎ যারা আল্লাহ্-প্রেরিত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালিম, আল্লাহ্র বিধানে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহী। তৃতীয় আয়াতের প্রথমে হযরত ঈসা (আ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর ইঞ্জীল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটিও তওরাতের মতই হিদায়েত ও জ্যোতি।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জীলের অধিকারীদের ইঞ্জীলে অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উদ্ধত।

কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জীলের সংরক্ষক ঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতরণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ইঞ্জীলের সত্যায়ন করে এবং এদের সংরক্ষকও বটে। কারণ যখন তওরাতের অধিকারীরা তওরাতে এবং ইঞ্জীলের অধিকারীরা ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কোরআনই তাদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কোরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব গ্রন্থের উত্তরাধিকারী এবং অনুসরণের দাবিদাররা এদের রূপ এমন ভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাংশে মহানবী (সা)-কে তওরাতধারী ও ইঞ্জীলধারীদের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহ্-প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। যারা আপনার দ্বারা স্বীয় বৈষয়িক কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা করাতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হুঁশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদীদের কতিপয় আলিম মহানবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানেন আমরা ইহুদীদের আলিম ও ধর্মীয় নেতা। আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তা হলো এই যে, আপনার কওমের সাথে আমাদের একটি মোকদ্দমা রয়েছে, আমরা মোকদ্দমাটি আপনার কাছে উত্থাপন করব। আপনি এর ফয়সালা আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ্ তা'আলা হুযুর (সা)-কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন ঃ আপনি এদের মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ্-প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোন ফয়সালা দেবেন না এবং এরা মুসলমান হবে কি হবে না–এ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।

পয়গম্বরগণের বিভিন্ন শরীয়তের আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য ঃ আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, সহীফা ও শরীয়তসমূহও যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরীয়তের মধ্যে প্রভেদ

কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তকে রহিত করে দেয় কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا اٰتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ .

অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ রয়েছে। যদি আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং সবার জন্য একই গ্রন্থ ও একই শরীয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন নি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা ইবাদতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্য সর্বদা কান পেতে রাখে, নতুন নতুন গ্রন্থ ও শরীয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসাবে আঁকড়ে থাকে—এর বিপক্ষে আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না।

শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট তাৎপর্য। এর মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে ইবাদত ও দাসত্বের এ-রূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনুগত্য-অনুসরণকেই ইবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিকর ও তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলো উদ্দেশ্যও নয়, বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য। এ কারণেই যে সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সে সময়ে নামায পড়লে সওয়াব তো দূরের কথা, উল্টা পাপের বোঝাই ভারী হয়। দুই ঈদসহ বছরে পাঁচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এ সময়ে রোযা রাখা নিশ্চিত গুণাহ। ৯ই যিলহজ্জ ছাড়া অন্য কোনদিন কোন মাসে আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়ে দোয়া ও ইবাদত করা বিশেষভাব কোন সওয়াবের কাজ নয়। অথচ ৯ই যিলহজ্জ তারিখে এটি সর্ববৃহৎ ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতের অবস্থাও তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ ততক্ষণই তা ইবাদত এবং যখন ও যেখানে নিষেধ করা হয় তখন সেখানে তাই হারাম ও না-জায়েয হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব ইবাদত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, বরং যেসব জাতীয় প্রথাকে তারা ইবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতি তারা কর্ণপাত করে না। এ ছিদ্র পথেই বিদ'আত ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তে পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তা-ই। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতারণ করে মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন একটি কাজ

অথবা এক প্রকার ইবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেওয়া ঠিক নয়, বরং বিশুদ্ধ অর্থে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য।

এ ছাড়া শরীয়তসমূহের পার্থক্যের আর একটি বড় তাৎপর্য এই যে, জগতের প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক স্তরের মানুষের মন-মেজায ও স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন। কালের পরিবর্তন মানবস্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্য শাখাগত বিধান এক করে দেওয়া হয়, তবে মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই আল্লাহ্‌র রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এখানে 'নাসিখ' (রদকারী আদেশ) ও 'মনসূখ' (রদকৃত আদেশ)-এর অর্থ এরূপ নয় যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এল, তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রহিত করে দিলেন অথবা পূর্বে অসাবধানতা ও ভ্রান্তিবশত কোন নির্দেশ জারি করেছিলেন পরে হুঁশিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দিলেন। বরং শরীয়তসমূহে নাসিখ ও মনসূখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকীম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রে পর্যায়ক্রমে ঔষধ পরিবর্তন করেন। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিনদিন এ ঔষধ প্রয়োগ করার পর রোগীর মধ্যে এরূপ অবস্থা দেখা দেবে, তখন অমুক ঔষধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপত্র রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের ব্যবস্থাপত্রটি ভুল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে। বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রটি নির্ভুল ও জরুরী ছিল এবং পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সার-সংক্ষেপ ঃ

(১) প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদীদের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় মহানবী (সা) যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা তওরাতের শরীয়তানুযায়ী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তসমূহের বিধি-বিধানকে যদি কোরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন, ইহুদীদের মোকদ্দমায় কিসাসের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তওরাতেও ছিল এবং অতঃপর কোরআনও তা হুবহু বহাল রেখেছে।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে যখমের কিসাস সম্পর্কিত বিধান তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জারি করেছেন। এ কারণেই আলিমদের মতে বিগত শরীয়তসমূহের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলো আমাদের শরীয়তেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তওরাতের অনুসারীদের তওরাত অনুযায়ী এবং ইঞ্জীলের অনুসারীদের ইঞ্জীল অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথচ এ গ্রন্থদ্বয় ও তার শরীয়ত মহানবী (সা)-এর আগমনের সাথে সাথেই রহিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এই যে, তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলোর আজও অনুসরণ করা জরুরী।

(৩) আল্লাহ্‌র প্রেরিত বিধি-বিধান সত্য নয়—এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যত বিপরীত করা হয়, তবে তা অন্যায় ও পাপ।

(৪) ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম—বিশেষত আইন বিভাগে ঘুষ গ্রহণ করা অধিকতর হারাম।

(৫) আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গম্বর ও তাঁদের শরীয়ত মূলনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাদের আংশিক ও শাখাগত বিধি-বিধান এবং এ পার্থক্য বিরাট তাৎপর্যের উপর নির্ভরশীল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى
ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ (৫১) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ
فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ
بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ (৫২)
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ
إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ (৫৩) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ ۙ
أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ
وَٰسِعٌ عَلِيمٌ (৫৪) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ
يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ (৫৫) وَمَن يَتَوَلَّ

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾ يٰۤاَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ

الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا

اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا

هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

(৫১) হে মু'মিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালিমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। (৫২) বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে ঃ আমরা আশংকা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন—ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে। (৫৩) মুসলমানরা বলবে ঃ এরাই কি সেই সব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি ? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। (৫৪) হে মু'মিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে অচিরে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি দয়াশীল হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ—তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। (৫৫) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনবৃন্দ—যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। (৫৬) আর যারা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। (৫৭) হে মু'মিনগণ, আহলে-কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহ্কে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (৫৮) আর যখন তোমরা নামাযের জন্য আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত আয়াতসমূহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়বস্তু বিবৃত হয়েছে। এগুলোই মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মূল ভিত্তি।

(এক) মুসলমানরা অমুসলিমদের সাথে উদারতা, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, ন্যায়বিচার, অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার করতে পারে এবং করাও উচিত। কারণ, ইসলামের শিক্ষা তা-ই—কিন্তু তাঁদের সাথে এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করার অনুমতি নেই, যার ফলে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণসমূহ মিশ্রিত হয়ে যায়। এ প্রশ্নটিই 'অসহযোগ' নামে খ্যাত। (দুই) যদি কখনও কোথাও মুসলিমরা এ মৌলিক নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে অমুসলিমদের সাথে উপরোক্তরূপে মেলামেশা করে, তবে মনে করার কোন কারণ নেই যে, এতে ইসলামের কোনরূপ ক্ষতি হবে। কেননা, ইসলামের হিফাযত ও স্থায়িত্বের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। ইসলামকে কেউ ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না। মনে করুন, যদি কোন সম্প্রদায় শরীয়তের সীমা লংঘন করে ইসলামকেই পরিত্যাগ করে বসে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন, যারা ইসলামের মূলনীতি ও আইন প্রতিষ্ঠা করবে।

(তিন) যখন নেতিবাচক দিকটি জানা হয়ে গেল, তখন মুসলিমদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সাথেই হতে পারে। এ হচ্ছে উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ। এবার আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেখুন।

হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা (মুনাফিকদের মত) ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা (নিজেরাই) একে অপরের বন্ধু। (অর্থাৎ ইহুদীরা পরস্পর এবং খ্রিস্টানরা পরস্পর বন্ধু। উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধুত্ব সামঞ্জস্যের কারণেই হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য রয়েছে, কিন্তু তোমাদের সাথে কি সামঞ্জস্য ?) এবং (যখন জানা গেল যে, সামঞ্জস্যের কারণে বন্ধুত্ব হয়, তখন) তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে (বিশেষ কোন সামঞ্জস্যের দিক দিয়ে) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। (বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট, কিন্তু) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (এ বিষয়ের) জ্ঞানই দেন না, যারা (কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে,) নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে (অর্থাৎ বন্ধুত্বে মগ্ন থাকার কারণে বিষয়টি তাদের বুঝেই আসে না। যেহেতু তারা বিষয়টি বুঝে না,) অই (হে দর্শকবৃন্দ,) তোমরা এমন লোকদের, যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ রয়েছে দেখবে যে দৌড়ে গিয়ে তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করে; (কেউ তিরস্কার করলে বাহানাবাজি করে) বলে ঃ (তাদের সাথে আমাদের মেলামেশা আন্তরিক নয়, বরং আন্তরিকভাবে আমরা তোমাদের সাথেই আছি, শুধু একটি কারণে তাদের সাথে মেলামেশা করি। তা এই যে,) আমাদের আশংকা হয় যে, (কালের আবর্তনে) আমরাও না কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই-(যেমন দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন। এসব ইহুদী আমাদের মহাজন। তাদের কাছে ধার-কর্জ চাওয়া যায়। বাহ্যিক মেলামেশা বন্ধ করে দিলে প্রয়োজন মুহূর্তে আমরা বিপদে পড়ব। তারা বাহ্যত نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ

বাক্যের এ অর্থই বর্ণনা করত। কিন্তু মনে মনে ধারণা করত যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিররা জয়ী হয়ে গেলে প্রাণ রক্ষার জন্য তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখাই দরকার।) অতএব, নিকটবর্তী আশা (অর্থাৎ ওয়াদা) এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের (ঐ সব কাফিরদের বিরুদ্ধে) পরিপূর্ণ বিজয় দান করবেন (যাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব করে—যাতে মুসলিমদের চেষ্টাও সক্রিয় থাকবে) অথবা অন্য কোন বিষয় নিজের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে (প্রকাশ করবেন অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে) নির্দিষ্ট করে দেবেন, (যাতে মুসলিমদের চেষ্টা কোনভাবে সক্রিয় থাকবে না। উদ্দেশ্য এই যে, মুসলিমদের বিজয় এবং মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন দুটিই অচিরে হবে।) অতঃপর (তখন তারা) স্বীয় (পূর্ববর্তী) গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে (যে, হায় আমরা তো মনে করতাম, কাফিররাই জয়ী হবে, এখন দেখি ব্যাপার উল্টো হয়ে গেছে। একে তো নিজেদের মনোভাবের ভ্রান্ততার কারণে অনুতাপ হবে যা স্বাভাবিক, দ্বিতীয়ত অনুতাপ হবে মুনাফিকদের কারণে—যদ্দরুন আজ অপমানিত হয়েছে। উভয়বিধ অনুতাপই مَا أَسَرُّوا বাক্যে অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় অনুতাপ এ কারণে হবে যে, কাফিরদের সাথেও বন্ধুত্ব নিষ্ফল হলো এবং মুসলমানদের সাথেও সম্পর্ক তিক্ত হয়ে গেল। أَسَرُّوا مَا বাক্যের উপর যেহেতু বন্ধুত্ব নির্ভরশীল ছিল। তাই উপরোক্ত দুই অনুতাপ উল্লেখ করার দরুন তৃতীয় অনুতাপ আপনাআপনিই বোঝা যাচ্ছে। এবং (যখন ঐ বিজয়কালে তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন পরস্পর) মুসলমানরা (অবাক হয়ে) বলবে ঃ আরে এরাই কি তারা—যারা খুব জোরেশোরে (আমাদের সামনে) প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা (আন্তরিকভাবে) তোমাদের সাথে আছি (এখন তো অন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ) তাদের কৃতকর্মসমূহ (অর্থাৎ উভয়পক্ষের নিকট সাধু সাজার অপচেষ্টা) ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে (উভয় পক্ষ থেকেই) বিফল মনোরথ হয়েছে। (অর্থাৎ কাফিররা পরাজিত হওয়ার কারণে তাদের সাথেও বন্ধুত্ব নিষ্ফল হয়েছে এবং অপরদিকে মুসলমানদের সামনে মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাওয়ায় তাদের কাছেও সাধু সাজা কঠিন। অতএব, উভয় কুলই গেল।) হে বিশ্বাসীগণ, (অর্থাৎ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যারা বিশ্বাসী) তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি স্বীয় (এ) ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তবে তাতে (ইসলামের কোন ক্ষতি নেই; কেননা ইসলামের কাজ সম্পাদন করার জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা অচিরে (তাদের স্থলে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসবে; মুসলমানদের প্রতি দয়াশীল হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, (অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে) আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করবে এবং (ধর্ম ও জিহাদের ব্যাপারে) তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। (মুনাফিকদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তারা চুপিচুপি জিহাদের জন্য যেত কিন্তু আশংকা করত যে, আন্তরিক বন্ধু কাফিররা এতে তিরস্কার করবে; কিংবা ঘটনাক্রমে যদি বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেই জিহাদ হয়, তবে যে-ই দেখবে এবং শুনবে, সে-ই বলবে যে, এমন আপন লোকদের মারতে গিয়েছিলে ?) এগুলো (অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলী) আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ—তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত প্রশস্ত—(ইচ্ছা করলে সবাইকে এসব গুণ দান

করতে পারেন, কিন্তু) মহাজ্ঞানী (-ও বটে। তাই তাঁর জ্ঞানমতে যাকে দেওয়া সমীচীন তাকে দেন)। তোমাদের বন্ধু (অর্থাৎ যাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব রাখা উচিত, তারা হচ্ছেন) আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল (সা) এবং সে বিশ্বাসীবৃন্দ, যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত দান করে এবং (যাদের অন্তরে) নম্রতা বিরাজমান থাকে। (অর্থাৎ বিশ্বাস, চরিত্র, শারীরিক ও আর্থিক সৎকর্ম ইত্যাদি সব গুণে তারা গুণান্বিত।) এবং যে ব্যক্তি (উল্লিখিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী) আল্লাহ্, রাসূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, (সে আল্লাহ্র দলভুক্ত হয়ে যায় এবং) আল্লাহ্র দল অবশ্যই বিজয়ী (আর কাফিররা হলো পরাজিত। অতএব, পরাজিতকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা মোটেই শোভনীয় নয়)। হে বিশ্বাসীগণ, যারা তোমাদের পূর্বে (ঐশী) গ্রন্থ (অর্থাৎ তওরাত, ইঞ্জীল) প্রাপ্ত হয়েছে (অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদী), যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে রেখেছে (যা মিথ্যা প্রতিপন্ন করারই লক্ষণ), তাদেরকে এবং (এমনিভাবে) অন্যান্য কাফিরকে (ও; যেমন মুশরিকদের) বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (কেননা, আসল কারণ—কুফর ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এদের সবার মধ্যেই বিদ্যমান।) আর আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (অর্থাৎ বিশ্বাসী তো আছই। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজে নিষেধ করেন, তা করো না।) এবং (তারা যেমন ধর্মের মূলনীতি নিয়ে উপহাস করে, শাখা নিয়েও করে। সেমতে) তোমরা যখন নামাযের জন্য (আযানের মাধ্যমে) ঘোষণা কর, তখন তারা (তোমাদের) এ ইবাদতকে (নামায ও আযান উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত) উপহাস ও খেলা মনে করে (এবং) এর (অর্থাৎ এমন করার) কারণ এই যে, তারা সম্পূর্ণ নির্বোধ সম্প্রদায় (নতুবা সত্যকে তারা বুঝত এবং তা নিয়ে উপহাস করত না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না।

এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইহুদী অথবা খ্রিস্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সেই সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

শানে নযূল ঃ তফসীরবিদ ইবনে জারীর ইকরিমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না; বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। এবং কোন বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য করবে না, বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ইহুদীরা স্বভাবগত কুটিলতা ও ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বেশি দিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার

মুশরিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহবান জানিয়ে পত্র লিখল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী কুরায়যার এসব ইহুদী একদিকে মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের জন্য ও গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ গ্রহণ করতে না পারে। তখন ওবাদা ইবনে সামেত প্রমুখ সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে কিছু সংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশংকা অনুভব করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরিক ও ইহুদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল এ কারণেই বলল ঃ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হলো ঃ

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ .

অর্থাৎ অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফির বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল ঃ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশংকা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এর উত্তরে বলেন ঃ

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ .

অর্থাৎ এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, মুশরিক ও ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত এই যে, এরূপ হবে না, বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুক্কায়িত চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবি ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবে ঃ এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহ্র নামে কঠোর শপথ

করে বন্ধুত্বের দাবি করত ? আজ এদের সব লোকদেখানো ধর্মীয় কার্য কলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা বিজয় ও মুনাফিকদের লাঞ্ছনার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পর সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্য ধর্ম ইসলামের হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোন ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না—হতে পারে না। কারণ, এর হিফাযতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোন জাতিকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন, যারা ইসলামের হিফাযত ও প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করবে। আল্লাহ্ তা'আলার কাজ কোন ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান খড়-কুটাকেও কড়িকাঠের কাজে লাগাতে পারেন। অন্যথায় কড়ি-কাঠও পচেগলে মাটি হতে থাকে। কবি চমৎকার বলছেন ঃ

ان القادر اذا ساعدت

الحقت العاجز بالقادر .

অর্থাৎ ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন অক্ষম ও অকর্মণ্য ব্যক্তি দ্বারা সক্ষম ও বলিষ্ঠ ব্যক্তির কাজ উদ্ধার করে নেয়।

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলীও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এসব গুণের অধিকারীরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে প্রিয় ও মকবুল।

তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসবে। এ গুণই দুই অংশে বিভক্ত ঃ (এক) আল্লাহ্র সাথে তাদের ভালবাসা। একে কোন না কোন স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। কারও সাথে কারও স্বভাবজাত ভালবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয়, কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। উদাহরণত আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং মানুষের প্রতি মানুষের মনে তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নিয়ামতের ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহ্র প্রতি স্বভাবজাত ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসার ক্ষেত্রে বাহ্যত মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোন ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শোনানোরও কোন বাহ্যিক সার্থকতা নেই।

কিন্তু কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এ ভালবাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে

তাদের সাথে আল্লাহ্ তা আলার ভালবাসা অবশ্যম্ভাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ.

অর্থাৎ হে রাসূল, আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন।

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নত অনুসরণে অবিচল থাকা। এমন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, যে দল সুন্নত বিরোধী কাজকর্ম ও বিদ'আত প্রচার করে না, একমাত্র তারাই কুফর ও ধর্ম ত্যাগের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

উপরোক্ত জাতির দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ-এখানে اَذِلَّةٌ শব্দটি কামূস অভিধানের বর্ণনানুযায়ী ذليل কিংবা ذلول শব্দের বহুবচন হতে পারে। আরবী ভাষায় ذليل শব্দের অর্থ তা-ই, যা উর্দু ইত্যাদি ভাষায় প্রচলিত রয়েছে-অর্থাৎ 'হীন'। ذلول শব্দের অর্থ নম্র ও সহজসাধ্য; যাকে সহজে বশ করা যায়। তফসীরবিদগণের মতে আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

انازعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق .

অর্থাৎ আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি, যে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে।

মোটকথা, তারা মুসলমানদের সাথে স্বীয় অধিকার ও কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে اَعِزَّةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি عزيز এর বহুবচন। এর অর্থ প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর দীনের শত্রুদের মুকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না।

উভয় বাক্য একত্র করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের ভালবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্তা ও সত্তাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও দীনের খাতিরে নিবেদিত। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগতদের দিকে নয়; বরং তাঁর শত্রু ও অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সূরা ফাত্‌হে উল্লিখিত اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তুও তা-ই।

প্রথম গুণের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম ছিল বান্দার অধিকার ও কাজ-কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ তারা সত্য ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করার জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত ইবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য চতুর্থ গুণ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভৎসনারই পরওয়া করবে না।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমত, বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়ত, আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না–জেল-জুলুম, যখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লান বদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনাবিদ্রুপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারও ভর্ৎসনার পরওয়া না করে স্বীয় জিহাদ অব্যাহত রাখবে।

আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম অভ্যাসসমূহ আল্লাহ্ তা'আলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টা-চরিত্রের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারে না।

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না, বরং ইসলামের হিফাযত ও সমর্থনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী একটি দলকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন।

তফসীরবিদগণ বলেছেন ঃ এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহতকারী দলের জন্য একটি সুসংবাদ। অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু কিছু জীবাণু নবুয়তের সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু করেছিল, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর তা ঘূর্ণির আকারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের সেই দল, যারা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর ডাকে বজ্র-কঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ করে দেন।

ঘটনাগুলো ছিল এই ঃ সর্বপ্রথম মুসায়লামা কাযযাব মহানবী (সা)-এর সাথে নবুয়তে অংশীদারিত্বের দাবি করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌঁছে যে, সে মহানবী (সা)-এর দূতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে ঃ যদি দূতদেরকে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী না হতো, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম।

মুসায়লামা স্বীয় দাবিতে মিথ্যাবাদী ছিল। হুযুর (সা) তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন।

এমনিভাবে ইয়ামানে মুয্‌জাজ গোত্রের সর্দার আসওয়াদ আ'নাসী নবুওয়তের দাবি করে বসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে দমন করার জন্য ইয়ামানে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাত্রে তাকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওফাত পান। রবিউল আউয়াল মাসের শেষদিকে সাহাবায়ে-কিরামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে। বনী আসাদ গোত্রেও এমনি ধরনের আরেক ঘটনা ঘটে। তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদ নবুয়ত দাবি করে বসে।

উপরোক্ত তিনটি গোত্র হুযুরে-আকরাম (সা)-এর রোগ-শয্যায় থাকা অবস্থায়ই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে ইসলামী আইন অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে।

হুযূর (সা)-এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাঁধে অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মুকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবূ বকর (রা) সাহাবায়ে-কিরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। সাহাবায়ে-কিরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামী দেশটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে—এমন আশংকাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সিদ্দীকের অন্তরকে এ জিহাদের জন্য পাথরের মত মজবুত করে দিলেন। তিনি সাহাবায়ে-কিরামের সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জিহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারও মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন ঃ

"যারা মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জ্বিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একা এ জিহাদ চালিয়ে যাব।"

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন সাহাবায়ে-কিরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বাসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরি করে ফেললেন।

এ কারণেই হযরত আলী মুর্তযা (রা), হাসান বসরী (র), যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন দল আয়াতে কথিত জাতি হবে না; অন্যদের বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে-কিরামকে আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও এর বিরোধী নন। বরং নির্ভুল বক্তব্য এই যে, তাঁরা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করবে, তাঁরাও এ আয়াতের লক্ষণভুক্ত। মোটকথা সাহাবায়ে-কিরামের একটি দল খলীফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরি হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে একটি বিরাট বাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হলো। সেখানে মুসায়লামার দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত ওয়াহ্শী (রা)-এর হাতে নিহত হলো এবং তাঁর দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদের মুকাবিলায়ও হযরত খালিদ (রা)-ই গমন করলেন। তোলায়হা পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে।

সিদ্দীকী খিলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ আ'নাসীর হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয়বার্তা, যা চরম সংকট মুহূর্তে খলীফা লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য যাকাত অস্বীকারকারীদের মুকাবিলায় আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি রণাঙ্গনে সাহাবায়ে-কিরামকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন।

এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লিখিত فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ (নিশ্চয় আল্লাহ্ভক্তদের দলই বিজয়ী।) আল্লাহ্ তা'আলার এ উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর আরবে ধর্ম ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং এর মুকাবিলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তাঁরা হলেন হযরত আবূ বকর (রা) ও তাঁর সহকর্মী সহাবায়ে-কিরাম-তখন এ আয়াত থেকেই একথাও প্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব গুণ কেরাআন পাক বর্ণনা করেছে, তা সবই হযরত আবূ বকর (রা) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ—প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ভালবাসেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসেন।

তৃতীয়ত, তাঁরা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাফিরদের বেলায় কঠোর। চতুর্থত, তাঁদের জিহাদ নিশ্চিত রূপেই আল্লাহ্‌র পথে ছিল এবং এতে তাঁরা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করেন নি।

আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব গুণ, এগুলোর যথাসময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী জিহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টাতদবীর, শক্তি অথবা দলের জোরে অর্জিত হবে না, বরং এ সবই আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ। তিনিই যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন।

উপরোক্ত চার আয়াতে মুসলমানদের কাফিরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে প্রমাণিত সত্য হিসাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা ? এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা ও অতঃপর তাঁর রাসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বন্ধু ও সাথী সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, সবই ধ্বংসশীল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই সম্পর্ক, পৃথক নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথী ও আন্তরিক বন্ধু ঐসব মুসলমান সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে নয়—সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ۔

প্রথমত, তারা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামায পড়ে। দ্বিতীয়ত, স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করে। তৃতীয়ত, তারা বিনম্র ও বিনয়ী, স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্বিত নয়।

তৃতীয় বাক্য—وَهُمْ رَاكِعُوْنَ এ ركوع শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রুকূর অর্থ পারিভাষিক রুকূ, যা নামাযের একটি রোকন। يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ। এরপর وَهُمْ رَاكِعُوْنَ বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য মুসলমানদের নামাযকে অপরাপর সম্প্রদায়ের নামায থেকে ভিন্ন রূপে প্রকাশ করা। কারণ, ইহুদী ও খ্রিস্টানরাও নামায পড়ে, কিন্তু তাদের নামাযে রুকূ নেই। রুকূ একমাত্র ইসলামী নামাযেরই স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য। —(মাযহারী)

কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে 'রুকূ' শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ নত হওয়া, নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে আবূ হাইয়ান এবং কাশ্শাফ গ্রন্থে যামাখশারী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তফসীরে মাযহারী এবং বয়ানুল-কোরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ হবে এই যে, তারা স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্ব করে না, বরং বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাব।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এ বাক্যটি হযরত আলী (রা)-এর বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আলী (রা) নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি

রুকূতে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাইল। তিনি রুকূ অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে আংটি বের করে ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামায শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন মেটাবেন, এতটুকু দেরী করাও তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি সৎকাজে যে দ্রুততা প্রদর্শন করলেন, তা আল্লাহ্ তা'আলার খুব পছন্দ হয় এবং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তার মূল্য দেওয়া হয়।

এ রেওয়ায়েতের সনদ আলিম ও হাদীসবিদদের মতে সর্বসম্মত নয়। তবে রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এর সারমর্ম হবে এই যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বের যোগ্য তারাই হবে, যারা নামায ও যাকাতের পাবন্দী করে। বস্তুত তাদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত আলী (রা) এ বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من كنت مولاه فعلى مولاه অর্থাৎ আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আলীকে যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আপনি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন এবং আলীর সাথে যে শত্রুতা করে, আপনি তাকে শত্রু মনে করুন।

হযরত আলী (রা)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তর্দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ গোলযোগের ঘটনাবলী ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হযরত আলী (রা)-এর শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছে।

মোটকথা আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক। সাহাবায়ে কিরাম এবং সব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোন এক ব্যক্তির সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম বাকের (রা)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে কি হযরত আলী (রা)-কে বোঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনিও আয়াতের লক্ষণভুক্ত।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কোরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ্ রাসূল ও মুসলমানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বিজয় ও বিশ্বজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ .

এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহ্র দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহ্র দলই সবার উপর জয়ী হবে।

পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবার উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই পাহাড়ে মাথা ঠুকেছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলীফার বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সবার

বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর মুকাবিলায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় কায়সার ও কিস্‌রা অবতীর্ণ হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পর খলীফা ও মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহ্‌র এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলমানরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিরত রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে।

ষষ্ঠ আয়াতে তাকীদের জন্য রুকূর শুরু ভাগে বর্ণিত নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা তাদেরকে সাথী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। এরা দুই দলে বিভক্ত ঃ (এক) আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়, (দুই) সাধারণ কাফির ও মুশরিক সম্প্রদায়।

আবূ হাইয়্যান বাহ্‌রে-মুহীত গ্রন্থে বলেন ঃ كفار শব্দে আহ্‌লে-কিতাব সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবুও এখানে স্বতন্ত্রভাবে আহ্‌লে-কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, আহ্‌লে-কিতাবরা অন্যান্য কাফিরদের তুলনায় যদিও বাহ্যত ইসলামের নিকটবর্তী, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, তাদের কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমল ও তৎপরবর্তী আমলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে সাধারণ কাফিরদের সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। আহ্‌লে-কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

এর কারণ এই যে, আহলে-কিতাবদের গর্ব ছিল যে, তারা আল্লাহ্‌র ধর্ম ও ঐশী গ্রন্থের অনুসারী। এ গর্ব ও অহংকারই তাদেরকে সত্য ধর্ম গ্রহণে বিরত রেখেছে। মুসলমানদের সাথে তারাই বেশির ভাগ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। এ দুষ্টামির একটি ঘটনা সপ্তম আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا —অর্থাৎ মুসলমান যখন নামাযের আযান দেয়, তখন তারা হাসি-তামাসা করে। তফসীরে মাযহারীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ মদীনায় জনৈক খ্রিস্টান বসবাস করত। সে আযানে যখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বাক্যটি শুনত, তখন বলত اَحْرَقَ اللّٰهُ الْكَاذِبَ অর্থাৎ আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করুক।

পরিণামে তার এ বাক্যটিই তার গোটা পরিবারের পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এক রাতে সে যখন ঘুমিয়েছিল, তার চাকর প্রয়োজনবশত আগুন নিতে ঘরে প্রবেশ করল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ে সবার অজ্ঞাতে কোন একটি কাপড়ে গিয়ে পড়ল। এ সময় সবাই নিদ্রায় বিভোর, তখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং সবাই পুড়ে মারা গেল।

এ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ —অর্থাৎ সত্য ধর্মের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা নির্বোধ।

তফসীরে-মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন, অথচ সাংসারিক ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমত্তার জুড়ি নেই। এতে বোঝা যায় যে,

একজন লোক এক ধরনের কাজে চতুর ও বুদ্ধিমান এবং অন্য ধরনের কাজে নির্বোধ ও বোকা হতে পারে। এ বোকা হওয়ার কারণ দ্বিবিধ—হয় সে বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, না হয় তার বুদ্ধি এ ব্যাপারে অচল। কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি অন্য এক আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ۔

অর্থাৎ তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়গুলো খুব বুঝে, কিন্তু পরিণাম ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾ وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿٦١﴾

(৫৯) বলুন ঃ হে আহ্লে কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এ ছাড়া কি শত্রুতা যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহ্র প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। (৬০) বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্র কাছে ? যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। (৬১) যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান করেছে। তারা যা গোপন করত, আল্লাহ্ তা খুব জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে রাসূল,) আপনি বলে দিন ঃ হে আহ্লে-কিতাবগণ, তোমরা আমাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কি দোষ পাও যে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমাদের কাছে

প্রেরিত কোরআনের প্রতি এবং ঐ গ্রন্থের প্রতি (ও) যা (আমাদের) পূর্বে প্রেরিত হয়েছিল (অর্থাৎ তোমাদের গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীল)। এ সত্ত্বেও যে তোমাদের অধিকাংশ লোক ঈমান থেকে বিচ্যুত (অর্থাৎ তারা না কোরআনে বিশ্বাস করে, আর না তওরাত ও ইঞ্জীলে বিশ্বাস করে। যা তারা স্বীকার করে কেননা, এগুলোতে বিশ্বাস থাকলে এগুলোতে রাসূলুল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার যে নির্দেশ রয়েছে তাতে অবশ্যই বিশ্বাস থাকত। কোরআনকে অস্বীকার করাই সাক্ষ্য দেয় যে, তওরাত ও ইঞ্জীলেও তাদের বিশ্বাস নেই। এ হচ্ছে তোমাদের অবস্থা। কিন্তু আমরা এর বিপরীতে সব গ্রন্থেই বিশ্বাস করি। অতএব চিন্তা কর, দোষ আমাদের নয়–তোমাদের)। এবং আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, (যদি এতেও তোমরা আমাদের তরীকাকে মন্দ মনে কর, তবে এস) আমি কি (ভালমন্দ যাচাই করার জন্য) তোমাদেরকে এমন একটি তরীকা বলে দেব, যা (আমাদের) (এ তরীকা) থেকেও (যাকে তোমরা মন্দ মনে করছ) আল্লাহ্র কাছে শাস্তি পাওয়ার দিক দিয়ে অধিক মন্দ ঃ তা ঐ ব্যক্তিদের তরীকা যাদেরকে (এ তরীকার কারণে) আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং যাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন ও যাদেরকে বানর এবং শূকরে পরিণত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের পূজা করেছে। (এখন দেখে নাও এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ তরীকা মন্দ। সে তরীকাই মন্দ, যাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের পূজা হয় এবং যদ্দরুন এসব শাস্তি ভোগ করতে হয়, না ঐ তরীকা মন্দ, যা নির্ভেজাল তওহীদ ও পয়গম্বরদের নবুয়তের স্বীকৃতি ? নিশ্চয়ই এ যাচাইয়ের ফল এই হবে যে,) এমন ব্যক্তিবর্গ (যাদের তরীকা এইমাত্র উল্লেখ করা হলো,) আখিরাতে বাসস্থানের দিক দিয়েও (যা শাস্তি হিসাবে তারা প্রাপ্ত হবে) খুবই মন্দ। (কেননা এ বাসস্থান হচ্ছে দোযখ।) এবং (দুনিয়াতে) সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। (ইঙ্গিত এই যে, তোমরা আমাদেরকে দেখে উপহাস কর, অথচ তোমাদের তরীকাই উপহাসের যোগ্য। কেননা, এসব কুঅভ্যাস তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান। ইহুদীরা গো-বৎসের পূজা করেছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা [আ]-কে আল্লাহ্ রূপে গ্রহণ করেছে। অতঃপর তারা নিজেদের আলিম ও মাশায়েখকে আল্লাহ্র ক্ষমতা অর্পণ করেছে। এ কারণেই ইহুদীরা যখন শনিবার সম্পর্কিত নির্দেশ অমান্য করে, তখন আল্লাহ্র আযাব নেমে আসে এবং তাদেরকে বানর করে দেওয়া হয়। খ্রিস্টানদের অনুরোধে আসমান থেকে খাঞ্চা অবতীর্ণ হতে শুরু করে। এরপরও তারা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলে তাদেরকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। এরপর তাদের একটি বিশেষ মুনাফিক দলের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এরা মুসলমানের সামনে ইসলামী পরিচয় প্রকাশ করত, কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে ছিল ইহুদী।) এবং যখন এরা (অর্থাৎ মুনাফিকরা) তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফর নিয়েই (মুসলমানদের মজলিসে) এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থানও করেছে এবং তারা যা (অন্তরে) গোপন করছে আল্লাহ্ তা'আলা তা পরিজ্ঞাত রয়েছেন (তাই তাদের কপটতা কোন কাজেই আসবে না এবং কুফরের জঘন্যতম শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَكْثَرُكُمْ فَاسِقُوْنَ–বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে সম্বোধন করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলীর অনুসারী এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও কোরআন অবতরণের পর তারা তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কোরআন অনুসারে কাজকর্ম সম্পাদন করতে থাকে।

প্রচারকার্যে সম্বোধিত ব্যক্তির রেয়াত করা ঃ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ বাক্যে উদাহরণের ভঙ্গিতে আল্লাহ্র অভিশাপ ও ক্রোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে সম্বোধিত ব্যক্তিদেরই অবস্থা ছিল। কাজেই এ দোষ সরাসরি তাদের উপর আরোপ করে, তোমরা এরূপ বললেও চলত। কিন্তু কোরআন এ বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে বিষয়টিকে একটি উদাহরণের রূপ দিয়েছে। এতে পয়গম্বরসুলভ প্রচার কার্যের একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ বর্ণনাভঙ্গি এরূপ হওয়া চাই, যদ্দারা সম্বোধিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ
لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ
عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾

(৬২) আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালংঘনে এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়। তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে। (৬৩) দরবেশ ও আলিমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি এদের (ইহুদীদের) মধ্যে অনেককে দেখবেন, তারা দৌড়ে দৌড়ে পাপে, (অর্থাৎ মিথ্যায়) সীমালংঘনে এবং হারাম (মাল) ভক্ষণে পতিত হয়। বাস্তবিকই তাদের এ কাজ মন্দ। (এ ছিল সর্বসাধারণের অবস্থা। এখন বিশিষ্ট লোকদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে যে,) ধর্মীয় নেতা ও আলিমরা কেন তাদেরকে পাপকথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে (বাস্তব অবস্থা ও মাস'আলা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও) নিষেধ করে না? বাস্তবিক পক্ষে তাদের এ অভ্যাস খুবই খারাপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় ঃ প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদীর চারিত্রিক বিপর্যয় ও কর্মগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে।

যদিও সাধারণভাবে ইহুদীদের অবস্থা তাই ছিল তথাপি তাদের মধ্যে কিছু ভাল লোকও ছিল। কোরআন পাক তাদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করার জন্য كَثِيْرًا (অনেকে) শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালংঘন এবং হারাম ভক্ষণ اِثْم (পাপ) শব্দের অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয় প্রকার পাপের ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। —(বাহরে-মুহীত)

তফসীরে রূহুল মা'আনী প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়ার' শিরোনাম ব্যবহার করে কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, তারা এসব কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে।

এতে বোঝা যায়, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোন কাজ উপর্যুপরি করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে কোন রূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইহুদীরা কু-অভ্যাসে এ সীমায়ই পৌঁছে গিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে ঃ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ (তারা দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়)। সৎকর্মে পয়গম্বর ও ওলীগণের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁদের সম্পর্কেও কোরআন বলেছে ঃ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ তারা দৌড়ে দৌড়ে পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে।

কর্ম সংশোধনের পদ্ধতি ঃ সূফী-বুযুর্গ ও ওলী-আল্লাহ্গণ কর্ম সংশোধনের সবচাইতে অধিক যত্নবান। তাঁরা কোরআন পাকের এসব বাণী থেকেই এ মূলনীতি বেছে নিয়েছেন যে, মানুষ যেসব ভাল কিংবা মন্দ কাজ করে, আসলে সেগুলোর মূল উৎস হচ্ছে ঐসব গোপন কর্মক্ষমতা ও চরিত্র, যা মানুষের মজ্জায় পরিণত হয়। এ কারণেই মন্দ কর্ম ও অপরাধ দমন করার জন্য তাঁদের দৃষ্টি এসব সূক্ষ্ম গোপন বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তাঁরা এগুলো সংশোধন করে দেন। ফলে সব কাজকর্ম আপনা থেকেই সংশোধন হয়ে যায়। উদাহরণত কারও অন্তরে জাগতিক অর্থ লিপ্সা প্রবল হলে সে এর ফলে ঘুষ গ্রহণ করে, সুদ খায় এবং সুযোগ পেলে চুরি-ডাকাতি পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। সূফী-বুযুর্গরা এসব অপরাধের পৃথক পৃথক প্রতিকার না করে এমন ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করেন, যদ্দরুন এসব অপরাধের ভিত্তিই উৎপাটিত হয়ে যায় অর্থাৎ, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্পনায় একথা বদ্ধমূল করে দেন যে, এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী এবং এর আরাম-আয়েশ বিষাক্ত।

এমনিভাবে মনে করুন, কেউ অহংকারী কিংবা ক্রোধের হাতে পরাভূত। সে অন্যকে ঘৃণা ও অপমান করে এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে। সূফী বুযুর্গগণ এমন লোকের ক্ষেত্রে পরকালের চিন্তা এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ব্যবস্থা-পত্র প্রয়োগ করেন। ফলে উপরোক্ত মন্দ অভ্যাস আপনা থেকেই খতম হয়ে যায়।

মোটকথা, এ কোরআনী ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু কর্মক্ষমতা রয়েছে, যা মজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। এগুলো সৎ কর্মক্ষমতা হলে সৎকাজ আপনা আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে এগুলো মন্দ কর্মক্ষমতা হলে মন্দ কাজের দিকে মানুষ আপনা আপনি ধাবিত হয়। পূর্ণ সংশোধনের নিমিত্ত এসব কর্মক্ষমতার সংশোধন আত্যাবশ্যক।

আলিমদের কাঁধে সর্বসাধারণের কাজকর্মের দায়িত্ব ঃ দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদী পীর মাশায়েখ ও আলিমদেরকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা সাধারণ মানুষকে মন্দ কাজ থেকে কেন বিরত রাখে না? কোরআন পাকে এক্ষেত্রে দু'টি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি رَبَّانِيُّوْنَ এর অর্থ আল্লাভক্ত; অর্থাৎ আমাদের পরিভাষায় যাকে দরবেশ, পীর কিংবা মাশায়েখ বলা হয়। দ্বিতীয় শব্দ أَحْبَارُ ব্যবহার করা হয়েছে। ইহুদীদের আলিমদেরকে 'আহবার' বলা হয়। এতে বোঝা যায় যে, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধে'র মূল দায়িত্ব এ দু'শ্রেণীর কাঁধেই অর্পিত—(এক) পীর ও মাশায়েখ এবং (দুই) আলিমবর্গ। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ ربانيون বলে ঐ সব আলিমকে বোঝানো হয়েছে, যারা সরকারের পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও ক্ষমতাসীন এবং احبار বলে সাধারণ আলিমবর্গকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব শাসককুল ও আলিমকুল উভয়ের কাঁধে ন্যস্ত হয়ে যায়। অন্যান্য কতিপয় আয়াতেও এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

আলিম ও পীর-মাশায়েখের প্রতি হুঁশিয়ারি ঃ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ—অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে এসব মাশায়েখ ও আলিম অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে, জাতিকে ধ্বংসের দিকে যেতে দেখেও তারা বাধা দিচ্ছে না।

তফসীরবিদ আলিমগণ বলেন, প্রথম আয়াতে সর্বসাধারণের দুষ্কর্ম বর্ণিত হয়েছিল। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে মাশায়েখ ও আলিমদের ভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আরবী অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই فعل বলা হয়। عمل শব্দটি ঐ কাজকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং صنع ও صنعت শব্দ ঐ কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসাবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্ব-সাধারণের কু-কর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু عمل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ —আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলিমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য صنع শব্দ প্রয়োগে لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইহুদীদের মাশায়েখ ও আলিমরা জানত যে, তারা নিষেধ করলে সর্বসাধারণ শুনবে এবং বিরত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের উপঢৌকনের লোভে কিংবা মানুষের বদ ধারণার ভয়ে মাশায়েখ ও আলিমদের মনে সত্য সমর্থন করার কোন আবেদন জাগ্রত হতো না। এ নিস্পৃহতা সেসব দুষ্কর্মীর দুষ্কর্মের চাইতেও গুরুতর অপরাধ।

এর সারমর্ম এই যে, কোন জাতি অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হলে তাদের মাশায়েখ ও আলিমরা যদি অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারে যে, তারা নিষেধ করলে জাতি অপরাধ থেকে বিরত হবে, তবে এমতাবস্থায় কোন লোভ কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না রাখলে মাশায়েখ ও আলিমদের অপরাধ প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের চাইতেও গুরুতর হবে। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মাশায়েখ ও আলিমদের জন্য সমগ্র কোরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুঁশিয়ারি আর কোথাও নেই। তফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন ঃ আমার মতে মাশায়েখ ও আলিমদের জন্য এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ।– (ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর)

কারণ এই যে, আয়াত দৃষ্টে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও দুষ্কর্মীদের অপরাধের চাইতেও কঠোর হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, অপরাধের তীব্রতা তখনই হবে যখন মাশায়েখ ও আলিমরা অবস্থাদৃষ্টে অনুমানও করতে পারবেন যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শোনা ও মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদৃষ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না; বরং উল্টা তাদেরকে নির্যাতন করা হবে, তবে তাঁরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তরীকা তখনও এই যে, কেউ মানুক বা না মানুক, তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবেন এবং এ ব্যাপারে কারও নির্যাতন বা তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। যেমন, কয়েক আয়াত পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় মুজাহিদগণের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে এবং সত্য প্রকাশে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করে না।

মোটকথা, যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে আলিম মাশায়েখ এবং প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী পাপ কাজে বাধা দান করা; হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা নিষেধকারীর বিরুদ্ধে শত্রুতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান করা ফরয নয়, তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই। 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' সম্পর্কিত এ বিবরণ হাদীস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। নিজে সৎ কর্ম করা ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অপরকেও সৎ কর্মের প্রতি পথ প্রদর্শন করা এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে মাশায়েখ ও আলিমদের উপর ন্যাস্ত করে ইসলাম জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য একটি মূলনীতি স্থাপন করেছে। এটি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জাতি অনায়াসেই যাবতীয় দুর্নীতি থেকে পবিত্র হতে পারে।

উম্মতের সংশোধনের পন্থা ঃ ইসলামের প্রথমে ও পরবর্তী সমগ্র শতাব্দীগুলোতে যতদিন এ মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমুন্নত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলমানরা এ-কর্তব্য

পালনে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারন করেছে। আজ পিতামাতা ও গোটা পরিবার ধার্মিক ও শরীয়তের অনুসারী; কিন্তু সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মতিগতি, চিন্তাধারা ও কর্মধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। এ কারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কোরআন ও হাদীসে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। কোরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে-মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন জাতির মধ্যে যখন পাপ কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। –(বাহরে-মুহীত)

পাপ কাজে ঘৃণা প্রকাশ না করার কারণে সতর্কবাণী ঃ মালেক ইবনে দীনার (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক জনপদটি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতারা আরয করলেন ঃ এ জনপদে আপনার অমুক ইবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল ঃ তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও–কারণ, আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনও ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি।

হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ)-এর প্রতি ওহী আসে যে, আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎলোক এবং ষাট হাজার অসৎলোক। ইউশা (আ) নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন, অসৎলোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই আছে, কিন্তু সৎলোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর এল ঃ এ সৎলোকগুলোও অসৎলোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের সাথে পানাহার ও হাসি-তামাশায় যোগদান করত। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনও তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহ্নও ফুটে ওঠেনি।–(বাহরে-মুহীত)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ
بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ

اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ
اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ
مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ
وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৪) আর ইহুদীরা বলে ঃ আল্লাহর হাত অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। ওদেরই হাত বদ্ধ হোক। একথা বলার জন্য তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অবাধ্যতা ও কুফরী পরিবর্ধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করে দেন। তারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়। আল্লাহ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৬৫) আর যদি আহলে কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং আল্লাহ্-ভীতি অবলম্বন করত তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম। (৬৬) যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে ভক্ষণ করত। তাদের কিছু সংখ্যক লোক সৎপথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে। (৬৭) হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ন হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কবল থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদীদের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আরও কিছু বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। ঘটনা এই যে, কায়নুকা গোত্রের ইহুদী সর্দার নাব্বাশ ইবনে কায়স এবং কাখখাস আল্লাহ্ তা'আলার শানে 'কৃপণ' ইত্যাদি ধৃষ্টতামূলক শব্দ ব্যবহার করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –(লুবাব)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ইহুদীরা বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলার হাত বন্ধ হয়ে গেছে (অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ- তিনি কৃপণতা করতে শুরু করেছেন; প্রকৃতপক্ষে) তাদেরই হাত বন্ধ (অর্থাৎ বাস্তবে তারাই কৃপণতাদোষে দোষী অথচ ওরা আল্লাহকে দোষারোপ করে।) এবং একথা বলার কারণে তাদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। (এর ফলে তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত, বন্দী, নিহত ইত্যাদি শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরকালে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে এ দোষের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নেই।) বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। (অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত দাতা ও দয়ালু। কিন্তু যেহেতু তিনি বিজ্ঞও বটেন, তাই) তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। (সুতরাং ইহুদীরা যে অভাবে পড়েছে, এর কারণ কৃপণতা নয়-বরং এতে তাদেরকে তাদের কুফরীর মজা ভোগ করানোই উদ্দেশ্য।) এবং (ইহুদীদের কুফর ও অবাধ্যতার অবস্থা উদাহরণত এমন যে, তারা নিজেদের উক্তির অসারতা যুক্তি সহকারে শোনার পরও তাদের তা থেকে তওবা করার তওফীক হবে না বরং) আপনার কাছে আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু প্রেরণ করা হয়, তা তাদের অনেকেই অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। তা এভাবে যে, তারা তাও অস্বীকার করে। অতএব, আগে যে অবাধ্যতা ও কুফরী ছিল, সেই সাথে এই নতুন অস্বীকৃতি যোগ হওয়ার কারণে তা আরও বেড়ে গেল।) এবং (তাদের কুফরের কারণে যে অভিসম্পাত তথা রহমত থেকে দূর করে দেওয়ার শাস্তি ওদেরকে দেওয়া হয়েছে, তার জাগতিক লক্ষণাদির মধ্যে একটি এই যে,) আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে (ধর্মের ব্যাপারে) কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। (ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্নমুখী দল-উপদল রয়েছে, যারা একে অপরের শত্রু। সেমতে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে) যখনই ওরা (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে চায় (অর্থাৎ যুদ্ধ করার সংকল্প করে) আল্লাহ তা'আলা তা নির্বাপিত করে দেন। (অর্থাৎ তারা ভীত হয়ে যায়-যুদ্ধ করে ভীত হয়, না হয় পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত হতে পারে না। আর (যখন যুদ্ধ করতে সক্ষম হয় না, তখন অন্যভাবে শত্রুতার ঝাল মিটায়-) দেশে (গোপনে) অশান্তি উৎপাদন করে বেড়ায়। (যেমন, নও-মুসলিমদেরকে বিপথগামী করা, গোপনে একের কথা অপরের কাছে লাগানো, জনগণকে তওরাতের পরিবর্তিত বিষয়বস্তু শুনিয়ে ইসলাম থেকে বিমুখ করা-) এবং আল্লাহ্ তা'আলা (যেহেতু) অশান্তি উৎপাদনকারীদের ভালবাসেন না () অর্থাৎ ঘৃণার্হ মনে করেন, তাই এসব অশান্তি উৎপাদনকারীদের প্রচণ্ড শাস্তি দেবেন-দুনিয়াতে এবং আখিরাতে তো অবশ্যই) এবং আহলে-কিতাবরা (অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানরা) যদি (যেসব বিষয়ে তারা অবিশ্বাসী, যেমন রিসালতে-মুহাম্মদী, কোরআনের সত্যতা-এসব বিষয়ের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে যেসব বিষয় কুফর ও পাপ বলে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো থেকে তাকওয়া (অর্থাৎ সংযম) অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের সব (অতীত) মন্দ বিষয় (কুফর, শিরক প্রভৃতি গুনাহ কথায় হোক কিংবা কাজে হোক-ক্ষমা করে দিতাম এবং ক্ষমা করে) অবশ্যই তাদেরকে (সুখও) শান্তিপূর্ণ উদ্যানে (অর্থাৎ বেহেশতে) প্রবেশ করাতাম (এসব হচ্ছে পারলৌকিক মঙ্গল)। বস্তুত যদি তারা (উল্লিখিত ঈমান ও সংযম অবলম্বন করত, যাকে শব্দান্তরে এরূপ বলা যায় যে) তওরাত ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে [এখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে] প্রেরণ করা হয়েছে (অর্থাৎ

কোরআন) পুরোপুরি পালন করত—(রিসালতকে সত্য মনে করাও এর অন্তর্ভুক্ত এবং পরিবর্তিত ও রহিত নির্দেশাবলী এর বাইরে। কেননা, এসব গ্রন্থের সমষ্টি এগুলো পালন করতে বলে না, বরং নিষেধ করে।) তবে তারা (এ কারণে যে) উপর থেকে (অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতো) এবং নিচে থেকে (অর্থাৎ মাটি থেকে ফসল উৎপাদিত হতো) খুব স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করত (অর্থাৎ ভোগ) করত। এগুলো হচ্ছে ঈমানের পার্থিব কল্যাণ। কিন্তু তারা কুফরীতেই আঁকড়ে রয়েছে—ফলে অভাব-অনটনে গ্রেফতার হয়েছে। যদ্দরুন কেউ কেউ আল্লাহ্ তা'আলার শানে 'কৃপণতা' শব্দ প্রয়োগ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সব খ্রিস্টান ও ইহুদী সমান নয়, (সে মতে) তাদের (-ই) একটি সম্প্রদায় সৎপথের অনুগামী (-ও) রয়েছে। (যেমন ইহুদীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সহচরবৃন্দ এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে হযরত নাজ্জাশী ও তাঁর সকহর্মীবৃন্দ। কিন্তু এঁদের সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য।) এবং তাদের (অবশিষ্ট) অধিকাংশই এমন যে, তাদের কাজকর্ম খুবই মন্দ) কেননা, কুফরী ও শত্রুতার চাইতে মন্দ আর কি হবে ? হে রাসূল (সা)! আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ন হয়েছে, আপনি (লোকের কাছে) তা পৌছিয়ে দিন এবং যদি (অসম্ভবকে সম্ভব মনে করে নেওয়া হিসেবে) আপনি এরূপ না করেন, তবে (মনে করা হবে, যেন) আপনি আল্লাহ তা'আলার বার্তাও পৌছান নি। (কেননা, সমষ্টিগতভাবে এগুলো পৌছানো ফরয।সমষ্টিকে গোপন করলে যেমন ফরয পালন ব্যাহত হয়, তেমনি কিছু অংশকে গোপন করলেও ফরয পালন ব্যাহত হয়।) এবং (প্রচার কার্যে কাফিরদেরকে ভয় করবেন না, কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মানবজাতি থেকে (অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনাকে হত্যা ও খতম করে ফেলবে-এ বিষয় থেকে) রক্ষা করবেন। (আর) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে (এভাবে হত্যা ও খতম করে দেওয়ার জন্য আপনার দিকে) পথপ্রদর্শন করবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদীদের একটি ধৃষ্টতার জওয়াব : وَقَالَتِ الْيَهُودُ—আয়াতে ইহুদীদের একটি গুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা দরিদ্র হয়ে গেছেন।

ঘটনাটি ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা মদীনার ইহুদীদের বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন, কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহবান পৌছে, তখন পাষণ্ডরা সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের খাতিরে এ আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি হিসাবে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মূর্খদের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা বের হতে থাকে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ তা'আলা কৃপণ হয়ে গেছেন। এ ধরনের ধৃষ্ট উক্তির জবাবেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো ওদেরই বাঁধা হবে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে পরকালে আযাব এবং ইহকালে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার হাত সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। তাঁর দান চিরকাল অব্যাহত

রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে। কিন্তু তিনি ধনবান ও বিত্তশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটেন। তিনি বিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যয় করেন, যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিত্তশালী করে দেন এবং যাকে উপযুক্ত মনে করেন, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ এরা উদ্ধত জাতি। আপনার প্রতি অবতীর্ন কোরআনী নিদর্শনাবলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফরী এবং অবিশ্বাস আরও কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ওদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহসী হয় না এবং তাদের কোন চক্রান্তও সফল হয় না كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاهَا اللّٰهُ বাক্যে প্রকাশ্য যুদ্ধে ব্যর্থতা يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا বাক্যে গোপন চক্রান্তের ব্যর্থতার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালনে ইহকালীন কল্যাণ ঃ ৬৪তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলী এবং পয়গম্বরগণের বাণী দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনি এবং জাগতিক লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে সব কিছু বিস্মৃত হয়ে বসেছে। ফলে দুনিয়াতেও এরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। যদি এখনও তারা বিশ্বাস ও আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের বিগত সব গুনাহ মাফ করে দেব এবং নিয়ামতপূর্ণ উদ্যান দান করব।

আল্লাহর নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালন করার উপায় ঃ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ আয়াতে ঐ বিশ্বাস ও আল্লাহ-ভীতির কিছু বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, যদ্দারা জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ এই যে, ইহুদীরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক। এখানে عمل তথা পালন করার পরিবর্তে اقامت তথা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এসব গ্রন্থের আমল পুরোপুরি ও বিশুদ্ধ তখনই হবে, যখন তাতে কোন রকম ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি না থাকে। যেমন কোন স্তম্ভকে তখনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোন দিকে ঝুঁকে থাকবে না বরং সোজা দাঁড়ানো থাকবে।

এর সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদীরা আজও তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন পাকের নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে—ত্রুটিপূর্ণ এবং মনগড়া বিষয়াদিকে ধর্ম রূপে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নিয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে উপর নিচ সবদিক থেকে তাদের রিযিক বর্ষিত হবে। উপর নিচের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে রিযিক প্রাপ্ত হবে।—(তফসীরে কবীর)

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু পরকালের নিয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য আয়াতে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, ইহুদীদের কুকর্ম এবং তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলীর পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সংসার প্রীতি ও অর্থলিপ্সা। এ মোহই তাদেরকে কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা

সত্ত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করছিল। তাদের আশংকা ছিল যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মোড়লি শেষ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যে সব হাদিয়া ও উপঢৌকন পাওয়া যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এ আশংকা দূর করার জন্য এ ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাচ্চা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হয়ে গেলে তাদের জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ হ্রাস পাবে না, বরং আরও বেড়ে যাবে।

একটি সন্দেহ নিরসন : এ বিবরণ থেকে একথাও জানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি ঐসব ইহুদীর জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী (সা)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রকম নিয়ামত ও শান্তি প্রদান করা হতো। সেমতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে তারা এসব নিয়ামত পুরোপুরিভাবেই লাভ করেছে। যেমন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী ও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে সেই ইহকালে অবশ্যম্ভাবী রূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব-অনটনে পতিত হবে। কারণ, এ স্থলে কোন সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় বরং একটি বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে।

তবে সাধারণ নীতি হিসাবে ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ পবিত্র জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাব-অনটনের আকারেও। পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাই এর প্রমাণ। তাঁরা সবাই অগাধ ধন-দৌলত প্রাপ্ত হন নি, তবে পবিত্র জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছেন।

আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থ একথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের যেসব বক্রতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদীর অবস্থা নয় বরং مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ —অর্থাৎ তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছেন। তবে তাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতকারী। সৎপথের অনুসারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান ছিল, এরপর কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

প্রচার কার্যের তাকীদ ও রাসূল (সা)-এর প্রতি সান্ত্বনা : এ আয়াতদ্বয়ের এবং এর পূর্ববর্তী উপর্যুপরি দুই রুকূতে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বক্রতা, বিপথগামিতা, হঠকারিতা এবং ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষ হিসাবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়াও সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে মহানবী (সা) নিরাশ হয়ে পড়তেন কিংবা বাধ্য হয়ে প্রচারকার্যে ভাটা দিতে পারতেন। আর এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এরূপ হতে পারত যে, তিনি বিরোধিতা, শত্রুতা ও নির্যাতনের পরওয়া না করে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে তাঁকে শত্রুর পক্ষ থেকে নানা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হতো। তাই তৃতীয় আয়াতে এর দিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু অবতরণ করা হয়, তার সম্পূর্ণটাই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিন ; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভাল, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে

তাকে এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফিররা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আপনার দেখাশোনা করবেন।

আয়াতের—فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ-বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য, -এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশও পৌছাতে বাকি রাখেন, তবে আপনি পয়গম্বরীর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) আজীবন কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (সা)-এর একটি উপদেশ ঃ বিদায় হজ্জের প্রসিদ্ধ ভাষণটি একদিকে ছিল ইসলামের আইন এবং অপর দিকে দয়ার সাগর, পিতামাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল পয়গম্বরের অন্তিম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে-কিরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন ঃ ألا هل بلغت। শোন, আমি কি তোমাদেরে কাছে দীন পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সাহাবীরা স্বীকার করলেন, জী-হ্যা, অবশ্যই পৌঁছায়ে দিয়েছেন। এরপর বললেন ঃ তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। তিনি আরও বললেন ঃ فليبلغ الشاهد الغائب। অর্থাৎ এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। অনুপস্থিত বলে দুই শ্রেণীর লোককে বোঝানো হয়েছে ঃ (এক) যারা দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না। (দুই) যারা তখন পর্যন্ত জন্মগ্রহণই করেনি। তাদের কাছে পয়গাম পৌছানোর পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন।

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে-কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ও হাদীসকে আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট আমানতের ন্যায় অনুভব করেছেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যদি কোন বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ বিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা না করতেন; তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তা দু'চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে দিয়েছেন, যাতে এ আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। সহীহ বুখারীতে হযরত মুয়ায (রা)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اخبر به معاذ عند موته تاثما অর্থাৎ এ আমানত না পৌছানোর কারণে গুনাহগার হওয়ার ভয়ে হযরত মুয়ায (রা) হাদীসটি মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেছেন। وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যত বিরোধিতাই করুক, শত্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসাবে সাধারণভাবে মহানবী (সা)-এর সাথে সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাঁকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। কারণ, এ দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেন।

হযরত হাসান (রা) বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ প্রচারকার্যের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, চতুর্দিক থেকে হয়ত সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা করবে। অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন ভয়ভীতি দূর হয়ে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। -(তফসীরে -কবীর)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এর প্রচারকার্যে কেউ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জিহাদে সাময়িকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থী নয়।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ
أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

(৬৮) বলে দিন ঃ হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত তোমরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধিই পাবে। অতএব, এ কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না। (৬৯) নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী এবং খ্রিস্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

যোগসূত্র ঃ পূর্বে আহলে-কিতাবদের ইসলামের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের বর্তমান তরীকা, যা সত্য বলে তারা দাবি করে আল্লাহ তা'আলার কাছে তা অসার; মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং মুক্তি ইসলামের উপরই নির্ভরশীল। এতদসত্ত্বেও তাদের কুফরকে আঁকড়ে থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য সান্ত্বনার বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। মাঝখানে বিশেষ সম্পর্ক ও প্রয়োজন হেতু প্রচার কার্যের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (এসব ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে) বলুন ঃ হে আহলে-কিতাবগণ। তোমরা কোন পথেই নও, (কেননা, অগ্রহণীয় পথে থাকা পথহীন হওয়ারই নামান্তর) যে পর্যন্ত তোমরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ (এখন) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে, (অর্থাৎ কোরআন) তারও পুরোপুরি অনুসরণ না করবে। এর অর্থ উৎসাহ প্রদান এবং কল্যাণসমূহ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।) এবং [হে মুহাম্মদ (সা), যেহেতু তাদের অধিকাংশই নিন্দনীয়, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, তাই এটা] অবশ্যই (যে,) যে বিষয় আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার কাছে প্রেরিত হয় তা তাদের অনেকেরই ঔদ্ধত্য ও কুফর-বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় (এবং এতে আপনার দুঃখিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু যখন জানা গেল যে, তারা বিদ্বেষপরায়ণ) অতএব, আপনি এসব কাফিরের (এ অবস্থার) জন্য দুঃখিত হবেন না। এটা সুনিশ্চিত যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী সাবেয়ী, খ্রিস্টান (তাদের মধ্যে) যে আল্লাহ্র প্রতি (অর্থাৎ তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি) এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং (শরীয়তের আইন অনুযায়ী) সৎকর্ম করে এমন লোকদের (পরকালে) কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আহলে-কিতাবদের প্রতি শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ ঃ প্রথম আয়াতে আহলে কিতাব, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,-যদি তোমরা শরীয়তের নির্দেশাবলী প্রতিপালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামী শরীয়ত অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধুতা ও ক্রিয়াকর্ম পণ্ডশ্রম মাত্র। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে একটি সৃষ্টিগত মর্যাদা দান করেছেন; অর্থাৎ তোমরা পয়গম্বরদের বংশধর। দ্বিতীয়ত তওরাত ও ইঞ্জীলের শিক্ষাগত মর্যাদাও তোমাদের আয়ত্তাধীন; তোমাদের মধ্যে অনেক সাধু ব্যক্তিও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে। কিন্তু এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তখনই হবে, যখন তোমরা ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবে। এছাড়া কোন সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার কোনটিতেই তোমাদের মুক্তি আসবে না।

এ আয়াত থেকে মুসলমানরাও নির্দেশ লাভ করেছে যে, শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ব্যতীত সাধুতা, আধ্যাত্মিকতা, চেষ্টা-সাধনা, অন্তর্দৃষ্টি লাভ, ইলহাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিলাভ করা যাবে না।

এ আয়াতে শরীয়ত অনুসরণের জন্য তিনটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ প্রথম তওরাত, দ্বিতীয় ইঞ্জীল, যা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কাছে পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তৃতীয় وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ – অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে।

সাহাবা ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর মর্ম কোরআন পাক, যা খ্রিস্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়সহ সব উম্মতের জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনের আনীত বিধি-বিধানগুলো

বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণরূপে পালন না করবে, সে পর্যন্ত তোমাদের বংশগত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য হবে না।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে তওরাত ও ইঞ্জীলের মত কোরআনেরও সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। এর তাৎপর্য কি ? সম্ভবত এতে কতিপয় হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমাকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার কোরআন দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যান্য তত্ত্বকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। এগুলোকে এক দিক দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। হাদীসের ভাষা এরূপঃ

الا انى اوتيت القرأن ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وان ما حرم رسول الله ﷺ كما حرم الله .

"শোন, আমাকে কোরআন দেওয়া হয়েছে এবং তৎসহ অনুরূপ আরো কিছু। ভবিষ্যতে এমন হবে যে, কোন তৃপ্ত ও আরামপ্রিয় ব্যক্তি আমার কেদারায় বসে বলাবলি করবে যে, তোমাদের জন্য কোরআনই যথেষ্ট। এতে যা হালাল আছে, তাকেই হালাল মনে কর এবং এতে যা হারাম আছে, তাকেই হারাম মনে কর। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, আল্লাহর রাসূল যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহর হারাম করা বস্তুর মতই হারাম।"—(আবূ-দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী)।

শরীয়তের বিধান তিন প্রকার ঃ স্বয়ং কোরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় ঃ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোন কথা স্বীয় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর ওহীর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, পরিণামে সে ইজতিহাদ ও ওহীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন, সেগুলো তিন প্রকার ঃ (এক) যেসব বিধান কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। (দুই) যেসব বিধান সুস্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লিখিত নেই, বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (তিন) যেসব বিধান তিনি স্বীয় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন, অতঃপর এর বিরুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি।

উপরোক্ত তিন প্রকার বিধানই অবশ্য পালনীয় এবং وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত।

সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই আলোচ্য আয়াতে কোরআনের সংক্ষিপ্ত নামের পরিবর্তে وما انزل اليكم من ربكم দীর্ঘ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআনে যা স্পষ্টত উল্লিখিত আছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যা দিয়েছেন, সবই অপরিহার্য ও অবশ্য পালনীয় বিধান।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন-এ তিনটি গ্রন্থের নির্দেশাবলী পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ এগুলোর একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে। ইঞ্জীল তওরাতের কোন কোন বিধানকে এবং কোরআন তওরাত ও ইঞ্জীলের বিধানকে রহিত করেছে। এমতাবস্থায় তিনটির সমষ্টিকে পালন করা কিভাবে সম্ভবপর হবে।

এর জওয়াব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ পরবর্তীকালে আগমনকারী গ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থের যেসব বিধানকে পরিবর্তন করেছে, সেসব পরিবর্তিত বিধান পালন করাই উভয় গ্রন্থ পালন করার নামান্তর। রহিত বিধান পালন করা উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

মহানবী (সা)-এর প্রতি একটি সান্ত্বনা ঃ উপসংহারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে ঃ আহলে-কিতাবদের অনেকেই আমার দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের দ্বারা উপকৃত হবে না। বরং তাদের কুফর ও ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে। অতএব, আপনি এতে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকম্পাশীলও হবেন না।

চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি ঈমান, সৎকর্মের আহবান এবং পরকালের মুক্তির ওয়াদা ঃ দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহবান জানিয়ে সেজন্য পরকালের মুক্তির ওয়াদা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ মুসলমান, দ্বিতীয়ত, اَلَّذِيْنَ هَادُوْا অর্থাৎ ইহুদী, তৃতীয়ত, صَابِئُوْنَ এবং চতুর্থত, نَصَارٰى এদের মধ্যে তিনটি জাতি–মুসলমান, ইহুদী ও খ্রিস্টান সর্বজনপরিচিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান। সবিয়ূন অথবা সাবেয়া নামে আজকাল পৃথিবীতে কোন প্রসিদ্ধ জাতি নেই। এ কারণেই এদের চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তফসীরবিদ ইবনে কাসীর হযরত কাতাদার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সবিয়ূন হলো তারা যারা ফেরেশতাদের ইবাদত করে, কিবলার উল্টোদিকে নামায পড়ে এবং দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ যবুর পাঠ করে।

কোরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যত এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, কোরআন মজীদে চারটি ঐশী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে ঃকোরআন , ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত। আয়াতে এ গ্রন্থ চতুষ্টয়ের অনুসারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুর একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহকারে সূরা-বাক্বারার সপ্তম রুকূতে বর্ণিত হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

এতে সহজবোধ্যতার কারণে কিছু শব্দকে আগেপিছে করা হয়েছে। এছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাফল্য সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল ঃ উভয় আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারও বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোন মূল্য নেই। যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থাক আমার কাছে প্রিয় বলে গণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীলেও এরই নির্দেশ রয়েছে এবং কোরআন পাক শুধুমাত্র এ উদ্দেশেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কোরআন অবতরণ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুরের অনুসরণ বিশুদ্ধ হতে পারে না। অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা মুসলমান হবে, তারাই পরকালে মুক্তি ও সওয়াবের অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন হয়েছে যে, এরা কুফর ও পাপের পথে থেকে এ যাবত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব হীন চক্রান্ত করেছে মুসলমান হওয়ার পর এদের পরিণাম কি হবে? আয়াতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, অতীত সব গুনাহ ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা শঙ্কিত ও দুঃখিত হবে না।

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে মুসলমানদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা, আয়াতে যে স্তরের ঈমান ও আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ স্তরের প্রতি যাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে শুধু তাদের উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বোঝা যাবে। কোন শাসনকর্তা অথবা বাদশাহ এরূপ স্থলে বলে থাকেন ঃ আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী, যে-ই আনুগত্য করবে সেই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই জানা যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছে। যে বিরোধী আসলে তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, অনুগতদের প্রতি আমার যে কৃপাদৃষ্টি তা কোন বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যদি বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ কৃপা অনুগ্রহের অধিকারী হবে।

উপরোক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অংশ তিনটি ঃ আল্লাহ্ প্রতি বিশ্বাস, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং সৎকর্ম।

রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই ঃ এ আয়াতে ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। এ আয়াত সে ক্ষেত্রও নয় ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তৎপ্রতি আহবান জানানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে রাসূল অথবা রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত না হওয়ার কোন সামান্যতম জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনরূপ সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কোরআন ও তার শত শত আয়াতে রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টোক্তিতে পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূল ও রাসূলের বাণীর প্রতি

পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোন ঈমান ও সৎকর্মই গ্রহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল কোন-না-কোন উপায়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কোরআনে অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রিসালত উল্লিখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে, "প্রত্যেক বিজ্ঞ ইহুদী, খ্রিস্টান এমনকি মূর্তিপূজারী হিন্দু থাকা অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তবে পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারে—পারলৌকিক মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করা কোন জরুরী বিষয় নয়।" (নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে কোরআন পাঠের শক্তি এবং কোরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কোরআনী স্পষ্টোক্তি দ্বারা এ ভিভ্রান্তি দূর করতে খুব বেশি বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। যারা কোরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক ভ্রান্তি অনায়াসে বুঝতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লিখিত হলো।

ঈমানে মুফাসসালের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারার শেষভাগে কোরআনের ভাষা এরূপঃ

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

সবাই বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি এভাবে যে, তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে আমরা কোনরূপ পার্থক্য করি না।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে ঈমানের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে এ কথাও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন একজন অথবা কয়েকজন পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কখনও মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং সমস্ত পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই শর্ত। যদি একজন রাসূলও বিশ্বাস থেকে বাদ পড়েন, তবে এরূপ ঈমান আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا . اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا .

"যারা আল্লাহ্ এবং রাসূলদের অস্বীকার করে, আল্লাহ্ এবং রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় (অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না) এবং যারা ইসলাম কুফরের মধ্যে অন্য কোন রাস্তা করে নিতে চায়, তবে বুঝে নাও যে, তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফির।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى অর্থাৎ "আজ মূসা (আ) যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।"

অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মুক্তি পাবে—এরূপ বলা কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ নয় কি ?

এ ছাড়া যে কোন যুগে যে কোন ধর্ম পালন করাই যদি মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে শেষ নবী (সা)-এর আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণ এবং এক শরীয়তের পর অন্য শরীয়ত প্রেরণ করা অর্থহীন। প্রথম রাসূল যে শরীয়ত ও যে গ্রন্থ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তা-ই যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য রাসূল ও গ্রন্থ প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল ? বড়জোর এমন একদল লোক থাকাই যথেষ্ট হতো, যারা সেই শরীয়ত ও গ্রন্থের হিফাযত করতেন এবং তা পালন করতে ও করাতে সচেষ্ট হতেন—সাধারণভাবে যা প্রত্যেক উম্মতের আলিমরা করে থাকেন।

এমতাবস্থায় কোরআন পাকের এ উক্তির কি মানে হয় যে, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি শরীয়ত ও বিশেষ পথ নির্ধারণ করেছি ?

এরপর এর কি বৈধতা থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ রিসালত ও কোরআনে অবিশ্বাসী ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য জাতির সাথে শুধু প্রচারযুদ্ধই করেন নি, বরং তরবারির যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছেন ? ঈমানদার ও আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য যদি শুধু আল্লাহ্র প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট হতো, তবে বেচারা ইবলীস কোন পাপে বিতাড়িত হলো ? আল্লাহ্র প্রতি কি তার বিশ্বাস ছিল না, কিংবা সে কি পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিল? সে তো ক্রোধান্বিত অবস্থায় اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ। (পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত) বলে পরকালে বিশ্বাসী হওয়ার স্বীকারোক্তি করেছিল।

বাস্তব সত্য এই যে, এ বিভ্রান্তিটি হচ্ছে ঐসব লোকের ভ্রান্ত মতবাদের ফসল, যারা মনে করে যে, দীন বিজাতিকে উপঢৌকন হিসাবে দেওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে বিজাতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অথচ কোরআন পাক খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, অমুসলমানদের সাথে উদারতা, সহানুভূতি, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, মানবতা ইত্যাদি সবকিছুই করা দরকার, কিন্তু ধর্মের চতুঃসীমার পুরোপুরি সংরক্ষণ এবং এর সীমান্তের দেখাশুনার দায়িত্ব উপেক্ষা করে নয়।

কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রাসূলের প্রতি বিশ্বাস একেবারেই উল্লেখ করা না হতো, তবুও অন্য যেসব আয়াতে বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সে আয়াতগুলোই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, স্বয়ং এ আয়াতেও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ কোরআনের পরিভাষায় 'আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস' বললে সে বিশ্বাসই ধরতে হবে যাতে আল্লাহ্র নির্দেশিত সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। কোরআনের এ পরিভাষা নিম্নোক্ত বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে ঃ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا অর্থাৎ সাহাবায়ে-কিরামের বিশ্বাস যেরূপ ছিল, একমাত্র সেরূপ বিশ্বাসই 'আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস' নামে গণ্য হওয়ার যোগ্য। সাহাবায়ে-কিরামের বিশ্বাসের বড় স্তম্ভই যে 'রাসূলের প্রতি বিশ্বাস' ছিল—একথা কারও অজানা নয়। তাই مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শব্দের মধ্যে রাসূলের প্রতি বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ
رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾
وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟
وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

(৭০) আমি বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যারোপ করত এবং অনেককে হত্যা করে ফেলত। (৭১) তারা ধারণা করেছে যে, কোন অনিষ্ট হবে না। ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তওবা কবূল করলেন। এরপরও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। আল্লাহ্ দেখেন, তারা যা কিছু করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি বনী ইসরাইলের কাছ থেকে (প্রথমে তওরাতের মাধ্যমে সব পয়গম্বরকে সত্য জানার এবং তাদের আনুগত্যের) অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং (এ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য) তাদের কাছে অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। (কিন্তু তাদের অবস্থা ছিল এই যে) যখনই তাদের কাছে কোন পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে আগমন করতেন, যা তাদের মনঃপূত নয়, তখনই (তারা তাদের বিরোধিতা করত) তাদের এক দলের প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং অন্য দলকে (নির্বিবাদে) হত্যাই করে ফেলত। আর (প্রত্যেক বার প্রত্যেক দুষ্কৃতির পর যখন কিছুদিনের অবকাশ দেওয়া হয় তখন) তারা এ ধারণাই করে যে, কোন শাস্তিই হবে না। এতে (অর্থাৎ এ ধারণার কারণে) তারা আরও অন্ধ ও বধির (-এর মত) হয়ে গেল (ফলে পয়গম্বরদের সত্যতার প্রমাণাদি দেখল না এবং তাঁদের কথাবার্তাও শুনল না)। অতঃপর (কিছুদিন অতিবাহিত হলে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি (অনুকম্পাসহ) মনোনিবেশ করলেন (অর্থাৎ অন্য একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন যে, এখনও সৎপথে আসে কি না, কিন্তু) এরপর (সবার না হলেও) তাদের অধিকাংশই (পূর্ববৎ) অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (এসব) কাজকর্ম প্রত্যক্ষকারী। (অর্থাৎ তাদের ধারণা ভ্রান্ত ছিল। সময়ে সময়ে তাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের রীতিনীতি তা-ই ছিল। এখন আপনার সাথেও সেই মিথ্যারোপ ও বিরোধিতার ভূমিকাই পালন করছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার ভঙ্গ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ অর্থাৎ বনী ইসরাইলের কাছে তাদের রাসূল যখন কোন নির্দেশ নিয়ে আসতেন যা তাদের রুচি বিরুদ্ধ হতো, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহ্র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করত এবং পয়গম্বরদের মধ্যে কারও প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাউকে হত্যা করত। এটি ছিল আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এতসব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকত। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের কোন সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং নির্যাতন ও বিদ্রোহের কুপরিণাম কখনও সামনে আসবে না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহ্র নিদর্শন ও তাঁর হুঁশিয়ারি থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গর্হিত কাজ তা করতে থাকে। এমনকি, কতক পয়গম্বরকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বাদশাহ্ বখতে-নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে বখতে-নসরের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্ তাদের সে তওবা কবূল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুষ্কৃতিতে মেতে ওঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। তারা হযরত ঈসা (আ)-কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। —(ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي
إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ
اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا
عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ
إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ

انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

(৭২) তারা কাফির, যারা বলে ঃ মরিয়ম-তনয় মসীহ্-ই আল্লাহ্ ; অথচ মসীহ্ বলেন ঃ হে বনী ইসরাইল, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই (৭৩) নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে ঃ আল্লাহ্ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (৭৪) তারা আল্লাহ্র কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ্ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭৫) মরিয়ম-তনয় মসীহ রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন; আর তাঁর জননী একজন পরম সত্যবাদিনী। তাঁরা উভয়ই খাদ্য আহার করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্য কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টো কোন দিকে যাচ্ছে। (৭৬) বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত কর, যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না ? অথচ আল্লাহ্ সব শোনেন, জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় তারা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে, মরিয়ম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ (অর্থাৎ উভয়ে এক ও অভিন্ন) অথচ (হযরত) মসীহ্ স্বয়ং বলেছিলেন ঃ হে বনী ইসরাইল, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর–যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। (এ উক্তিতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্র প্রতিপালিত ও বান্দা ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাকে উপাস্য বলা 'বাদী নীরব' সাক্ষী সরব' এর মত ব্যাপার নয় কি ?) নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে (আল্লাহ্তে কিংবা আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্যে) অংশীদার স্থির করে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দেন এবং চিরকালের জন্য তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। আর এরূপ অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (যে তাদেরকে দোযখ থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে পৌঁছাতে পারে। আল্লাহ এবং মসীহ্ উভয়েই এক–এরূপ বিশ্বাস করা যেমন কুফর, তেমনি ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করাও কুফর। সুতরাং) নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে আল্লাহ্ তা'আলা তিনের (অর্থাৎ তিন উপাস্যের) অন্যতম–অথচ এক (সত্য) উপাস্য ছাড়া আর কোন (সত্য) উপাস্য নেই। (দুইও নেই তিনও নেই। এ বিশ্বাস যখন কুফর ও শিরক, তখন إِنَّهُ مَن

يُشْرِكْ বাক্যে যে শাস্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা এখানেও প্রযোজ্য হবে।) এবং যদি এরা (অর্থাৎ উভয় প্রকার বিশ্বাসী লোকেরা) স্বীয় (কুফরী) বাক্য থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে (বুঝে রাখুক) যারা তাদের মধ্যে কাফির থাকবে, তাদের উপর (পরকালে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। এরা কি (একত্ববাদের বিষয়বস্তু ও শাস্তিবাণী শুনে) তবুও (স্বীয় বিশ্বাস ও উক্তি থেকে) আল্লাহ তা'আলার সামনে তওবা করে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা (যখন কেউ তওবা করে তখন) অত্যন্ত ক্ষমাশীল (এবং) দয়ালু। (হযরত) মসীহ ইবনে মরিয়ম (সাক্ষাৎ আল্লাহ কিংবা আংশিক আল্লাহ) কিছুই নন–শুধু একজন পয়গম্বর, যাঁর পূর্বে আরও (মু'জিযা সমৃদ্ধ) বহু পয়গম্বর বিগত হয়েছেন। [খ্রিস্টানরা তাঁদেরকে আল্লাহ বলে না। সুতরাং যদি পয়গম্বরিত্ব কিংবা অলৌকিকত্ব উপাস্য হওয়ার প্রমাণ হয়, তবে সবাইকেই উপাস্য আল্লাহ হিসাবে মান্য করা উচিত। আর যদি তা উপাস্য হওয়ার প্রমাণ না হয় তবে হযরত মসীহকেই উপাস্য বলা হবে কেন? মোটকথা অন্যান্য পয়গম্বরকে যখন উপাস্য বলছ না, তখন ঈসা (আ)-কেও বলো না]। এবং (এমনিভাবে) তাঁর জননীও (উপাস্য কিংবা আংশিক উপাস্য নয় বরং তিনি) একজন পরম সত্যবাদিনী মহিলা (যেমন অন্যান্য আরও মহিলা পরম সত্যবাদিনী হয়েছেন। তাঁদের উভয়েরই উপাস্য না হওয়ার একটি সহজ যুক্তি এই যে) তাঁরা উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করতেন। (বস্তুত যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করে, সে খাদ্যের মুখাপেক্ষী হয়। খাদ্য গ্রহণ জড়ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং মুখাপেক্ষিতাও জড়ত্ব সৃষ্টির এমন বৈশিষ্ট্য, যা ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ যা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান নয় এবং অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে না, তা উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়)। দেখুন তো আমি কেমন পরিষ্কার যুক্তি-প্রমাণ তাদের জন্য বর্ণনা করছি, আবার দেখুন–তারা উল্টো কোনদিকে যাচ্ছে। আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন (সৃষ্ট) বস্তুর ইবাদত কর, যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? (এ অক্ষমতা আল্লাহ্‌র পরিপন্থী) আল্লাহ সব শোনেন ও জানেন (এরপরও তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর না এবং কুফর ও শিরক থেকে বিরত হও না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ –অর্থাৎ হযরত মসীহ রূহুল কুদস ও আল্লাহ কিংবা মসীহ, মরিয়ম ও আল্লাহ সবাই আল্লাহ। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ। এরপর তাঁরা তিনজনই এক এবং একজনই তিন। এ হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এ যুক্তি-বিরোধী ধর্ম বিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কারও বোধগম্য হয় না, তখন একে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়। –(ফাওয়ায়েদ-ওসমানী)

মসীহ (আ)-এর উপাস্যতা খণ্ডন ঃ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ অর্থাৎ অন্যান্য পয়গম্বর যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে এখান থেকে লোকান্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেন নি, যা উপাস্য হওয়ার লক্ষণ, এমনিভাবে হযরত মসীহ (আ)

যিনি তাঁদের মতই একজন মানুষ –স্থায়িত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে পারেন নি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে পৃথিবীর সব কিছুরই মুখাপেক্ষী। মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীব-জন্তু থেকে সে পরাঙ্মুখ হতে পারে না। খাদ্যশস্য উদরে পৌঁছা এবং হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কত কিছু প্রয়োজন। এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছে। পরমুখাপেক্ষিতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ ও মরিয়মের উপাস্যতা খণ্ডনকল্পে যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি ঃ মসীহ ও মরিয়ম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোক পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোন বস্তু থেকেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, যে সত্তা মানবমণ্ডলীর মত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে বস্তুজগত থেকে পরাঙ্মুখ নয়, সে কিভাবে আল্লাহ হতে পারে ? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী, ও মূর্খ-সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী–যদিও পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুবা সব ফেরেশতা আল্লাহ হয়ে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)–(ফাওয়ায়েদে ওসমানী)।

হযরত মরিয়ম পয়গম্বর ছিলেন কি ওলী ঃ হযরত মরিয়মের পয়গম্বর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার স্থলে صديقة শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনি ওলী ছিলেন–নবী নয়। কারণ, প্রশংসার স্থলে সাধারণত উচ্চপদই উল্লেখ করা হয়। নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে نبية বলা হতো। অথচ বলা হয়েছে صديقة এটি ওলীত্বের একটি স্তর। (রূহুল-মা'আনী, সংক্ষেপিত)

আলিমদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মহিলারা কখনও নবুয়ত লাভ করেনি। এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে। وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর পূর্বে পুরুষদের কাছেই ওহী প্রেরিত হয়েছে। –(ইউসুফ, রুকূ ১২ ফাওয়ায়েদে-উসমানী)

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ
قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ
مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَ

لُّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ

عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا

مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾

(৭৭) বলুন ঃ হে আহ্লে-কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। (৭৮) বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম-তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালংঘন করত। (৭৯) তারা পরস্পর মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্য মন্দ ছিল। (৮০) আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। (৮১) যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি এবং রাসূল ও রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (এসব খ্রিস্টানকে) বলুন ঃ হে আহ্লে-কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে (অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে) অন্যায় বাড়াবাড়ি (ও সীমাতিক্রম) করো না এবং এতে (অর্থাৎ এ বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে) ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির (অর্থাৎ ভিত্তিহীন কথাবার্তার) অনুসরণ করো না, যারা (ইতি) পূর্বে নিজেরাও ভ্রান্ত পথে পতিত হয়েছে এবং (নিজেদের সঙ্গে অন্য আরও) অনেককে (নিয়ে ডুবেছে। অর্থাৎ) ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে (এবং তাদের ভ্রান্ত পথে পতিত হওয়া এ কারণে নয় যে, সত্যপথ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিংবা তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, বরং) তারা সত্যপথ থাকা সত্ত্বেও (ইচ্ছাকৃতভাবে) তা থেকে বিচ্যুত (ও পৃথক) হয়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ যুক্তির নিরিখে তাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হওয়ার পরও তারা তা ত্যাগ করে না কেন ?) বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের প্রতি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কঠোর) অভিসম্পাত (যবুর ও ইঞ্জীলে) করা হয়েছিল, (যা প্রকাশ পেয়েছিল হযরত) দাউদ (আ) ও (হযরত) ঈসা (আ)-এর মুখে। (অর্থাৎ যবুর ও ইঞ্জীলে কাফিরদের প্রতি অভিসম্পাত লিখিত ছিল যেমন কোরআন মজীদেও فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ রয়েছে এ গ্রন্থদ্বয় হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা

[আ]-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে এ অভিসম্পাত তাঁদের মুখেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং) এ অভিসম্পাত এ কারণে হয়েছিল, যেহেতু তারা নির্দেশের (বিশ্বাসগত বিরুদ্ধাচরণ করেছিল যা কুফর) এবং (এ বিরুদ্ধাচরণে) সীমালংঘন করে (অনেক দূরে চলে গিয়ে) ছিল। (অর্থাৎ কুফর ছিল কঠোর ও দীর্ঘায়িত। তারা তা সদাসর্বদাই করত। সে মতে) তারা যে দুষ্কর্ম (অর্থাৎ কুফর) অবলম্বন করে রেখেছিল তা থেকে (ভবিষ্যতের জন্য) বিরত হতো না (বরং তা করেই যেত। সুতরাং তাদের কঠোর ও দীর্ঘায়িত কুফরের কারণে তাদের প্রতি কঠোর অভিসম্পাত হলো)। বাস্তবিকই তাদের (এ) কাজ (যা বর্ণিত হলো, অর্থাৎ কুফরতাও কঠোর ও দীর্ঘায়িত-) অবশ্যই মন্দ ছিল (যদ্দরুন এ শাস্তি দেওয়া হলো)। আপনি (এসব) ইহুদীর মধ্যে অনেককে দেখবেন, (মুশরিক) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, (সেমতে মদীনার ইহুদী ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কুফরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে মুসলমানদের সাথে শত্রুতার সূত্রে খুব বন্ধুত্ব বিদ্যমান ছিল)। যে কাজ তারা পরবর্তীর জন্য (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে ভোগ করার জন্য) করেছে (অর্থাৎ কুফর, যা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতার কারণ ছিল) তা নিঃসন্দেহে মন্দ-(এর কারণে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি (চিরতরে) অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (এ চিরকালীন অসন্তুষ্টির ফল হবে এই যে) এরা চিরকাল আযাবে থাকবে। আর যদি এরা (ইহুদীরা) আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখত এবং পয়গম্বর [অর্থাৎ (মূসা) আ]-এর প্রতি (বিশ্বাস যা তারা দাবি করে) এবং ঐ গ্রন্থের প্রতি (বিশ্বাস রাখত) যা তাদের পয়গম্বরের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল (অর্থাৎ তওরাত) তবে তারা এদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু এদের অধিকাংশ লোক ফাসিক ও দুরাচার (তাই ঈমানের সীমা থেকে বাইরে চলে যাওয়ার ফলে কাফিরদের সাথে তাদের ঐক্য ও বন্ধুত্ব হয়ে গেছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বনী ইসরাইলের কুটিলতার আরেকটি দিক ঃ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ -পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাইলের ঔদ্ধত্য ও তাঁদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল-যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ অর্থাৎ কোন কোন পয়গম্বরকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কাউকে কাউকে হত্যা করে ফেলে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বনী ইসরাইলেরই কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্ত থেকে আল্লাহ্র পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কাউকে কাউকে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্তে পরিণত করে দিয়েছে ঃ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ -অর্থাৎ যেসব বনী ইসরাইল বলে যে, আল্লাহ্ তো ঈসা ইবনে মরিয়মেরই নাম, তারা কাফির হয়ে গেছে।

এখানে এ উক্তিটি শুধু খ্রিস্টানদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই ধরনের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইহুদীদের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرٰى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ। অর্থাৎ ইহুদীরা বলে যে, হযরত ওযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে যে মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র।

غلو শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। ধর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লংঘন করা।

উদাহরণত পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলে স্বীকার করা হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমালংঘন।

বনী ইসরাইলের বাড়াবাড়ি ঃ পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও কুণ্ঠিত না হওয়া অথবা তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলে স্বীকার করা—বনী ইসরাইলের এ পরস্পরবিরোধী দুটি কাজই হচ্ছে মূর্খতাপ্রসূত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ প্রবচন হচ্ছে اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ। অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি কখনও মিতাচার ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালংঘনে। এ বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন বনী ইসরাইলের দুটি ভিন্ন দলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে, একদল লোকই দুটি ভিন্নমুখী কর্ম বিভিন্ন পয়গম্বরের সাথে করেছে অর্থাৎ কারো কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহ্র সমতুল্য করে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আহ্লে-কিতাবদের সম্বোধন করে যেসব নির্দেশ তাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরকে দেওয়া হয়েছে তা ধর্ম ও ধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি মূল স্তম্ভ বিশেষ। এ মূলনীতি থেকে সামান্য এদিক-সেদিক হলেই মানুষ পথভ্রষ্টতার আবর্তে পতিত হয়ে যায়। এ কারণে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার পথ ঃ এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র দুনিয়া জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। সমগ্র বিশ্বে তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই নির্দেশ চালু রয়েছে। তাঁরই আনুগত্য করা প্রতিটি মানবের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বেচারী মাটির মানুষ মৃত্তিকাজনিত তমসা ও অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর বিধান ও নির্দেশাবলী শত চেষ্টা করেও জানতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তার জন্য দুটি মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মাধ্যমদ্বয়ের দ্বারা সে আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দ-অপছন্দ এবং আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারে। তন্মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে ঐশী গ্রন্থ, যা মানুষের জন্য আইন ও নির্দেশনামা বিশেষ। দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা এবং স্বীয় গ্রন্থের বাস্তব ব্যাখ্যা রূপে পাঠিয়েছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁদেরকে রাসূল কিংবা নবী বলা হয়। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, কোন গ্রন্থ—তা যতই সর্ববিষয়ে সম্বলিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, মানুষের সংশোধন ও

শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যথেষ্ট হয় না বরং স্বভাবিকভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক ও সংস্কারক একমাত্র মানুষই হতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য দুটি উপায় রেখেছেন ঃ আল্লাহ্র গ্রন্থ এবং আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার জামাত। পয়গম্বরগণ, তাঁদের উত্তরসূরি আলিম ও মাশায়েখ– এঁরা সবাই এ মানব মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্ববাসী বাড়াবাড়ির ভুলে লিপ্ত রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভুলের ফসল। কোথাও তাদেরকে সীমা ডিঙ্গিয়ে ব্যক্তিপূজার স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও তাদেরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে حسبنا كتاب الله বাক্যটিকে ভুল অর্থ পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে রাসূলকে বরং পীরদেরকেও 'আলিমুল গায়ব' এবং আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেওয়া হয়েছে এবং পীরপূজা ও কবরপূজা আরম্ভ হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্র রাসূলকে শুধু একজন পত্রবাহকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গম্বরদের অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাফির বলা হয়েছে, তেমনি তাঁদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহ্র সমতুল্য আখ্যাদানকারীদেরকেও কাফির সাব্যস্ত করা হয়েছে। لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ–আয়াতখানি এ বিষয়বস্তুর ভূমিকা। এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা ও প্রতিবন্ধককেই বলা হয়। এ সীমার ভিতরে ত্রুটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়াও অন্যায়। রাসূল ও তাঁদের উত্তরসূরিদের কথা অমান্য করা এবং তাঁদের অবমাননা করা যেমন মহাপাপ, তেমনি তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী মনে করা আরও গুরুতর অপরাধ।

শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় ঃ আলোচ্য আয়াতে لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ–বলার সাথে সাথে غَيْرَ الْحَقِّ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। সূক্ষ্মদর্শী তফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকীদ অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, ধর্মে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। আল্লামা যামাখশারী প্রমুখ তফসীরবিদ এ স্থলে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি ন্যায় ও বৈধ। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁরা শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণকে উপস্থিত করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত মাস'আলায় মুসলিম দার্শনিকরা এবং ফিকহ্ সংক্রান্ত মাস'আলায় ফিকহ্বিদরা এরূপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরোক্ত তফসীরবিদদের মতে এগুলোও বাড়াবাড়ি ; তবে ন্যায় ও বৈধ। সাধারণ তফসীরবিদরা বলেন ঃ এগুলো আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কোরআন ও সুন্নাহ্র মাস'আলা যতটুকু তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার–বিশ্লেষণ রাসূলে করীম (সা), সাহাবী এবং তাবেয়ীদের থেকে প্রমাণীত হয়েছে, ততটুকু বাড়াবাড়ি নয় এবং যা বাড়াবাড়ির সীমা পর্যন্ত যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নিন্দনীয়।

বনী ইসরাইলকে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমান কালের বনী ইসরাইলদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا –অর্থাৎ ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ –অর্থাৎ তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এভাবে এ আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি যে একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, তা এবং সরল পথে কায়েম থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

বনী ইসরাইলের কুপরিণাম ঃ দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটিজনিত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত বনী ইসরাইলের কুপরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে–প্রথমত হযরত দাঊদ (আ)–এর মুখে যার ফলে তাদের আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে শূকরে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষ্যজনিত এ অভিসম্পাত তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়। এর জাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত হয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এস্থলে স্থানোপযোগিতার কারণে মাত্র দু'জন পয়গম্বরের ভাষ্যে তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের উপর অভিসম্পাতের সূচনা হযরত মূসা (আ) থেকে হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তব্যে। এভাবে উপর্যুপরি চারজন পয়গম্বরের উক্তির মাধ্যমে তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে, যারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা তাঁদেরকে সীমা ডিঙ্গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীতে অংশীদার করেছিল।

সর্বশেষ দু'আয়াতে কাফিরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী ইসরাইলের সব বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা তাদের ভ্রান্ত পরিবেশ ও কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বেরই ফলশ্রুতি ছিল, যা তাদেরকে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করেছিল।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ
وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا
نَصٰرٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ
تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا
مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ

أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

(৮২) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রিস্টানদের মধ্যে আলিম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না। (৮৩) আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন শোনে তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন। (৮৪) আমাদের কি ওযর থাকতে পারে না যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এ আশা করব না যে, আমাদের পালনকর্তা আমাদের সৎ লোকদের সাথে প্রবিষ্ট করবেন ? (৮৫) অতঃপর তাদের আল্লাহ্ এ উক্তির প্রতিদান স্বরূপ এমন উদ্যান দেবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান (৮৬) যারা কাফির হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তারাই দোযখী।

যোগসূত্র ঃ পূর্বে মুশরিকদের সাথে ইহুদীদের বন্ধুত্ব বর্ণিত হয়েছিল। এখানে মুসলমানদের সাথে ইহুদী ও মুশরিকদের শত্রুতা উল্লিখিত হয়েছে। এ শত্রুতাই ছিল তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের আসল কারণ। যেহেতু প্রত্যেক ব্যাপারেই কোরআন পাক ন্যায়বিচার ও ইনসাফের পতাকাবাহী, তাই ইহুদী-খ্রিস্টানদের মধ্যেও সবাইকে এক কাতারে গন্য করে নি। যার মধ্যে যে গুণ রয়েছে, কোরআন পাক অকুণ্ঠচিত্তে তার স্বীকৃতি দিয়েছে। উদাহরণত কোরআন পাকে বর্ণিত রয়েছে যে, খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ দলের মধ্যে ইহুদীদের তুলনায় মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ কম এবং এ দলের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা যে বিশেষ প্রশংসা ও উত্তম প্রতিদানের যোগ্য, একথাও কোরআন বর্ণনা করেছে। এ বিশেষ দলটি হচ্ছে আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানদের। হিজরতের পূর্বে মুসলমানরা যখন জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে আবিসিনিয়ায় চলে যায়, তখন খ্রিস্টানদের এ দলটি মুসলমানদের কোনরূপ কষ্ট দেয়নি। অন্য যে সব খ্রিস্টান এ গুণে গুণান্বিত, ওরাও কার্যত তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এ দলের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন বাদশাহ্ নাজ্জাশী ও তাঁর পারিষদবর্গ। তাঁরা আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের মুখে কোরআন শুনে কাঁদতে শুরু করেন এবং মুসলামন হয়ে যান। অতঃপর ত্রিশ জনের একটি

প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন। তাঁরাও কোরআন শুনে কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং মুসলমান হয়ে যান। এ ঘটনাই হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নযুল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(অমুসলিমদের মধ্যে) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের প্রতি অধিকতর শত্রুতা পোষণকারী ইহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন এবং তাদের (অর্থাৎ অমুসলিম লোকদের) মধ্যে মুসলমানদের সাথে (অন্যদের তুলনায়) বন্ধুত্বে অধিকতর নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদের খ্রিস্টান বলে। (অধিকতর নিকটবর্তী বলার উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু তারাও নয়, কিন্তু উল্লিখিত অন্যান্য কাফিরের তুলনায় এরা অপেক্ষাকৃত ভাল)। এটা (অর্থাৎ বন্ধুত্বের অধিক নিকটবর্তী হওয়া এবং শত্রুতায় কম হওয়া) এ কারণে যে, এদের (অর্থাৎ খ্রিস্টানদের) মধ্যে অনেক বিদ্যোৎসাহী জ্ঞানী ব্যক্তিও রয়েছে এবং অনেক সংসারত্যাগী দরবেশও রয়েছে। (কোন জাতির মধ্যে প্রচুর সংখ্যক এরূপ লোক থাকলে জনগণের মধ্যেও সত্যের প্রতি তেমন বিদ্বেষ থাকে না। যদিও বিশেষ শ্রেণীর লোক ও সর্বসাধারণ সত্যকে গ্রহণও করে না)। এবং এ কারণে যে, এরা (অর্থাৎ খ্রিস্টানরা) অহংকারী নয়। (এরা জ্ঞানী ও দরবেশদের দ্বারা দ্রুত প্রভাবান্বিত হয়ে যায়। এছাড়া সত্যের সামনে বিনম্র হয়ে যাওয়া বিনয় ও নম্রতার লক্ষণ। এ কারণে তাদের শত্রুতা খুব বেশি নয়। অতএব, জ্ঞানী ও দরবেশ অর্থাৎ আলিম ও মাশায়েখের অস্তিত্ব কর্তাকারণের দিকে এবং নিরহংকার হওয়া কবুল করার যোগ্যতার দিকে ইঙ্গিতবহ। ইহুদী ও মুশরিকদের অবস্থা এর বিপরীত। ওরা সংসারাসক্ত ও অহংকারী। অবশ্য ইহুদীদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক সত্যপন্থী আলিম ছিলেন, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, সংখ্যাল্পতার দরুন জনগণের মধ্যে তাদের এমন কোন প্রভাব ছিল না। তাই তাদের মধ্যে এমন প্রতিহিংসা রয়েছে; যা তীব্র শত্রুতার কারণ। ফলে ইহুদীদের মধ্যেও কম সংখ্যক লোকই মুসলমান হয়। মুশরিকদের অন্তর থেকে প্রতিহিংসা দূর হয়ে যাওয়ার পর তারা মুসলমান হতে শুরু করে) এবং (তাদের কিছু সংখ্যক, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, এমন রয়েছে যে,) যখন তারা রাসূল (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ কালাম (অর্থাৎ কোরআন) শোনে, তখন আপনি তাদের চক্ষু অশ্রুসজল দেখতে পাবেন এ কারণে যে, তারা সত্য (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে) চিনে নিয়েছে। (অর্থাৎ তারা সত্য শুনে প্রভাবান্বিত হয়ে যায় এবং) তারা বলে যে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরও তাদের তালিকাভুক্ত করে নিন (অর্থাৎ তাদের মধ্যে গণ্য করুন) যারা [মুহাম্মদ (সা) ও কোরআনের সত্যতার] সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া আমাদের জন্য এমন কি ওযর থাকতে পারে, যার দরুন আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং যে সত্য (ধর্ম) আমরা (এখন) প্রাপ্ত হয়েছি, তার প্রতি (শরীয়তে মুহাম্মদীর শিক্ষানুযায়ী) বিশ্বাস স্থাপন করব না? এবং (এরপর) এ আশা করব না যে, আমাদের পরওয়ারদিগার আমাদেরকে সৎ ও (প্রিয়) লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন? (বরং এরূপ আশা করা ইসলাম গ্রহণের উপরই নির্ভরশীল। তাই মুসলমান হওয়া একান্ত জরুরী)। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (এ বিশ্বাসপূর্ণ) উক্তির প্রতিদানস্বরূপ (বেহেশতের) এমন উদ্যান দেবেন, যার (প্রাসাদসমূহের)

তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে (এবং) তারা তাতে সর্বদা অবস্থান করবে। বস্তুত সৎকর্মশীলদের এটাই পুরস্কার। আর (তাদের বিপরীতে) যারা কাফির থেকে যায় এবং আমার নিদর্শনাবলী (অর্থাৎ নির্দেশাবলীকে) মিথ্যা বলতে থাকে, তারা দোযখের অধিবাসী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতিপয় আহ্লে-কিতাবের সত্যানুরাগ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে ঐসব আহ্লে-কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সত্যানুরাগ ও আল্লাহ্‌ভীরুতার কারণে মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করত না। ইহুদীদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই নগণ্য। উদাহরণত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। খ্রিস্টানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল বেশি। বিশেষত মহানবী (সা)-এর আমলে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে এরূপ লোকদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ কারণেই মক্কার নব-দীক্ষিত মুসলমানরা কোরায়েশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন এবং বলেন, আমি শুনেছি আবিসিনিয়ার সম্রাট কারও প্রতি জুলুম করেন না এবং কাউকে যুলুম করতেও দেন না। তাই মুসলমানরা কিছুদিনের জন্য সেখানে চলে যেতে পারে।

পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমবার এগার জনের একটি দল আবিসিনিয়ায় চলে যায়। তাদের মধ্যে হযরত ওসমান গনী (রা)-এর স্ত্রী নবী-দুহিতা হযরত রোকাইয়া (রা)-ও ছিলেন। এরপর হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেবের নেতৃত্বে একটি বিরাট কাফেলা আবিসিনিয়ায় গিয়ে পৌঁছে। এ কাফেলায় পুরুষ ছিলেন বিরাশি জন। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তাঁরা তথায় সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকেন।

কিন্তু মুসলামনরা অন্য কোন দেশে গিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করবে, মক্কার ক্রোধান্ধ কাফিরকুলের তাও সহ্য হলো না। তারা প্রচুর উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দিল এবং মুসলমানদের সেই দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু সম্রাট প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করলেন এবং হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেব ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত হলেন। এসব তথ্য ও ইসলামী শিক্ষাকে তিনি হযরত ঈসা (আ) ও ইঞ্জীলের ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ অনুরূপ পেলেন। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব, তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্ত চিত্র, তাঁর ও তাঁর সহচরবর্গের দৈহিক আকার-আকৃতি ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছিল। এতে প্রভাবান্বিত হয়ে সম্রাট কোরায়েশী প্রতিনিধিদলের সব উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং তাদের পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আমি এমন লোকদের কখনও দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারি না।

জা'ফর ইবনে আবূ তালেবের বক্তৃতার প্রভাব ঃ হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ও সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তাঁদের বসবাসের ফলেও সম্রাট, রাজকর্মচারী ও জনগণের অন্তরে ইসলামের প্রতি অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় হিজরত

করার পর যখন সাহাবীদের নিয়ে নিরাপদে কালাতিপাত করতে থাকেন, তখন আবিসিনিয়ার মুহাজিররা মদীনা যাওয়ার সংকল্প করেন। এ সময় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ সম্রাট নাজ্জাশী তাঁদের সাথে প্রধান প্রধান খ্রিস্টান আলিম ও মাশায়েখের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। সত্তর জনের এ প্রতিনিধিদলে বাষট্টি জন আবিসিনীয় ও আটজন সিরীয় আলিম ও মাশায়েখ ছিলেন।

নবীর দরবারে শাহী প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি ঃ প্রতিনিধিদলটি সংসারত্যাগী দরবেশসুলভ পোশাক পরিহিত হয়ে দরবারে উপস্থিত হলে মহানবী (সা) তাঁদেরকে সূরা-ইয়াসীন পাঠ করে শোনালেন। কোরআন পাঠ শুনে তাদের চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। তারা শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে বললেন ঃ এ কালাম ঈসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কালামের সাথে কতই না গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর প্রতিনিধিদলের সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাদের প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজ্জাশীও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং একখানা চিঠি লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় পাঠালেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জাহাজডুবির ফলে তারা সবাই প্রাণ হারাল। মোটকথা, আবিসিনিয়ার সম্রাট, রাজকর্মচারী ও জনগণ ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে শুধু ভদ্র ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং পরিশেষে তাঁরা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান।

তফসীরবিদদের মতে উল্লিখিত আয়াতসমূহ তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে ঃ لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى—এবং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌র ভয়ে তাদের ক্রন্দন করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরবিদরা এ বিষয়েও একমত যে, যদিও আলোচ্য আয়াতসমূহ সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভাষার ব্যাপকতার দরুন অন্যান্য ন্যায়পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ খ্রিস্টানের বেলায়ও এ আয়াত প্রযোজ্য। অর্থাৎ যারা ইসলাম পূর্বকালে ইঞ্জীলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্তরকালে ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছে।

ইহুদীদের মধ্যেও এ ধরনের কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা পূর্বে তওরাতের অনুসরণ করতেন এবং ইসলাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা জাতিসমূহের আলোচনায় অনুল্লেখযোগ্য এবং পরিমাণে কম ছিল। অবশিষ্ট ইহুদীদের অবস্থা সবারই জ্ঞাত ছিল যে, তারা মুসলমানদের শত্রুতা ও মূলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই আয়াতের শুরুভাগে ইহুদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদীরাই সর্বাধিক কঠোর।

মোটকথা, এ আয়াতে খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা ছিল আল্লাহ্‌ভীরু ও সত্যপ্রিয়। নাজ্জাশী এবং তাঁর পারিষদবর্গও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যেসব খ্রিস্টান এসব গুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, তারাও এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াতের এই অর্থ নয় এবং হতেও পারে না যে, খ্রিস্টান জাতি যতই পথভ্রষ্ট হোক না কেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক না কেন সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে

মুসলমানদের বন্ধু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে। কেননা, এমন অর্থ করাও নির্জলা ভুল এবং ঘটনাবলীর পরিপন্থী। তাই ইমাম আবূ বকর জাসসাস আহ্‌কামুল-কোরআনে বলেন ঃ কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে, এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় খ্রিস্টানদের প্রশংসা-কীর্তন করা হয়েছে এবং তারা সর্বতোভাবে ইহুদীদের চাইতে উত্তম। এটি নিরেট মূর্খতা। কারণ, সাধারণভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, খ্রিস্টানদের মুশরিক হওয়াই অধিক সুস্পষ্ট। মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টানদের কাজ-কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বর্তমান কালের সাধারণ খ্রিস্টানরাও ইসলাম বিদ্বেষে ইহুদীদের চাইতে পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় খ্রিস্টানদের মধ্যে আল্লাহ্‌ভীরু ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচুর্য ছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। স্বয়ং এ আয়াতের শেষভাগে কোরআন এ সত্য বর্ণনা করে বলেছে ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

অর্থাৎ এসব আয়াতে খ্রিস্টানদলের প্রশংসা করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলিম, সংসারত্যাগী ও আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিরা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অহংকার নেই যে, অন্যের কথা শুনতে সম্মত হবে না। এতে বোঝা গেল যে, ইহুদীদের অবস্থা এমন ছিল না। তারা আল্লাহ্‌ভীরু ও সত্যপ্রিয় ছিল না। তাদের আলিমরাও সংসার ত্যাগের পরিবর্তে স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধিকে জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত করেছিল এবং সংসারের প্রতি এমন মোহাবিষ্ট ছিল যে, সত্যাসত্য ও হালাল হারামের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করত না।

সত্যানুরাগী আলিম ও মাশায়েখই জাতির প্রাণস্বরূপ ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, সত্যানুরাগী আল্লাহ্‌ভীরু আলিম ও মাশায়েখরাই জাতির আসল প্রাণস্বরূপ। তাঁদের অস্তিত্বের মধ্যেই সমগ্র জাতির জীবন নিহিত। যতদিন কোন জাতির মধ্যে এমন আলিম ও মাশায়েখ বিদ্যমান থাকেন, যাঁরা পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী নন এবং যাঁরা আল্লাহ্‌ভীরু, ততদিন সে জাতি অব্যাহতভাবে কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে থাকে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

(৮৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা ঐসব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। (৮৮) আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদের

দিয়েছেন, তার ভিতর থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

যোগসূত্র ঃ এ পর্যন্ত আহলে-কিতাবদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এখন আবার আনুষঙ্গিক বিধি-বিধান বর্ণিত হচ্ছে, যা সূরার প্রারম্ভে এবং মাঝখানেও কিছু কিছু আলোচিত হয়েছিল। স্থানের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এখানে একটি বিশেষ সম্বন্ধও বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, পূর্বে প্রশংসার স্থলে সংসার ত্যাগ তথা দরবেশীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। তা এর একটি বিশেষ অংশ অর্থাৎ সংসারাসক্তি ত্যাগের দিক দিয়ে হলেও সম্ভাবনা ছিল যে, কেউ সংসার ত্যাগের সমতুল্য বৈশিষ্ট্যকে প্রশংসনীয় মনে করে বসে। তাই এস্থলে হালালকে হারাম করার নিষিদ্ধতা বর্ণনা করা অধিক উপযুক্ত মনে হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসীগণ ! আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন (তা পানাহার ও পোশাক জাতীয় হোক, অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক জাতীয় হোক) তন্মধ্যে সুস্বাদু (এবং উপাদেয়) বস্তুসমূহকে (কসম ও প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে নিজের উপর) হারাম করো না এবং (শরীয়তের) সীমা (যা হালাল-হারামের ব্যাপারে নির্ধারিত হয়েছে) অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা (শরীয়তের) সীমা অতিক্রমকারীদের ভালবাসেন না এবং আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদের দিয়েছেন তার ভিতর থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর (ব্যবহার কর) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী (অর্থাৎ হালালকে হারাম করা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিপন্থী। অতএব, ভয় কর এবং এরূপ কাজে বিরত থাক)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সংসার ত্যাগ আল্লাহ্‌র সীমার ভিতরে হলে বৈধ, নতুবা হারাম ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, সংসার বিরাগ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা যদিও এক পর্যায়ে প্রশংসনীয়, কিন্তু এতেও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা নিন্দনীয় ও হারাম। এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর ঃ কোন হালাল বস্তুকে হারাম করে নেওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। এক. বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে করে নেওয়া। দুই. উক্তির মাধ্যমে কোন বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া। উদাহরণত এরূপ প্রতিজ্ঞা করা যে, ঠাণ্ডা পানি পান করবে না, কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জায়েয কাজ করবে না। তিন. বিশ্বাস ও উক্তি কিছুই নয় কিন্তু কার্যত কোন হালাল বস্তুকে চিরতরে বর্জন করার সংকল্প করে নেওয়া।

প্রথমাবস্থায় যদি ঐ বস্তু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, তবে তাকে হারাম বলে যে লোক বিশ্বাস করবে সে আল্লাহ্‌র আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের কারণে কাফির হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থায় যদি কসমের শব্দ যোগে হালাল বস্তুটিকে নিজের উপর হারাম করে থাকে তবে কসম শুদ্ধ হবে। কসমের শব্দ অনেক, যা ফিকহ্ গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লিখিত রয়েছে। উদাহরণত কেউ এরূপ বলে যে, আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, অমুক বস্তু খাব না কিংবা অমুক কাজ করব না। অথবা এরূপ বলে যে, আমি অমুক বস্তু কিংবা অমুক কাজকে নিজের উপর হারাম করছি। বিনা প্রয়োজনে এরূপ কসম খাওয়া গুনাহ্। কিন্তু এরূপ কসম ভঙ্গ করলে তার কাফ্ফারা দেওয়া জরুরী। কাফ্ফারার বিবরণ পরে বর্ণিত হবে।

তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ বিশ্বাস ও উক্তি দ্বারা কোন হালালকে হারাম না করে কার্যত হারামের মত ব্যবহার করলে যদি এরূপ বর্জনকে সওয়াবের কাজ মনে করে, তবে তা বিদ'আত এবং বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগ বলে গণ্য হবে। এরূপ বৈরাগ্য যে মহাপাপ তা কোরআনের স্পষ্ট আয়াতে বর্ণিত রয়েছে। এর বিরুদ্ধাচরণ করা ওয়াজিব এবং এরূপ বিধি-নিষেধে অটল থাকা গুনাহ্। তবে এরূপ বিধি-নিষেধ সওয়াবের নিয়তে না হয়ে অন্য কোন কারণে যথা, কোন দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোন বিশেষ বস্তুকে স্থায়ীভাবে বর্জন করলে তাতে কোন গুনাহ্ নেই। কোন কোন সূফী বুযুর্গ হালাল বস্তু বর্জন করেছেন বলে যেসব ঘটনা বর্ণিত আছে, তা এমনি ধরনের বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এসব বস্তুকে স্বীয় নফসের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছেন কিংবা কোন বুযুর্গ ক্ষতিকর বলেছেন। তাই প্রতিকারার্থ তা বর্জন করেছেন। এতে কোন দোষ নেই।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করো না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সীমাতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।

সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, কোন হালাল বস্তুকে বিনা ওযরে সওয়াব মনে করে বর্জন করা। অজ্ঞ ব্যক্তি একে তাক্ওয়া তথা আল্লাহ্ভীরুতা মনে করে। অথচ আল্লাহ্র কাছে এটা সীমাতিক্রম ও অবৈধ। তাই দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল বস্তু তোমাদের দিয়েছেন তা খাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস রয়েছে।

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হালাল ও পবিত্র বস্তুকে সওয়াব মনে করে বর্জন করা তাক্ওয়া নয় বরং আল্লাহ্র নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্যে তাক্ওয়া নিহিত। হ্যাঁ কোন দৈহিক ও আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থ কোন বস্তু বর্জন করলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

تَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيۡمَانِكُمۡ اِذَا حَلَفۡتُمۡ ؕ وَاحۡفَظُوۡۤا اَيۡمَانَكُمۡ ؕ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۸۹﴾

(৮৯) আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য ; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্য, যা তোমরা মজবুত করে বাঁধ। অতএব, এর কাফ্ফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে। মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দেবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিনদিন রোযা রাখবে। এটা কাফ্ফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা করবে। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

যোগসূত্র ঃ পূর্বে পাক-পবিত্র বস্তু হারাম করার কথা বর্ণিত হয়েছিল। এ হারামকরণ মাঝে মাঝে কসম তথা শপথের মাধ্যমে হয়। তাই এখন শপথ সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ বর্ণনা করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে (জাগতিকভাবে) পাকড়াও করেন না। (অর্থাৎ কাফ্ফারা ওয়াজিব করেন না) তোমাদের অসত্য শপথের জন্য (অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ করার জন্য)। কিন্তু (এমন) পাকড়াও এজন্য করেন যখন তোমরা শপথসমূহকে (ভবিষ্যৎ বিষয়ের জন্য) মজবুত কর (অতঃপর তা ভঙ্গ কর) অতএব, এর (অর্থাৎ এ রকম শপথ ভঙ্গের) কাফ্ফারা (এই যে,) দশ জন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে ; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে (সাধারণভাবে) দিয়ে থাক অথবা (দশ জন দরিদ্রকে মধ্যম শ্রেণীর) বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দেবে। (অর্থাৎ উল্লিখিত তিনটির মধ্যে যে কোন একটি কাজ করবে)। আর যে ব্যক্তি (তিনটির মধ্য থেকে একটিরও) সামর্থ্য রাখে না, (সে কাফ্ফারা হিসাবে) তিনদিন (উপর্যুপরি) রোযা রাখবে। (যা বর্ণিত হলো), এটা হচ্ছে কাফ্ফারা তোমাদের (এমন) শপথের যখন তোমরা শপথ কর (অতপর তা ভঙ্গ কর)।এবং (যেহেতু এ কাফ্ফারা ওয়াজিব, তাই) স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর। (এমন যেন না হয় যে, শপথ ভঙ্গ কর এবং কাফ্ফারা আদায় না কর। আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্দেশটি যেমন তোমাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে বর্ণনা করেছেন), তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় (অন্যান্য) বিধান (ও) বর্ণনা করেন–যাতে তোমরা (এ নিয়ামতের অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রাখার) কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শপথের কয়েকটি প্রকার ও তার বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে শপথের কয়েকটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সূরা বাকারায়ও বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোর সারকথা এই যে, যদি অতীত ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা হয়, তবে ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এরূপ শপথকে 'ইয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। উদাহরণত কেউ একটি কাজ করে ফেলল এবং জানে যে, এ কাজটি সে করেছে। এরপর সে জেনেশোনে শপথ করে যে, সে কাজটি করেনি। এ মিথ্যা শপথ কবীরা গুনাহ্ এবং ইহকাল ও পরকালে শাস্তির কারণ। কিন্তু এর জন্য কোনরূপ কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না—তওবা ও ইস্তেগফার করা জরুরী। এ কারণেই একে ফিকহ্‌বিদদের পরিভাষায় 'ইয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। কেননা, গুমূসের অর্থ যে ডুবিয়ে দেয়। এ শপথ শপথকারীকে গুনাহ্ ও শাস্তিতে ডুবিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কোন অতীত ঘটনা সম্পর্কে শপথ করা, কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হওয়া। উদাহরণত কোন সূত্রে জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এর উপর নির্ভর করে কেউ শপথ করল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এরপর দেখা গেল যে, এটা বাস্তবের বিপরীত। এরূপ শপথকে 'ইয়ামীনে লগ্ভ' বলা হয়। এমনিভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখে শপথবাক্য উচ্চারিত হলে একেও 'ইয়ামীনে লগ্ভ' বলা হয়। এরূপ শপথে গুনাহ্ নেই এবং কাফ্‌ফারাও দিতে হয় না।

তৃতীয় প্রকার এই যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার শপথ করা। এরূপ শপথকে 'ইয়ামীনে মুনআকিদা' বলা হয়। এ শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়। তবে কোন কোন অবস্থায় গুনাহ্ হয়, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় গুনাহ্ হয় না।

এস্থলে কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে লগ্ভ বলে বাহ্যত এমন শপথকেই বোঝানো হয়েছে, যাতে কাফ্‌ফারা নেই। গুনাহ্ হোক বা না হোক। কেননা, এর বিপরীতে عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ উল্লিখিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানে পাকড়াও করার অর্থ জাগতিকভাবে পাকড়াও, যা কাফ্‌ফারার আকারে হয়।

সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

এখানে لغو বলে ঐ শপথকে বোঝানো হয়েছে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, কিংবা কেউ নিজ ধারণায় সত্য মনে করে, শপথ করে কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হয়। এর বিপরীতে ঐ শপথ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা হয়। একে 'ইয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। অতএব, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লগভে গুনাহ্ নেই—ইয়ামীনে গুমূসে গুনাহ্ আছে, যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা হয়। সূরা বাকারায় পারলৌকিক গুনাহ্ বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে জাগতিক নির্দেশ অর্থাৎ কাফ্‌ফারা বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লগভের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না, অর্থাৎ—কাফ্‌ফারা ওয়াজিব করেন না, বরং কাফ্‌ফারা শুধু ঐ শপথের জন্যই

ওয়াজিব করেন যা ভবিষ্যতে কোন কাজ করা না করা সম্পর্কে করা হয় এবং অতঃপর তা ভঙ্গ করা হয়। এরপর কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .

অর্থাৎ তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে ঃ এক. দশজন দরিদ্রকে মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল দু'বেলা খাওয়াতে হবে, কিংবা দুই. দশ জন দরিদ্রকে 'সতর ঢাকা' পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণত একটি পায়জামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা, কিংবা তিন. কোন গোলাম মুক্ত করতে হবে। এরপর বলা হয়েছে ঃ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ অর্থাৎ কোন শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ আর্থিক কাফ্ফারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে তার জন্য কাফ্ফারা এই যে, সে তিন দিন রোযা রাখবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এখানে উপর্যুপরি তিন রোযা রাখার নির্দেশ রয়েছে। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে শপথের কাফ্ফারা হিসাবে যে রোযা রাখা হবে তা উপর্যুপরি হওয়া জরুরী।

আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফ্ফারা প্রসঙ্গে প্রথমে اِطْعَامُ শব্দ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি কাউকে খাদ্য দান করাও হয়। তাই ফিকহবিদরা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে দাতা ইচ্ছা করলে দশজন দরিদ্রকে আহারও করিয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে খাদ্য তার মালিকানায় দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আহার করালে তা মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য হতে হবে, যা সে নিজ গৃহে খেতে অভ্যস্ত। দশজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে। পক্ষান্তরে খাদ্য দান করলে প্রত্যেক দরিদ্রকে একজনের ফিতরা পরিমাণ দিতে হবে। অর্থাৎ পৌনে দু'সের গম অথবা তার মূল্য। মোটকথা উপরোক্ত তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি করতে হবে। কিন্তু রোযা রাখা তখনই যথেষ্ট হতে পারে, যখন তিনটির মধ্যে যে কোন একটিরও সামর্থ্য না থাকবে।

শপথ ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফ্ফারা দিলে তা ধর্তব্য নয় ঃ আয়াতের শেষভাগে হুঁশিয়ার করার জন্য দুটি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ অর্থাৎ এ হচ্ছে তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ কর। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র) ও অন্যান্য অধিকাংশ ইমামের মতে এর উদ্দেশ্য এই যে, যখন তোমরা কোন ভবিষ্যৎ কাজ করা না করার ব্যাপারে শপথ কর, এরপর যদি এর বিপরীত হয়ে যায়, তবে সেজন্য যে কাফ্ফারা দিতে হবে তা উপরে বর্ণিত হলো। এর সারমর্ম এই যে, শপথ ভঙ্গ হওয়ার পরই কাফ্ফারা দেওয়া দরকার। শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা দিলে তা ধর্তব্য হবে না। এর কারণ এই যে, যে বিষয় কাফ্ফারাকে জরুরী করে, তা হলো শপথ ভঙ্গ করা। অতএব শপথ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। সুতরাং সময় হওয়ার পূর্বে যেমন নামায হয় না, রমযান মাস আগমনের পূর্বে যেমন রমযানের রোযা হয় না, তেমনি শপথ ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে শপথের কাফ্ফারাও আদায় হবে না।

এরপর বলেছেন ঃ وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ অর্থাৎ স্বীয় শপথ রক্ষা কর। উদ্দেশ্য এই যে, কোন বিষয়ে শপথ করে ফেললে শরীয়তসম্মত কিংবা প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া শপথ ভঙ্গ করে না। কেউ কেউ বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য এই যে, শপথ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না—শপথকে রক্ষা কর। একান্ত অপারক না হলে শপথ করো না।—(মাযহারী)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ
اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾

(৯০) হে মু'মিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ—এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক—যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (৯১) শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না ? (৯২) তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও, রাসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈ কিছু নয়।

যোগসূত্র ঃ উপরে হালাল বস্তু বিশেষ পদ্ধতিতে বর্জন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এখন কতিপয় হারাম বস্তুর ব্যবহার করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসীগণ ! মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাক—যাতে তোমরা (এগুলোর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার কারণে—যা পরে বর্ণিত হবে) সুফলপ্রাপ্ত হও। (দীন দুনিয়া উভয়ের জন্যই এগুলো ক্ষতিকর। আর ক্ষতিগুলো এইঃ) শয়তান তো চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পর (ব্যবহারে) শত্রুতা এবং (অন্তরে) বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দেয়। (সেমতে একথা স্পষ্ট যে, মদ্যপানে বুদ্ধি-বিবেক লোপ পায়। ফলে গালিগালাজ ও দাঙ্গা-ফাসাদ হয়ে যায়, এতে পরবর্তীকালেও স্বভাবত মনোমালিন্য বাকি থাকে। জুয়ায় যে ব্যক্তি হেরে যায়, সে

বিজয়ীর প্রতি ক্রোধান্বিত হয়। সে যখন দুঃখিত হবে, অন্যের উপরও এর প্রভাব পড়বে। এ হচ্ছে জাগতিক ক্ষতি) এবং (শয়তান চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তা'আলার যিক্র ও নামায থেকে (যা আল্লাহ্কে স্মরণ করার একটি উত্তম পন্থা) তোমাদের বিরত রাখে (সেমতে এ বিষয়টি স্পষ্ট, কেননা মদ্যপায়ীর তো সংজ্ঞাই ঠিক থাকে না এবং জুয়ার বিজয়ী পক্ষ আনন্দ-উল্লাসে ডুবে থাকে, আর পরাজিত ব্যক্তি পরাজয়ের দুঃখ ও গ্লানিতে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এরপর সে বিজয় লাভের চেষ্টায় এমন ব্যাপৃত হয়ে পড়ে যে, অন্য কোন কিছুর খেয়ালই থাকে না। এ হচ্ছে ধর্মীয় ক্ষতি। এগুলো যখন এমন মন্দ বস্তু) অতএব (বল) তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না ? এবং আল্লাহ্র অনুগত হও ও রাসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মানুষের কল্যাণের জন্যই বস্তুজগতের সৃষ্টি ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের সেবার যোগ্য করেছেন। তবে তিনি মানুষের প্রতি শুধু একটি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, আমার সৃষ্ট বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে সীমা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি, তা লংঘন করবে না। যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকা ধৃষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা এবং যেসব বস্তুর বিশেষ ব্যবহারকে হারাম করেছি, তার বিরুদ্ধাচরণ করা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী তার সৃষ্ট বস্তুকে ব্যবহার করা, এরই নাম দাসত্ব।

প্রথম আয়াতে মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য পরীক্ষার শর-এই চারটি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুরই একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহযোগে সূরা বাকারায়ও উল্লিখিত হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۔

এতে উপরোক্ত চার বস্তুকে رِجْس বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় رجس এমন নোংরা বস্তুকে বলা হয়, যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে। এ চারটি বস্তুও এমন যে, সামান্য সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই এগুলোর প্রতি আপনা আপনিই ঘৃণা জন্মে।

'আযলাম'-এর ব্যাখ্যা ঃ এ চার বস্তুর মধ্যে ازلام অন্যতম। এটি زلم-এর বহুবচন। যলাম এমন শরকে বলা হয়, যদ্বারা আরবে ভাগ্য নির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে একটি উট যবাই করত। অতঃপর এর গোশত সমান দশভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হতো। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশের চিহ্ন অঙ্কিত

থাকত। কোনটিতে এক এবং কোনটিতে দুই বা তিন অংশ অঙ্কিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। এ শরগুলোকে তূনের মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে এককে অংশীদারের জন্য একটি শর বের করা হতো। যত অংশবিশিষ্ট শর যার নামে বের হতো, সে তত অংশের অধিকারী হতো এবং যার নামে অংশবিহীন শর বের হতো, সে বঞ্চিত হতো। আজকাল এ ধরনের অনেক লটারী বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলোও জুয়া এবং হারাম।

লটারির জায়েয প্রকার ঃ এক প্রকার লটারী জায়েয এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে প্রমাণিত আছে। তা এই যে, সবার অধিকার সমান এবং অংশও সমান বন্টন করা হয়েছে। এখন কার অংশ কোনটি, তা লটারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায় । উদাহরণত একটি গৃহ চারজন অংশীদারের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এখন মূল্যের দিক দিয়ে গৃহটিকে সমান চার ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর কে কোন ভাগ নেবে, তা যদি পারস্পারিক সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয়, তবে লটারির মাধ্যমে যার নামে যে অংশ আসে, তা তাকে দেওয়া জায়েয। অথবা মনে করুন, কোন একটি বস্তুর প্রার্থী এক হাজার জন এবং সবার অধিকারই সমান। কিন্তু যে বস্তুটি ভাগ করতে হবে, তা সর্বমোট একশটি। এক্ষেত্রে লটারিযোগে সীমাংসা করা যায়।

জুয়ার শর দ্বারা গোশত বন্টনের মূর্খজনোচিত প্রথা যে হারাম তা সূরা মায়েদার এক আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত চারটি হারাম বস্তুর মধ্যে দু'টি অর্থাৎ জুয়া ও ভাগ্য নির্ধারক শর ফলাফলের দিক দিয়ে একই বস্তু। অবশিষ্ট দু'টির মধ্যে একটি হচ্ছে

انصاب যা نصب -এর বহুবচন ঃ نصب এমন বস্তুকে বলে, যাকে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়–তা মূর্তি অথবা বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি যাই হোক ।

মদ ও জুয়ার দৈহিক ও আত্মিক ক্ষতি ঃ এ আয়াত অবতরণের হেতু ও পরবর্তী আয়াতদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে দু'টি বস্তুর নিষেধাজ্ঞা ও ক্ষতি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মদ ও জুয়া– انصاب। তথা মূর্তির প্রসঙ্গ এর সাথে জুড়ে দেওয়ার কারণ–যাতে শ্রোতা বুঝে নেয় যে, মদ ও জুয়ার ব্যাপারটিও মূর্তিপূজার মতই জঘন্য অপরাধ।

ইবনে মাজার এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ شارب الخمر كعابد الوثن অর্থাৎ মদ্যপায়ী মূর্তিপূজারীর সমতুল্য অপরাধী। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে شارب الخمر كعابد اللات والعزى অর্থাৎ মদ্যপায়ী লাত ও ওযযার উপাসকেরই মত।

মোটকথা, এখানে মদ ও জুয়ার কঠোর অবৈধতা এবং এগুলোর আত্মিক ও দৈহিক ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে আত্মিক ক্ষতি رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ বাক্যে বিবৃত হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এগুলো সুস্থ বিবেকের কাছে নোংরা ও ঘৃণার্হ এবং শয়তানের চক্রান্ত জাল। এতে একবার আবদ্ধ হয়ে গেলে মানুষ অসংখ্য ক্ষতি ও মারাত্মক অনিষ্টের গর্তে নিপতিত হয়। এসব আত্মিক ক্ষতি বর্ণনা করার পর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ فَاجْتَنِبُوْهُ অর্থাৎ এগুলো যখন এমন ক্ষতিকর, তখন এগুলো থেকে বিরত ও বেঁচে থাক।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপরই নির্ভরশীল।

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে মদ ও জুয়ার জাগতিক ও বাহ্যিক ক্ষতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ -

অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে মদ ও জুয়ায় লিপ্ত করে তোমাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতার বীজ বপন করতে চায়।

আলোচ্য আয়াতগুলো যেসব ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় তা এই যে, মদের নেশায় বিভোর হয়ে এমন সব কাণ্ডকীর্তি সংঘঠিত হয়েছিল, যা প্রথমে পারস্পরিক ক্রোধ ও প্রতিহিংসা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সত্য বলতে কি, এটা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিল না বরং মদের নেশায় মানুষ যখন জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তখন এরূপ কাণ্ডকীর্তি অনিবার্যভাবেই সংঘটিত হয়ে পড়ে।

জুয়ার ব্যাপারটিও তদ্রূপ। পরাজিত ব্যক্তি যদিও তাৎক্ষণিকভাবে পরাজয় স্বীকার করে নিরস্ত হয়েও যায়, কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতি ক্রোধ, গোস্বা, শত্রুতা এর অন্যতম অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। হযরত কাতাদাহ্ (রা) এ আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ কোন কোন আরবের অভ্যাস ছিল যে, জুয়ায় পরিবার-পরিজন, অর্থ-কড়ি ও আসবাবপত্র সব খুইয়ে চরম দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন করত।

আয়াতের শেষে এগুলোর আরও একটি অনিষ্ট বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ। অর্থাৎ এগুলো তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও নামায থেকে গাফিল করে দেয়।

এটি বাহ্যত আত্মিক ও পারলৌকিক অনিষ্ট, জাগতিক অনিষ্টের পর পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে এই ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, চিরস্থায়ী জীবনই প্রকৃত প্রণিধানযোগ্য জীবন। এ জীবনের সৌন্দর্যই জ্ঞানী ব্যক্তির কাম্য হওয়া উচিত এবং এর অনিষ্টকেই ভয় করা দরকার। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য যেমন গর্বের বিষয় নয়, তেমনি এর অনিষ্টও অধিক দুঃখ ও কষ্টের কারণ নয়। কেননা, এ জীবনের সৌন্দর্য ও অনিষ্ট উভয়টিই কয়েক দিনের অতিথি।

دوران بقا چو باد صحرا بگذشت
تلخی وخوشی وزشت وزیبا بگذشت

এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও নামায থেকে গাফিল হওয়া ইহকাল ও পরকাল এবং দেহ ও আত্মা উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। পরকাল ও আত্মার জন্য যে ক্ষতিকর সে কথা বলাই বাহুল্য। কেননা, আল্লাহ্ থেকে গাফিল বে-নামাযীর পরকাল বরবাদ এবং তার আত্মা মৃত। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ থেকে গাফিল ব্যক্তির ইহকালও তার প্রাণের শত্রু হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ্ থেকে গাফিল হয়ে যখন তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্থ-সম্পদ,

মান-সম্ভ্রম ও জাঁকজমক অর্জন হয়ে যায়, তখন এগুলোও একা আসে না, বরং সাথে করে অনেক জঞ্জালও নিয়ে আসে, যা চিন্তার বোঝা হয়ে অহোরাত্র তার মস্তিষ্কে সওয়ার হয়ে থাকে। এ চিন্তায় লিপ্ত হয়ে মানুষ জীবনের আসল উদ্দেশ্য সুখ, শান্তি ও বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং আরামের কথাই ভুলে যায়। যদি কোন সময় এ অর্থ-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম ও জাঁকজমক খোয়া যায় কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন আর চিন্তার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। মোটকথা, খাঁটি দুনিয়াদার মানুষ উভয় অবস্থাতেই দুঃখ, চিন্তা-ভাবনা ও ক্লেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

اگر دنیا نباشد درد مندیم
وگر باشد بمہرش پائے بندیم

যে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ্‌র যিক্‌রে উজ্জ্বল এবং নামাযের নূর দ্বারা আলোকিত তার অবস্থা এর বিপরীত। জগতের অর্থ -সম্পদ, জাঁকজমক ও উচ্চপদ তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে এবং তাকে প্রকৃত শান্তি ও আরাম দান করে। যদি এগুলো খোয়া যায়, তবে এতে তার অন্তরে বিন্দুমাত্রও প্রতিক্রিয়া হয় না। তার অবস্থা এরূপ ঃ

نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے
بہ پیش ہمت ما ہرچہ آمد بود مہمانے

মোটকথা এই যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও নামায থেকে গাফিল হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এতে পারলৌকিক ও ইহলৌকিক উভয় প্রকার ক্ষতিই রয়েছে। এজন্য এটা সম্ভব যে, رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ বাক্যে খাঁটি আত্মিক ক্ষতি يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ বাক্যে খাঁটি জাগতিক ও শারীরিক ক্ষতি এবং تَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ বাক্যে ইহকাল ও পরকালের উভয়বিধ ক্ষতি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, নামাযও আল্লাহ্‌র যিকরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার তাৎপর্য কি ? কারণ এই যে, নামাযের গুরুত্ব এবং এটি যে আল্লাহ্‌র যিকরের উত্তম ও সেরা প্রকার, সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য নামাযকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যাবতীয় ধর্মীয়, জাগতিক, দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা করার পর এসব বস্তু থেকে বিরত রাখার জন্য অভূতপূর্ব চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ—অর্থাৎ এসব অনিষ্ট জেনে নেওয়ার পরেও কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?

উপরোক্ত আয়াতে মদ, জুয়া ইত্যাদির অবৈধতা ও কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র আইনের একটি বিশেষ ধারা। তৃতীয় আয়াতে এ নির্দেশের বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য কোরআন পাক বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি অনুসরণ করে বলেছে ঃ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ তোমাদেরই উপকারার্থ দেওয়া হয়েছে। যদি তোমরা অমান্য কর, তবে তাতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই এবং তাঁর রাসূলেরও কোন অনিষ্ট হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা যে লাভ-ক্ষতির উর্ধ্বে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। রাসূল সম্পর্কে এরূপ ধারণা হতে পারত যে, তাঁর আদেশ পালিত না হলে সম্ভবত তাঁর সওয়াব ও মর্তবা হ্রাস পাবে। এ ধারণা নিরসনের জন্য বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রাসূলের আদেশ পালন না করে, তবে তাতে তাঁর মর্তবা হ্রাস পাবে না। কারণ তাঁকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তা তিনি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পৌঁছিয়ে দেওয়া। এরপর কেউ না মানলে সে তার নিজেরই ক্ষতি করে। আমার রাসূলের এতে কিছুই যায় আসে না।

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ
أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا
عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ
صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ
مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ

وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾

(৯৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গুনাহ্ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ সৎকর্মীদেরকে ভালোবাসেন। (৯৪) হে মু'মিনগণ আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যে, শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌঁছতে পারবে—যাতে আল্লাহ্ বুঝতে পারেন যে, কে তাকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে। অতএব, যে ব্যক্তি এরপর সীমা অতিক্রম করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৯৫) মু'মিনগণ, তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে—বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসাবে কা'বায় পৌঁছতে হবে অথবা তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব—কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখবে, যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ্ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কাণ্ড করবে, আল্লাহ্ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। (৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের এবং মুসাফিরদের উপকারার্থ। আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থলভাগের শিকার, যতক্ষণ তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাক। আল্লাহ্কে ভয় কর, যার কাছে তোমরা সমবেত হবে।

যোগসূত্র ঃ লুবাব গ্রন্থে মুসনাদে-আহমদ থেকে আবূ হোরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্বোক্ত আয়াতে যখন মদ ও জুয়ার অবৈধতা অবতীর্ণ হয়, তখন কিছু সংখ্যক সাহাবী আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। অনেক মদ্যপায়ী ও জুয়াড়ী মুসলমান এগুলো অবৈধ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। এখন জানা গেল যে, এগুলো হারাম। সুতরাং তাদের কি অবস্থা হবে ? এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا—আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়।

পূর্বোক্ত يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ—আয়াতে পবিত্র বস্তুকে হারাম করে নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত ছিল। এখন يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ—আয়াতে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বস্তুকে হারাম করে দিতে পারেন। (বয়ানুল কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা যা ভক্ষণ করেছে, তজ্জন্য তাদের কোন গুনাহ্ নেই। যদি তখন তা হালাল থাকে; পরে হারাম হয়ে গেলেও যখন (গুনাহ্র কোন কারণ নেই, তাদের গুনাহ্ কিরূপে হবে, বরং গুনাহ্র পরিপন্থী একটি বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। তা এই যে), তারা (আল্লাহ্র ভয়ে তখনকার অবৈধ বস্তুসমূহ থেকে) সংযত রয়েছে এবং (এ আল্লাহ্ভীতির প্রমাণ এই যে, তারা) বিশ্বাস স্থাপন করেছে (যা আল্লাহ্ভীতির কারণ) এবং সৎকর্ম করেছে (যা আল্লাহ্ভীতির লক্ষণ এবং তদবস্থায়ই তারা সারা জীবন অতিবাহিত করেছে। যদি সে হালাল বস্তু, যা তারা ভক্ষণ করত, পরে কোন সময় হারাম হয়ে যায়, তবে) অতঃপর (তা থেকেও সে আল্লাহ্ভীতির কারণেই) সংযত হয়েছে এবং (এ আল্লাহ্ভীতির প্রমাণও আগের মত এই যে, তারা) বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং চমৎকার সৎকর্ম করেছে (যা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এখানেও আল্লাহ্ভীতির কারণ ও লক্ষণের সমাবেশ ঘটেছে। উদ্দেশ্য এই যে, যতবারই হারাম করা হয়েছে, ততবারই তাদের কর্মপন্থা এক হয়েছে—দু'তিন বারের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অতএব, পরিপন্থী এবং পরিপন্থীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা গুনাহ্গার হবে—এমনটি আমার কৃপা থেকে অনেক দূরে।) এবং (তাদের এ বিশেষ ধরনের সৎকর্মশীলতা শুধু গুনাহ্ হওয়ারই পরিপন্থী নয়, বরং সওয়াব ও প্রিয়পাত্র হওয়ারও কারণ। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (সুতরাং তারা ক্রোধের পাত্র হবে—তা কেমন করে সম্ভব ? তারা ক্রোধের পাত্র না হওয়ার সীমা অতিক্রম করে প্রিয়পাত্র হওয়ার সীমায় উন্নীত)।

হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কিছু শিকার দ্বারা পরীক্ষা করবেন যে শিকার পর্যন্ত (দূরে পলায়ন না করার কারণে) তোমাদের হাত এবং তোমাদের বর্শা পৌঁছতে পারবে। (পরীক্ষার মর্ম এই যে, ইহ্রাম অবস্থায় বন্য জন্তুর শিকার তোমাদের জন্য হারাম করে, যা পরে বর্ণিত হবে—এসব বন্য জন্তুকে তোমাদের আশেপাশে হাতের কাছে ফেরানো হবে) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা (বাহ্যতও) বুঝতে পারেন যে, কে তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে) অদৃশ্যভাবে ভয় করে (এবং হারাম কাজ থেকে—যা শাস্তির কারণ, বিরত থাকে ? এতে প্রসঙ্গক্রমে একথাও জানা গেল যে, এরূপ শিকার করা হারাম)। অতএব, যে এ উক্তির (অর্থাৎ হারাম করার) এর (পরীক্ষা দ্বারা যা বোঝা যায়—শরীয়তের) সীমা অতিক্রম করবে (অর্থাৎ নিষিদ্ধ শিকার করবে) তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত) রয়েছে। (সেমতে শিকারী জন্তু আশেপাশে হাতের কাছে ঘোরাফিরা করতো। সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই শিকারে অভ্যস্ত ছিলেন এতে তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা হচ্ছিল। তারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। অতঃপর নিষেধাজ্ঞা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হচ্ছে—) হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা বন্য জন্তু (শরীয়ত বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া) শিকার করো না, যখন তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাক (এমনিভাবে শিকারী জন্তু হেরেমের ভিতরে থাকলে তোমরা যদি ইহ্রাম অবস্থায় না-থাক, তবুও শিকার করো না) এবং তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর (এ কাজের) কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, (যা মূল্যের দিক দিয়ে) সমান হবে এ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে—যার (অনুমানের)

ফয়সালা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করবে (যারা ধার্মিকতায় এবং অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে নির্ভরযোগ্য হবে। মূল্য অনুমান করার পর বধকারীর ইচ্ছা-) হয় (এ মূল্যের এ ধরনের কোন জন্তু ক্রয় করবে যে,) তা বিনিময় (অর্থাৎ বিনিময়ের জন্তু) বিশেষভাবে চতুষ্পদ জন্তু হবে (অর্থাৎ উট, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, নর জাতীয় হোক বা মাদী) এই শর্তে যে, উৎসর্গ হিসাবে কা'বা (অর্থাৎ কা'বার নিকট) পর্যন্ত (অর্থাৎ হেরেমের সীমার ভিতরে) পৌঁছাতে হবে এবং না হয় (এ মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য) কাফ্ফারা (হিসাবে) দরিদ্রদেরকে দান করবে (অর্থাৎ একজন দরিদ্রকে একজনের ফিতরা পরিমাণ দেবে) ; এবং না হয় তার (অর্থাৎ খাদ্যশস্যের) সমপরিমাণ রোযা রাখবে (সমপরিমাণ এভাবে হবে যে, প্রত্যেক দরিদ্রের অংশ অর্থাৎ একজনের ফিতরার পরিবর্তে একটি রোযা রাখতে হবে। আর এ বিনিময় নির্ধারণের কারণ এই) যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। (ঐ ব্যক্তির অবস্থা ভিন্ন, যে জেনেশুনে শিকার বধ করে না, যদিও তার উপরও এ বিনিময়ই ওয়াজিব কিন্তু তা তার কৃতকর্মের প্রতিফল নয়। বরং সম্মানিত স্থান অর্থাৎ হেরেমের এলাকায় শিকার যা হেরেম হওয়ার কারণে সম্মানিত কিংবা ইহ্রাম বাঁধার কারণে সম্মানিতের মত হয়ে গেছে, তার প্রতিফল। এ বিনিময় আদায় করার ক্ষেত্রে) যা অতীত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করেছেন এবং যে ব্যক্তি পুনরায় এরূপ কাজ করবে, (যেহেতু অধিকাংশ পুনরাবৃত্তিতে আগের তুলনায় অধিক নির্ভীকতা থাকে, এ কারণে উল্লিখিত বিনিময় ছাড়াও, যা কৃতকর্মের প্রতিফল কিংবা স্থানের প্রতিফল, পরকালে) আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে (এ নির্ভীকতার) প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। (তবে তওবা করলে এ প্রতিশোধের কারণ বাকি থাকবে না।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। তোমাদের জন্য (ইহ্রাম অবস্থায়) সমুদ্রের (অর্থাৎ পানির) শিকার ধরা এবং তা ভক্ষণ করা (সবই) হালাল করা হয়েছে, তোমাদের (এবং তোমাদের) মুসাফিরদের (উপকারের) উপকারার্থ (যাতে সফরে একেই পাথেয় করে নিতে পারে) ; আর স্থলভাগের শিকার (যদিও কোন কোন অবস্থায় ভক্ষণ করা বৈধ, কিন্তু,) ধরা (কিংবা তাতে সহায়তা করা) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, যে পর্যন্ত তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলাকে (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় করবে, যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত (করে উপস্থিত) করা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা ঃ হেরেমের সীমার ভেতরে ইহ্রাম অবস্থায় যেসব শিকার হারাম, তা খাদ্য জাতীয় অর্থাৎ হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ হারাম জন্তু হোক-সবই হারাম।

০ বন্য জন্তুকে শিকার বলা হয়, যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে মানুষের কাছে থাকে না। সুতরাং যেসব জন্তু সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত; যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট-এগুলো জবাই করা এবং খাওয়া জায়েয।

০ তবে যেসব জন্তু দলীলের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী, সেগুলোকে ধরা এবং বধ করা হালাল। যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার। দলীল এই ঃ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (তোমাদের জন্য

সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে)। কিছু সংখ্যক স্থলভাগের জন্তু যেমন, কাক, চিল, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর প্রভৃতি বধ করাও হালাল। এমনিভাবে যে হিংস্র জন্তু আক্রমণ করে, সেটিকে বধ করাও হালাল। হাদীসে এগুলোর ব্যতিক্রম উল্লিখিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, الصيد শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত الف لام عهدى।

০ যে হালাল জন্তু ইহরাম ছাড়া অবস্থায় এবং হেরেমের বাইরে শিকার করা হয়, ইহরামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েয, যদি সে জন্তুকে শিকার করা ও বধ করার কাজে সে নিজে সহায়ক কিংবা পরামর্শদাতা কিংবা জন্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদীসে তাই বলা হয়েছে এবং আয়াতের لَا تَقْتُلُوا শব্দেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, আয়াতে لا تقتلوا (বধ করো না) বলা হয়েছে—لا تأكلوا (খেয়ো না) বলা হয়নি।

০ হেরেমের এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনেশুনে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে ভুলক্রমে বা অজ্ঞাতে বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব। (রূহুল মা'আনী)

০ প্রথম বার বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব, এমনিভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয় বার বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব হয়ে থাকে।

০ বিনিময়ের সারমর্ম এই যে, যে সময়ে এবং যে স্থানে জন্তুকে বধ করা হয়, উত্তম এই যে, দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা (একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারাও জায়েয) জন্তুর মূল্য অনুমান করাতে হবে। যদি নিহত জন্তু খাবার অযোগ্য (অর্থাৎ হারাম) হয়, তবে এর মূল্য একটি ছাগলের মূল্যের চাইতে বেশি ওয়াজিব হবে না। আর যদি জন্তুটি খাবার যোগ্য (অর্থাৎ হালাল) হয়, তবে যে পরিমাণ মূল্য অনুমান করা হবে তাই ওয়াজিব হবে। উভয় অবস্থায় পরবর্তীতে তিনটি কাজের মধ্য থেকে সে যে কোন একটি করতে পারে। হয় এ মূল্যের দ্বারা কুরবানীর শর্তানুযায়ী কোন জন্তু ক্রয় করে হেরেমের সীমানার ভেতরে তা জবাই করে গোশ্‌ত ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে, না হয় এ মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ফিতরার শর্তানুযায়ী প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা' হিসাবে দান করে দেবে এবং না হয় সে খাদ্যশস্য অর্ধ ছা হিসাবে যতজনকে দেওয়া যেত, তত সংখ্যক রোযা রাখবে। খাদ্যশস্য বন্টন এবং রোযা রাখা হেরেমের ভেতরে হওয়া শর্ত। যদি অনুমান কৃত মূল্য অর্ধ ছা' থেকেও কম হয়, তবে ইচ্ছা করলে তা একজন ফকীরকে দিয়ে দিতে পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রাখতে পারবে। এমনিভাবে প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা হিসাবে দেওয়ার পর যদি অর্ধ ছা' থেকে কম অবশিষ্ট থাকে, তবুও ইচ্ছা করলে তা এক মিসকীনকে দিয়ে দেবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রাখবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী অর্ধ ছা' পৌনে দু'সেরের সমান।

০ উল্লিখিত অনুমানে যতজন মিসকীনের অংশ সাব্যস্ত হয়, যদি তাদেরকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করিয়ে দেয় তবে তাও জায়েয।

০ যদি এ মূল্য দিয়ে যবেহ্ করার জন্য জন্তু ক্রয় করার পর কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তবে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে ইচ্ছা করলে অন্য জন্তু ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্য ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্যের হিসাবে রোযা রাখতে পারবে। জন্তু বধ করলে যেমন বিনিময়ে

ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে বস্তুকে আহত করলেও অনুমান করতে হবে যে, এ আঘাতের ফলে জন্তুটির মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অতঃপর হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য দিয়ে পূর্বোক্ত তিনটি কাজের যে কোন একটি কাজ করা জায়েয হবে।

০ ইহ্‌রাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে যে জন্তু শিকার করা হারাম সে জন্তুকে যবেহ্ করাও হারাম। তার যবেহ্‌কৃত জীবটি মৃত বলে গণ্য হবে। لا تقتلوا বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহ্‌রাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে যবেহ্ করা বধ করারই অনুরূপ।

০ যদি কোন অনাবাদী জায়গায় জন্তু বধ করা হয়, তবে নিকটতম জনবসতির বাজার দর হিসাবে মূল্য অনুমান করতে হবে।

০ শিকার কাজের জন্য ইঙ্গিত-ইশারা করা, বলে দেওয়া এবং সাহায্য করাও শিকার করার মতই হারাম।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ
وَالْقَلَآئِدَ ۚ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ
وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾

(৯৭) আল্লাহ্ সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, হেরেমে কুরবানীর জন্তুকেও যেগুলির গলায় বিশেষ ধরনের বেড়ী পরানো রয়েছে। এর কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু জানেন এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৯৮) জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল-দয়ালু। (৯৯) রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপনে কর। (১০০) বলে দিন ঃ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর—যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের কায়েম থাকার জন্য কল্যাণময় স্থিতিশীলতার কারণ বানিয়েছেন এবং (এমনিভাবে) সম্মানিত মাসসমূহকেও এবং (এমনিভাবে) হেরেমের কুরবানীর জন্তুদেরকেও এবং (এমনিভাবে) ঐসব জন্তুকেও, যাদের গলায় (একথা বোঝাবার জন্য) আভরণ থাকে যে, (এগুলো আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত এবং হেরেমে যবেহ্ করা হবে) এ (সিদ্ধান্ত অন্যান্য জাগতিক উপযোগিতা ছাড়াও ধর্মীয় উপযোগিতার) কারণে (ও) যাতে (তোমাদের বিশ্বাস বিশুদ্ধ ও পাকাপোক্ত হয়; এভাবে যে, তোমরা এসব কল্যাণকর দলীলের ভিত্তিতে) এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস প্রথমত ও পূর্ণত অর্জন কর যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অন্তর্নিহিত সব বস্তুর (পূর্ণ) জ্ঞান রাখেন। (কেননা, মানুষের কল্পনাতীত ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধি-বিধান প্রণয়ন করা পরিপূর্ণ জ্ঞানেরই পরিচায়ক)। এবং (যাতে এসব জানা বিষয়ের সাথে জ্ঞানের সম্পর্কের যুক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন কর যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (কেননা, এসব জানা বস্তুর জ্ঞান সম্পর্কে আর কেউ অবহিত করেনি। জানা গেল যে, জ্ঞানের সম্বন্ধ সব জানা বস্তুর সাথে একই রূপ হয়ে থাকে।) তোমরা নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল, করুণাময়। (অতএব, তাঁর নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করো না। মাঝে মাঝে হয়ে গেলে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তওবা করে নাও।) রাসূল (সা)-এর দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া (তিনি যথার্থভাবে পৌঁছিয়েছেন। এখন তোমাদের কাছে কোন ওযর ও বাহানা নেই) এবং আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয় পরিজ্ঞাত রয়েছেন যা কিছু তোমরা (মুখে কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা) প্রকাশ কর এবং যা কিছু (অন্তরে) গোপন রাখ। (অতএব, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তর উভয়টির মাধ্যমে তোমাদের আনুগত্য করা উচিত)। আপনি (হে মুহাম্মদ [সা], তাদেরকে একথাও) বলে দিন ঃ অপবিত্র ও পবিত্র (অর্থাৎ গুনাহ্ ও আনুগত্য কিংবা গুনাহ্গার ও আনুগত্যশীল ব্যক্তি) সমান নয়, (বরং অপবিত্র ঘৃণার্হ এবং পবিত্র গ্রহণীয়। সুতরাং আনুগত্য করে গ্রহণীয় হওয়া উচিত; অবাধ্যতা করে ঘৃণার্হ হওয়া উচিত নয়)। যদিও (হে দর্শক,) তোমাকে অপবিত্রের প্রাচুর্য (যেমন দুনিয়াতে অধিকাংশ এমনই হয়) বিস্ময়াবিষ্ট করে দেয় (যে, ঘৃণার্হ হওয়া সত্ত্বেও এর এত প্রাচুর্য কেন! কিন্তু জেনে রেখো কোন রহস্যের কারণে যে প্রাচুর্য, তা প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণ নয়। সেটা যখন প্রাচুর্যের উপর ভিত্তিশীল নয় কিংবা যখন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শাস্তির কথা জানতে পারলে।) অতএব হে বুদ্ধিমানগণ, (একে দেখো না বরং) আল্লাহ্ তা'আলাকে (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় করতে থাক যেন তোমরা (পরিপূর্ণ) সফলতা লাভ করতে পার (তা হচ্ছে জান্নাত লাভ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শান্তির চারটি উপায় ঃ প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত কা'বা। আরবী ভাষায় কা'বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বলা হয়। আরবে 'খাস্ আম' গোত্রের নির্মিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত ছিল। সে গৃহকে 'কা'বাইয়ামানিয়াহ্' বলা

হতো। তাই বায়তুল্লাহ্‌কে সে কা'বা থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্য কা'বা শব্দের সাথে البيت الحرام শব্দ যোগ করা হয়েছে।

قوام ও قيام শব্দটি اسم مصدر-এর অর্থ ঐ সব বস্তু যার উপর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাই قِيَامًا لِّلنَّاسِ-এর অর্থ হবে এই যে, কা'বা ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায়।

ناس শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে স্থানের ইঙ্গিতে বিশেষভাবে মক্কার লোকজন কিংবা আরববাসী কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেও বোঝা যেতে পারে। বাহ্যত সমগ্র বিশ্বের মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মক্কা ও আরববাসীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা তথা বায়তুল্লাহ্‌কে এবং পরবর্তীতে উল্লিখিত আরও কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত জগতের প্রতি দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকবে এবং হজ্জব্রত পালন করতে থাকবে অর্থাৎ যাদের উপর হজ্জ ফরয তারা হজ্জ করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি এক বছরকালও হজ্জব্রত পালন না করে কিংবা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে কেউ নামায আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আযাব নেমে আসবে।

কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ ঃ এ বিষয়বস্তুটি তফসীরবিদ হযরত আতা (র) এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ لو تركوه عامًا واحدًا لم ينظروا ولم يؤخروا (বাহ্‌রে মুহীত)–। এতে বোঝা গেল যে, তাৎপর্যগতভাবে খানায়ে-কা'বা সমগ্র বিশ্বের জন্য স্তম্ভ বিশেষ। যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ্জ পালিত হতে থাকবে, ততদিনই জগত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোন সময় বায়তুল্লাহ্‌র এ সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেওয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহ্‌র মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে, তার স্বরূপ জানা জরুরী নয়। যেমন, চুম্বক লোহা এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও খড়কুটোর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায়, কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহ্ ও বিশ্ব ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিশ্ব-স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা যায়। বায়তুল্লাহ্‌র সমগ্র বিশ্বের স্থায়িত্বের কারণ হওয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বাহ্যিক দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য এটি যে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ, তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।

বায়তুল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্ব শান্তির কারণ ঃ সাধারণত বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে ডাকাত, চোর, লুণ্ঠনকারীরা দুঃসাহস করতে পারে না। কিন্তু জাহিলিয়াত যুগের আরবে কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জননিরাপত্তার জন্য কোন নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না। গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের জানমাল ও মান-সম্ভ্রমের উপর যখন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। কাজেই কোন গোত্রের পক্ষে কখনও শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয়

পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মক্কার বায়তুল্লাহ্‌কে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তির উপায় করে দেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার মত ধৃষ্টতা যেমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার সাহসও তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। আল্লাহ্‌ তা'আলা জাহিলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও কুণ্ঠিত হতো না।

সে যুগের আরবদের রণোম্মাদনা ও গোত্রগত বিদ্বেষ সারা বিশ্বে প্রবাদ বাক্যের মত খ্যাত ছিল। আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরে বায়তুল্লাহ্‌ ও তার আনুষঙ্গিক বস্তু-সামগ্রীর সম্মান ও মাহাত্ম্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণের ঘোরতর শত্রু কিংবা কঠোরতর অপরাধীও যদি একবার হেরেম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার সাত খুন মাফ হয়ে যেত। তারা তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ সত্ত্বেও তাকে কিছুই বলত না। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে দেখেও তারা চক্ষু নত করে চলে যেত।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরার নিয়তে বাড়ি থেকে বের হতো কিংবা যে জন্তু হেরেম শরীফে কুরবানীর জন্য আনা হতো, তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোন অতি মন্দ ব্যক্তিও এর ক্ষতি করত না। হজ্জ ও ওমরার কোন লক্ষণ কিংবা কণ্ঠাভরণ বাঁধা অবস্থায় কোন প্রাণের শত্রুকেও তারা কিছুই বলত না।

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদল সাহাবায়ে কিরামকে সাথে করে ওমরার ইহ্‌রাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশে রওয়ানা হন। হেরেম শরীফের সীমানার সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং হযরত ওসমান (রা)-কে কয়েকজন সঙ্গীসহ মক্কায় পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা মক্কার সর্দারদেরকে বলে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়তে নয়—ওমরা আদায় করার জন্য এসেছেন। কাজেই তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

কোরাইশ সর্দাররা অনেক আলাপ-আলোচনার পর মহানবী (সা)-এর খিদমতে একজন প্রতিনিধি পাঠায়। এ প্রতিনিধিকে দেখা মাত্রই মহানবী (সা) বললেন, লোকটিকে বায়তুল্লাহ্‌র সম্মান সম্ভ্রমে গভীর বিশ্বাসী বলে মনে হয়। কাজেই চিহ্নযুক্ত কুরবানীর জন্তুগুলোকে দেখে সে নির্দ্বিধায় স্বীকার করল যে, মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহ্‌ গমনে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

মোটকথা, জাহিলিয়াত যুগেও আল্লাহ্‌ তা'আলা আরবদের মনে হেরেম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল। এ সম্মানের ফলশ্রুতিতে শুধু হেরেম শরীফের ভেতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় হজ্জ ও ওমরার জন্য আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহির্বিশ্বের লোকজন এদ্বারা কোন উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত না। কিন্তু আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ্‌ ও হেরেম শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজ্জের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদশন করা হতো। আরবরা এ মাসগুলোকে 'আসহুরে হুরুম' বা সম্মানিত মাস বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের বাইরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযত্নে বেঁচে থাকত।

এ কারণে কোরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের উপায় হিসাবে কা'বার সাথে আরও তিনটি বস্তুর উল্লেখ করেছে ঃ প্রথমত اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ অর্থাৎ সম্মান ও মহত্ত্বের মাস। এখানে شهر

শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেছেন যে, এখানে شهر حرام বলে যিলহজ্জ মাসকে বোঝানো হয়েছে। এ মাসেই হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটি একবচন হলেও অর্থের দিক দিয়ে جنس হওয়ার কারণে অন্যান্য সম্মানিত মাসও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে هدى হেরেম শরীফে যে জন্তুকে কুরবানী করা হয়, তাকে هدى বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত, তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কুরবানীর জন্তুও ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়।

তৃতীয় বস্তু قَلَائِدَ।—এটি قِلَادَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ গলার হার। জাহিলিয়াত যুগের আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজ্জের উদ্দেশে বের হলে চিহ্নস্বরূপ গলায় একটি হার পরে নিত, যাতে একে দেখে সবাই বুঝতে পারে যে, লোকটি হজ্জ করতে যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কোন কষ্ট না দেয়। কুরবানীর জন্তুর গলায়ও এ ধরনের হার পরিয়ে দেওয়া হতো। এসব হারকেও قلائد বলা হয়। এর কারণে قلائد ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায়।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, সম্মানিত মাসসমূহ কুরবানীর জন্তু এবং গলার হার এ তিনটি বস্তুই বায়তুল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের সম্মানও বায়তুল্লাহ্‌র সম্মানেরই একেকটি অংশ। সারকথা এই যে, বায়তুল্লাহ্ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য সাধারণভাবে এবং আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য বিশেষভাবে স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন।

قِيَامًا لِّلنَّاسِ এর ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ এই যে, বায়তুল্লাহ্ ও হেরেমকে সবার জন্য শান্তির আবাসস্থল করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে মক্কাবাসীদের জন্য রুযী-রোজগারের সুবিধা দান। কেননা, এখানে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সারা বিশ্বের নিজিসপত্র এখানে পৌঁছিয়ে দেন।

কেউ বলেন, মক্কাবাসীরা যেহেতু কা'বাগৃহের খাদেম ও সংরক্ষক বলে পরিচিত ছিল, তাই তাদেরকে আল্লাহ্‌র ভক্ত মনে করে সর্বদা মানুষ তাদের সম্মান করত। قِيَامًا لِّلنَّاسِ বাক্যে তাদের এ বিশেষ সম্মানকেই বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আবদুল্লাহ্ রাযী (র) বলেন, এসব উক্তির মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। এসবগুলোই উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্‌কে সব মানুষের স্থায়িত্ব, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব ও মক্কাবাসীদের বিশেষভাবে এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও বরকত দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۔

অর্থাৎ আমি বায়তুল্লাহ্ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে মানুষের জন্য স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় করেছি। আরববাসীরা বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে থাকে। এটা

এজন্য বলা হয়েছে যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে জনেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–অর্থাৎ জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। এতে বলা হয়েছে যে, হালাল ও হারামের যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযোগী। এগুলো পালন করার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা কঠোর শাস্তির কারণ। সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, মানবীয় ভুলভ্রান্তি ও ঔদাসীন্যের কারণে কোন গুনাহ্ হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তৎক্ষাণাৎ শাস্তি দেন না বরং তওবাকারী অনুতপ্ত লোকদের জন্য ক্ষমার দ্বারও উন্মুক্ত রাখেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلاَغُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ .

অর্থাৎ আমার রাসূলের দায়িত্ব এতটুকুই যে, তিনি আমার নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ও ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে আমার রাসূলের কোনই ক্ষতি নেই। একথাও জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন–সব কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ لاَّ يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ–আরবী ভাষায় طيب ও خبيث দু'টি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে طيب এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে خبيث বলা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে خبيث শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং طيب শব্দ দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতেও পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না।

এক্ষেত্রে خبيث ও طيب শব্দ দু'টি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ–সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোন সুস্থ বিবেকবানের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সমান নয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার কাছে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। এমনিভাবে ভাল ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোকও সমান নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ অর্থাৎ যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় এবং আশেপাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভাল বলে মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ।

আয়াতের শানে নযুল ঃ এ আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি মদের ব্যবসা করত এবং এ পথে বেশ অর্থ-সম্পদও উপার্জন করেছিল। ইসলামে মদ্যপান ও মদের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে গেলে সে লোক মহানবী (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মদের ব্যবসা দ্বারা সঞ্চিত যেসব টাকা-পয়সা আমার কাছে রয়েছে, সেগুলো কোন সৎকাজে ব্যয় করে দিলে আমার জন্য উপকার হবে কি ? মহানবী (সা) বললেন, যদি তুমি এসব টাকা-পয়সা হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি কাজেও ব্যয় কর, তবুও তা আল্লাহ্র কাছে মাছির ডানার সমানও মূল্যবান হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

এ হচ্ছে পরকালের দিক দিয়ে হারাম মালের অমর্যাদা। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এবং প্রত্যেক কাজের শেষ পরিণতিকে সামনে রাখলে বোঝা যায় যে, জগতের কাজ-কারবারেও হারাম ও হালাল মাল সমান নয়। হালাল মাল দ্বারা যতটুকু উপকার, সুফল এবং সত্যিকার সুখ-শান্তি লাভ করা যায়, হারাম মাল দ্বারা তা কখনও লাভ করা যায় না।

তফসীর দুররে-মনসূরে ইবনে আবী-হাতেমের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, তাবেয়ীদের যমানার খলীফায়ে-রাশেদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ পূর্ববর্তী খলীফাদের আরোপিত অবৈধ কর রহিত করে দেন এবং যাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ-কড়ি আদায় করা হয়েছিল, তা সবই ফেরত দিয়ে দেন। ফলে সরকারী ধনাগার শূন্য হয়ে যায় এবং আমদানী সীমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখে জনৈক প্রাদেশিক গভর্নর খলীফার কাছে পত্র লিখলেন যে, সরকারী আমদানী অনেক হ্রাস পেয়েছে। এখন সরকারী কাজ-কারবার কিভাবে চলবে, তা-ই চিন্তার বিষয়। খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ উত্তরে আলোচ্য لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ আয়াতটি লিখে অতঃপর লিখলেন ঃ তোমার পূর্ববর্তী গভর্নররা অন্যায় ও অত্যাচারের মাধ্যমে ধনাগার যতটুকু পূর্ণ করেছিল, তুমি এর বিপরীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় ধনাগারকে ততটুকু হ্রাস করে নাও এবং কোন পরওয়া করো না। আমাদের সরকারী কাজকর্ম টাকা-পয়সা দিয়েই পূর্ণ হবে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও এর ব্যাপক অর্থ এই যে, সংখ্যার কমবেশী কোন বিষয় নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যাল্পতা দ্বারা কোন বস্তুর ভালমন্দ যাচাই করা যায় না। মাথার উপর হাত গণনা করে ৫১ হাতকে ৪৯ হাতের বিপক্ষে সত্য ও সত্যবাদিতার মাপকাঠি বলা যায় না।

বরং জগতের সকল স্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভাল বিষয়ের পরিমাণ ও সংখ্যা কম এবং মন্দ বিষয়ের সংখ্যা অধিক। ঈমানের বিপরীতে কুফর; আল্লাহ্ভীতি, পবিত্রতা ও ধার্মিকতার বিপরীতে পাপাচার ও অন্যায়াচরণ; ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীতে জুলুম ও উৎপীড়ন, জ্ঞানের বিপরীতে অজ্ঞানতা এবং সুবুদ্ধির বিপরীতে কুবুদ্ধির প্রাচুর্য বিদ্যমান। এতে এরূপ বিশ্বাসই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, কোন বস্তু কিংবা কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সে বস্তু বা দলের ভাল ও সত্যপন্থী হওয়ার প্রমাণ কিছুতেই হতে পারে না। বরং কোন বস্তুর উৎকৃষ্টতা ব্যক্তিগত অবস্থা ও হাল-হকীকতের উপরই তা নির্ভরশীল। অবস্থা ও হাল-হাকীকত

ভাল হলে বস্তুটি ভাল; নতুবা মন্দ। কোরআন পাক এ সত্যটিই وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ বাক্যে ফুটিয়ে তুলেছে।

অবশ্য ইসলামও কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যকে চূড়ান্ত মীমাংসা সাব্যস্ত করেছে। তবে তা ঐসব ক্ষেত্রেই, যেখানে যুক্তির সারবত্তা ও ব্যক্তিগত গুণাগুণ যাচাই করার মত কোন ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা বিদ্যমান নেই। এক্ষেত্রে জনগণের বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য সংখ্যাধিক্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। উদাহরণত গভর্নর নিযুক্তির প্রশ্নে যদি কোন নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী শাসনকর্তার অভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে জনগণের মতানৈক্য পরিহারের লক্ষ্যে সংখ্যাধিক্যকেই অগ্রগণ্য মনে করা হয়। এর অর্থ কখনোই এমন নয় যে, অধিক সংখ্যক লোক যে কাজ করবে, তাই হালাল, বৈধ ও সত্য হবে।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ হে জ্ঞানবানগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বস্তুর সংখ্যাধিক্য কামনা করা কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যালঘুতার বিপরীতে সত্যের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা বুদ্ধিমানদের কাজ নয়। তাই বুদ্ধিমানদেরকে সম্বোধন করে এ ভ্রান্ত কর্মপন্থা থেকে বিরত রাখার জন্য فَاتَّقُوا اللّٰهَ আদেশ দেওয়া হয়েছে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾

(১০১) হে মু'মিনগণ! এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল। (১০২) এরূপ কথাবার্তা তোমাদের পূর্বে এক সম্প্রদায় জিজ্ঞেস করেছিল। এরপর তারা এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ে গেল। (১০৩) আল্লাহ্ 'বহিরা', সায়েবা 'ওছীলা' এবং 'হামী'কে শরীয়তসিদ্ধ করেন নি। কিন্তু যারা কাফির, তারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তাদের অধিকাংশেরই বিবেকবুদ্ধি নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসীগণ! এমন (অনর্থক) কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না (যাতে এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে), যদি তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়, তবে তোমাদের কষ্টের কারণ হবে (অর্থাৎ এরূপ সম্ভাবনা আছে যে, উত্তর তোমাদের মনোবাঞ্ছনার বিপরীতে হওয়ার ফলে তা তোমাদের জন্য কষ্টকর হবে) এবং (যেসব কথাবার্তায় এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে যে,) যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব কথাবার্তা জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্য পরিব্যক্ত করা হবে (অর্থাৎ প্রশ্ন করার মধ্যে এ দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও রয়েছে যে, উত্তর ব্যক্ত করা হবে এবং উত্তর ব্যক্ত করার মধ্যে প্রথমোক্ত সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তোমাদের পক্ষে তা কষ্টকর হবে। এতদুভয় সম্ভাবনাই সমষ্টিগতভাবে প্রশ্ন করতে নিষেধ করার কারণ এবং সম্ভাবনাদ্বয় বাস্তব। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ।) অতীত প্রশ্নাবলী (যা এ পর্যন্ত তোমরা করেছ, তা) আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেছেন (কিন্তু ভবিষ্যতে আর এমন করো না।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, (তাই অতীত প্রশ্নাবলী ক্ষমা করেছেন এবং) অত্যন্ত সহিষ্ণু-(তাই ভবিষ্যতের বিরুদ্ধাচরণ হেতু ইহ্কালে শাস্তি না দিলে মনে কারো না যে, পরকালেও শাস্তি হবে না) এমন কথা তোমাদের পূর্বে (অর্থাৎ পূর্বকালে) অন্য উম্মতের লোকেরাও (নিজেদের পয়গম্বরগণকে) জিজ্ঞেস করেছিল, এরপর (উত্তর পেয়ে) এগুলোর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেনি। (অর্থাৎ বিধি-বিধান সম্পর্কিত এসব উত্তর অনুযায়ী তারা কাজ করেনি এবং যেসব উত্তর বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত ছিল, সেগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করেনি। সুতরাং তোমরাও যাতে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়ে পড়, এজন্য এ ধরনের প্রশ্ন না করাই উত্তম।) আল্লাহ্ তা'আলা 'বহীরা', 'সায়েবা', 'ওছীলা' এবং 'হামী'কে শরীয়তসিদ্ধ করেন নি, কিন্তু যারা কাফির, তারা (এসব কুপ্রথার ব্যাপারে) আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে (যে, আল্লাহ্ এসব কর্মে সন্তুষ্ট) এবং অধিকাংশ কাফির (ধর্মীয়) বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী নয় (এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, বরং তাদের বড়দের দেখাদেখি এহেন মূর্খজনোচিত কাজ করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অনাবশ্যক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্র বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাঁটাঘাঁটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেওয়া হয়নি, সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

শানে নযুল ঃ মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে নযুল এই যে, যখন হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন আকরা ইবনে হারেস (রা) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য কি প্রতি বছরই হজ্জ করা ফরয? রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী তৃতীয়বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বললেন ঃ যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হ্যাঁ, প্রতি বছরই হজ্জ ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন

করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই না, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দিও–ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উম্মত বেশি প্রশ্ন করেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ্ ও রাসূল যেসব বিষয় ফরয করেন নি, তারা প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দিই সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজে নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত (অর্থাৎ যেসব বিষয়ে আমি নীরব থাকি, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না)।

মহানবী (সা)-এর পর নবুয়ত ও ওহী আগমনের সমাপ্তি ঃ এ আয়াতের একটি প্রাসঙ্গিক বাক্যে বলা হয়েছে ঃ اِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ — অর্থাৎ কোরআন অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ প্রশ্ন কর, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে। এতে 'কোরআন অবতরণকাল' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুয়ত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেওয়া হবে।

নবুয়তের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না এবং যা ফরয নয়, তা ফরয হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারও গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে না তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরি করে করে সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা, এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলমান ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে। আজকাল অনেক মুসলমান অনর্থক বিষয়াদির তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। মূসা (আ)-এর মায়ের নাম কি ছিল, নূহ (আ)-এর নৌকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কি ছিল, ইত্যাকার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক মানুষের কর্মের সাথে নেই। উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, এ জাতীয় প্রশ্ন করা নিন্দনীয়, বিশেষ করে যখন একথাও জানা যায় যে, এরূপ প্রশ্নকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মাস'আলা সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে। অনর্থক কাজে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে মানুষ জরুরী কাজ থেকে বঞ্চিত থাকে। অতীতে ফিকহ্‌বিদ আলিমরা মাস'আলা-মাসায়েলের অনেক কাল্পনিক দিক বের করে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এগুলো জরুরী ছিল। তাই এসব প্রশ্ন অনর্থক ও অনাবশ্যক ছিল না। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোন দীনী কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কোন জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়।

বহীরা, সায়েবা ইত্যাদির সংজ্ঞা ঃ 'বহীরা', 'সায়েবা', 'হামী'–প্রভৃতি সবই জাহিলিয়াত যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরবিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর। আমরা সহীহ্ বুখারী থেকে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি।

'বহীরা' এমন জন্তুকে বলা হয় যার দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হতো এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না।

'সায়েবা' ঐ জন্তু, যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশের ষাঁড়ের মত ছেড়ে দেওয়া হতো। 'হামী' পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমণ সমাপ্ত করে। এরূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো।

'ওছীলা' যে উট উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। জাহিলিয়াত যুগে এরূপ উষ্ট্রীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো।

এসব শিরকের নিদর্শনাবলী তো ছিলই; তদুপরি যে জন্তুর গোশ্‌ত, দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া' আল্লাহ্‌র আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তাদি আরোপ করে সে জন্তুকে হালাল ও হারাম করার অধিকার তারা কোথায় পেল ? মনে হয় তারা শরীয়ত প্রণেতার পদে নিজেরাই আসীন হয়ে গিয়েছিল। আরও অবিচার এই যে, নিজেদের এসব মুশরিকসুলভ কুপ্রথাকে তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে করত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনও এসব প্রথা নির্ধারণ করেন নি বরং তাদের বড়রা আল্লাহ্‌র প্রতি এ অপবাদ আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ জনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। মোটকথা, এখানে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অনর্থক প্রশ্ন করে শরীয়তের বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরীয়ত প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া স্বীয় অভিমত ও প্রবৃত্তি দ্বারা হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরও বড় অপরাধ।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

(১০৪) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান এবং রাসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপদাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপদাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং হিদায়েত প্রাপ্ত না হয়, তবুও কি তারা তাই করবে ? (১০৫) হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে।

যোগসূত্র ঃ উপরে কুপ্রথায় বিশ্বাসী কাফিরদের একটি মূর্খতা বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে এ ধরনের অনেক মূর্খতা বিদ্যমান ছিল, যা শুনে মুসলমানরা দুঃখ ও বেদনা অনুভব করত। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা কেন দুঃখিত হও ? তোমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, তোমরা নিজের সংশোধন এবং সাধ্যমত অপরের সংশোধনে যত্নবান হও। প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়ার ব্যাপারটি তোমাদের ইখতিয়ার বহির্ভূত। তাই নিজের কাজ কর–অপরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বিধান নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূল (সা)-এর দিকে (যাঁর প্রতি সেসব বিধান অবতীর্ণ হয়েছে) এস। (যে বিষয়ের আলোকে সত্য প্রমাণিত হয়, তাকে সত্য মনে কর এবং যা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাকে মিথ্যা মনে কর,) তখন তারা বলে ঃ (আমাদের এসব বিধান ও রাসূলের প্রয়োজন নেই।) আমাদের জন্য ঐ (রীতিনীতিই) যথেষ্ট, যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদের জন্য সে রীতিনীতি সর্বাবস্থায়ই কি যথেষ্ট হবে ?) যদি তাদের পিতৃপুরুষরা (ধর্মের) কোন জ্ঞান না রাখে এবং (কোন ঐশী গ্রন্থের) হিদায়েত না রাখে (তবুও কি) ? হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজের (সংশোধনের) চিন্তা কর। (এ কাজটিই তোমাদের আসল কর্তব্য। অপরের সংশোধনের বিষয়টি হলো এই যে, তোমরা যখন সাধ্যানুযায়ী এ সংশোধনের চেষ্টা করছ; কিন্তু ফলপ্রসূ হচ্ছে না, তখন তোমরা ফলপ্রসূ না হওয়ার চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ো না। কেননা) তোমরা যখন (দীনের) পথে চলছ (এবং দীনের জরুরী কর্তব্য পালন করে যাচ্ছ অর্থাৎ নিজের সংশোধন করছ এবং অপরের সংশোধনের চেষ্টা করে যাচ্ছ) তখন যে ব্যক্তি (তোমাদের সংশোধন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও) পথভ্রষ্ট থাকে, তার (পথভ্রষ্ট থাকার) কারণে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। (সংশোধন ইত্যাদি কাজে সীমাতিরিক্ত চিন্তিত হতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, তদ্রূপ নিরাশ হয়ে ক্রোধবশত ইহকালেই তাদের প্রতি শাস্তি অবতরণ কামনা করাও নিষিদ্ধ।) কেননা, সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত মীমাংসা পরকালেই হবে। (সেমতে) আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন হবে। অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে, তা তোমাদের সবাইকে বলে দেবেন (এবং বলে দিয়ে সত্যের বিনিময়ে সওয়াব এবং মিথ্যার বিনিময়ে আযাবের আদেশ কার্যকর করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নযূল ঃ জাহিলিয়াত যুগে যেসব কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছিল অন্যতম। এ কুপ্রথাই তাদেরকে কুকর্মে লিপ্ত ও সৎকর্ম থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। তফসীর দুররে মনসূরে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি সত্যোপলব্ধির ফলে মুসলমান হয়ে যেত, তবে তাকে এমনভাবে ধিক্কার দেওয়া হতো যে, তুই আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে বেওকুফ সাব্যস্ত করেছিস্। তাদের রীতিনীতি ত্যাগ করে অন্য তরীকা অবলম্বন করেছিস্। তাদের এ অন্ধ বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই এ

আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا .

অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হতো যে, তোমরা আল্লাহ্র অবতীর্ণ সত্য বিধানাবলী ও রাসূলের দিকে এস, যা সর্বদিক দিয়ে উপযোগী এবং তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্যের রক্ষাকবচ, তখন তারা এছাড়া কোন উত্তর দিত না যে, আমরা বাপদাদাদেরকে যে তরীকায় পেয়েছি, আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট।

এ শয়তানী যুক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করেছে। কোরআন পাক এর উত্তরে বলে ঃ اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـئًا চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে যে, কোরআন পাকের এ বাক্যটি কোন ব্যক্তি অথবা দলের অনুসরণ করার ব্যাপারে একটি বিশুদ্ধ মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। ফলে অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে এবং মূর্খ ও গাফিলদের জন্য সত্য প্রকাশের পথ খুলে গেছে। মূলনীতিটি এই যে, অজ্ঞরা জ্ঞানবানদের, অনভিজ্ঞরা অভিজ্ঞদের এবং মূর্খরা জ্ঞানীদের অনুসরণ করবে—একথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও হিদায়েতের মাপকাঠি পরিত্যাগ করে বাপদাদা কিংবা ভাই-বন্ধুদের অনুসরণকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। অনুসৃত ব্যক্তি নিজে কোথায় যাচ্ছে এবং অনুসারীদেরকেই বা কোথায় নিয়ে যাবে একথা না জেনে তার পদাঙ্ক অনুসরণে লেগে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনিভাবে কিছু সংখ্যক লোক বেশি মানুষের সমাগমকেই অনুসরণের মাপকাঠি মনে করে। যার কাছে মানুষের ভিড় দেখে তারা তারই অনুসরণে লেগে যায়। এটিও একটি অযৌক্তিক কাজ। কেননা, জগতে সব সময়ই বেওকুফ, নির্বোধ ও কুকর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই মানুষের ভিড়ই সত্যাসত্য ও ভালমন্দ চিহ্নিত করার মাপকাঠি হতে পারে না।

অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা ধ্বংস ডেকে আনার শামিল ঃ কোরআন পাকের এ বাক্যের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে, বাপদাদা, ভাই-বেরাদর ইত্যাদি কেউ অনুসৃত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার গতিপথ নির্ধারণ করা জরুরী। এরপর তা অর্জনের জন্য দেখা দরকার যে, এমন ব্যক্তি কে, যার লক্ষ্য অর্জনের পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে এবং এ পথে নিজেও চল্ছেন! এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে তাঁর অনুসরণ অবশ্যই মনযিলে-মকসুদে পৌঁছাতে পারে। মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের তাৎপর্যও তাই। তাঁরা দীন সম্পর্কে যেমন সম্যক অবগত, তেমনি নিজেরাও এ পথেই চলেন। তাই অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের অনুসরণ করে ধর্মের লক্ষ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই বিপথগামী, যার মনযিলে-মকসুদ জানা নেই কিংবা জেনেশুনে বিপরীত দিকে ধাবমান, তার পেছনে চলা জ্ঞানী মাত্রের দৃষ্টিতেই নিজ প্রচেষ্টা ও কর্মকে বিনষ্ট করার শামিল, বরং ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। দুঃখের বিষয়, বর্তমান জ্ঞান-গরিমা ও আধুনিকতার যুগেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সত্যের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। বর্তমান ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে অযোগ্য ও ভ্রান্ত নেতাদের অনুসরণ।

অনুসরণের মাপকাঠি ঃ কোরআন পাকের এ বাক্য দু'টি বিষয়কে অনুসরণের যুক্তিযুক্ত ও সুস্পষ্ট মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে ঃ একটি علم ও অপরটি اهتداء। এখানে علم এর অর্থ মনযিলে-মকসুদ ও মনযিলে-মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছার পথ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং اهتداء এর অর্থ এ লক্ষ্যের পথে চলা অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্ম।

সারকথা এই যে, অনুসরণ করার জন্য যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে প্রথম দেখে নেবে যে, অভীষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যের পথ সম্পর্কে সে অবগত কি না। এরপর দেখবে, সে নিজেও সে পথেই চলছে কি না এবং তার কর্ম তার জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না।

মোটকথা, কাউকে অনুসৃতব্য সাব্যস্ত করার জন্য তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরী। শুধু বাপদাদা হওয়া কিংবা অনেক মানুষের নেতা হওয়া অথবা ধনাঢ্য হওয়া কিংবা রাষ্ট্রের অধিপতি হওয়া ইত্যাদি কোনটিই অনুসরণের মাপকাঠি হওয়ার যোগ্য নয়।

কারও সমালোচনা করার কার্যকরী পন্থা ঃ কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে বাপদাদার অনুসরণে অভ্যস্ত লোকদের বিভ্রান্তি ব্যক্ত করার সাথে সাথে অন্যের সমালোচনা ও তার বিভ্রান্তি প্রকাশ করার একটি কার্যকরী পন্থাও শিক্ষা দিয়েছে। এ পন্থায় সমালোচনা করলে সমালোচিত ব্যক্তি ব্যথিত কিংবা উত্তেজিত হয় না। কেননা, পৈতৃক ধর্ম অনুসরণকারীদের জওয়াবে কোরআন পাক একথা বলেনি যে, তোমাদের বাপদাদা মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। বরং বিষয়টিকে প্রশ্নের আকারে বলেছে ঃ বাপদাদার অনুসরণ তখনও কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে, যখন বাপদাদার মধ্যে না থাকে জ্ঞান এবং না থাকে সৎকর্ম ?

যারা মানুষের সংশোধন চিন্তা করে তাদের জন্য একটি সান্ত্বনা ঃ দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের সংশোধন চিন্তায় সবকিছু বিসর্জনকারী মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ সত্যপ্রচার ও শিক্ষায় তোমাদের সাধ্যমত চেষ্টা এবং যথাযথ হিতাকাঙ্ক্ষার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্টতায়ই ডুবে থাকে, তবে এর জন্য মোটেই চিন্তিত হয়ো না। এমতাবস্থায় অন্যের পথভ্রষ্টতার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ .

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা নিজের চিন্তা কর। তোমরা যখন সঠিক পথে চলছ, তখন যে বিপথগামী, তার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি নেই।

এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট; অন্যরা যা ইচ্ছা করুক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি কোরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থী। সেসব আয়াতে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ' করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি 'সৎকাজে আদেশ দান'-এর পরিপন্থী নয়। তোমরা যদি 'সৎকাজে আদেশ

দান' পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। এজন্যই তফসীর বাহ্রে-মুহীতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে—তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। জিহাদ এবং 'সৎকাজে আদেশ দান'-ও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কোরআনের اهْتَدَيْتُمْ ।اِذَا শব্দে চিন্তা করলে এ তফসীরের যথার্থতা ফুটে ওঠে। কেননা, এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি 'সৎকাজে আদেশ দানে'র কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়।

তফসীর দুররে-মনসূরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তাঁকে কোন এক ব্যক্তি বলল যে, অমুক অমুক ব্যক্তির মধ্যে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ রয়েছে। তারা একে অপরকে মুশরিক বলে অভিহিত করে। হযরত ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ তুমি কি মনে কর যে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাকে আদেশ করব ? কখনই নয়। যাও তাদেরকে নম্রতার সাথে বোঝাও। যদি মানে, উত্তম; নতুবা তাদের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর। অতঃপর এ উক্তির প্রমাণ হিসাবে তিনি আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

পাপ দমন সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর একটি ভাষণ ঃ আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এক ভাষণে বললেন ঃ তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ এবং বলছ যে, 'সৎকাজে আদেশ দান'-এর প্রয়োজন নেই। জেনে রাখ, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে শুনেছি ঃ যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ্ তা'আলা সত্বরই হয়তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাউদের ভাষায় হাদীসটি এরূপ ঃ যারা কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) বাধা দেয় না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবাইকে একযোগে আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

معروف ও منكر -এর অর্থঃ পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা জানা গেল যে, منكر অর্থাৎ অবৈধ কার্যাবলী দমন করা কিংবা কমপক্ষে ঘৃণা প্রকাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এখন জানা দরকার যে, معروف ও منكر কাকে বলে?

معروف শব্দটি معرفة এবং منكر শব্দটি انكار থেকে উদ্ভূত। معروف বলা হয় কোন বস্তুকে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে বোঝা ও চেনা। এর বিপরীতে انكار বলে, না বোঝা ও না চেনা দুটি শব্দই বিপরীতমুখী। কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও সামর্থ্যের বিকাশ দেখে তাঁর নিয়ামতসমূহকে চেনে, এরপর একগুঁয়েমিবশত সেগুলোকে এমনভাবে অস্বীকার করে, যেন এগুলোকে চেনেই না। এতে বোঝা গেল যে, আভিধানিক দিক দিয়ে معروف এর অর্থ পরিচিত বস্তু এবং منكر এর অর্থ

অপরিচিত বস্তু। এ অর্থের সাথে সংগতি রেখে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআন' গ্রন্থে শরীয়তের পরিভাষায় معروف ও منكر এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ معروف ঐ কর্মকে বলা হয় যার উত্তম হওয়া যুক্তি কিংবা শরীয়তের মাধ্যমে জানা যায়। আর منكر এমন কাজকে বলা হয় যা যুক্তি ও শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরিচিত অর্থাৎ মন্দ মনে করা হয়। তাই امر بالمعروف। অর্থ হচ্ছে সৎ কাজে আদেশ দান এবং نهى عن المنكر। অর্থ অসৎ কাজে নিষেধ করা।

মুজতাহিদ ইমামদের বিভিন্ন উক্তিতে কোন শরীয়তগত منكر নেই ঃ

কিন্তু এতে গুনাহ্ বা সওয়াব কিংবা মান্যকরণ ও অমান্যকরণ না বলে معروف ও منكر শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য যে, যেসব সূক্ষ্ম ও ইজতিহাদী মাস'আলায় কোরআন ও সুন্নাহর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কিংবা অস্পষ্টতার কারণে ফিকহ্‌বিদরা বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, সেগুলো এর আওতাভুক্ত নয়। মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদ আলিম সমাজে স্বীকৃত। তারা যদি কোন মাস'আলায় ভিন্নমুখী দুটি মত ব্যক্ত করেন, তবে উভয়ের মধ্যে কোনটিকেই শরীয়তগত منكر বলা যায় না। বরং উভয় মতই معروف এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ মাস'আলায় যে ব্যক্তি একটি মতকে প্রবল মনে করে, অপরটিকে গুনাহ্ হিসাবে অগ্রাহ্য করার অধিকারও তার নেই। এ কারণেই সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে অনেক ইজতিহাদী মতবিরোধ ও পরস্পর বিরোধী মতামত থাকা সত্ত্বেও কোথাও একথা বর্ণিত নেই যে, তাঁরা একে অপরকে ফাসিক কিংবা গুনাহ্‌গার বলেছেন। বাহাস-বিতর্ক, কথা কাটাকাটি ইত্যাদি সবই হতো এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করতেন, কিন্তু এ মতবিরোধের কারণে একজন অপরজনকে গুনাহ্‌গার মনে করতেন না।

সারকথা এই যে, ইজতিহাদী মতবিরোধের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি যে মতকে প্রবল মনে করেন তাই গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ভিন্নমতকে منكر মনে করে অগ্রাহ্য করার অধিকার কারও নেই। এতে বোঝা গেল, আজকাল ইজতিহাদী মাস'আলা সম্পর্কে কোন কোন মহল থেকে যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা করা হয়, সেগুলো 'সৎকাজে আদেশ দান' ও 'অসৎকাজে নিষেধকরণের' অন্তর্ভুক্ত নয়, নিছক অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই এসব মাসআলাকে রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয়।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا

نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلٰٓى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا

فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰنِ

فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ إِنَّآ

إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ ذٰلِكَ أَدْنٰٓى أَنْ يَّأْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ

أَوْ يَخَافُوْٓا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌۢ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۗ وَاللّٰهُ

لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾

(১০৬) হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ দুজনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহ্র নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহ্র সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গুনাহ্গার হব। (১০৭) অতঃপর যদি জানা যায় যে, উভয় ওসী কোন গুনাহে জড়িত রয়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে গুনাহ্ হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে মৃত ব্যক্তির নিকটতম দু'ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর আল্লাহ্র নামে কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যের চাইতে অধিক সত্য এবং আমরা সীমা অতিক্রম করিনি। এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই অত্যাচারী হব। (১০৮) এটি এ বিষয়ের নিকটতম উপায় যে, তারা ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে অথবা আশংকা করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেওয়ার পর আবার কসম চাওয়া হবে। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং শোন, আল্লাহ্ দুরাচারীদেরকে পথ-প্রদর্শন করবেন না।

যোগসূত্র ঃ পূর্বে ধর্মীয় কল্যাণ সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখন জাগতিক কল্যাণ সম্পর্কে কিছু বিধান উল্লেখ করা হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় পরকাল সংশোধনের মতই ইহকালেরও সংশোধন করেন। (বয়ানুল কোরআন)

শানে নযুল ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, বুদাইল নামক জনৈক মুসলমান তামীম ও আদী নামক দু'জন খ্রিস্টানের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করে। সিরিয়া পৌঁছেই বুদাইল অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে স্বীয় অর্থসম্পদের একটি তালিকা লিখে

আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয় এবং বিষয়টি সঙ্গীদ্বয়ের কাছে গোপন রাখে। অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে সে খ্রিস্টান সঙ্গীদ্বয়কে ওসীয়ত করে যে, আমার মৃত্যু হলে আমার যাবতীয় আসবাবপত্র ওয়ারিসদের কাছে পৌঁছে দেবে। সেমতে বুদাইলের মৃত্যুর পর তার আসবাবপত্র এনে ওয়ারিসদের কাছে সমর্পণ করে, কিন্তু স্বর্ণের কারুকার্য খচিত একটি রূপার পেয়ালা তার আসবাবপত্র থেকে তুলে নেয়। ওয়ারিসরা আসবাবপত্রের মধ্যে তালিকা পেয়ে পেয়ালার কথা জানতে পারে। তারা খ্রিস্টানদ্বয়কে জিজ্ঞেস করল যে, মৃত ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার পর কোন আসবাবপত্র বিক্রি করেছিল কি না? কিংবা অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা ইত্যাদিতে কিছু সম্পদ ব্যয় হয়েছে কি না? তারা উভয়ই এ প্রশ্নের না বোধক উত্তর দেয়। অবশেষে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদালতে উপস্থিত হয়। ওয়ারিসদের কোন সাক্ষী ছিল না। তাই খ্রিস্টানদ্বয়কে আদেশ করা হলো ঃ তোমরা কসম খেয়ে বল যে, তোমরা মৃত ব্যক্তির আসবাবপত্রের মধ্য থেকে কোন কিছু আত্মসাৎ করনি এবং কোন বস্তু গোপন করনি। অবশেষে তাদের কসম অনুযায়ী মোকদ্দমার রায় তাদের পক্ষে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর প্রকাশ পেল যে, তার উপরোক্ত পেয়ালাটি মক্কার জনৈক স্বর্ণকারের কাছে বিক্রি করেছে। জিজ্ঞেস করার পর তারা উত্তর দিল যে, আমরা পেয়ালাটি মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম; কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের কোন সাক্ষী না থাকায় আমরা ইতিপূর্বে মিথ্যারোপের ভয়ে তা উল্লেখ করিনি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসীগণ ! তোমাদের পরস্পরের মধ্যে (অর্থাৎ পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে উদাহরণত ওয়ারিসদেরকে মাল সোপর্দ করার জন্য) দু'ব্যক্তি ওসী হওয়া সমীচীন, (অবশ্য একজনের সামনে করাও জায়েয) যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় (অর্থাৎ যখন ওসীয়ত করার সময় হয়)। (তবে) ঐ দু'ব্যক্তিকে ধর্মপরায়ণ হতে হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে (অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে) হতে হবে কিংবা বিজাতীয় দু'ব্যক্তি হবে যদি (মুসলমান পাওয়া না যায়। উদাহরণত) তোমরা সফরে যাও অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর বিপদ আপতিত হয়। (এসব বিষয় ওয়াজিব নয়, তবে সমীচীন ও উত্তম। নতুবা কাউকে ওসী না করাও যেমন জায়েয, তেমনি একজন ওসী হওয়া কিংবা ধর্মপরায়ণ না হওয়া অথবা স্বগৃহে অবস্থানকালে অ-মুসলিমকে ওসী করা সবই জায়েয। অতঃপর ওসীদের বিধান এই যে,) যদি (কোন কারণে তাদের প্রতি) তোমাদের (অর্থাৎ ওয়ারিসদের) সন্দেহ হয়, তবে (হে বিচারপতিগণ, মামলা এভাবে মীমাংসা কর যে, প্রথমে বাদী ওয়ারিসদের এ বিষয়ে সাক্ষী তলব করবে যে, তারা অমুক বস্তু উদাহরণত পেয়ালা নিয়ে গেছে। যদি তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে বিবাদী ওসীদের কাছ থেকে এভাবে কসম নেবে যে,) উভয় (ওসী)-কে নামাযের (উদাহরণত আসরের) পর (উপস্থিত) থাকতে বলবে। (কেননা, সাধারণত এ সময় জনসমাগম বেশি থাকে, তাই মিথ্যা কসম খেতে কিছু না কিছু লজ্জাবোধ করবে। এছাড়া সময়টিও মহিমামণ্ডিত, এদিকেও কিছু খেয়াল থাকবে। এর উদ্দেশ্য জনসমাবেশের স্থান ও বরকতের সময় দ্বারা কসমকে কঠোরতর করা।) অতঃপর উভয়ই (এভাবে) আল্লাহ্র কসম খাবে যে, (শপথবাক্য

সহকারে এরূপ বলবে—) আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন (জাগতিক) উপকার গ্রহণ করতে চাই না (যে, জাগতিক উপকার লাভের জন্য কসমে সত্য বলা পরিহার করব)। যদিও (এ ঘটনায় আমাদের) কোন আত্মীয়ও হয় (যার উপকারকে আমরা নিজের উপকার ভেবে মিথ্যা কসম খেতাম; এখন তো এরূপও কেউ নেই—যখন নিষিদ্ধ উপকারের কারণেও আমরা মিথ্যা বলতাম না, তখন এর উপকারের কারণে আমরা কেন মিথ্যা বলব?) এবং আল্লাহ্র (পক্ষ থেকে যে) কথা (বলার নির্দেশ আছে, তা) আমরা গোপন করব না, (নতুবা যদি) আমরা (এরূপ করি) এমতাবস্থায় কঠোর গুনাহ্গার হবে। (এটি উক্তিগত কঠোরতা—এর উদ্দেশ্য সত্যবাদিতা জরুরী হওয়া, মিথ্যা হারাম হওয়া এবং আল্লাহ্র মাহাত্ম্যের ধারণাকে চিন্তায় জাগ্রত করা, যা মিথ্যা শপথে বাধা দান করে। বর্ণিত কঠোরতার পর যদি বিচারক উপযুক্ত মনে করেন, তবে কঠোরতা ছাড়াই আসল বিষয়বস্তুর কসম খাবে। উদাহরণত মৃত ব্যক্তি আমাদেরকে পেয়ালা দেয়নি। অতঃপর এ কসম অনুযায়ী মামলার রায় ঘোষণা করা উচিত। আলোচ্য ঘটনায় তাই করা হয়েছিল।) অতঃপর যদি (কোন প্রকারের বাহ্যত) পরিব্যক্ত হয় যে, তারা উভয় ওসীও কোন গুনাহে জড়িত হয়েছে (যেমন, আয়াতের ঘটনায় পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কায় পেয়ালাটি পাওয়া যায় এবং জিজ্ঞেস করার পর উভয় ওসী মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে তা ক্রয় করার দাবি করে। এতে করে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়ালাটি নেওয়ার স্বীকারোক্তি হয়ে যায় এবং এটি তাদের পূর্বেকার উক্তির বিপরীত, যাতে নেওয়ার কথাই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছিল। যেহেতু ক্ষতিকর বিষয় স্বীকার করা একটি প্রমাণ, তাই বাহ্যত তাদের আত্মসাৎকারী ও মিথ্যাবাদী হওয়া বোঝা গেল।) তবে এমতাবস্থায় মোকদ্দমার মোড় ঘুরে যাবে। যে ওসী পূর্বে বিবাদী ছিল, এখন ক্রয় করার দাবিদার হয়ে যাবে। এবং যে ওয়ারিসরা পূর্বে আত্মসাতের দাবিদার ছিল, এখন বিবাদী হয়ে যাবে কাজেই এখন মীমাংসার পথ হবে এই যে, প্রথমে ওসীদের কাছ থেকে ক্রয় করার সাক্ষী তলব করা হবে। যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না, তখন তাদের (ওয়ারিসদের) মধ্য থেকে, যাদের বিরুদ্ধে (ওসীদের পক্ষ থেকে উল্লিখিত) গুনাহ্ হয়েছিল (এবং যারা শরীয়তসম্মতভাবে উত্তরাধিকারের যোগ্য, উদাহরণত আয়াতে ঘটনায়) দু'ব্যক্তি (ছিল) যারা সবার (অর্থাৎ ওয়ারিসদের মধ্যে উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে) নিকটতম, যেস্থলে (শপথের জন্য) ওসীদ্বয় দণ্ডায়মান হয়েছিল, সেখানে (এখন) এ দু'ব্যক্তি (শপথের জন্য) দণ্ডায়মান হবে। অতঃপর উভয়ে (এভাবে) কসম খাবে যে, (শপথবাক্য সহকারে বলবে যে,) অবশ্যই আমাদের এ সাক্ষ্য (সন্দেহ থেকে বাহ্যত ও প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়ার কারণে) তাদের উভয়ের (ওসীদের) সাক্ষ্যের চাইতেও অধিক সত্য। (কেননা,) যদিও আমরা সে সাক্ষ্যের স্বরূপ অবগত নই, তথাপি বাহ্যত তা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে এবং আমরা (সত্যের) সামান্যও সীমাতিক্রম করিনি। (নতুবা) আমরা (যদি এরূপ করি, তবে) এমতাবস্থায় কঠোর অত্যাচারী হব। (কেননা, পরের মাল জেনেশুনে নিয়ে যাওয়া অত্যাচার। এটিও একটি কঠোরতা এবং বিচারকের মতের উপর নির্ভরশীল। অতঃপর আসল বিষয়বস্তুর জন্য কসম নেওয়া হবে। যেহেতু এটি অপরের কাজের জন্য কসম,

তাই এর বাক্য এরূপ হবে 'আল্লাহ্র কসম আমাদের জানা মতে মৃত ব্যক্তি বাদীদের হাতে পেয়ালা বিক্রি করেনি। যেহেতু জানার বাস্তবতা ও অবাস্তবতার কোন বাহ্যিক উপায় হতে পারে না, তাই এর বাস্তবতার জন্য অধিক জোরদার কসম নেওয়া হবে। أَحَقُّ শব্দ থেকে এ কথা বোঝা যায়। এর সারমর্ম এই যে, এটি যেহেতু আমার উপরই নির্ভরশীল, তাই কসম খাচ্ছি। কেননা, এতে যেমন বাহ্যিক মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে না, তেমনি প্রকৃতপক্ষেও মিথ্যা নেই। এ ইঙ্গিতটি উপকারী। কেননা, এখানে জানার উপর শপথ। যেহেতু স্বীকারোক্তি ছাড়া এর মিথ্যা হওয়া প্রমাণিত হতে পারে না, তাই এতে যে আত্মসাৎ হবে, তা হবে ঘোরতর যুলুম। খুব সম্ভব এখানে ظَّالِمِيْنَ শব্দটি এ কারণেই প্রয়োগ করা হয়েছে।) এটি (অর্থাৎ এ আইনটি, যা আয়াতদ্বয়ের সমষ্টিতে ব্যক্ত করা হলো) খুব নিকটতম উপায় এ বিষয়ের যে, তারা (ওসীরা) ঘটনাকে ঠিকভাবে প্রকাশ করবে। (যদি অতিরিক্ত মাল সমর্পণ না হয়ে থাকে, তবে কসম খাবে, আর যদি হয়ে থাকে, তবে পাপকে ভয় করে অস্বীকার করবে। এটি হচ্ছে ওসীদেরকে কসম দেওয়ার তাৎপর্য।) অথবা এ বিষয়ের আশংকা (করে কসম খেতে অস্বীকার) করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেওয়ার পর (ওয়ারিসদের কাছ থেকে) কসম চাওয়া হবে (তখন আমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে। এটি হচ্ছে ওয়ারিসদেরকে কসম দেওয়ার রহস্য। সব কটি অবস্থাতেই হকদারকে হক পৌঁছানো হয়েছে, যা আইনসিদ্ধ ও কাম্য। কেননা ওসীদেরকে কসম দেওয়া আইনসিদ্ধ না হলে এবং ওসীরা সত্য সত্যই মাল সমর্পণ করলে তাদের উপর থেকে অপবাদ দূর করার কোন উপায় ছিল না। এখন কসম খাওয়া আইনসিদ্ধ হওয়ার কারণে ওসীরা সত্যবাদী হলে কসম খেয়ে দোষমুক্ত হয়ে যাবে এবং মিথ্যাবাদী হলে সম্ভবত মিথ্যা কসমকে ভয় করে কসম খেতে অস্বীকার করবে, ফলে ওয়ারিসদের হক প্রমাণিত হয়ে যাবে। অপরদিকে ওয়ারিসদের কসম দেওয়া আইনসিদ্ধ না হলে এবং হক অস্বীকার করা শরীয়তসিদ্ধ হলে, হক প্রমাণিত করার কোন উপায় থাকত না। পক্ষান্তরে হক অস্বীকার করা শরীয়তসিদ্ধ না হলে ওসীদের হক প্রমাণিত করার কোন উপায় ছিল না। এখন ওয়ারিসদের হক হলে তাদের হক প্রমাণিত হতে পারে এবং তাদের হক না হলে কসম খেয়ে অস্বীকার করার ফলে ওসীদের হক প্রমাণিত হয়ে যাবে। অতএব দু'অবস্থা হচ্ছে ওসীদেরকে কসম দেওয়ার তাৎপর্যভুক্ত। আর يَّأْتُوْا بِالشَّهَادَةِ বাক্য দ্বারা উভয় অবস্থাই বোঝা যায়। পক্ষান্তরে দু'অবস্থা হচ্ছে ওয়ারিসদেরকে কসম দেওয়ার রহস্যের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থাটি ওসীদেরকে কসম দেওয়ার প্রথম অবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট এবং প্রথম অবস্থাটি أَوْ يَخَافُوْا বাক্য দ্বারা বোঝা যায়। সুতরাং উভয় প্রকার কসম দেওয়ার মধ্যে সবগুলো অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে।) আর আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর (এবং কাজ-কারবার ও হকের ব্যাপারে মিথ্যা বলো না) এবং (এদের বিধান) শোন —(অর্থাৎ মান্য কর) এবং (যদি বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে ফাসিক হয়ে যাবে।) আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের (কিয়ামতের দিন অনুগতদের মর্যাদার দিকে) পথপ্রদর্শন করবেন না। (বরং মুক্তি পেলেও তাদের মর্যাদা কম থাকবে। অতএব এমন ক্ষতি কেন স্বীকার করবে?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা ঃ মরণোন্মুখ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে যায়, তাকে ওসী বলা হয়। ওসী একজন বা একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে।

০ সফরে হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ ওসী নিয়োগ করা উত্তম; জরুরী নয়।

০ মোকদ্দমায় যে পক্ষ অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়, সে বাদী এবং অপর পক্ষ বিবাদী।

০ প্রথম বাদীর কাছ থেকে সাক্ষী তলব করা হয়। যদি সে শরীয়তের বিধি মোতাবেক সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে তার পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সাক্ষী উপস্থিত করতে পারলে বিবাদীর কাছ থেকে কসম নেওয়া হয় এবং তার পক্ষে মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। যদি বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়।

০ আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ কাল কিংবা স্থান দ্বারা কসমকে কঠোর করা বিচারকের অভিমতের উপর নির্ভরশীল—জরুরী নয়। এ আয়াত দ্বারাও জরুরী প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস থেকে জরুরী না হওয়া প্রমাণিত হয়।

০ বিবাদী নিজের কোন কাজ সম্পর্কে কসম খেলে ভাষা এরূপ হয়—আমি এ কাজ সম্পর্কে জানি না।

০ যদি উত্তরাধিকারের মোকদ্দমায় ওয়ারিস বিবাদী হয়, তবে শরীয়তের আইনানুযায়ী যারা উত্তরাধিকারী, তাদেরকেই কসম খেতে হবে—একজন হোক কিংবা একাধিক। যারা উত্তরাধিকারী নয়, তারা কসম খাবে না। —(বয়ানুল-কোরআন)

কাফিরের ব্যাপারে কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ঃ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ.........أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে দু'ব্যক্তিকে ওসী নিযুক্ত কর। তারা তোমাদরে মধ্য থেকেই হবে এবং ধর্মপরায়ণ হবে। যদি স্বজাতীয় লোক না থাকে, তবে বিজাতি অর্থাৎ কাফিরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত কর।

এ আয়াত থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র) এ মাস'আলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কাফিরদের ব্যাপারে কাফিরদের সাক্ষ্য বৈধ। কেননা আয়াতে কাফিরদের সাক্ষ্য মুসলমানের ব্যাপারে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ থেকে তা সুস্পষ্ট। অতএব, কাফিরের ব্যাপারে কাফিরের সাক্ষ্য আরও উত্তমরূপে বৈধ হবে। কিন্তু পরে— يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে কাফিরের সাক্ষ্যের বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু কাফিরদের ব্যাপারে কাফিরদের সাক্ষ্যের বৈধতা পূর্বাবস্থায়ই বহাল রয়েছে। —(কুরতুবী, আহ্কামুল-কোরআন)

ইমাম সাহেবের মতের সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয়। জনৈক ইহুদী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে জনগণ তার মুখে চুনকালি দিয়ে মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত করে। তিনি তার

দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল ঃ সে ব্যভিচার করেছে। তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে অপরাধীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। —(জাসসাস)

প্রাপক খাতককে কয়েদ করাতে পারে ঃ تَحْبِسُوْنَهُمَا—আয়াত থেকে একটি মূলনীতি জানা যায় যে, যার যিম্মায় অপরের কোন প্রাপ্য ওয়াজিব রয়েছে, তাকে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনার দায়ে প্রয়োজনবোধে কয়েদ করাতে পারে। —(কুরতুবী)

مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ—এখানে صلوة বলে আসরের নামায বোঝানো হয়েছে। এ মসয়টি নির্ধারণ করার কারণ এই যে, আহ্লে-কিতাবরা এ সময়ের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত। এ সময়ে মিথ্যা বলা তাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। এতে বোঝা যায় যে, কোন বিশেষ সময় কিংবা স্থানের শর্ত যোগ করে কসমকে কঠোর করা জায়েয। —(কুরতুবী)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ
اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ
وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۟ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى
الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ
وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ
طَيْرًۢا بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى
بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾

(১০৯) যেদিন আল্লাহ্ সব পয়গম্বরকে একত্র করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে ? তাঁরা বলবেন ঃ আমরা অবগত নই; আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১১০) যখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি যাতে ফুঁ দিতে;

ফলে তা আমার আদেশে পাখি হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি নবী ইসরাইলকে তোমার থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা বলল ঃ এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

যোগসূত্র ঃ পূর্বে বিভিন্ন বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে এসব বিধি-বিধান পালন করার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং সাথে সাথে তার বিরুদ্ধাচরণের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়বস্তুকে অধিকতর জোরদার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে—যাতে মানুষ অধিকতর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বিরুদ্ধাচরণে বিরত থাকে। কোরআন পাকের অধিকাংশ বর্ণনাভঙ্গি এরূপ। অতঃপর সূরার শেষভাগে আহ্‌লে-কিতাবদের কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য আহ্‌লে কিতাবদেরকে হযরত ঈসা (আ) যে আল্লাহ্‌র বান্দা এ তথ্যের প্রমাণ ও তিনি যে উপাস্য নন, এ সম্পর্কে কিছু বিষয় শোনানো (যদিও এ কথোপকথন কিয়ামতে সংঘটিত হবে)।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ঐ দিনটিও কেমন ভীতিপ্রদ হবে) যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা সব পয়গম্বরকে (তাঁদের উম্মতসহ) একত্র করবেন। অতঃপর (উম্মতের মধ্যে যারা অবাধ্য শাসানির উদ্দেশে তাদেরকে শোনাবার জন্য পয়গম্বরদের) বলবেন ঃ তোমরা (এসব উম্মতের পক্ষ থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা আরয করবেন ঃ (বাহ্যিক উত্তর তো আমাদের জানাই আছে এবং তা বর্ণনাও করব, কিন্তু তাদের অন্তরে যা কিছু ছিল, তা) আমরা অবগত নই (আপনি তা জানেন। কেননা,) নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (অর্থাৎ একদিন এমন আসবে এবং মানুষের কাজকর্ম ও অবস্থার তদন্ত হবে। তাই বিরুদ্ধাচরণ ও গুনাহ্ থেকে তোমাদের বেঁচে থাকা উচিত। সেদিনই ঈসা (আ)-এর সাথে বিশেষ বাক্যালাপ হবে।) যখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর (যেন আনন্দ সজীব হয়) যা তোমার মাতার প্রতি (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে) হয়েছে। (উদাহরণত) যখন আমি তোমাকে 'রূহুল-কুদ্স' (অর্থাৎ জিবরাঈল) (আ)-এর দ্বারা সাহায্য ও শক্তি যুগিয়েছি (এবং) তুমি মানুষের সাথে (উভয় অবস্থাতে একইভাবে কথা বলতে মায়ের) কোলেও এবং পরিণত বয়সেও (এসব কথাবার্তার মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না।) এবং যখন আমি তোমাকে (ঐশী) গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান এবং (বিশেষ করে) তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, তৎপর তুমি তাতে (নির্মিত প্রতিকৃতিতে) ফুঁ দিতে, ফলে তা আমার আদেশে (সত্যি সত্যি প্রাণবিশিষ্ট) পাখি হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে (কবর থেকে) বের করে (ও জীবিত করে) দাঁড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাইল (-এর মধ্য থেকে যারা তোমাদের বিরোধী ছিল,

তাদের)-কে তোমা থেকে (অর্থাৎ তোমাকে হত্যা করা থেকে) নিবৃত্ত রেখেছিলাম যখন (তারা তোমার অনিষ্ট সাধন করতে চেয়েছিল—যখন) তুমি তাদের কাছে (স্বীয় নবুয়তের) প্রমাণাদি (মু'জিযাসমূহ) নিয়ে এসেছিলে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা বলল যে, এ (মু'জিযাগুলো) প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিয়ামতে পয়গম্বরদের সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে ঃ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ —কিয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। যে-কোন অঞ্চলের, যে-কোন দেশের এবং যে-কোন সময়ের মানুষই হোক না কেন, সবাই সে সুবিশাল ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রাসূলদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে ঃ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ—অর্থাৎ ঐ দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা সব পয়গম্বরকে হিসাবের জন্য একত্র করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত সবাইকে করা হবে, কিন্তু সর্বপ্রথম প্রশ্ন নবী-রাসূলদেরই করা হবে, যাতে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ দেখতে পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে না। পয়গম্বরদের যে প্রশ্ন করা হবে, তা এই ঃ مَاذَا اُجِبْتُمْ —অর্থাৎ তোমরা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সত্য ধর্মের দিকে আহবান করেছিলে, তখন তারা তোমাদের কি উত্তর দিয়েছিল ? তারা তোমাদের বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেছিল, না অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছিল ?

এ প্রশ্ন যদিও আম্বিয়া (আ)-কে করা হবে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাঁদের উম্মতকে শোনানো অর্থাৎ উম্মতরা যেসব সৎকর্ম ও কুকর্ম করেছে, তার সাক্ষ্য সর্বপ্রথম তাদের পয়গম্বরদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। উম্মতের জন্য মুহূর্তটি হবে অত্যন্ত নাজুক। কারণ, তারা এ হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের নবী-রাসূলদের সুপারিশ আশা করবে, তখনই স্বয়ং নবী-রাসূলদের কাছে তাদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, আম্বিয়ারা ভ্রান্ত ও বাস্তববিরোধী কথা বলতে পারবেন না। তাই গুনাহ্গার ও অপরাধীরা আশঙ্কা করবে যে, যখন স্বয়ং নবীরাই আমাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্যদাতা তখন আর কে আমাদের সুপারিশ ও সাহায্য করবে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলবেন ঃ قَالُوْا لَاعِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

একটি সন্দেহের নিরসন ঃ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের ওফাতের পর তাঁর যে উম্মত জন্মগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে পয়গম্বরদের এ উত্তর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট। কেননা, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া কারও জানা নেই। কিন্তু বিরাট সংখ্যক উম্মত এমনও তো রয়েছেন, যাঁরা স্বয়ং পয়গম্বরদের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁদের হাতেই মুসলমান হন এবং তাঁদের সামনেই বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেন। এমনিভাবে যেসব কাফির পয়গম্বরদের আদেশের

বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে নির্ভুল হতে পারে যে, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই ! তফসীরে বাহরে-মুহীত-এ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ রাযী এর উত্তরে বলেন ঃ এখানে পৃথক পৃথক দু'টি বিষয় রয়েছে ঃ (এক) ইলম্--যার অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস ; (দুই) প্রবল ধারণা। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্ত্বেও তার ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে—পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা অন্তরে ভেদ ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ ওহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। কারণ ঈমানের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। প্রত্যেক উম্মতের কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদেরও একটি দল ছিল। তারা বাহ্যত ঈমানও আনত এবং নির্দেশাবলীও পালন করত। কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না এবং নির্দেশাবলী অনুসরণের আন্তরিক কোন প্রেরণাও ছিল না। তাদের মধ্যে যা কিছু, সবই ছিল লোক-দেখানো। তবে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের উপরই জাগতিক বিচার নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে, আল্লাহ্র নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং ইসলাম ও ঈমান-বিরোধী কোন কথা ও কর্মে জড়িত হয় না, নবী-রাসূলরা তাকে ঈমানদার ও সৎকর্মী বলতে বাধ্য ছিলেন, সে অন্তরে খাঁটি ঈমানদার কিংবা মুনাফিক যাই হোক। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ نحن نحكم بالظواهر والله متولى السرائر অর্থাৎ আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি। অন্তর্নিহিত গোপন ভেদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা।

এ বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে আম্বিয়া (আ) ও তাঁদের উত্তরাধিকারী আলিম সমাজ বাহ্যিক কাজকর্মের ভিত্তিতে কারও ঈমানদার সৎকর্মী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারতেন কিন্তু আজ সে দুনিয়া ও দুনিয়ার রীতিনীতি শেষ হয়ে গেছে। আজ হাশরের ময়দান। এখানে চুলচেরা তথ্য উদ্ঘাটিত হবে এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রথমে অন্যদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। যদি অপরাধী এতে নিশ্চিত না হয় এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে, তবে বিশেষ ধরনের সরকারী সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। অপরাধীদের মুখে ও জিহবায় সীল মেরে দেওয়া হবে এবং তাদের হস্ত, পদ ও চামড়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এরা প্রত্যেক কাজের পূর্ণ স্বরূপ তুলে ধরবে—

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

অর্থাৎ অদ্য আমি তাদের মুখে সীল মেরে দেব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তখন মানুষ জানতে পারবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল রাব্বুল আলামীনের গুপ্ত পুলিশ। এদের বর্ণনার পর অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকবে না।

মোটকথা, পরজগতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুর বিচার করা হবে না বরং অকাট্য জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবকিছুর বিচার হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারও ঈমান ও কর্মের সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নেই। তাই হাশরের

ময়দানে যখন নবী-রাসূলদের প্রশ্ন করা হবে مَاذَا أُجِبْتُمْ তখন তাঁরা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবেন যে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছে না যে, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জওয়াব দিলেই চলবে, বরং এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়দানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছু বলা হবে না। তাই তাঁদের এ উত্তর যথার্থ ও সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর পয়গম্বরদের চূড়ান্ত দয়ার্দ্রতার প্রকাশ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, উম্মতের গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার যেসব ঘটনা তাঁদের সামনে সংঘটিত হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে প্রবল ধারণাপ্রসূত যে জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছিলেন, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে অন্তত তা বর্ণনা করা উচিত ছিল। এ জ্ঞানটি নিশ্চিত কিনা, শুধু এ বিষয়টিরই আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সমর্পণ করলে চলত। কিন্তু এখানে নবী-রাসূলরা নিজস্ব জ্ঞান ও সংঘটিত ঘটনাবলী একেবারেই উল্লেখ করেন নি। সবকিছু আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উপর সমর্পণ করে তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন।

এর তাৎপর্য এই যে, নবী-রাসূলরা নিজ নিজ উম্মত ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তাঁদের সম্পর্কে এমন কোন কথাই উচ্চারণ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক, যার ফলে তারা বিপদের সম্মুখীন হয়। তবে নিরুপায় হলে অবশ্যই বলতে হতো। এখানে অকাট্য জ্ঞান না থাকার অজুহাত ছিল। এ অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে মুখে উম্মতের বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন এবং সেমতে তাঁরা তাই করে আত্মরক্ষা করেছেন।

হাশরে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন ঃ সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক মাত্র সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-কিতাবের কাঠগড়ায় আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় রাসূলরা কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। সুতরাং অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-কিতাবের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা কর্তব্য।

তিরমিযীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لاتزول قدما ابن ادم يوم القيامة حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه واين انفقه وماذا عمل بما علم-

অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেওয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিবারাত্রকে কি কাজে ব্যয় করেছে ? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তৃতীয় এই যে, অর্থকড়িকে সে কোন্ (হালাল কিংবা হারাম) পথে উপার্জন করেছে ? চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িকে সে কোন্ (জায়েয কিংবা নাজায়েয) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ ইল্‌ম অনুযায়ী সে কি আমল করেছে?

আল্লাহ্ তা'আলা চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দয়াবশত এর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে উম্মতের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এখন এসব প্রশ্নে সমাধান শিক্ষা করাই উম্মতের কাজ। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে দেওয়ার পরও যদি কেউ ফেল করে, তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর ঃ প্রথম আয়াতে সমস্ত পয়গম্বরের অবস্থা ও তাঁদের সাথে প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এবং এর পরবর্তী নয় আয়াতে (সূরার শেষ পর্যন্ত) বিশেষভাবে বনী ইসরাইলের শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে আলোচনা ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হাশরে তাঁকে একটি বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে।

এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্মও বনী ইসরাইল তথা সমগ্র মানবজাতির সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা। এ ময়দানে রূহুল্লাহ্ ও কালেমাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্র আত্মা, আল্লাহ্র বাণী) অর্থাৎ ঈসা (আ)-কেও প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার উম্মত তোমাকে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। হযরত ঈসা (আ) স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিষ্পাপতা ও নবুয়ত সত্ত্বেও অস্থির হয়ে আল্লাহ্র দরবারে সাফাই পেশ করবেন। একবার নয়, বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেন নি। প্রথমে বলবেন ঃ

سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ —অর্থাৎ আপনি পবিত্র, আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বলব, যা বলার অধিকার আমার নেই?

স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে সাক্ষী করে বলবেন ঃ যদি আমি এরূপ বলতাম তবে অবশ্যই আপনার তা জানা থাকত। কেননা, আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত। কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি তো 'আল্লামুল-গুয়ুব,' যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর হযরত ঈসা (আ) প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

হযরত ঈসা (আ)-এর উত্তর ঃ অর্থাৎ আমি তাদেরকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন, اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ —অর্থাৎ আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের পালনকর্তা। এ শিক্ষার পর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, (তখন পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ কথা বলত না—) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা আপনার দেখাশোনার মধ্যে ছিল। আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহের বর্ণনা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে যে প্রশ্নোত্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার পূর্বে ঐসব অনুগ্রহের বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ)-কে মু'জিযার আকারে দেয়া হয়। এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে বনী ইসরাইলের ঐ জাতিদ্বয়কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাঁকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি 'আল্লাহ্' কিংবা 'আল্লাহ্র পুত্র' আখ্যা দেয়।

অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রথম জাতিকে এবং প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করে শেষোক্ত জাতিকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এখানে যেসব অনুগ্রহ কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি বাক্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে ঃ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً — অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-কে দেয়া একটি বিশেষ মু'জিযা এই যে, তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন।

এখানে প্রথমোক্ত বিষয়টি যে মু'জিযা ও বিশেষ অনুগ্রহ, তা বলাই বাহুল্য। জন্ম গ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু মায়ের কোলে কিংবা দোলনায় কথাবার্তা বললে তা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা বলে থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ)-এর বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এটিও একটি মু'জিযা। কেননা, পরিণত বয়সে পৌঁছার পূর্বেই ঈসা (আ)-কে ইহজগত থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে,। এখন এ জগতের মানুষের সাথে পরিণত বয়সে কথা বলা তখনই হতে পারে, যখন দ্বিতীয়বার তিনি এ জগতে পদার্পণ করবেন। মুসলমানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস তা-ই এবং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বর্ণনা থেকেও একথাই প্রমাণিত। অতএব বোঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আ)-এর শিশু অবস্থায় কথা বলা যেমন মু'জিযা, তেমনি পরিণত বয়সে কথা বলাও একটি মু'জিযা বলেই গণ্য হবে। কারণ, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পণ করবেন।

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ج قَالُوا آمَنَّا
وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
السَّمَاءِ ط قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ
نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا
مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ج وَارْزُقْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ج فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ
مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ ع

(১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্যশীল। (১১২) যখন হাওয়ারীরা বলল ঃ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা ! আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতারণ করে দেবেন ? সে বলল ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (১১৩) তারা বললঃ আমরা তা থেকে খেতে চাই ; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব। (১১৪) ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন ঃ হে আল্লাহ্—আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতারণ করুন। তা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। (১১৫) আল্লাহ্ বললেন ঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতারণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন আমি হাওয়ারীদের (ইঞ্জীলে আপনার বর্ণনার মাধ্যমে) নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি ও আমার রাসূল ঈসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; (তখন) তারা (প্রত্যুত্তরে আপনাকে) বলল ঃ আমরা (আল্লাহ্ ও রাসূল অর্থাৎ আপনার প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আল্লাহ্‌র ও আপনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল। সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন হাওয়ারীগণ [হযরত ঈসা) (আ)-কে] বলল ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম। আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন (অর্থাৎ হিকমত বিরোধী হওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় এর পরিপন্থী তো নয়) যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে কিছু (রান্না করা) খাদ্য অবতারণ করে দেবেন ? তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তো ঈমানদার, তাই আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং মু'জিযার ফরমায়েশ করা থেকে বিরত থাক। কারণ, এটি অনাবশ্যক হওয়ার কারণে শিষ্টাচার বিরোধী।) তারা বলল, (আমাদের উদ্দেশ্য অনাবশ্যক ফরমায়েশ করা নয়; বরং একটি উপযোগিতার কারণেই আবেদন করছি। তা এই যে,) আমরা (একে তো) এই চাই যে, (বরকত হাসিল করার জন্য) তা থেকে আহার করব এবং (দ্বিতীয়ত এই চাই যে,) আমাদের অন্তরসমূহ (ঈমানের ব্যাপারে) পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে আর (পরিতৃপ্ত হওয়ার অর্থ এই যে,) আমাদের এ বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়ে যাবে যে, আপনি (রিসালতের দাবির ব্যাপারে) আমাদের সাথে সত্য (কথাই) বলেছেন। (কেননা, প্রমাণ যতই বৃদ্ধি পায়, দাবির প্রতি বিশ্বাসও ততই দৃঢ় হয়।) আর (তৃতীয়ত) আমরা এই চাই যে, (ঐ লোকদের সামনে, যারা এ মু'জিযা দেখেনি) সাক্ষ্য প্রদানকারী হয়ে যাব (যে আমরা এমন মু'জিযা দেখেছি—যাতে করে আপনি তাদের সামনে রিসালত প্রমাণ করতে পারেন এবং এ বিষয়টি যেন তাদের সুপথ প্রাপ্তির উপায় হয়ে যায়)।

ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) (যখন দেখলেন যে, এ আবেদনে তাদের উদ্দেশ্য সৎ, তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে) দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ্ , আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্য অবতারণ করুন—তা (অর্থাৎ সে খাদ্য) আমাদের সবার (অর্থাৎ) আমাদের মধ্যে যারা প্রথম (অর্থাৎ বর্তমান কালে আছে) এবং যারা পরবর্তী (কালে আগমন করবে তাদের) সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে। (উপস্থিত লোকদের আনন্দ হবে আহার করার কারণে এবং আবেদন গৃহীত হওয়ার কারণে। পরবর্তী লোকদের আনন্দ হবে পূর্ববর্তীদের প্রতি নিয়ামত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে, এ লক্ষ্যটি ঈমানদারদের বেলায়ই প্রযোজ্য।) এবং (এটা) আপনার পক্ষ থেকে (আমার রিসালত প্রমাণের জন্য) একটা নিদর্শন হবে (যার ফলে ঈমানদারদের ঈমান সুদৃঢ় হবে এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে একটা নিদর্শন হয়ে থাকবে। এ লক্ষ্যটি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সবার বেলায় প্রযোজ্য।) আর আপনি আমাদেরকে (সে খাদ্য) দান করুন এবং আপনিই দানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম (কেননা, সবাই নিজের স্বার্থে দান করে; কিন্তু আপনার দান সৃষ্ট জীবের স্বার্থে, তাই আমরা স্বীয় স্বার্থ তুলে ধরে আপনার কাছে খাদ্যের আবেদন করছি)। আল্লাহ্ তা'আলা (উত্তরে) বললেন ঃ (আপনি লোকদেরকে বলে দিন যে,) আমি সে খাদ্য (আকাশ থেকে) তোমাদের প্রতি অবতারণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে এরপর (এর প্রতি) অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে (অর্থাৎ যুক্তিসম্মতভাবে এর প্রতি যত সম্মান প্রদর্শন করা দরকার, তা করবে না) আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি (তখনকার) বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মু'জিযা দাবি করা মু'মিনের পক্ষে অনুচিত ঃ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ —যখন হাওয়ারীগণ ঈসা (আ)-এর কাছে আকাশ থেকে খাদ্যাধার অবতারণ দাবি করল, তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে আল্লাহ্কে ভয় কর। এতে বোঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের ফরমায়েশ করে আল্লাহ্কে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁর কাছে অলৌকিক বিষয় দাবি করা একান্ত অনুচিত। বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহ্র নির্ধারিত পথেই রুযী ইত্যাদি অন্বেষণ করা কর্তব্য।

নিয়ামত অসাধারণ বড় হলে অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও বড় হয় ঃ

فَاِنِّىْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ **এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, নিয়ামত অসাধারণ ও অনন্য হলে তার কৃতজ্ঞতার তাকীদও অসাধারণ হওয়া দরকার এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও অসাধারণ হওয়াই স্বাভাবিক।**

মায়েদা তথা খাদ্যাধার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল কিনা, এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন ঃ অবতীর্ণ হয়েছিল। তিরমিযীর হাদীসে আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত আছে যে, খাদ্যাধার আকাশ থেকে নাযিল হয়েছিল এবং তাতে রুটি ও গোশত ছিল। এ হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ তাদের কিছু সংখ্যক) বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

(نعو ذبا لله من غضب الله)

এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, তারা তা ভক্ষণও করেছিল। আয়াতের نَأكل শব্দে এ তথ্যও বিবৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ ছিল। (বয়ানুল কোরআন)

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ
اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۤ
بِحَقٍّ ڲ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۭ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۭ
اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ
اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۭ وَاَنْتَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ
عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾

(১১৬) যখন আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহ্কে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর ? ঈসা বলবেন ঃ আপনি পবিত্র ! আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই তা পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না, যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। (১১৭) আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর —যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (১১৮) যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়টিও উল্লেখযোগ্য) যখন আল্লাহ্ তা'আলা [কিয়ামতে খ্রিস্টানদেরকে শোনাবার বিশ্বাসী হযরত ঈসা (আ)-কে] বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, [তাদের মধ্যে যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ঈসা (আ) ও মরিয়ম (আ)-কে উপাস্যতায় অংশীদার মনে করত] তুমি কি তাদেরকে বলে দিয়েছিল যে, আমাকে [অর্থাৎ ঈসা (আ)-কে] এবং আমার মাতা (মরিয়ম)-কেও আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্যরূপে গ্রহণ কর ? তখন ঈসা (আ) নিবেদন করবেন ঃ (তওবা, তওবা) আমি তো (স্বয়ং নিজ বিশ্বাসে) আপনাকে (অংশীদার থেকে) পবিত্র মনে করি। (যেমন আপনি বাস্তবেও পবিত্র। এমতাবস্থায়) আমার জন্য কিছুতেই শোভা পেত না যে, আমি এমন কথা বলতাম, যা বলার কোন অধিকারই আমার নেই (নিজ বিশ্বাসের দিক দিয়েও না, আমি একত্ববাদী অর্থাৎ এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছানোর দিক দিয়েও না। কারণ, এরূপ কোন পয়গাম আমাকে দেওয়া হয়নি। আমার এ 'না' বলার প্রমাণ এই যে,) যদি আমি (বাস্তবে বলে থাকি) তবে আপনি অবশ্যই তা পরিজ্ঞাত রয়েছেন (কিন্তু আপনার জ্ঞানেও যখন আমি বলিনি, তখন বাস্তবেও বলিনি। বলে থাকলে আপনার তা পরিজ্ঞাত হওয়া এজন্য জরুরী যে) আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন (কাজেই মুখে যা বলতাম তা কিরূপে না জানতেন) এবং আমি (তো অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মতোই এমন অক্ষম যে) আপনার জ্ঞানে যা আছে, তা (আপনার বলে দেওয়া ছাড়া) জানি না (যেমন, অন্যান্য সৃষ্ট জীবের অবস্থাও তদ্রূপ। সুতরাং) আপনিই সব অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (অতএব নিজের এতটুকু অক্ষমতা এবং আপনার ক্ষমতা যখন আমি জানি, তখন উপাস্যতায় আপনার সাথে শরীক হওয়ার দাবি কিরূপে করতে পারি ? এ পর্যন্ত উপরোক্ত কথাটি না বলার বিষয় বর্ণিত হয়েছে, পরবর্তী বাক্যে এর বিপরীত কথাটি বলে প্রমাণ করা হয়েছে যে) আমি তো তাদেরকে আর কিছুই বলিনি শুধু ঐ কথাই, (বলেছি) যা আপনি আমাকে বলতে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। এ পর্যন্ত ঈসা (আ) নিজ অবস্থা সম্পর্কে আরয করলেন। পরবর্তী বাক্যে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আরয করেছেন। কেননা, ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ—বাক্যে যদিও প্রকাশ্যত এ প্রশ্ন রয়েছে যে, তুমি তাদেরকে এ কথা বলেছ কিনা ? কিন্তু ইঙ্গিতে এ প্রশ্নও বোঝা যায় যে, ত্রিত্ববাদের এ বিশ্বাস কোত্থেকে এল ? সুতরাং ঈসা (আ) এ সম্পর্কে আরয করবেন যে, আর আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলাম ততদিনই, যতদিন তাদের মধ্যে (বিদ্যমান) ছিলাম (অতএব বর্ণনা করতে পারি) অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন (অর্থাৎ প্রথমবার জীবিতাবস্থায় আকাশে নিয়ে এবং দ্বিতীয়বার মৃত্যু দিয়ে তখন (সে সময় শুধু) আপনি তাঁদের (অবস্থা) সম্বন্ধে অবগত ছিলেন (সে সময় আমি জানতাম না যে, তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ কি হলো এবং কিভাবে হলো)। বস্তুত আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (এ পর্যন্ত নিজের এবং তাদের ব্যাপারে আরয করলেন। পরবর্তী বাক্যে তাদের এবং আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে বলেন যে) যদি আপনি তাদেরকে (এ বিশ্বাসের

দরুন) শাস্তি দেন, তবে (আপনার ইচ্ছা, কেননা) এরা আপনারই দাস (এবং আপনি তাদের প্রভু। অপরাধের দরুন দাসকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার প্রভুর আছে) আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে (তাও আপনার ইচ্ছা—) আপনি তো মহাপরাক্রান্ত (ক্ষমতাশীল অতএব ক্ষমা করতেও সক্ষম এবং) মহাবিজ্ঞ (কাজেই আপনার ক্ষমাও বিজ্ঞতা অনুযায়ী হবে। তাই এটাও মন্দ হতে পারে না। উদ্দেশ্য এই যে, উভয় অবস্থাতেই আপনি স্বেচ্ছাধীন। আমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না)।

[মোটকথা, ঈসা (আ)-এর প্রথম নিবেদন سبحانك বাক্য ত্রিত্ববাদীদের বিশ্বাস ও তাঁর শিক্ষাদানের ব্যাপারে নিজের সাফাই পেশ করলেন। আর وكنت عليهم বাক্যে সাফাই হলো তাদের এ বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ব্যাপারে এবং তৃতীয় নিবেদন ان تعذبهم বাক্যে তাদের সম্পর্কে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা থেকে সাফাই প্রকাশ করে দিয়েছেন। ঈসা (আ)-এর সাথে এসব কথোপকথন দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য তাই ছিল। সুতরাং এসব বাক্য বিনিময়ে কাফিররা স্বীয় মূর্খতার দরুন পুরোপুরি তিরস্কৃত হবে এবং ব্যর্থতার দরুন মর্মাহত হবে]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى —আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন। সুতরাং অজানাকে জানার জন্য ঈসা (আ)-কে প্রশ্ন করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য খ্রিস্টান জাতিকে তিরস্কার করা ও ধিক্কার দেওয়া যে, যাকে তোমরা উপাস্য মনে করছ তিনি স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীতে স্বীয় দাসত্ব স্বীকার করছেন এবং তোমাদের অপবাদ থেকে তিনি মুক্ত। —(ইবনে-কাসীর)

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ —হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু অথবা আকাশে উত্থিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সূরা আলে-ইমরানের اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ বাক্যটিকে ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর দলীল ও আকাশে উত্থিত হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কেননা এ কথোপকথন কিয়মতের দিন হবে। তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর তাঁর সত্যিকার মৃত্যু হবে অতীত বিষয়। ইবনে কাসীর আবূ মূসা আশ'আরীর রেওয়ায়েতক্রমে এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন নবী-রাসূলগণকে ও তাঁদের উম্মতকে ডাকা হবে। অতঃপর ঈসা (আ)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্বীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করাবেন এবং নিকটে এনে বলবেন ঃ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, اُذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমি যে সমস্ত নিয়ামত দান করেছিলাম তা স্মরণ কর। অবশেষে বলবেন ঃ يَا عِيْسَى ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ — হে ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে এমন কথা বলেছ যে, আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্যরূপে গ্রহণ কর ? ঈসা (আ) বলবেন ঃ পরওয়ারদেগার আমি এরূপ বলিনি। এরপর খ্রিস্টানদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। এরপর খ্রিস্টানদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ — অর্থাৎ আপনি বান্দাদের প্রতি যুলুম ও অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। তাই তাদের শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতাভিত্তিকই হবে। অগত্যা যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমাও অক্ষমতাপ্রসূত হবে না। কেননা, আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। তাই কোন অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। যেহেতু আপনি সুবিজ্ঞ, তাই এটাও সম্ভব নয় যে, অপরাধীকে বিনা বিচারেই ছেড়ে দেবেন। মোটকথা, অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই দেবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ হবে। হযরত ঈসা (আ) হাশরের ময়দানে এসব কথা বলবেন। সেখানে কাফিরদের পক্ষে কোনরূপ সুপারিশ, দয়া, ভিক্ষা ইত্যাদি চলবে না। তাই তিনি عزيز حكيم -এর পরিবর্তে غفور رحيم ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ অবলম্বন করেন নি। এর বিপরীতে হযরত ইবরাহীম (আ) দুনিয়াতে পরওয়ারদিগারের দরবারে আরয করেছিলেন।

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

হে পরওয়ারদিগার, এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ এখনও সময় আছে, তুমি স্বীয় রহমতে ভবিষ্যতে তাদেরকে তওবা ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তি দান করে অতীত গুনাহ্ ক্ষমা করতে পার। —(ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

ইবনে-কাসীর হযরত আবু যর (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) একবার সারারাত إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ-আয়াতখানিই পাঠ করতে থাকেন। ভোর হলে আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি একই আয়াত পাঠ করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত দ্বারাই রুকূ করেছেন এবং এ আয়াত দ্বারাই সিজদা করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি পরওয়ারদিগারের কাছে নিজের জন্য শাফাআতের আবেদন করেছি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। অতি সত্বরই আমি তা লাভ করব। আমি এমন ব্যক্তির জন্য শাফাআত করতে পারব, যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন অংশীদার করেনি।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মহানবী (সা) উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে আকাশের দিকে হস্ত উত্তোলন করেন এবং বলেন ঃ اللهم امتى।—অর্থাৎ হে পাক পরওয়ারদিগার, আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। অতঃপর তিনি কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জিবরাঈলকে উপরোক্ত উক্তি শুনিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেনঃ তা হলে যাও এবং (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে বলে দাও যে, আমি অতি সত্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব—অসন্তুষ্ট করব না।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيْمُ ﴿١١٩﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

(১১৯) আল্লাহ্ বলবেন ঃ আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা। (১২০) নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী দুই রুকূতে কিয়ামতের দিন মানুষের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ ও প্রশ্নোত্তর উল্লিখিত হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে এর তদন্ত ও হিসাব-নিকাশের ফলাফল বর্ণিত হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরোক্ত কথোপকথনের পর) আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আজকের দিনে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) যারা (ইহজগতে উক্তি, কর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) সত্যপরায়ণ ছিল, (যে সত্যপরায়ণ হওয়া এখন প্রকাশ পাচ্ছে। সব পয়গম্বর ও সব ঈমানদারই এর অন্তর্ভুক্ত। পয়গম্বরদের তো সম্বোধনই করা হচ্ছে এবং ঈমানদারদের ঈমান সম্পর্কে সব পয়গম্বর ও ফেরেশতা সাক্ষ্য দেবেন। এসব সম্বোধনে পয়গম্বরদের সত্যতা ও ঈসা (আ)-এর সত্যতার প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে গেছে। মোটকথা, এরা সবাই, যারা ইহজগতে সত্যপরায়ণ ছিলেন) তাদের সত্যপরায়ণতা তাদের উপকারে আসবে (এবং এ উপকারে আসা এই যে) তারা (বেহেশতের) উদ্যান (বসবাসের জন্য) পাবে, যার (প্রাসাদসমূহের) তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে (এবং এসব নিয়ামত তারা কেন পাবে না, কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। আর তারাও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। (যে ব্যক্তি নিজে সন্তুষ্ট এবং তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলাও সন্তুষ্ট, সে এ ধরনের নিয়ামতই লাভ করে) এটিই (অর্থাৎ যা উল্লিখিত হলো) মহান সফলতা। (জগতের কোন সফলতা এর সমতুল্য হতে পারে না।) নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহ্র জন্যই এবং তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

(قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ)—সাধারণভাবে বাস্তবসম্মত উক্তিকে 'সিদক' তথা সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে 'কিয্‌ব' তথা মিথ্যা মনে করা হয়। কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে জানা যায় যে, সত্য ও মিথ্যা শুধু উক্তি নয় কর্মও হতে পারে। নিম্নোক্ত হাদীসে বাস্তব বিরোধী কর্মকে মিথ্যা বলা হয়েছে।

من تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبى زور —অর্থাৎ কেউ যদি এমন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, যা তাকে দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ এমন কোন গুণ বা কর্ম দাবি করে, যা তার মধ্যে নেই, তবে সে যেন মিথ্যার বস্ত্র পরিধান করে।

অন্য এক হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমরূপে নামায আদায়কারীকে সত্য বান্দা বলা হয়েছে ঃ

ان العبد اذا صلى في العلانية فاحسن وصلى في السر فاحسن قال الله تعالى هذا عبدى حقا—

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জনসমক্ষে উত্তমরূপে নামায পড়ে এবং নির্জনতায়ও এমনিভাবে নামায পড়ে, তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ সে আমার সত্যিকার বান্দা। —(মিশকাত)

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ বড় নিয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এখন থেকে কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।

ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ — অর্থাৎ এটিই মহান সফলতা। স্রষ্টা ও পরম প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে এর চাইতে বৃহত্তম সফলতা আর কি হতে পারে?

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلُهٗ وَاٰخِرُهٗ

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ

সূরা আল-আন'আম

(মক্কায় অবতীর্ণ, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকূ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۥ
ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ① هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ
ثُمَّ قَضٰىٓ اَجَلًا ۭ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ② وَهُوَ اللّٰهُ فِى
السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ۭ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ③
وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوْا
بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۭ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑤

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফিররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে। (২) তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর। (৩) তিনিই আল্লাহ্ নভোমণ্ডলে এবং ভূ-মণ্ডলে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা কর তাও অবগত। (৪) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসেনি ; যার প্রতি তারা বিমুখ হয় না। (৫) অতএব, অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে। বস্তুত অচিরেই তাদের কাছে ঐ বিষয়ের সংবাদ আসবে, যা নিয়ে তারা উপহাস করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন ; তথাপি কাফিররা (ইবাদতে অন্যকে) স্বীয় পালনকর্তার সমতুল্য স্থির করে। তিনি (আল্লাহ্) এমন, যিনি তোমাদের (সবাই)-কে [আদম (আ)-এর মাধ্যমে] মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (তোমাদের মৃত্যুর) নির্দিষ্টকাল স্থির করেছেন এবং (পুনরায় জীবিত হয়ে উত্থিত হওয়ার) অন্য নির্দিষ্টকাল আল্লাহ্‌রই কাছে (নিরূপিত) রয়েছে, তথাপি তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের কতিপয় লোক) সন্দেহ কর (অর্থাৎ কিয়ামতকে অসম্ভব মনে কর। অথচ যিনি প্রথমবার জীবন দান করেছেন, পুনর্বার জীবন দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়) এবং তিনিই প্রকৃত উপাস্য নভোমণ্ডলেও এবং ভূমণ্ডলেও (অর্থাৎ অন্যসব উপাস্য মিথ্যা), তিনি তোমাদের গোপন বিষয় এবং প্রকাশ্য বিষয় (সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে) জানেন (এবং বিশেষভাবে) তোমরা যা কিছু (প্রকাশ্য ও গোপনে) কাজ কর (যার উপর প্রতিদান ও শাস্তি নির্ভরশীল) তাও জানেন। আর তাদের (কাফিরদের) কাছে তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী থেকে (এমন) কোন নিদর্শন আসেনি, যা থেকে তারা বিমুখ হয়নি। অতএব (যেহেতু এটি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাই) তারা এ সত্য (গ্রন্থ কুরআন)-কেও মিথ্যা বলেছে, যখন তা তাদের কাছে পৌঁছেছে। বস্তুত (তাদের এ মিথ্যা বলা বিফলে যাবে, বরং) অচিরেই তাদের নিকট সেই (শাস্তির) সংবাদ আসবে, যার সাথে তারা উপহাস করত (অর্থাৎ কুরআনে যে শাস্তির কথা শুনে তারা উপহাস করত। এর সংবাদ পাওয়ার অর্থ এই যে, যখন শাস্তি অবতীর্ণ হবে, তখন এ সংবাদের সত্যতা চাক্ষুষ দেখে নেবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা আন'আমের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকখানি আয়াত ব্যতীত গোটা সূরাটিই একযোগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তসবীহ্ পাঠ করতে করতে এ সূরার সাথে অবতরণ করেছিলেন। তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ, কলবী, কাতাদাহ প্রমুখও প্রায় এ কথাই বলেন।

আবু ইসহাক ইসফারায়িনী বলেন ঃ এ সূরাটিতে তওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাটিকে الحمد لله বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। এতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্য এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া এবং এ বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি কারও হামদ বা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা সত্তার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয়। এ বাক্যের পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণও ব্যক্ত করা হয়েছে, যে সত্তার এহেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিজ্ঞতার বাহক, তিনিই হামদ ও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন।

এ আয়াতে سموات শব্দটিকে বহুবচনে এবং ارض শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নভোমণ্ডলের ন্যায় ভূমণ্ডলও সাতটি। সম্ভবত

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সপ্ত আকাশ আকার-আকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার দিক দিয়ে একটি অপরটি থেকে অনেক স্বতন্ত্র কিন্তু সপ্ত পৃথিবী পরস্পর সমআকৃতি বিশিষ্ট, তাই এগুলোকে এক গণ্য করা হয়েছে। (মাযহারী)

এমনিভাবে ظلمات শব্দটি বহুবচনে এবং نور শব্দটিকে এক বচনে উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نور বলে বিশুদ্ধ ও সরল পথ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। আর ظلمات বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য। (মাযহারী ও বাহরে-মুহীত)

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নির্মাণ করাকে خلق শব্দ দ্বারা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করাকে جعل শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্ধকার ও আলো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মতো স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর বস্তু নয়, বরং পরনির্ভর, আনুষঙ্গিক ও গুণবাচক বিষয়। অন্ধকারকে আলোর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এ জগতে অন্ধকার হলো আসল এবং আলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাথে জড়িত। সেসব বস্তু সামনে থাকলে আলোর উদ্ভব হয়, না থাকলে সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের ঐসব জাতিকে হুঁশিয়ার করা, যারা মূলত একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে।

অগ্নি-উপাসকদের মতে জগতের স্রষ্টা দু'জন-- ইয়াযদান ও আহরামান। তারা ইয়াযদানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহরামানকে অমঙ্গলের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে। এ দুটিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে।

ভারতের পৌত্তলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা আল্লাহর অংশীদার। আর্য সমাজ একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা ও মূল পদার্থকে অনাদি এবং আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্য ও সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করে একত্ববাদের মূল স্বরূপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এমনিভাবে খ্রিস্টানরা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর মাতাকে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা 'একে তিন' এবং 'তিনে এক'-এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরিকরা তা আল্লাহর বন্টনে চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরও তাদের মতে মানবজাতির উপাস্য হতে পারত। মোট কথা, যে মানবকে আল্লাহ তা'আলা 'আশরাফুল-মখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পথভ্রষ্ট হলো, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, বৃক্ষলতা এমনকি, পোকা-মাকড়কেও সিজদার যোগ্য উপাস্য, রুযীদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল।

কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরোক্ত সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেছে। কেননা, অন্ধকার ও আলো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট। অতএব এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করা যায়?

প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তর বস্তুগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে

মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। যদি এরই সূচনা, পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে সামনে ফুটে উঠবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে এক বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম-সন্তানরা, বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লাল বর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র স্বভাবের হয়ে থাকে। --(মাযহারী)

এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এরপর পরিণতির দু'টি মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্ট জগৎ-- সবার সমষ্টির পরিণতি, যাকে কিয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً অর্থাৎ মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুষ্কালের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও আল্লাহর ফেরেশতারা জানেন, বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা সে সর্বদা, সর্বত্র আশেপাশে আদম-সন্তানদের মৃত্যুবরণ করতে দেখে।

এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ কিয়ামতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ অর্থাৎ আরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফেরেশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই।

সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্ট জীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে যারপর তার মৃত্যু অবধারিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশেপাশে প্রত্যক্ষ করে। وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু অর্থাৎ কিয়ামতকে সপ্রমাণ করা একটা মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাভাবিক বিষয়। তাই কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে আয়াতের শেষভাগে উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ—অর্থাৎ এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর। এটা অনুচিত।

তৃতীয় আয়াতে প্রথম দু'আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলাই এমন এক সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে ইবাদত ও আনুগত্যের

যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত।

চতুর্থ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্যবিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের হিদায়েতের জন্য যে কোন নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়-- এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না।

পঞ্চম আয়াতে কতিপয় ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এ অমনোযোগিতার আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে ঃ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ -অর্থাৎ সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হলো, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এখানে সত্যের অর্থ কোরআন হতে পারে এবং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র ব্যক্তিত্বও হতে পারে।

কেননা, মহানবী (সা) আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন। তাঁর শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা একথাও পুরোপুরিই জানত যে, মহানবী (সা) কোন মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ করেন নি। এমনকি তিনি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উম্মী (নিরক্ষর) উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়স এভাবেই অতিবাহিত হয়ে যায় যে, তিনি কোন দিন কবিতা বা কাব্যচর্চার দিকে আকৃষ্ট হননি এবং কখনো বিদ্যাচর্চায় ব্রতী হন নি। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তাঁর মুখ দিয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব, অধ্যাত্মবিদ্যা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের পারদর্শী দার্শনিকদেরকেও বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। তিনি নিজের আনীত কালামের মুকাবিলা করার জন্য আরবের স্বনামখ্যাত প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলংকারবিদদের চ্যালেঞ্জ দিলেন। তারা মহানবী (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জানমাল, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত, অথচ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সাহস্য তাদের কারও হলো না।

এভাবে নবী করীম (সা) এবং কোরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নিদর্শন। এছাড়া মহানবী (সা)-এর মাধ্যমে হাজারো মু'যিজা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ যা অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু কাফিররা এসব নিদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۔

আয়াতের শেষে তাদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ —অর্থাৎ আজ তো এসব অপরিণামদর্শী

লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা, তাঁর আনীত হিদায়েত, কিয়ামত ও পরকাল সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও স্বীকার করলেও কোন উপকার হবে না। কেননা, সেটা কর্মজগৎ নয়-- প্রতিদান দিবস। আল্লাহ্ তা'আলা এখনও চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا ص وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ
فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا
سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ط وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ
الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن
قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

(৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৭) যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা স্বহস্তে স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা এ কথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়। (৮) তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হলো না? যদি আমি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতাম,

তবে গোটা ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া হতো না। (৯) যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হতো। এতেও ঐ সন্দেহই করত, যা এখন করেছে। (১০) নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত। (১১) বলে দিনঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে ?

তফসীরের সার সংক্ষেপ

তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে (শারীরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে) এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম—যা তোমাদেরকে দেইনি এবং আমি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য আসমানকে অব্যাহতি দিয়েছিলাম এবং আমি তাদের (ক্ষেত ও বাগানের) তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত করেছিলাম (ফলে কৃষি ও ফলমূলের প্রভূত উন্নতি হয় এবং তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে থাকে) অতঃপর (এহেন শক্তি-সামর্থ্য ও সাজসরঞ্জাম সত্ত্বেও) আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে (বিভিন্ন প্রকার আযাব দ্বারা) ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। অতএব তোমাদের উপরও আযাব অবতীর্ণ করলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এদের একগুঁয়েমির অবস্থা এই যে, যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম অতঃপর তারা তা নিজের হাতে স্পর্শও করত (যেমন তাদের দাবি ছিল যে, আকাশ থেকে লিখিত গ্রন্থ আসুক। হাতে স্পর্শ করার কথা উল্লেখ করে ভেল্কী দেওয়ার সন্দেহ দূর করা হয়েছে।) তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটি প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়। (কারণ যখন মেনে নেওয়ার ইচ্ছাই নেই, তখন প্রতিটি প্রমাণেই তাদের পক্ষে কোন না কোন নতুন অজুহাত বের করা মোটেই কঠিন নয়।) এবং তারা আরও বলে যে, তাঁর (অর্থাৎ পয়গম্বরের) কাছে (এমন) কোন ফেরেশতা (যাকে আমরা দেখতে পাব এবং কথাবার্তা শুনব) কেন প্রেরণ করা হলো না ? (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ) যদি আমি কোন ফেরেশতা (এমনিভাবে) প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটিই শেষ হয়ে যেত। অতঃপর (ফেরেশতা অবতরণের পরে) তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া হতো না। (—কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত রীতি এই যে, প্রার্থিত মু'জিযা দেখানোর পরও যদি কেউ তা অস্বীকার করে, তবে এক মুহূর্তও অবকাশ না দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং এরূপ প্রার্থিত মু'জিযা না দেখানো পর্যন্ত দুনিয়াতে অবকাশ দেওয়া হয়।) এবং যদি আমি তাকে (অর্থাৎ রাসূলকে) ফেরেশতাই করতাম, তবে (ফেরেশতা প্রেরণ করলে তার ভীতি মানুষ সহ্য করতে পারত না। তাই) আমি তাকে (ফেরেশতাকে) মানুষরূপেই প্রেরণ করতাম (অর্থাৎ মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম) এতেও সন্দেহই করত, যা এখন করছে। অর্থাৎ এ ফেরেশতাকে মানুষ মনে করে এরূপ আপত্তিই করত। মোটকথা, তাদের ফেরেশতা অবতারণের দাবিটি পূর্ণ করা হলে তাতে তাদের কোন উপকার হতো না। কেননা, ফেরেশতাকে ফেরেশতার আকৃতিতে দেখার শক্তি তাদের নেই। পক্ষান্তরে ফেরেশতাকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করলে তাদের

সন্দেহ দূর হবে না। তদুপরি তাদের ক্ষতি হবে। কারণ, অমান্য করার কারণে তারা আযাবে পতিত হবে। এবং (আপনি তাদের বাজে দাবির কথা শুনে দুঃখিত হবেন না)। কেননা,) আপনার পূর্বে যাঁরা পয়গম্বর হয়েছেন, তাঁদের সাথেও (বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে) এমনিভাবে উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে সে শাস্তি পরিবেষ্টন করে নিয়েছে যাকে তারা উপহাস করত। (এতে জানা গেল যে, তাদের এ জাতীয় কর্ম দ্বারা পয়গম্বরদের কোন ক্ষতি হয়নি বরং এ কর্ম স্বয়ং তাদের জন্যই আযাব ও বিপদের কারণ হয়েছে। যদি তারা পূর্ববর্তী উম্মতদের আযাব অস্বীকার করে, তবে) আপনি (তাদেরকে) বলে দিন ঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ যে, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা আল্লাহ্‌র বিধান ও পয়গম্বরদের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিশ্ব-ইতিহাস একটি শিক্ষাগ্রন্থ। জ্ঞানচক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করলে এটি হাজারো উপদেশের চাইতে অধিক কার্যকরী উপদেশ। 'জগৎ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট শিক্ষক'—জনৈক দার্শনিকের এ উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই কোরআন পাকের একটি বিরাট বিষয়বস্তু হচ্ছে কাহিনী ও ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে অমনোযোগী মানুষেরা জগতের ইতিহাসকেও একটি চিত্তবিনোদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়নি ; বরং উপদেশ ও জ্ঞানের এ উৎকৃষ্ট বিষয়টিকেও তারা অমনোযোগিতা ও গুনাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী কিসসা-কাহিনীকে হয় শুধু ঘুমের পূর্বে ঘুমের ঔষধের স্থলে ব্যবহার করা হয়, না হয় অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

সম্ভবত এ কারণেই কোরআন পাক শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বিশ্ব-ইতিহাসকে বেছে নিয়েছে। তবে কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি বিশ্বের সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মতো নয় যাতে কাহিনী ও ইতিহাস রচনাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই কোরআন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ধারাবাহিক কাহিনীর আকারে বর্ণনা করেনি; বরং কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্যাপারে ও যে অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত সে ব্যাপারে ততটুকু অংশই উল্লেখ করেছে। অতঃপর অন্যত্র এ কাহিনীর অন্য অংশ বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বর্ণনা করেছে। এতে এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, কোন কাহিনী কখনও স্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না, বরং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা করার লক্ষ্য হচ্ছে তা থেকে কোন কার্যকর ফল বের করা। এ কারণে এ ঘটনার যতটুকু অংশ এ লক্ষ্যের জন্য জরুরী, ততটুকু পাঠ কর এবং সামনে এগিয়ে যাও। স্বীয় অবস্থা পর্যালোচনা কর এবং অতীত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা অর্জন করে আত্ম-সংশোধনে ব্রতী হও।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যক্ষ সম্বোধিত মক্কাবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি ? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও

উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে 'দেখা'র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা, সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ –অর্থাৎ তাদের পূর্বে অনেক 'কারনকে' (অর্থাৎ সম্প্রদায়কে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। قرن শব্দের অর্থ একাধিক। সমসাময়িক লোকসমাজকেও قرن বলা হয় এবং সুদীর্ঘ কালকেও قرن বলা হয়। দশ বছর থেকে একশ বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قرن শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোন কোন ঘটনা ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে ঃ মহানবী (সা) আবদুল্লাহ্ ইবনে বিশর মায়োনীকে বলেছিলেন ঃ তুমি এক 'কারন' পর্যন্ত জীবিত থাকবে। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ বছর জীবিত ছিলেন। মহানবী (সা) জনৈক বালককে দোয়া দেন যে, তুমি এক 'কারন' জীবিত থেকো। বালকটি পূর্ণ একশ বছর জীবিত ছিল। خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم এ হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে অধিকাংশ আলিম 'এক কারন' বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন।

এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু তারাই যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদ তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামুদ গোত্রের মতো শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও ইয়ামেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতির ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ –অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত অসাধারণ জাঁকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের পলকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়ে যায়নি, বরং তাদেরকে ধ্বংস করার সাথে সাথে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। ফলে কেউ বুঝতে পারল না যে, এখান থেকে লোকজন হ্রাস পেয়েছে।

এমনিতেও আল্লাহ্ তা'আলার এ শক্তি-সামর্থ্য আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে থাকি। দৈনিক লাখো মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, কিন্তু কারও স্থান অপূর্ণ থাকে না। কোন জায়গায় জনবসতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সে জায়গা জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় না।

خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی ؟
ھزاروں اٹھ گئے رونق وھی باقی ہے مجلس کی

একবার আরাফাতের ময়দানে প্রায় দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে চিন্তাস্রোত এদিকে প্রবাহিত হলো যে, আজ থেকে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগে এ জনসমুদ্রের মধ্যে কেউ বিদ্যমান ছিল না এবং তাদের স্থলে প্রায় সমসংখ্যক অন্য মানুষ ছিল, কিন্তু আজ তাদের কোন চিহ্নই নেই। এভাবে প্রতিটি জনসমাবেশকে অতীত ও ভবিষ্যতের সাথে মিলিয়ে দেখলে প্রতিটি জনসমাবেশই কার্যকরী উপদেশদাতা দৃষ্টিগোচর হয়।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۔

দ্বিতীয় আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী উমাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে একটি হঠকারিতাপূর্ণ দাবি পেশ করে বসল। সে বলল ঃ আমি আপনার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যে পর্যন্ত না আপনাকে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে দেখব। গ্রন্থে আমার নাম উল্লেখ করে এ আদেশ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে ঃ হে আবদুল্লাহ্! রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সে আরও বলল ঃ আপনি এগুলো করে দেখালেও আমার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতসব কথার পরও লোকটি মুসলমান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইসলামের গাযী হয়ে তায়েফ যুদ্ধে শাহাদাতও বরণ করেছিল।

জাতির এহেন হঠকারিতাপূর্ণ দাবি-দাওয়া এবং উপহাসের ভঙ্গিতে কথাবার্তা পিতামাতার চাইতে অধিক স্নেহশীল রাসূলে-করীম (সা)-এর অন্তরকে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, তার সঠিক অনুমান আমরা করতে পারি না। শুধু ঐ ব্যক্তি হয়ত তা অনুভব করতে পারে, যে জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মতো জীবনের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে।

এ কারণেই আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে ঃ তাদের এসব দাবি-দাওয়া কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়। তাদের অবস্থা এই যে, তারা যেসব দাবি-দাওয়া করছে, আপনার সত্যতা প্রতিপাদন করার জন্য তার চাইতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি তাদের সামনে এলেও তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না। উদাহরণত তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আমি যদি আকাশ থেকে কাগজে লিখিত গ্রন্থ অবতরণ করে দেই, শুধু তাই নয়, তারা যদি তা স্বচক্ষে দেখেও নেয় এবং ভেল্কী সৃষ্টির আশংকা দূরীকরণার্থে হাতে স্পর্শও করে নেয় তবুও এ কথাই বলে দেবে যে, اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়। কারণ, হঠকারিতাবশতই তারা এসব দাবি-দাওয়া করছে।

তৃতীয় আয়াত অবতরণেরও একটি ঘটনা রয়েছে। পূর্বোল্লিখিত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী উমাইয়া, নযর ইবনে হারেস এবং নওফেল ইবনে খালেদ (রা) একবার একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যদি আপনি আকাশ থেকে গ্রন্থ নিয়ে আসেন। গ্রন্থের সাথে চারজন ফেরেশতা এসে সাক্ষ্য দেবে যে, এ গ্রন্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর এক উত্তর এই যে, গাফিলরা এসব দাবি-দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা, আল্লাহ্র আইন এই যে, কোন জাতি কোন

পয়গম্বরের কাছে যখন বিশেষ কোন মু'জিযা দাবি করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের দাবি পূরণ করে দেওয়া হয়; তখন ইসলাম গ্রহণের সামান্য দেরীও সহ্য করা হয় না। ব্যাপক আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মক্কাবাসীরাও এ দাবি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা মেনে নেওয়ার আশা করা যেত। তাই বলা হয়েছে ঃ لَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ —অর্থাৎ আমি যদি তাদের চাহিদা মতো মু'জিযা দেখানোর জন্য ফেরেশতা পাঠিয়ে দেই, তবে মু'জিযা দেখার পরও বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মু'জিযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল।

এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এরা ফেরেশতা অবতারণের দাবি করে অদ্ভুত বোকামীর পরিচয় দিচ্ছে। কেননা, ফেরেশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি, আতংকগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশংকাও রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা সামনে আসে, যেমন জিবরাঈল (আ) বহুবার মহানবী (সা)-এর কাছে এসেছেন, তবে তারা তাঁকে একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে।

এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর পঞ্চম আয়াতে নবী করীম (সা)-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে ঃ স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গম্বরদের এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতী ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সাহস হারান নি। পরিণামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ্র বিধানাবলী প্রচার করাই আপনার কাজ। এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কিনা তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন না।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلْ لِّلّٰهِ ۗ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۗ
لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾
قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ

وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑭

(১২) জিজ্ঞেস করুন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে তার মালিক কে ? বলে দিন ঃ মালিক আল্লাহ্। তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্ব বলে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন। এর আগমনে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে না। (১৩) যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (১৪) আপনি বলে দিন ঃ আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত—যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার্য দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না—অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব ? আপনি বলে দিন ঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আজ্ঞাবহ হব। আপনি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (এসব বিরোধীকে জব্দ করার জন্য) বলুন ঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তার মালিক কে ? (প্রথমত তারাও এ উত্তরই দেবে। ফলে একত্ববাদ প্রমাণিত হবে এবং যদি কোন কারণে, যেমন পরাজয়ের ভয়ে এ উত্তর না দেয় তবে,) আপনি বলে দিন ঃ সবার মালিক আল্লাহ্। (এবং তাদেরকে একথাও বলে দিন যে,) আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় (তওবাকারীদের প্রতি) অনুগ্রহ করা নিজ দায়িত্বে অপরিহার্য করে নিয়েছেন (এবং আরও বলে দিন যে, তোমরা একত্ববাদ গ্রহণ না করলে শাস্তিও ভোগ করতে হবে। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে অবশ্যই কিয়ামতের দিন (কবর থেকে তুলে হাশরের ময়দানে) একত্র করবেন (এবং কিয়ামতের অবস্থা এই যে,) এর আগমনে কোন সন্দেহ নেই। (কিন্তু) যারা নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত (অর্থাৎ অকেজো) করেছে, বস্তুত তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (এবং তাদেরকে জব্দ করার জন্য আরও বলুন যে,) যা কিছু রাত ও দিনে অবস্থিত, তা আল্লাহ্রই। (এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ আয়াত সমষ্টির সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, স্থান ও কালে যত বস্তু আছে, সবই আল্লাহ্র মালিকানাধীন।) এবং তিনিই সর্বপেক্ষা অধিক শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (একত্ববাদ প্রমাণ করার পর তাদেরকে) বলুন ঃ আমি আল্লাহ্কে ছাড়া—যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি (সবাইকে) আহার্য দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না (কেননা, তিনি পানাহারের প্রয়োজন থেকে ঊর্ধ্বে। অতএব এমন আল্লাহ্কে ছাড়া) অপরকে স্বীয় উপাস্য স্থির করব ? (আপনি এ অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্নের ব্যাখ্যায় নিজে) বলে দিন ঃ (আমি আল্লাহ্ ছাড়া

অপরকে কিরূপে উপাস্য স্থির করতে পারি, যা যুক্তি ও ইতিহাসের পরিপন্থী ?)। আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই ইসলাম কবূল করব (এতে একত্ববাদের বিশ্বাসও এসে গেছে।) এবং (আমাকে বলা হয়েছে যে,) তুমি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ —আয়াতে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে ? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেন ঃ সবার মালিক আল্লাহ্। কাফিরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেওয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফিরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ্ তা'আলাকেই মানত। لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ বাক্যে اِلٰى শব্দটি فِى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে মর্ম দাঁড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদি-অন্ত সব মানুষকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্র করা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্র করতে থাকবেন এবং কিয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন। (কুরতুবী)

كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ —সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছে ঃ ان رحمتى سبقت على غضبى অর্থাৎ আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। (কুরতুবী)

اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ —এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আয়াতের শুরুতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফির ও মুশরিকরা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ, তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ ঈমান অবলম্বন করেনি। (কুরতুবী)

لَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এখানে سكون অর্থ استقرار (অবস্থান করা), অর্থাৎ পৃথিবীর দিবারাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত, তা সবই আল্লাহ্র। অথবা এর অর্থ سكون وحركت এর সমষ্টি। অর্থাৎ ما سكن وما تحرك (স্থাবর ও অস্থাবর)। আয়াতে শুধু سكون উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত حركت আপনা-আপনিই বোঝা যায়।

قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ

اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ⑱
قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ
هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ
اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْۤءٌ
مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ⑲ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَ
هُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑳ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ㉑

(১৫) আপনি বলুন ঃ আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি। (১৬) যার কাছ থেকে ঐ দিন এ শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুকম্পা হবে। এটাই বিরাট সাফল্য। (১৭) আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১৮) তিনি পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (১৯) আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে ? বলে দিন ঃ আল্লাহ্ ; আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে—যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কোরআন পৌঁছে—সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে ? আপনি বলে দিন ঃ আমি এরূপ সাক্ষ্য দেব না। বলে দিন ঃ তিনিই একমাত্র উপাস্য ; আমি অবশ্যই তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। (২০) যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চেনে। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (২১) আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় যালিম কে ? নিশ্চয় যালিমরা সফলকাম হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন ঃ নিশ্চয় আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হওয়াকে (অর্থাৎ ইসলাম ও ঈমানের আদেশ পালন না করাকে কিংবা শিরকে লিপ্ত হওয়াকে এজন্য) ভয় করি কেননা, আমি একটি মহাদিবসের (কিয়ামতের) শাস্তির ভয় করি। [এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষ্পাপ। ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে শিরক ও গুনাহ্ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এখানে উম্মতকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, নিষ্পাপ পয়গম্বর আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করেন। অতঃপর বলেন, এ শাস্তি এমন যে,] যার উপর থেকে এ শাস্তি সরিয়ে দেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা বড় করুণা করবেন ; আর এটিই (অর্থাৎ শাস্তি সরে যাওয়া এবং আল্লাহ্র করুণা লাভ করতে পারাই হলো) প্রকাশ্য সফলতা। (এতে অনুগ্রহ বর্ণিত হয়ে গেল, যা ইতিপূর্বে كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ –বাক্যে উল্লিখিত হয়েছিল) এবং (আপনি তাদেরকে একথাও বলে দিন যে, হে মানব) যদি আল্লাহ্ তা'আলা (ইহকালে কিংবা পরকালে) তোমাকে কোন কষ্টের সম্মুখীন করেন তবে তা তিনিই দূর করবেন (কিংবা করবেন না, শীঘ্র করবেন, কিংবা দেরীতে করবেন।) আর যদি তোমাকে (এমনিভাবে) কোন উপকার পৌঁছান (তবে তাতেও বাধাদানকারী কেউ নেই। যেমন, অন্য আয়াতে لَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ বলা হয়েছে। কেননা,) তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান (এবং উল্লিখিত বিষয়টির প্রতি আরো জোর দেওয়ার জন্য আরও বলে দিন যে,) তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে) স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রান্ত এ উচ্চতর এবং (জ্ঞানের দিক দিয়ে) তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (সুতরাং জ্ঞান দ্বারা তিনি সবার অবস্থা জানেন, শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা সবাইকে একত্র করবেন এবং প্রজ্ঞ দ্বারা উপযুক্ত প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন।) আপনি (তওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসীদেরকে) বলুন ঃ (আচ্ছা বল তো দেখি,) প্রবলতর সাক্ষ্যদাতা কে ? (যার সাক্ষ্যে সবার মতভেদ দূর হয়ে যায় ? এর স্বতঃসিদ্ধ উত্তর এটাই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই প্রবলতর।) আপনি বলুন ঃ আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে (যে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, তাতে) আল্লাহ্ তা'আলাই সাক্ষী (যাঁর সাক্ষ্য প্রবলতর)। বস্তুত) তাঁর সাক্ষ্য এই যে,) আমার প্রতি এ কোরআন (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) ওহীযোগে এসেছে– যাতে আমি এ কোরআন দ্বারা তোমাদের এবং যাদের কাছে এ কোরআন পৌঁছবে, সবাইকে (ঐসব শাস্তি সম্পর্কে) ভয় প্রদর্শন করি (যা একত্ববাদ ও রিসালতে অবিশ্বাসীদের জন্য এতে উল্লিখিত রয়েছে। কেননা, কোরআন মজীদের অলৌকিকত্ব এবং এর সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে বিশ্বাসীদের অক্ষমতা ইত্যাদি আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগত সাক্ষ্য, যদ্দারা রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া কোরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার আইনগত সাক্ষ্য হয়ে গেছে।) তোমরা কি (এ প্রবলতর সাক্ষ্যের পরও, যাতে একত্ববাদও অন্তর্ভুক্ত) একত্ববাদ সম্পর্কে সত্যি সত্যি এ সাক্ষ্যই দেবে যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে (ইবাদতের হকদার হওয়ার ব্যাপারে) আরও উপাস্য (শরীক) রয়েছে ? (এবং এতেও যদি তারা হঠকারিতা করে বলে যে, হ্যাঁ আমরা তো এ সাক্ষ্যই দেব, তবে তাদের সাথে বিতর্ক অর্থহীন। বরং শুধু) আপনি (স্বীয় বিশ্বাস প্রকাশার্থে) বলে দিন ঃ আমি তো এ সাক্ষ্য প্রদান করি না। আপনি আরও বলে দিন ঃ তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং অবশ্যই আমি তোমাদের শেরেকী থেকে মুক্ত। (আর আপনার রিসালত সম্পর্কে তারা যে বলে, আমরা ইহুদী ও

খ্রিস্টানদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি, এ ব্যাপারে সত্য ঘটনা এই যে,) যাদেরকে আমি (তওরাত ও ইঞ্জীল) কিতাব দান করেছি, তারা সবাই রাসূল (সা)-কে (এমনভাবে) চেনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চেনে। (কিন্তু প্রবলতর সাক্ষ্যের উপস্থিতিতে যখন আহ্‌লে-কিতাবদের সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়, তখন তাদের সাক্ষ্য না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই এবং এ প্রবলতর সাক্ষের উপস্থিতিতেও) যারা নিজেদের বিবেককে নষ্ট করেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (বিবেককে নষ্ট করার অর্থ তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া– কাজে না লাগানো) যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীতে মিথ্যারোপ করে, তার চাইতে অধিকতর অত্যাচারী আর কে আছে? এমন অত্যাচারীরা (কিয়ামতের দি) নিষ্কৃতি পাবে না (বরং চিরস্থায়ী আযাবে পতিত হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এ নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলে দিন, মনে কর, যদি আমিও স্বীয় পালনকর্তার নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারও কিয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষ্পাপ। তাঁর দ্বারা অবাধ্যতা হতেই পারে না। কিন্তু তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে উম্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন নবীদের সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যরা কোন্ ছার!

এরপর বলা হয়েছে : مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ অর্থাৎ হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কারও উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহর অশেষ করুণা হয়েছে। وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ–অর্থাৎ এটিই বৃহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা। এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ। এতে বোঝা গেল যে, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ করা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা। সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহ্যত একজনকে অপরজন দ্বারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশি এর কোন গুরুত্ব নেই।

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں

مصلحت را تہمتے بر آہوئے چیں بستہ اند

এ বিশ্বাসটিও ইসলামের অন্যতম বৈপ্লবিক বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মুসলমানদের সমগ্র সৃষ্টি জগৎ থেকে বিমুখ করে একমাত্র স্রষ্টার মুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। ফলে মুসলমানরা এমন একটি নজীরবিহীন সদাপ্রফুল্ল সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে গেছে, যারা দারিদ্র্যে এবং উপবাসেও সারা বিশ্বের উপর ভারী–কারও সামনে মস্তক অবনত করতে জানে না।

فقر میں بھی میں سر بسر فخر وغرور ونازھوں
کس کا نیاز مندھوں سب سے جو بے نیاز ھوں

কোরআন-মজীদে এ বিষয়বস্তুটি বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে রহমত মানুষের জন্য খুলে দিয়েছেন তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই এবং যাকে তিনি আটকে দেন, তাকে খুলে দেওয়ারও কেউ নেই। সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই দোয়ায় একথা বলতেন ঃ

اللّٰهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আপনি যা দান করেন, তাকে বাধাদানকারী কেউ নেই, আপনি যা আটকে দেন, তার কোন দাতা নেই এবং আপনার বিপক্ষে কোন চেষ্টাকারীর চেষ্টা উপকার সাধন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বগভী (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পেছনে বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর চলার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ হে বৎস! আমি আরয করলাম ঃ আদেশ করুন, আমি হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্কে স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ তোমাকে স্মরণ রাখবেন। তুমি আল্লাহ্কে স্মরণ রাখলে সর্বাবস্থায় তাঁকে সামনে দেখতে পাবে। তুমি শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহ্কে স্মরণ রাখলে বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। কোন কিছু যাচ্না করতে হলে তুমি আল্লাহ্র কাছেই যাচ্না কর এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাও। জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে। তোমার অংশে নেই—তোমার এমন কোন উপকার করতে সমগ্র সৃষ্ট জীব সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও তারা কখনও তা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোন ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্য ধারণ করতে পার তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা, স্বভাববিরুদ্ধ কাজে ধৈর্য ধরার মধ্যে অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহ্র সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত—কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)

পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাক-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)—এর আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে পথভ্রান্ত। তারা আল্লাহ্ তা'আলার সব ক্ষমতা সৃষ্ট জীবের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। আজ এমন মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য নয়, যারা বিপদের সময় আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে না। বরং তারা তাঁর কাছে দোয়া করার পরিবর্তে বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি লক্ষ্য করে না।

পয়গম্বর ও ওলীদের ওছিলায় দোয়া করা ভিন্ন কথা, এটা জায়েয। স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর শিক্ষায় এর প্রমাণ রয়েছে। সরাসরি কোন সৃষ্ট জীবকে অভাব পূরণের জন্য ডাকা এ কোরআনী নির্দেশের পরিপন্থী ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সরল পথে কায়েম রাখুন।

আয়াতের শেষে বলেছেন ঃ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তার ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন মহত্তম ব্যক্তিরাও সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, তিনি নৈকট্যশীল রাসূলই হোন কিংবা রাজাধিরাজ।

তিনি প্রজ্ঞাময়ও বটে, তাঁর সব কাজেই প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বিদ্যমান। তিনি সর্বজ্ঞ। আয়াতে قاهر শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য এবং حكيم শব্দ দ্বারা সবকিছু বেষ্টনকারী জ্ঞান বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, পরাকাষ্ঠামূলক যাবতীয় গুণ প্রজ্ঞা ও শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা একক।

অধিকাংশ তফসীরবিদ পঞ্চম আয়াতের একটি বিশেষ শানে-নযুল উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, মক্কাবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর দরবারে এসে বলল ঃ আপনি রাসূল হওয়ার দাবি করেন। এ দাবির পক্ষে আপনার সাক্ষী কে ? কেননা, আপনার সত্যায়ন করার মতো কোন লোক আমরা পাইনি। আমরা খ্রিস্টান ও ইহুদীদের কাছে এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের পুরোপুরি চেষ্টা করেছি।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً —অর্থাৎ আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্র চাইতে অধিক প্রবল কোন্ সাক্ষ্য হবে ? সারা জাহান এবং সবার লাভ-লোকসান তাঁরই আয়ত্তাধীন। অতঃপর আপনি বলে দিন ঃ আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ সাক্ষী। আল্লাহ্র সাক্ষ্যের অর্থ ঐসব মু'জিযা ও নিদর্শন, যা আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-এর সত্য নবী হওয়া সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন। তাই পরের আয়াতে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এ সাক্ষ্যের পরও কি তোমরা এর বিপক্ষে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যও শরীক আছে। এরূপ করলে স্বীয় পরিণাম ভেবে নাও, আমি এরূপ সাক্ষ্য দিতে পারি না। قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থাৎ আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা একক উপাস্য ; তাঁর কোন অংশীদার নেই।

আরও বলা হয়েছে ঃ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ অর্থাৎ আমার প্রতি ওহীযোগে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যেন এর মাধ্যমে আমি তোমাদের আল্লাহ্র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করি এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি, যাদের কাছে কিয়ামত পর্যন্ত এ কোরআন পৌঁছবে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) সর্বশেষ নবী এবং কোরআন আল্লাহ্র সর্বশেষ কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত এর শিক্ষা ও তিলাওয়াত বাকি থাকবে এবং এর অনুসরণ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য হবে।

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা) বলেন ঃ যার কাছে কোরআন পৌঁছে গেল, সে যেন মুহাম্মদ (সা)-এর সাক্ষ্য লাভ করল। অন্য এক হাদীসে আছে, যার কাছে কোরআন পৌঁছে আমি তার ভিতি-প্রদর্শক

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে জোর দিয়ে বলেন ঃ بلغوا عنى ولو اية অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলী ও শিক্ষাকে মানুষের কাছে পৌঁছাও—যদি তা একটি আয়াতও হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সতেজ ও সুস্থ রাখুন, যে আমার কোন উক্তি শুনে তা স্মরণ রাখে ; অতঃপর তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়। কেননা, অনেক সময় প্রত্যক্ষ শ্রোতার চাইতে পরোক্ষ শ্রোতা কালামের মর্ম অধিক অনুধাবন করে।

সর্বশেষ আয়াতে কাফিরদের এ উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে যে, আমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে তথ্যানুসন্ধান করে জেনে নিয়েছি তাদের কেউই আপনাদের সত্যতা ও নবুয়তের সাক্ষ্য দেয় না। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۤءَهُمْ —অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এমনভাবে চিনে যেমন করে চিনে নিজের সন্তানদেরকে।

কারণ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৈহিক আকৃতি, জন্মভূমি, হিজরত ভূমি, অভ্যাস, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। এ বর্ণনার পর কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শুধু মহানবী (সা)-এর আলোচনাই নয়—তাঁর সাহাবায়ে-কিরামের বিস্তারিত অবস্থাও তওরাত ও ইঞ্জীলে উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি তওরাত ও ইঞ্জীলে বিশ্বাস করে এবং তা পাঠ করে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনবে না এরূপ সম্ভাবনা নেই।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তুলনামূলকভাবে বলেছেন ঃ 'যেমন, মানুষ নিজ সন্তানদের চেনে।' একথা বলেন নি যে, 'যেমন সন্তানরা পিতা-মাতাকে চেনে।' এর কারণ এই যে, পিতা–মাতার পরিচয় সন্তানের জন্য অত্যধিক সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। সন্তানের দেহের প্রত্যেকটি অংশ পিতা-মাতার দৃষ্টিতে থাকে। তারা শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাদের হাতে ও ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়। তাই পিতামাতা সন্তানকে যতটুকু চিনতে পারে ততটুকু সন্তান পিতা-মাতাকে চিনতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) পূর্বে ইহুদী ছিলেন, পরে মুসলমান হয়ে যান। হযরত ফারূকে আযম (রা) একবার তাঁকে প্রশ্ন করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে বলেন যে, তোমরা আমাদের পয়গম্বরকে এমন চেন, যেমন নিজ সন্তানদেরকে চেন–এরূপ বলার কারণ কি? আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন ঃ হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণিত গুণাবলীর দ্বারাই চিনি, যা তওরাতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই আমাদের এ

জ্ঞান অকাট্য ও সুনিশ্চিত। নিজ সন্তানরা এরূপ নয়। তাদের পরিচয়ে সন্দেহ হতে পারে যে, আমাদের সন্তান কি না।

হযরত যায়েদ ইবনে সা'না (রা) আহলে-কিতাবদের একজন ছিলেন। তিনি তওরাত ও ইঞ্জীলের বর্ণনার মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনেছিলেন। শুধু একটি মাত্র গুণের সত্যতা তিনি পূর্বে জানতে পারেন নি। পরীক্ষার পর তাও জানতে পারেন। তা হলো এই যে, তাঁর সহনশীলতা ক্রোধের উপর প্রবল হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ গুণটিও তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান দেখতে পান। অতঃপর কালবিলম্ব না করে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে ঃ আহলে-কিতাবরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পূর্ণরূপে চেনা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে না। এভাবে তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ
الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ
رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم
مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا
بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ
إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

(২২) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব, অতঃপর যারা শিরক করেছিল, তাদেরকে বলব ঃ যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায় ? (২৩) অতঃপর তাদের কোন অপরিচ্ছন্নতা থাকবে না; তবে এটুকুই যে, তারা বলবে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহর কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। (২৪) দেখ তো, কিভাবে মিথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে ? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি মিছেমিছি রটনা করত,

তা সবই উধাও হয়ে গেছে। (২৫) তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে একে না বুঝে এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি। যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি, তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফিররা বলে ঃ এটি পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী বৈ তো নয়। (২৬) তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। অথচ তারা কেবল নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে, কিন্তু বুঝছে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর সে সময়টিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সব সৃষ্ট জগতকে (হাশরের ময়দানে) একত্র করব। অতঃপর আমি মুশরিকদের (পরোক্ষভাবে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে, তিরস্কৃত করার জন্য) বলব ঃ (বল,) যে অংশীদারদের উপাস্য হওয়ার দাবি তোমরা করতে, এখন তারা কোথায়? (তোমরা তো তাদের সুপারিশের ভরসা করতে, তারা সুপারিশ করে না কেন?) অতঃপর তাদের শিরকের পরিণাম এছাড়া কিছুই (জাহির) হবে না যে, তারা (এ শিরক থেকে নিজেরাই বিমুখতা ও ঘৃণা প্রকাশ করবে এবং হতবুদ্ধি হয়ে) বলবে ঃ আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে) দেখ তো কিভাবে (প্রকাশ্যে) এরা মিথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে! এবং যেসব বস্তু তারা মিছেমিছি তৈরি করত (অর্থাৎ মূর্তি এবং যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করত) তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে (কোরআন অস্বীকারের নিন্দা–وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) আর তাদের (মুশরিকদের) মধ্যে কেউ কেউ (আপনার কোরআন পাঠের সময় তা শোনার জন্য) আপনার দিকে কান লাগায় (কিন্তু তাদের এ শোনা সত্যান্বেষণের জন্য নয়, বরং শুধু তামাশা ও বিদ্রূপের নিয়তে হতো। তাই এতদ্দ্বারা তাদের কোন উপকার হতো না। সেমতে) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে করে তারা একে (অর্থাৎ কোরআনের উদ্দেশ্যকে) না বুঝে এবং তাদের কর্ণসমূহে বোঝা ভরে দিয়েছি (অর্থাৎ তারা একে হিদায়েতের উদ্দেশ্যে শোনে না। এ হচ্ছে তাদের অন্তর ও কর্ণের অবস্থা। এখন তাদের জ্ঞানচক্ষুকে ও চর্মচক্ষুকে দেখ) যদি তারা (আপনার নবুয়তের সত্যতার) সব যুক্তি-প্রমাণ (গুলোও) অবলোকন করে, তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। (তাদের হঠকারিতা) এতদূর (পৌঁছেছে) যে, যখন তারা আপনার সাথে অনর্থক বিসম্বাদ করে (এভাবে যে,) যারা কাফির তারা বলে ঃ এটি তো (অর্থাৎ কোরআন) কিছুই নয়–শুধু ভিত্তিহীন কথাবার্তা যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে (বর্ণিত) চলে এসেছে। (অর্থাৎ ধর্মাবলম্বীরা প্রাচীন কাল থেকেই এ ধরনের কথাবার্তা বলে এসেছে যে, উপাস্য একজনই এবং মানুষ আল্লাহ্‌র পয়গম্বর হতে পারে। 'কিয়ামতে পুনর্জীবন লাভ করতে হবে না' এর সারমর্ম হঠকারিতা ও অসত্যারোপ। পরে তা উন্নত হয়ে অবিশ্বাসের রূপ নেয় এবং অপরকেও হিদায়েত থেকে বাধা দিতে শুরু করে) অতঃপর তারা এ (কোরআন) থেকে অপরকেও বাধা দেয় এবং নিজেরাও (এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশার্থ) দূরে দূরে থাকে এবং (এসব কাণ্ড করে) তারা নিজেদেরকেই বিনষ্ট করছে (বোকামি ও শত্রুতাবশত) কিন্তু বুঝে না (যে, তারা কার ক্ষতি করছে? তাদের এ কর্ম দ্বারা রাসূল ও কোরআনের কোন ক্ষতি হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুশরিকদের ব্যর্থতার অবস্থা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অত্যাচারী ও কাফিররা সফলতা পাবে না। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে ঃ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا

–অর্থাৎ ঐ দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সবাইকে অর্থাৎ মুশরিক ও তাদের তৈরি করা উপাস্যসমূহকে একত্র করব। ثُمَّ نَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ –অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায় ? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন ?

এখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিলম্ব ও দেরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে বোঝা যায় যে, হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে না, বরং সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হতবাক আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনেককাল পর হিসাব-কিতাব ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্র করবেন যেমন তীরসমূহকে তূণীরে একত্রিত করা হয়। পঞ্চাশ হাজার বছর তোমরা এমনিভাবে থাকবে। অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর কথাবার্তাও বলতে পারবে না। –(মুস্তাদরাক, বায়হাকী)

উপরোক্ত দুই হাদীসে পঞ্চাশ হাজার ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা কোরআন পাকের দুই আয়াতেও উল্লিখিত রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ —অর্থাৎ ঐ দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে। إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ অর্থাৎ এক দিন তোমার পালনকর্তার কাছে এক হাজার বছরের মত হবে। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, এ দিনটি তীব্র কষ্ট ও কঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও শ্রমের স্তর বিভিন্ন রূপ হবে। তাই কারও কাছে এ দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের এবং কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে।

সারকথা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমত দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরীক্ষা শুরুই হবে না। এমনকি সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনরূপ পরীক্ষা ও হিসাব-কিতাব হয়ে যাক–পরিণতি যাই হোক, এ অনিশ্চয়তার কষ্ট তো দূর হবে। এ দীর্ঘ অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ثُمَّ শব্দ প্রয়োগ করে ثُمَّ نَقُولُ বলা হয়েছে। এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে উত্তর বর্ণিত হয়েছে, তাতেও ثُمَّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, তারাও দীর্ঘ বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে এ উত্তর দেবে ঃ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا

مُشْرِكِيْنَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। এ আয়াতে তাদের উত্তরকে فِتْنَة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কারও প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই সম্ভবপর। প্রথম অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থ-সম্পদ এদের জন্যই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালবাসা ও আসক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এ ছাড়া তাদের মুখে কোন উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবি করে বসল।

তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী এবং রাব্বুল আলামীনের শক্তি-সামর্থ্যের অভাবনীয় ঘটনাবলী দেখার পর তারা কোন্ সাহসে রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারল! তাও এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, আল্লাহর মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছে যে, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

অধিকাংশ তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেন ঃ তাদের এ উত্তর বিবেক-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং ভয়ের আতিশয্যে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলেছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলী ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্য তাদেরকে এ শক্তিও দিয়েছেন যেন তারা পৃথিবীর মত অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা ইচ্ছা বলুক—যাতে কুফর ও শিরকের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা-ভাষণে অদ্বিতীয় পটু; এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কোরআন পাকের অপর এক আয়াতে فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ বলে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ এই যে, এরা মুসলমানদের সামনে যেমন মিথ্যা কসম খায়, তেমনি স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না।

হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শেরেকী ও কুফরী অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হস্তপদকে নির্দেশ দেবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করত। তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্ষু-কর্ণ—এরা সবাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজ কর্ম একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ অদ্য আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।'

এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোন তথ্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا –অর্থাৎ ঐদিন তারা আল্লাহ্‌র কাছে কোন কথা গোপন করতে পারবে না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এর অর্থ এই-ই যে, প্রথম তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিন্তু স্বয়ং তাদের হস্তপদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে না।

মহা-বিচারপতির আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত তখনও তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার মিথ্যা আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত করে দেবেন।

মৃত্যুর পর কবরে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মুনকার-নাকীর যখন কাফিরকে জিজ্ঞেস করবে, من ربك وما دينك –অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা কে এবং তোমার দীন কি? কাফির বলবে, هاه هاه لا ادرى অর্থাৎ হায়, হায়! আমি কিছুই জানি না। এর বিপরীতে মু'মিন বলবে, ربى الله ودينى الاسلام –আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ এবং আমার দীন ইসলাম। এতে বোঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফিরও মু'মিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারত। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফেরেশতা। তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করত। ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্ব শক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকরী হবে না।

তফসীর 'বাহ্‌রে-মুহীত' ও 'মাযহারী'তে কোন কোন তফসীরবিদের এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় শিরককে অস্বীকার করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোন সৃষ্ট জীবকে খোলাখুলি আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি না বললেও আল্লাহ্‌র সব ক্ষমতা সৃষ্ট জীবে বন্টন করে দিয়েছি। সৃষ্ট জীবের কাছেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাচনা করত, তাদের নামে নৈবেদ্য প্রদান করত এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ্য, রুযী-রোযগার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য যাবতীয় মনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করত। তারা নিজেদেরকে মুশরিক মনে করত না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে যে, তারা মুশরিক ছিল না। কিন্তু কসম খাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের লাঞ্ছিত করবেন।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোরআনের কোন কোন আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও গুনাহ্গারদের সাথে কথা বলবেন না। অথচ আলোচ্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলবেন।

উত্তর এই যে, এ সম্বোধন ও কথাবার্তা সম্মান প্রদান ও প্রার্থনা শ্রবণ হিসাবে হবে না। হুমকি প্রদর্শন ও শাসানির জন্যও সম্বোধন হবে না, উক্ত আয়াতের অর্থ তা নয়। এ কথাও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে, তা হবে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। পক্ষান্তরে

যে আয়াতে সম্বোধন ও কথাবার্তা হবে না বলে বলা হয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ—এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলছে; আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা মিছামিছি শরীক তৈরি করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরি করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ্র অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি (শরীক) ও মনগড়া। আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরির অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে। অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেনঃ মনগড়া তৈরি করা বলে মুশরিকদের ঐসব অপব্যাখ্যা বোঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা করত। উদাহরণত তারা বলত ঃ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

—অর্থাৎ আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না, বরং উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের সুপারিশ করবে না।

এখানে প্রশ্ন হয়, আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যখন এ প্রশ্ন ও উত্তর হবে, তখন মিথ্যা উপাস্যরা উধাও হয়ে যাবে, কেউ সামনে থাকবে না। কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতে আল্লাহ্ নির্দেশ দেবেন, অত্যাচারীদের, তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের এবং তারা যাদের উপাসনা করত, সবাইকে একত্র কর। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা উপাস্যরাও হাশরে উপস্থিত থাকবে।

উত্তর এই যে, আয়াতে তাদের উধাও হওয়ার অর্থ অংশীদার কিংবা সুপারিশকারী হিসাবে তারা অনুপস্থিত থাকবে। অর্থাৎ অংশীবাদীদের কোন উপকারই তারা করতে পারবে না, বরং এমনিতেই সেখানে উপস্থিত থাকবে। এভাবে উভয় আয়াতে কোনরূপ গরমিল থাকে না। একথা বলাও সম্ভব যে, এক সময়ে তাদেরকে একত্র করা হবে এবং পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উপরোক্ত প্রশ্ন করা হবে।

উভয় আয়াতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদের যা ইচ্ছা বলার স্বাধীনতাদানের মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস একটি দুষ্ট অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সামনে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে মিথ্যা বলার নিন্দা জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্

(সা) বলেন ঃ মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাপাচার উভয়ই জাহান্নামে যাবে।—(ইবনে হাব্বান)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ-যে কাজের দরুন মানুষ দোযখে যাবে, তা কি ? তিনি বললেন, ঃ সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা।-(মুসনাদে-আহমদ) মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেওয়া হচ্ছে। সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি কে ? জিবরাঈল বললেন ঃ এ হলো মিথ্যাবাদী।

মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না। এমনকি, হাসি-ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলা উচিত নয়। বায়হাকীতে সহীহ্ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে, মুসলমানের মধ্যে অন্য কু-অভ্যাস থাকতে পারে, কিন্তু আত্মসাৎ ও মিথ্যা থাকতে পারে না। অন্য এক হাদীসে আছে, মিথ্যা মানুষের রিযিক কমিয়ে দেয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ-যাহ্হাক, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে এ আয়াত মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কোরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী (সা)-এর চাচা আবু তালিব ও আরও কয়েকজন চাচা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতেন এবং কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। এমতাবস্থায় عَنْهُ শব্দের সর্বনামটির অর্থ কোরআনের পরিবর্তে নবী করীম (সা) হবেন।--(মাযহারী)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِنْ
هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا
عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ

يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

(২৭) আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদের দোযখের উপর দাঁড় করানো হবে! তারা বলবে ঃ কতই না ভাল হতো, যদি আমরা পুনঃ প্রেরিত হতাম ; তা হলে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। (২৮) এবং তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা পুনঃপ্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (২৯) তারা বলে ঃ আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদের পুনরায় জীবিত হতে হবে না। (৩০) আর যদি আপনি দেখেন ঃ যখন তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বললেন ঃ এটা কি বাস্তব সত্য নয় ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, আমাদের পালনকর্তার কসম। তিনি বলবেন ঃ অতএব স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর। (৩১) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে ঃ হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ত্রুটি করেছি। তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে, তা নিকৃষ্টতর বোঝা। (৩২) পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহিযগারদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি আপনি (তাদের) তখন দেখেন, (তবে ভয়ংকর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে--) যখন তাদের (অবিশ্বাসীদের) দোযখের উপর দাঁড় করানো হবে (এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করার কাছাকাছি অবস্থায় থাকবে) তারা (শত সহস্র আকাঙ্ক্ষার সাথে) বলবে হায়, কতই না ভাল হতো, যদি আমরা দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরিত হতাম। আর এরূপ হয়ে গেলে আমরা (পুনরায়) স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে (কোরআন ইত্যাদিতে) কখনও মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা (অবশ্যই) বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদের এ আকাঙ্ক্ষা ও ওয়াদা সত্যিকার আগ্রহ ও আনুগত্যের ইচ্ছাপ্রসূত নয়) বরং (এখন তারা একটি বিপদে জড়িত হচ্ছে যে,) যা তারা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) গোপন (ও নিশ্চিহ্ন) করত, তা আজ তাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে। এর অর্থ পরকালের সে শাস্তি, কুফর ও অবাধ্যতার কারণে যার হুমকি দুনিয়াতে তাদেরকে দেওয়া হতো। গোপন করার অর্থ অস্বীকার করা। মর্মার্থ এই যে, এখন তাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি আরম্ভ হয়েছে। তাই প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে এসব ওয়াদা করা হচ্ছে। ওয়াদা পূর্ণ করার আন্তরিক ইচ্ছা মোটেই নেই। এমনকি) যদি (ধরে

নেওয়া যায়) তারা পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে তাই করবে যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল। (অর্থাৎ কুফর ও অবাধ্যতা) এবং নিশ্চয় তারা (এসব ওয়াদায়) সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী (অর্থাৎ ওয়াদা পূরণের ইচ্ছা এখনও নেই এবং দুনিয়াতে গিয়েও এর সম্ভাবনা নেই)। এবং (এরা একমাত্র অবিশ্বাসীরা) বলে ঃ জীবন আর কোথাও নেই; এ পার্থিব জীবনই জীবন। (এ জীবন শেষ হওয়ার পর পুনরায়) আমরা উত্থিত হব না (যেমন নবী রাসূলরা বলেন)। আর যদি আপনি (তাদেরকে) তখন দেখেন, (তবে বিস্ময়কর ঘটনা অবলোকন করবেন-) যখন তাদের স্বীয় পালনকর্তার সামনে হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ (বল) এটা (কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হওয়া) কি বাস্তব সত্য নয় ? তারা বলবে ঃ নিঃসন্দেহে (বাস্তব), আমাদের পালনকর্তার কসম। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ অতএব স্বীয় কুফরের স্বাদ গ্রহণ কর। (এরপর তাদেরকে দোযখে পাঠিয়ে দেওয়া হবে) নিশ্চয় তারা (অত্যন্ত) ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাতকে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে জীবিত হয়ে আল্লাহ্র সামনে পেশ হওয়াকে) মিথ্যা বলে (এ মিথ্যা বলা অল্পদিন স্থায়ী হবে)। এমনকি, যখন সেই নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন লক্ষণাদিসহ) তাদের কাছে অকস্মাৎ (বিনা নোটিশে) উপস্থিত হবে, (তখন সব গালভরা বুলি ও মিথ্যা বলা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং) তারা বলবে ঃ এর (কিয়ামতের) সম্পর্কে আমরা যে ত্রুটি (ও অবহেলা) করেছি সে জন্য আফসোস! এবং তারা স্বীয় (কুফর ও অবাধ্যতার) বোঝা নিজ পিঠে বহন করবে। কান খুলে শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে তা নিকৃষ্টতর। আর এ পার্থিব জীবন (অনুপকারী ও অস্থায়ী হওয়ার কারণে) ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয় এবং পরলোকের আবাস পরহিযগারদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি চিন্তা কর না ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে-১. একত্ববাদ, ২. রিসালত ও ৩ আখিরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যত এমন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কোরআন পাকের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, অশেষ সওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ পরকালে যখন তাদেরকে দোযখের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস। আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা পালনকর্তার প্রেরিত নিদর্শনাবলী ও নির্দেশাবলীতে মিথ্যারোপ করতাম না, বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

দ্বিতীয় আয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, মহাবিচারপতি তাদের বিহ্বল আকাঙক্ষার রহস্য উন্মোচন করে বলেছেন ঃ এরা চিরকালই মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল। এ আকাঙক্ষায়ও এরা মিথ্যাবাদী। আসল ব্যাপার এই যে, পয়গম্বরদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল এবং তারা তা জানা ও চেনা সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এসব সত্যকে পর্দায় আবৃত রাখার চেষ্টা করত। আজ সেগুলি একটি একটি করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে, আল্লাহ্ পাকের একচ্ছত্র অধিকার ও শক্তি-সামর্থ্য চোখে দেখেছে, পয়গম্বরদের সত্যতা অবলোকন করেছে, পরকালে পুনর্জীবিত হওয়া যা সব সময়ই তারা অস্বীকার করত, নির্মম সত্য হয়ে তা সামনে এসেছে, প্রতিদান ও শাস্তি প্রকাশ হতে দেখেছে এবং দোযখও দেখেছে। কাজেই বিরোধিতা করার কোন ছুতা তাদের হাতে অবশিষ্ট রইল না। তাই এমনিতেই বলতে শুরু করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে ফিরতাম।

তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ তারা যে, ওয়াদা করছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করব না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না, তারা দুনিয়াতে পৌঁছে আবারও মিথ্যারোপ করবে। এ মিথ্যা বলার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনও যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্য বলছে–অন্তরে এখনও তাদের সদিচ্ছা নেই।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا–এর عطف হয়েছে عَادُوْا -এর উপর। অর্থ এই যে, যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌঁছে একথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মানি না, এ জীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে এবং হিসাব-কিতাব, প্রতিদান ও শাস্তিকে একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভবপর ?

উত্তর এই যে, অস্বীকার করার জন্য বাস্তবে ঘটনাবলীর বিশ্বাস না থাকা জরুরী নয়। বরং আজকাল যেমন অনেক কাফির ইসলামী সত্যসমূহে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতাবশত ইসলামকে অস্বীকার করে চলছে, এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কোরআন পাক বর্তমান জীবনে কোন কোন কাফির সম্পর্কে বলে ঃ

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا—অর্থাৎ তারা নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, কিন্তু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ নবী (সা)-কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে আছে।

মোটকথা, জগৎস্রষ্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, তাদের এ বক্তব্য যে 'দুনিয়াতে পুন প্রেরিত হলে মু'মিন হয়ে যাব'–সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তাদের কথা অনুযায়ী

পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করত।

তফসীরে মাযহারীতে তিবরানীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, হিসাব-কিতাবের সময় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে বিচার দণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে বলবেন ঃ সন্তানদের কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সৎকর্ম পাপকর্মের চাইতে এক রতি বেশি হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌঁছাতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলবেন ঃ আমি জাহান্নামের আযাবে ঐ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করাব, যার সম্পর্কে জানি যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলেও সে পূর্বের মতই কাজ করবে।

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ —হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সৎ লোকদের কাজকর্ম তাদের বাহন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অসৎ লোকদের কাজকর্ম ভারী বোঝার আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কাফির ও পাপীরা হাশরের ময়দানে প্রাণ রক্ষার্থে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা বলবে। কখনও মিথ্যা কসম খাবে, কখনও দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত হওয়ার আকাঙক্ষা করবে। কিন্তু একথা কেউ বলবে না যে, আমরা এখন বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এখন সৎকাজ করব। কেননা, এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে যে, এ জগৎ কর্মজগৎ নয় এবং বিশ্বাস স্থাপন ততক্ষণ পর্যন্তই শুদ্ধ, যতক্ষণ তা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন হয়। দেখার পর সত্য জানা, তা দেখারই প্রতিক্রিয়া—আল্লাহ্ ও রাসূলকে সত্য জানা নয়। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, এর ফলাফল অর্থাৎ চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ, দুনিয়াতে শান্তিময় পবিত্র জীবন এবং পরকালে জান্নাত লাভ শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এর পূর্বে আত্মজগতে এগুলো অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এর পরে পরকালেও এগুলো উপার্জন করা সম্ভবপর নয়।

এতে ফুটে উঠল যে, পার্থিব জীবন অনেক বড় নিয়ামত এবং অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। উপরোক্ত সুমহান সওদা এ জীবনেই ক্রয় করা যায়। তাই ইসলামে আত্মহত্যা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ। কারণ, এতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিরাট নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তির জীবনালেখ্যে দেখা যায় যে, ওফাতের সময় তাঁদের মুখে হযরত জামীর এ পংক্তিটি উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

با دوروزِ زندگی جامی نشد سیر غمت
وه چه خوش بودے که عمرِ جاودانی داشتیم

এতে একথাও ফুটে উঠেছে যে, আলোচ্য শেষ আয়াতে এবং কোরআন পাকের আরও কতিপয় আয়াতে পার্থিব জীবনকে যে ক্রীড়া ও কৌতুক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কিংবা অনেক হাদীসে দুনিয়ার যে নিন্দা বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ—পার্থিব জীবনের ঐসব মুহূর্ত, যা আল্লাহ্র স্মরণ ও চিন্তা থেকে গাফিল অবস্থায় অতিবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে সময় আল্লাহ্র ইবাদত ও স্মরণে অতিবাহিত হয়, তার সমতুল্য পৃথিবীর কোন নিয়ামত ও সম্পদই নেই।—

دن وهی دن ہے شب وهی شب ہے
جو تری یاد میں گذر جائے

এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ الدنيا ملعون وملعون ما فيها الا ذكر الله او عالم او متعلم অর্থাৎ দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছুই অভিশপ্ত কেবল আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং আলিম কিংবা তালিবে ইল্‌ম বাদে।

চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আলিম ও তালিবে ইল্‌মও আল্লাহ্‌র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ইল্‌ম দ্বারা হাদীসে ঐ ইল্‌ম বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ হয়। এমন ইল্‌ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া উভয়ই আল্লাহ্‌র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম জযরীর বর্ণনা মতে–দুনিয়ার যে কোন কাজই আল্লাহ্‌র আনুগত্য অর্থাৎ শরীয়তের বিধান অনযায়ী করা হয়, তা আল্লাহ্‌র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। এতে বোঝা যায় যে, দুনিয়ার সব জরুরী কাজ, জীবিকা উপার্জনের যাবতীয় বৈধ পন্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনাদি শরীয়তের সীমার বাইরে না হলে সবই আল্লাহ্‌র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, মেহমান ইত্যাদির প্রাপ্য পরিশোধ করাকে সহীহ্ হাদীসে সদকা ও ইবাদত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মোটকথা এই যে, এ জগতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য এবং স্মরণ ছাড়া কোন কিছুই আল্লাহ্‌র পছন্দীয় নয়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র) চমৎকার বলেছেন ঃ

بگذر از یاد گل وگلبن که هیچم یاد نیست
درزمیں و آسماں جز ذکر حق آباد نیست

সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যে বস্তু প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা সর্বাধিক মূল্যবান ও প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন। একথাও সবার জানা যে, মানুষের জীবনের একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি রয়েছে কিন্তু জীবনের সঠিক সীমা কারও জানা নেই যে, তা সত্তর বছর হবে না, সত্তর ঘন্টা, না একটি শ্বাস ছাড়ারও সময় পাওয়া যাবে না।

অপরদিকে এ কথাও জানা যে, ইহকাল ও পরকালের সুখশান্তি ও আরাম-আয়েশের নিশ্চয়তা বিধায়ক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিরূপী অমূল্য মূলধনটি একমাত্র এ সীমাবদ্ধ পার্থিব জীবনেই অর্জন করা যায়। এখন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ নিজের ফয়সালা করতে পারে যে, জীবনের এ সীমাবদ্ধ মুহূর্তগুলোকে কি কাজে ব্যয় করা যায়? নিঃসন্দেহে বুদ্ধির দাবি ও এই হবে যে, এ মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের কাজেই অধিকতর ব্যয় করা দরকার। জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ যতটুকু করা নেহায়েত জরুরী, ততটুকুই করা উচিত।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

الكيس من دان نفسه ورضى با لكفاف وعمل لما بعد الموت

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিই বুদ্ধিমান ও চতুর, যে আত্মসমালোচনা করে, ন্যূনতম জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করে।

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ
الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿৩৩﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ
فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿৩৪﴾ وَاِنْ كَانَ
كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ
اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا
تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿৩৫﴾ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕ وَالْمَوْتٰى
يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿৩৬﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ
قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿৩৭﴾ وَمَا
مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ
مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿৩৮﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ
عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿৩৯﴾ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ
السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿৪০﴾ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ
فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿৪১﴾ ع

(৩৩) আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, প্রকারান্তরে এ জালিমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকেই অস্বীকার করে। (৩৪) আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা

এতে সবর করেছেন। তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে। (৩৫) আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে আপনি যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন, অতঃপর তাদের কাছে কোন একটি মু'জিযা আনতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সবাইকে সরল পথে সমবেত করতে পারতেন। অতএব, আপনি অবুঝদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৩৬) তারাই মানে, যারা শ্রবণ করে। আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করে উত্থিত করবেন। অতঃপর তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৭) তারা বলে ঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন ? বলে দিন ঃ আল্লাহ্ নিদর্শন অবতারণ করতে পূর্ণ সক্ষম; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩৮) আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় পালনকর্তার কাছে সমবেত হবে। (৩৯) যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (৪০) বলুন, বল তো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও ? (৪১) বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর যে বিপদের জন্য তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দূরও করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিরদের বাজে কথার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দান ঃ আমার ভাল জানা আছে যে, তাদের (কাফিরদের) উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব (আপনি দুঃখিত হবেন না, বরং তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করুন কেননা) তারা সরাসরি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না। কিন্তু জালিমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী (ইচ্ছাকৃতভাবে) অস্বীকার করে (যদিও এতে অপরিহার্যভাবে আপনাকেই মিথ্যাবাদী বলা হয়ে যায়, কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যারোপ করা। যেমন, তাদের কেউ কেউ অর্থাৎ আবূ জাহল প্রমুখ এ কথা স্বীকারও করে। তাদের আসল উদ্দেশ্য যখন আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তখন বুঝতে হবে যে, তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র সাথেই সম্পৃক্ত। তিনি নিজেই তাদেরকে বুঝে নেবেন। আপনি দুঃখিত হবেন কেন ?) আর (কাফিরদের এ মিথ্যারোপ করার ব্যাপরটি নতুন কিছু নয়, বরং) আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরের প্রতিও মিথ্যারোপ করা হয়েছে, আর এ মিথ্যারোপের জবাবে তাঁরা ধৈর্যই ধরেছিলেন এবং তাঁদের উপর (নানাবিধ) নির্যাতন চালানো হয়—এমনকি তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে যায়। (ফলে বিরোধী পক্ষ পরাজিত হয়—তখন পর্যন্ত তাঁরা ধৈর্যই ধরেছিলেন।) এবং (এমনিভাবে ধৈর্য ধরার পর আপনার

কাছেও আল্লাহ্র সাহায্য পৌঁছবে। কেননা) আল্লাহ্র বাণী (অর্থাৎ ওয়াদাসমূহ)-কে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। (আপনার সাথেও সাহায্যের ওয়াদা হয়ে গেছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ এবং) আপনার কাছে পয়গম্বরদের কোন কোন কাহিনীর (কোরআনের বাহির) মাধ্যমে পৌঁছেছে (যদ্দারা আল্লাহ্র সাহায্য এবং পরিণামে বিরোধী পক্ষের পরাজয় প্রমাণিত হয়। এ সান্ত্বনার সারমর্ম এই যে, প্রথম প্রথম কয়েকদিন ধৈর্য ধারণের পর আল্লাহ্ পয়গম্বরদের কাছে সাহায্য প্রেরণ করেন–এটি আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা। এ সাহায্যের ফলে ইহকালেও সত্য জয়ী এবং মিথ্যা পরাভূত হয়ে যায় এবং পরকালেও তাঁরা সম্মান ও সাফল্য লাভ করেন। আপনার সাথেও এ ব্যবহারই করা হবে। কাজেই আপনি দুঃখিত হবেন না। যেহেতু সব মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চূড়ান্ত দয়া ও ভালবাসা ছিল তাই এ সান্ত্বনা সত্ত্বেও তাঁর বাসনা ছিল যে, মুশরিকরা বর্তমান মু'জিযা ও নবুয়তের প্রমাণাদিতে আশ্বস্ত হয়ে বিশ্বাস স্থাপন না করলে তারা যেরূপ মু'জিযা দাবি করে, তদ্রূপ মু'জিযাই প্রকাশ করা হোক–এতে হয়তো তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। এদিক দিয়ে তাদের কুফরী দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধৈর্য ধারণ করতে পারতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র হিকমত অনুযায়ীই ফরমায়েশকৃত মু'জিযা প্রকাশ করা হবে না। আপনি কিছু দিন ধৈর্য ধরুন, মু'জিযা প্রকাশের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। সেমতে বলা হয়েছে ঃ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ এবং যদি তাদের (অবিশ্বাসীদের) বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয় (এবং তাই মনে চায় যে, তাদের ফরমায়েশকৃত মু'জিযা প্রকাশিত হোক) তবে আপনি যদি ভূতলে (যাওয়ার জন্য) কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে ওঠার জন্য কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন এবং (তার দ্বারা ভূতলে কিংবা আকাশে গিয়ে সেখান থেকে) কোন একটি (ফরমায়েশী) মু'জিযা আনতে পারেন, তবে (ভাল কথা, আপনি তাই) আনুন। (অর্থাৎ আমি তো তাদের এসব ফরমায়েশ প্রয়োজন ও হিকমত অনুযায়ী না হওয়ার কারণে পূর্ণ করব না। আপনি যদি চান যে, তাঁরা কোন-না-কোনরূপে মুসলমান হোক, তবে আপনি নিজে এর ব্যবস্থা করুন।) আর আল্লাহ্ (সৃষ্টিগতভাবে) ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে সৎপথে একত্র করতেন, (কিন্তু যেহেতু তারা নিজেরাই নিজেদের মঙ্গল চায় না, তাই সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্ তা ইচ্ছা করেন নি। এমতাবস্থায় আপনার চাওয়া ঠিক হবে না।) অতএব, আপনি (এ চিন্তা পরিহার করুন)। অবুঝদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (সত্য ও হিদায়েতকে তো) তারাই গ্রহণ করে যারা (সত্য বিষয়কে অনুসন্ধিৎসার সাথে) শ্রবণ করে এবং (এ অস্বীকার ও বিমুখতার পূর্ণ শাস্তি ইহকালে না পেলে তাতে কি হলো, একদিন আল্লাহ্) মৃতদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উত্থিত করবেন, অতঃপর তারা সবাই আল্লাহ্রই দিকে (হিসাবের জন্য) প্রত্যাবর্তিত হবে। আর তারা (অবিশ্বাসীরা হঠকারিতা করে) বলে যে, যদি তিনি নবী হন, তবে তাঁর প্রতি (আমাদের ফরমায়েশকৃত মু'জিযার মধ্য থেকে) কোন মু'জিযা কেন অবতীর্ণ করা হয়নি ? আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা (এরূপ) মু'জিযা অবতরণ করতে পূর্ণ শক্তিমান, কিন্তু তাদের অধিকাংশই (এর পরিণাম সম্পর্কে) অবগত নয়। (তাই এরূপ আবেদন করছে। পরিণাম এই যে, এর

পরেও বিশ্বাস স্থাপন না করলে কালবিলম্ব না করে সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। প্রমাণ ঃ ولو انزلنا ملكا لقضى الامر সারকথা এই যে, তাদের ফরমায়েশকৃত মু'জিযা প্রকাশ করার প্রয়োজন এ জন্য নেই যে, পূর্বের মু'জিযাগুলোই যথেষ্ট। আল্লাহ্ বলেন ঃ اولم يكفهم। এ ছাড়া আমি জানি যে, ফরমায়েশকৃত মো'জিযা দেখেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। ফলে তাৎক্ষণিক শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। তাই হিকমতের দাবি এই যে, তাদের ফরমায়েশকৃত মু'জিযা প্রকাশ না করা হোক! ভালবাসা ও দয়াবশত আয়াতের শেষ ভাগে وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ। বলা হয়েছে جهالت (মূর্খতা) শব্দটি আরবী ভাষায় অবুঝ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর অনুবাদে 'অজ্ঞতা' কিংবা 'অজ্ঞানতা' বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থী। (পরবর্তী আয়াতে হুঁশিয়ার করার জন্য কিয়ামত ও সব সৃষ্ট জীবের হাশর বর্ণিত হচ্ছে-) এবং যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে (স্থলে হোক কিংবা জলে) বিচরণশীল রয়েছে, যত প্রকার পাখি দু'ডানা যোগে উড়ে বেড়ায় তাদের মধ্যে কোন প্রকারই এরূপ নেই, যা (কিয়ামতের দিন জীবিত ও উত্থিত হওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের মত সম্প্রদায় নয় এবং (যদিও এগুলোর সংখ্যাধিক্যের কারণে সাধারণভাবে অগণিত মনে করা হয়, কিন্তু আমার হিসাবে সব লিপিবদ্ধ আছে। কেননা) আমি (স্বীয়) গ্রন্থে (লওহে মাহফুযে) কোন বস্তু (যা কিয়ামত পর্যন্ত হবে, না-লিখে) ছাড়িনি। (যদিও আল্লাহ্র পক্ষে লেখার প্রয়োজন ছিল না-তাঁর আদি ও সর্বব্যাপী জ্ঞানই যথেষ্ট, কিন্তু সাধারণকে বোঝাবার জন্য লিপিবদ্ধ করে নেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত।) অনন্তর (এর পরে নির্দিষ্ট সময়ে) সবই (মানুষ ও জন্তু জানোয়ার) স্বীয় পালনকর্তার কাছে একত্র হবে। [অতঃপর পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে] যারা আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করে, তারা তো (সত্য বলার ব্যাপারে) মূক (সদৃশ) এবং (সত্য শ্রবণে) বধির (সদৃশ) হচ্ছে (এবং এর কারণে) নানারূপ অন্ধকারে (পতিত) রয়েছে। (কেননা, প্রত্যেকটি কুফর এক একটি অন্ধকার। তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কুফরী একত্র রয়েছে। এরপর বিভিন্ন প্রকার কুফরীর বারবার পুনরাবৃত্তি পৃথক পৃথক অন্ধকারের সমাবেশ ঘটিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, (সত্যবিমুখ হওয়ার কারণে) পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা, (কৃপাবশত) সরল পথে পরিচালিত করেন। আপনি (মুশরিকদের) বলুন ঃ (আচ্ছা) বল তো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র কোন শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায় তবে কি (এ শাস্তি ও কিয়ামতের ভয়াবহতা দূরীকরণার্থ) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে আহবান করবে ?-যদি তোমরা (শিরকের দাবিতে) সত্যবাদী হও। (সত্যবাদী হলে তখনও অন্যকেই আহবান কর, কিন্তু এরূপ কখনও হবে না) এবং (তখন তো) বিশেষভাবে তাঁকেই আহবান করবে। অতঃপর যার (অর্থাৎ যে বিপদ টলানোর) জন্য তোমরা (তাঁকে) আহবান করবে তিনি ইচ্ছা করলে হটাবেন না এবং যাদেরকে তোমরা (এখন আল্লাহ্র) অংশীদার করছ (তখন) তাদের সবাইকে ভুলে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ অর্থাৎ কাফিররা প্রকৃতপক্ষে আপনার পতি মিথ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতিই মিথ্যারোপ

করে। সুদ্দীর বর্ণনা সূত্রে তফসীরে মাযহারীতে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দু'জন কাফির সর্দার আখনাস ইবনে শরীফ ও আবূ জাহেলের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আখনাস আবূ জাহেলকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবুল হিকাম! [আরবে আবূ জাহেল 'আবুল হিকাম' (জ্ঞানধর) নামে খ্যাত ছিল। ইসলাম যুগে কুফরী ও হঠকারিতার কারণে তাকে 'আবূ জাহেল' (মূর্খতাধর) উপাধি দেওয়া হয়।] আমরা এখন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে না; মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা কি, আমাকে সত্য সত্য বল। তাকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী ?

আবূ জাহেল আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলল ঃ নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সত্যবাদী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেননি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, কোরাইশ গোত্রের একটি শাখা 'বনী কুসাই'-এ সব গৌরব ও মহত্ত্বের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কোরাইশরা রিক্তহস্ত থেকে যাবে–আমরা তা কিরূপে সহ্য করতে পারি ? পতাকা বনী কুসাই-এর হাতে রয়েছে। হেরেম শরীফে হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে। খানায়ে-কা'বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ত্ত। এখন যদি আমরা নবুয়তও তাদের মধ্যেই ছেড়ে দেই, তবে অবশিষ্ট কোরাইশদের হাতে কি থাকবে ?

নাজিয়া ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একবার আবূ জাহেল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল ঃ আপনি মিথ্যাবাদী–এরূপ কোন ধারণা আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা ঐ ধর্ম ও গ্রন্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন। —(মাযহারী)

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত অর্থেও নেওয়া যেতে পারে, কোন রূপক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কাফিররা আপনাকে নয়–আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফিররা বাহ্যত যদিও আপনাকে মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে ও তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কেই কষ্ট দেয়।

ষষ্ঠ আয়াতে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা এমন সুবিচার করবেন যে, কোন শিং বিশিষ্ট জন্তু কোন শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এ দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেওয়া হবে। এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধও নেওয়া হবে। যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবে ঃ 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।' সব জন্তু তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়ই কাফিররা আক্ষেপ করে বলবে ঃ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا–অর্থাৎ আফসোস, আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম।

ইমাম বগভী হযরত আবূ হোরায়রার রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে। এমনকি, শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে নেওয়া হবে।

সৃষ্ট জীবের পাওনার গুরুত্ব ঃ সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে কোন শরীয়ত ও বিধি-বিধান পালন করতে আদেশ দেওয়া হয়নি, এ আদেশ শুধু মানুষ ও জ্বীনদের প্রতি। একথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয়, তাদের সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবহার হতে পারে না। তাই আলিমরা বলেন ঃ হাশরে জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং রাব্বুল আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর নির্যাতনের প্রতিশোধ অন্য জন্তুর কাছ থেকে নেওয়া হবে। তাদের অন্য কোন কাজের হিসাব-নিকাশ হবে না। এতে বোঝা যায় যে, সৃষ্ট জীবের পারস্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট নয়—এমন জন্তুদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধার্মিক ও ইবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ (৪২)
فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (৪৩) فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ
شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ (৪৪)
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (৪৫)

(৪২) আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। (৪৩) অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব এল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না ? বস্তুত তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল। (৪৪) অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্য তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। (৪৫) অতঃপর যালিমদের মূল শিকড় কর্তিত হলো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম (কিন্তু তারা তাঁদেরকে অমান্য করে) অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন মাধ্যমে পাকড়াও করেছিলাম-যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে (এবং কুফর ও গুনাহ্ থেকে তওবা করে নেয়)। অতএব তাদের কাছে যখন আমার শাস্তি পৌঁছেছিল, তখন কেন তারা কাকুতি-মিনতি করেনি (যাতে তাদের অপরাধ মাফ হয়ে যেত) ? পরন্তু তাদের অন্তর তো (তেমনি) কঠোরই রয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কুকর্মসমূহকে তাদের ধারণায় (যথারীতি) সুশোভিত (ও প্রশংসার্হ) করে দেখাতে থাকে। অনন্তর যখন তারা (যথারীতি) উপদেশ বিস্মৃত হলো (এবং পরিত্যাগ করল) যা তাদেরকে (পয়গম্বরদের পক্ষ থেকে) দেওয়া হতো (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য) তখন আমি তাদের জন্য (আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের) সব দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়সমূহের জন্য তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল (এবং) অমনোযোগিতা ও শৈথিল্যবশত তাদেরকে অকস্মাৎ (ধারণাতীত আযাবে) পাকড়াও করলাম (এবং কঠোর আযাব-নাযিল করলাম, যা কোরআনের স্থানে স্থানে বর্ণিত হয়েছে,) অতঃপর (এ আযাব দ্বারা) যালিমদের মূল শিকড় (পর্যন্ত) কর্তিত হয়ে গেল। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা (আর্থাৎ যে যালিমের কারণে জগতে অমঙ্গল ছড়িয়েছিল, তাদের পাপছায়া দূর হয়ে গেল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কুফর ও শিরক বাতিল করে একত্ববাদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে মক্কার মুশরিকদের প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ যদি আজ তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে-উদাহরণত আল্লাহ্‌র আযাব যদি দুনিয়াতেই তোমাদের পাকড়াও করে কিংবা মৃত্যু অথবা কিয়ামতের ভয়াবহ হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়, তবে চিন্তা করে বল, তোমরা এ বিপদ দূর করার জন্য কাকে ডাকবে ? কার কাছে বিপদ-মুক্তির আশা করবে ? পাথরের এসব স্বনির্মিত মূর্তি কিংবা কোন সৃষ্ট জীব, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র মর্যাদায় আসীন করে রেখেছ, তারা তোমাদের কাজে আসবে কি ? তোমরা তাদের কাছে ফরিয়াদ করবে, না শুধু আল্লাহ্ তা'আলাকেই আহবান করবে ?

এর উত্তর যে কোন সচেতন মানুষের পক্ষ থেকে এছাড়া কিছুই হতে পারে না, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ ব্যাপক বিপদমুহূর্তে কট্টর মুশরিকই সব মূর্তি ও স্বনির্মিত উপাস্যদের ভুলে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই আহবান করবে। এখন ফলাফল সুস্পষ্ট যে, তোমাদের মূর্তি এবং ঐ উপাস্য, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র আসনে আসীন করে রেখেছ এবং বিপদ বিদূরণকারী ও অভাব মোচনকারী মনে করছ, তারা যখন এ বিপদ মুহূর্তে তোমাদের কাজে আসবে না এবং তোমরা সাহায্যের জন্য তাদেরকে আহবান করতেও সাহসী হবে না, তখন তাদের ইবাদত কোন্ উপকারে আসবে ?

এ বিষয়টি হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতের সারমর্ম। এসব আয়াতে কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ পার্থিব জীবনেও আযাব আসার সম্ভাব্যতা বর্ণিত হয়েছে। ধরে নেওয়া যাক, যদি এ জীবনে আযাব নাও আসে, তবে কিয়ামতের আগমন তো অবশ্যম্ভাবী। সেখানে মানুষের সব কাজ-কর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রতিদান এবং শাস্তির বিধানও জারি হবে।

এখানে ساعة শব্দের প্রসিদ্ধ কিয়ামতও হতে পারে এবং 'কিয়ামতে ছুগরা' (ছোট কিয়ামত)-ও হতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুতেই কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়। প্রবাদবাক্য আছেঃ من مات فقد قامت قيامته অর্থাৎ যার মৃত্যু হয়, তার কিয়ামত সেদিনই হয়ে যায়। কেননা, কিয়ামতের হিসাব-কিতাবের প্রাথমিক নমুনাও কবর ও বরযখে দেখা যাবে এবং প্রতিদান এবং শাস্তির নমুনাও এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে।

সারকথা এই যে, অবাধ্যদেরকে এসব আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন নিশ্চিত হয়ে না যায়। পার্থিব জীবনেও তারা আযাবে পতিত হতে পারে—যেমন পূর্ববর্তী উম্মতরা হয়েছে। যদি তা না হয়, তবে মৃত্যু কিংবা কিয়ামতে পরবর্তী হিসাব তো অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু যে মানব সীমাবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে সমগ্র বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করে, তারা এ জাতীয় বিষয়বস্তুতে বাহানাবাজির আশ্রয় নেয়। তারা পয়গম্বরদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণীকে কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা আখ্যা দিয়ে গা বাঁচিয়ে যায়। বিশেষ করে যখন প্রায় সব যুগেই এমন অবস্থাও সামনে আসে যে, অনেক মানুষ আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্যতা সত্ত্বেও ধনেজনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও সম্মান মর্যাদা সব কিছুই তাদের করায়ত্ত রয়েছে। একদিকে এ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং অপরদিকে পয়গম্বরগণের ভীতিপ্রদর্শন—যখন তারা উভয়টিকে মিলিয়ে দেখে, তখন বাহানাবাজ মন ও শয়তান তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, পয়গম্বরগণের উক্তি একটি প্রতারণা ও কুসংস্কারপ্রসূত ধারণা বৈ নয়।

এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতগণের ঘটনাবলী এবং তাদের উপর প্রয়োগকৃত আইন বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ٠

অর্থাৎ আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে কি না। তারা যখন এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরও বেশি লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হলো। অর্থাৎ তাদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বার খুলে দেওয়া হলো এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হলো। আশা ছিল যে, তারা এ সব নিয়ামত দেখে নিয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা আল্লাহকে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হলো। নিয়ামতদাতাকে চেনা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ ও রাসূলের বাণী ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওযর-আপত্তির আর কোন ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলা অকস্মাৎ তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমনভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবারও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর এ আযাব জলে-স্থলে ও অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে মিসমার

করে দিয়েছে। নূহ (আ)-এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যুপরি আট দিন প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামুদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। লূত (আ)-এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টিয়ে দেওয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীব-জন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'বাহরে-মাইয়্যেৎ' তথা 'মৃত-সাগর' নামে এবং 'বাহরে-লূত' নামেও অভিহিত করা হয়।

মোটকথা পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আযাবের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে— যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোন সময় তারা বাহ্যত স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোন জাতির প্রতি অকস্মাৎ আযাব নাযিল করেন না, বরং প্রথমে হুঁশিয়ারির জন্য অল্প শাস্তি অবতারণ করেন। এতে ভাগ্যবান লোক অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার সুযোগ পায়। আরও জানা গেল যে, ইহকালে সাজা হিসেবে যে কষ্ট ও বিপদ আসে, তা সাজার আকারে হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়, বরং অসাবধানতা থেকে সজাগ করাই তার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটি সাক্ষাৎ করুণা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٠

অর্থাৎ আমি তাদেরকে বড় আযাবের স্বাদ গ্রহণ করানোর পূর্বে একটি ছোট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাই, যাতে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসে।

এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহকাল প্রতিদান জগৎ নয়, বরং কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ একই পাল্লায় ওজন করা হয়; বরং অসৎ লোক সৎ লোকের চাইতে অধিক সুখে থাকে। অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি ? এ সন্দেহের উত্তর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আসল প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতেই হবে। তাই কিয়ামতের অপর নাম 'ইয়াওমুদ্দীন' প্রতিদান দিবস। কিন্তু আযাবের নমুনা হিসেবে কিছু কষ্ট এবং সওয়াবের নমুনা হিসেবে কিছু সুখ করুণাবশত ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন সাধক বলেছেন যে, এ জগতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা, যাতে মানুষ জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে, সব পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোন কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং কোন কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না।

মোটকথা, দুনিয়ার সুখ ও কষ্ট প্রকৃত শাস্তি ও প্রতিদান নয়, বরং শাস্তি ও প্রতিদানের নমুনা মাত্র। সমগ্র বিশ্বজগৎ পরকালের একটি শো-রুম। ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যের নমুনা দেখাবার জন্য দোকানের অগ্রভাগে একটি শো-রুম সাজিয়ে রাখে, যাতে নমুনা দেখে ক্রেতার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতএব, বোঝা গেল যে, দুনিয়ার কষ্ট ও সুখ প্রকৃতপক্ষে শাস্তি ও প্রতিদান নয়, বরং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল মাত্র।

خلق را باتو چنیں بد خو کنند
تا ترا ناچار، روان سو کنند

আলোচ্য আয়াতের শেষভাগেও لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তিদান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। এতে বোঝা গেল যে, দুনিয়াতে আযাব হিসেবেও কষ্ট ও বিপদ কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহর রহমত কার্যরত থাকে।

এরপর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নিয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

এতে সাধারণ মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে রয়েছে এবং সফল জীবন যাপন করছে। অনেক সময় আযাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে।

তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তির উপর নিয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, অথচ সে গুনাহ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিলা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস। --(ইবনে-কাসীর)

তফসীরবিদ ইবনে-জারীর ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের মধ্যে দু'টি গুণ সৃষ্টি করে দেন-- এক. প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তিতা, দুই. সাধুতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চান, তখন তাদের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে দেন। অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ ও কুকর্ম সত্ত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর ব্যাপক আযাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বংশ নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর পর বলা হয়েছে وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্য একটি নিয়ামত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ
إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾
قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ
إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ
فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

(৪৬) আপনি বলুন ঃ বল তো দেখি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে ? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। (৪৭) বলে দিন ঃ দেখ তো, যদি আল্লাহর শাস্তি আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে যালিম সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? (৪৮) আমি পয়গম্বরদের প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শকরূপে-- অতঃপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয় তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৪৯) যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে আযাব স্পর্শ করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে আরও) বলুন ঃ বল, যদি আল্লাহ্ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ (ছিনিয়ে) নিয়ে যান (অর্থাৎ যদি তোমরা কোন কিছু শুনতে ও দেখতে অক্ষম হয়ে পড়) এবং তোমাদের অন্তরসমূহে মোহর এঁটে দেন (যাতে তোমরা অন্তর দ্বারা কোন কিছু বুঝতে না পার), তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য আছে কি, যে এ (বস্তু)-গুলো তোমাদেরকে প্রত্যর্পণ করবে? (তোমাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও যখন এরূপ কেউ নেই, তখন কিরূপে অন্যকে উপাসনার যোগ্য মনে কর?) আপনি দেখুন তো আমি কি (কি)–ভাবে বিভিন্নরূপে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করছি ! এরপরও (এসব নিদর্শনে চিন্তাভাবনা ও তার ফলাফল স্বীকার করা থেকে) তারা বিমুখ হচ্ছে। আপনি (তাদেরকে আরও) বলুন ঃ বল, যদি আল্লাহর শাস্তি আকস্মিক কিংবা প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তবে অত্যাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত (এ শাস্তি দ্বারা) অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি ? (উদ্দেশ্য এই যে, শাস্তি আগমন করলে তা তোমাদের

অত্যাচারের কারণে তোমাদের উপরই নিপতিত হবে। ঈমানদাররা বেঁচে থাকবে) কাজেই مرگ انبوهی جشنی دارد (পাইকারী মৃত্যুও একটি উৎসব বিশেষ—এ সান্ত্বনাও ভুলে যাওয়া উচিত যে, আযাব আগমন করলে আমাদের সাথে মুসলমানদের উপরও তা নিপতিত হবে।) এবং আমি পয়গম্বরদের (যাদের পয়গম্বরী অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করেছি) শুধু এ কারণে প্রেরিত করি যে, তাঁরা (ঈমানদার ও অনুগতদের আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের নিয়ামতের) সুসংবাদ দেবেন এবং (কাফির ও গুনাহ্গারদের আল্লাহর অসন্তুষ্টির) ভয় প্রদর্শন করবেন। (এ জন্য প্রেরণ করি না যে, বলা-কওয়া শেষ হওয়ার পরও বিরোধীরা তাদেরকে যেসব আবোল-তাবোল ফরমায়েশ করবে তারা তা পূর্ণ করে দেখাবেন।) অনন্তর (পয়গম্বরদের সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের পর) যে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং (স্বীয় অবস্থার বিশ্বাসগত ও কার্যগত) সংশোধন করে নেবে তাদের (পরকালে) কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। পক্ষান্তরে যারা (সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি-প্রদর্শনের পরেও) আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের (মাঝে মাঝে ইহকাল আর পরকালে তো অবশ্যই) শাস্তি স্পর্শ করবে। কারণ, তারা বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে।

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ
اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى
وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا
اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾

(৫০) আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া, আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি একজন সম্মানিত ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে ? তোমরা কি চিন্তা কর না? (৫১) আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশংকা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্র হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না-- যাতে তারা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

আপনি (হঠকারীদের) বলে দিন ঃ আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার সব ভাণ্ডার রয়েছে (যে, যা চাওয়া হবে, তাই নিজ বলে দিয়ে দেব) এবং আমি সব অদৃশ্য বিষয়েও অবগত নই (যা আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য) এবং তোমাদের বলি না যে, আমি

একজন ফেরেশতা, আমি তো শুধু ঐ ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে-- (তাতে ওহী অনুযায়ী নিজে করা এবং অপরকে আহবান করার কথা রয়েছে। পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরদের অবস্থাও তাই ছিল। অতঃপর) আপনি তাদেরকে বলুন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি (কখনো) সমান হতে পারে? (বিষয়টি যখন সর্বজনস্বীকৃত,) অনন্তর তোমরা কি (চক্ষুষ্মান হতে চাও না এবং উল্লিখিত বক্তব্যে সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে পুরোপুরি) চিন্তা কর না? বস্তুত (যদি এতেও তারা হঠকারিতা পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে দিন এবং স্বীয় আসল কর্তব্য রিসালত প্রচারে নিয়োজিত হোন) এমন লোকদের (কুফর ও গুনাহ্‌র কারণে আল্লাহ্‌র শাস্তির বিশেষভাবে) ভয় প্রদর্শন করুন, যারা বিশ্বাসগতভাবে কিংবা কমপক্ষে সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে) ভয় করে (যে, কিয়ামতে স্বীয় পালনকর্তার দিকে এমতাবস্থায় একত্রিত হতে হবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া যাদের কাফিররা সাহায্যকারী কিংবা সুপারিশকারী মনে করেছিল, তখন তাদের মধ্য থেকে) কোন সাহায্যকারী এবং কোন সুপরিশকারী হবে না-যেন তারা শাস্তিকে ভয় করে (এবং কুফর ও গুনাহ্ থেকে বিরত হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিরদের পক্ষ থেকে ফরমায়েশী মু'জিযার দাবি ঃ মক্কার কাফিরদের সামনে রাসূলে করীম (সা)-এর অনেক মু'জিযা এবং আল্লাহ্ তা'আলার খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর ইয়াতীম অবস্থায় দুনিয়াতে আগমন, লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর অবস্থায় থাকা, এমন দেশে জন্মগ্রহণ করা, যারা আশেপাশে না কোন বিদ্বান ব্যক্তি ছিল এবং না কোন বিদ্যাপীঠ, জীবনের চল্লিশ বছর পর্যন্ত খাঁটি নিরক্ষর অবস্থায় মক্কাবাসীদের সামনে থাকা, অতঃপর চল্লিশ বছর পর হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বিস্ময়কর দার্শনিক উক্তি বের হতে থাকা -এগুলো নিঃসন্দেহে একেকটি মু'জিযা ও আল্লাহ্‌র নিদর্শন ছিল। তাঁর দার্শনিক উক্তির প্রাঞ্জলতা ও অলঙ্কার প্রাঞ্জলভাষী আরব জাতিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাদের চিরতরে নির্বাক করে দিয়েছে। তাঁর উক্তির অর্থ প্রজ্ঞাবহ এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত মানবীয় প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। একজন কামেল মানুষের কর্মধারা কি হবে, তিনি তা শুধু চিন্তা ক্ষেত্রেই রচনা করেন নি, বরং কার্যক্ষেত্রে দুনিয়াতে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রচলিত করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা প্রবর্তিত কর্ম-ব্যবস্থা মানব-বুদ্ধি ও মানব মস্তিষ্কের পক্ষে রচনা করা সম্ভবপর নয়। যেসব মানুষ মানবতাকে ভুলে গিয়ে গরু-ছাগল ও ঘোড়া-গাধার মত শুধু পানাহার ও নিদ্রা-জাগরণকেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিল, তিনি তাদেরকে বিশুদ্ধ মানবতার শিক্ষা দেন এবং তাদের জীবনের গতি এমন সুউচ্চ লক্ষ্যের দিকে ঘুরিয়ে দেন, যার জন্য তাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের প্রত্যেকটি সময়াবর্তন এবং তাতে সংঘটিত প্রত্যেকটি মহান ঘটনা একেকটি মু'জিযা ও ঐশী নিদর্শন ছিল, যা দেখার পর ন্যায়নিষ্ঠ বুদ্ধিমানের জন্য আর কোন নিদর্শন ও মু'জিযা দাবি করার অবকাশ ছিল না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কোরাইশ কাফিররা নিজেদের বাসনা অনুযায়ী অন্য রকম মু'জিযাসমূহের মধ্যে কোন কোনটি আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্যভাবে কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা চন্দ্রকে

দ্বিখণ্ডিত করার দাবি করেছিল। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযাটি শুধু কোরাইশরাই নয়, তৎকালীন বিশ্বের বহু লোক স্বচক্ষে দেখেছিল।

তাদের দাবি অনুযায়ী এমন বিরাট মু'জিযা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কুফর ও পথভ্রষ্টতায় এবং জেদ ও হঠকারিতা পূর্ববৎ অটল থেকে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার এ নিদর্শনকে اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ বলে উপেক্ষা করে। এসব বিষয় দেখা ও বোঝা সত্ত্বেও তারা প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করত। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাই বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ তারা বলে, মুহাম্মদ সত্যি সত্যি যদি আল্লাহ্র রাসূল হন, তবে তাঁর কোন মু'জিযা প্রকাশ পায় না কেন ? এর উত্তরে কোরআন মহানবী (সা)-কে আদেশ দিয়েছে যে, তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুই করতে সক্ষম। তোমাদের চাওয়া ছাড়াই তিনি যেমন অসংখ্য নিদর্শন ও মু'জিযা অবতীর্ণ করেছেন, তেমনি তিনি তোমাদের প্রার্থিত মু'জিযাও অবতীর্ণ করতে পারেন। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ্র একটি শাশ্বত রীতি রয়েছে। তা এই যে, কোন জাতিকে তাদের প্রার্থিত মু'জিযা দেখানোর পরও যদি তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের তাৎক্ষণিক আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। তাই প্রার্থিত মু'জিযা প্রকাশ না করার মধ্যেই জাতির মঙ্গল নিহিত। কিন্তু এ সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ অনেক মানুষ প্রার্থিত মু'জিযা দেখানোর জন্যই পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের প্রশ্ন ও দাবির উত্তর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে।

কাফিররা বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তিনটি দাবি করেছিল। এক. যদি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহ্র রাসূল হয়ে থাকেন, তবে মু'জিযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমাদের জন্য একত্র করে দিন। দুই. যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রাসূল হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলী ব্যক্ত করুন, যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে নিতে পারি। তিন. আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি আমাদের মতই পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পানাহার ও বাজারে ঘোরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সম অংশীদার, তিনি কিভাবে আল্লাহ্র রাসূল হতে পারেন। সৃষ্টি ও গুণাবলীতে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কোন ফেরেশতা হলে আমরা তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল ও মানব জাতির নেতারূপে মেনে নিতাম।

উপরোক্ত তিনটি দাবির উত্তরে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لاَّ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ . اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশ্নাদির উত্তরে আপনি বলে দিন ঃ তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধনভাণ্ডার দাবি করছ, কিন্তু আমি কবে এ দাবি করলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলার সব ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত ? তোমরা দাবি করছ যে, আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা তোমাদের বলে দিই, আমি এ কথাও কবে বললাম যে, আমি সব অদৃশ্য বিষয় জানি ? তোমরা আমার মধ্যে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলী দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবি করলাম যে, আমি ফেরেশতা?

মোটকথা, আমি যে বিষয় দাবি করি, তার প্রমাণ আমার কাছে চাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র রাসূল। তাঁর প্রেরিত নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছাই এবং নিজেও তা অনুসরণ করি, অপরকেও অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করি। এর জন্য একটি দুটি নয়-অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে।

রিসালত দাবি করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সব ধনভাণ্ডারের মালিক হওয়া, আল্লাহ্ তা'আলারই মত প্রত্যেক ছোট বড় অদৃশ্য বিষয় অবগত হওয়া, এবং মানবিক গুণের ঊর্ধ্বে কোন ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরী নয়। রাসূলের কর্তব্য এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহ্ প্রেরিত ঐশী বাণী অনুসরণ করবেন ; নিজেও তদনুযায়ী কাজ করবেন এবং অপরকেও কাজ করতে আহ্বান করবেন।

এ নির্দেশনামা দ্বারা একদিকে রিসালতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং অপরদিকে রাসূল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছিল, তাও দূর করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদেরও পথনির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন খ্রিস্টানদের মত রাসূলকে আল্লাহ্ না মনে করে বসে। রাসূলের মাহাত্ম্য ও ভালবাসার দাবিও তাই ; এ ব্যাপারে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মত বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদীরা রাসূলদের সম্মান হানিতে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং খ্রিস্টানরা সম্মানদানে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ্ বানিয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত নয়। এ ধনভাণ্ডার দ্বারা বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরবিদরা অনেক জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোরআন স্বয়ং ধনভাণ্ডার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। এতে বোঝা যায় ভাণ্ডার বলে দুনিয়ার সব বস্তুকেই বোঝানো হয়েছে, এতে কোন বিশেষ বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায় না। অবশ্য তফসীরবিদরা যেসব নির্দিষ্ট বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ করেছেন। কাজেই এতে কোন মতবিরোধ নেই। এ আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র ভাণ্ডার পয়গম্বর কুল-শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর হাতেও নেই, তখন উম্মতের কোন ওলী অথবা বুযুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা-তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, যাকে যা ইচ্ছা দিতে পারেন-সুস্পষ্ট মূর্খতা বৈ কিছু নয়।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ অর্থাৎ আমি তোমাদের বলি না যে, আমি ফেরেশতা, যে কারণে তোমরা আমার মানবিক গুণ দেখে রিসালতে অস্বীকার করবে।

মধ্যবর্তী বাক্যে কথার ভঙ্গি পরিবর্তন করে وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ الْغَيْبَ বলার পরিবর্তে وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। একথা না বলে "আমি অদৃশ্য বিষয় জানি" বলা হয়েছে।

তফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যান এরূপ বলার একটি সূক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের মালিক হওয়া না হওয়া এবং কোন ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া না হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয়। কাফিররাও জানত যে, আল্লাহ্ তা'আলার সব ভাণ্ডার রাসূলের হাতে নেই এবং তিনি ফেরেশতাও নন। তারা শুধু হঠকারিতাবশত এসব দাবি করত। কাজেই কাফিরদের এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আমি আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের মালিক হওয়া এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবি কখনও করিনি।

• কিন্তু অদৃশ্য বিষয় জানার প্রশ্নটি এমন নয়। কেননা, তারা জ্যোতিষী ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের সম্পর্কেও এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। অতএব আল্লাহ্‌র রাসূল সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস রাখাও অবান্তর ছিল না। বিশেষ করে, তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ থেকে অনেক অদৃশ্য সংবাদও শুনেছিল এবং তদনুযায়ী ঘটনা ঘটতে দেখেছিল। তাই এখানে শুধু 'বলি না' বলাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি, বরং 'অদৃশ্য বিষয় জানি না' বলা হয়েছে। এতে ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান ঘটানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে যেসব অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান কোন রাসূল, ফেরেশতা কিংবা ওলীকে দান করা হয়, কোরআনের পরিভাষায় তাকে 'অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান' বলা যায় না।

এ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেছে। এ ব্যাপারে কোন মুসলমানের দ্বিমত নেই যে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাজারো লাখো অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। বরং সব ফেরেশতা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে যেটুকু জ্ঞান দান করা হয়েছিল তাদের সবার জ্ঞানের চাইতে অনেক বেশি জ্ঞান একা মহানবী (সা)-কে দান করা হয়েছিল। সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস তাই। কিন্তু এর সাথে কোরআন-সুন্নাহ্‌র অসংখ্য বর্ণনা অনুযায়ী পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব পণ্ডিতের এটাও বিশ্বাস যে, সমগ্র সৃষ্টজগতের পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁর স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও সর্বশক্তিমান হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু কোন ফেরেশতা কিংবা রাসূল তাঁর সমতুল্য নয়, এ কারণেই কোন ফেরেশতা কিংবা পয়গম্বরকে লাখো অদৃশ্য বিষয় জানা সত্ত্বেও 'আলিমুল গায়ব' বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী বলা যায় না। এ গুণ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার।

মোটামুটিভাবে সাইয়্যেদুর-রাসূল, সরওয়ারে-কায়েনাত, ইমামুল-আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠা সম্পর্কে সর্বাধিক অর্থবহ বাক্য হচ্ছে এই। بعد از خدا بزرگ توئى قصه مختصر (সংক্ষেপে আল্লাহ্‌র পরে তুমিই সবার বড়)।

জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠার ব্যাপারেও আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত ফেরেশতা ও নবী-রাসূলের চাইতে তাঁর জ্ঞান অধিক, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সমান নয়। সমান হওয়ার দাবি করা খ্রিস্টবাদ প্রবর্তিত বাড়াবাড়ির পথ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না। উদ্দেশ্য এই যে, মানসিক আবেগপ্রবণতা ও হঠকারিতা পরিহার করে বাস্তব সত্য উপলব্ধি কর, যাতে তোমরা

অন্ধদের মধ্যে গণ্য না হও এবং চক্ষুষ্মান হয়ে যাও। সামান্য চিন্তা-ভাবনা দ্বারা তোমরা এ দৃষ্টি অর্জন করতে পার।

দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে আসল কাজে অর্থাৎ রিসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। যারা কিয়ামতে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। যেমন, মুসলমান কিংবা যারা কমপক্ষে এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে তারা হিসাবের আশংকা করে।

মোটকথা এই যে, কিয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে ঃ এক. কিয়ামতে নিশ্চিত বিশ্বাসী, দুই. অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং তিন. সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। এ তিন প্রকার লোককেই ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ নবী-রাসূলদের দেওয়া হয়েছে। কোরআনের অনেক আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। কিন্তু প্রথমোক্ত দু'প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হবে বলে বেশি আশা করা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ —অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র কাছে একত্রিত হওয়ার আশংকা করে, তাদেরকে কোরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ
عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا
بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ
بِأَعْلَمَ بِالشّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ
عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَا
لَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ
الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

(৫২) আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয়

এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (৫৩) আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি–যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন ? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন ? (৫৪) আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞানতাবশত কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৫৫) আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি–যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদেরকে (স্বীয় মজলিস থেকে)– বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল (অর্থাৎ সম্ভাব্য সর্বদা) আপন পালনকর্তার ইবাদত করে যাতে শুধুমাত্র আল্লাহ্রই সন্তুষ্টি কামনা করে (এবং জাঁকজমক, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। অর্থাৎ তাদের ইবাদত সার্বক্ষণিক এবং নিষ্ঠাপূর্ণ হয়ে থাকে। নিষ্ঠা যদিও একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু লক্ষণাদি দ্বারা তার পরিচয় পাওয়া যায়। যতক্ষণ নিষ্ঠার বিপক্ষে কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নিষ্ঠার ধারণা রাখাই সঙ্গত।) এবং তাদের (অভ্যন্তরীণ) হিসাব (ও অনুসন্ধান) বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং (তাদের অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান আপনার দায়িত্বে না থাকা এমনই নিশ্চিত, যেমন) আপনার (অভ্যন্তরীণ) হিসাব (ও অনুসন্ধান) বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। (অর্থাৎ যদি তাদের অভ্যন্তরীণ আন্তরিকতা অনুসন্ধান করা আপনার দায়িত্বে থাকত, তবে এরূপ অবকাশ ছিল যে, যাদের আন্তরিকতা নিশ্চিত নয় এবং তাদেরকে বহিষ্কার করার অন্য কোন বৈধ্য কারণও নেই। মহানবী (সা) ছিলেন উম্মতের অভিভাবক–তাই অধীনস্থদের অবস্থা অনুসন্ধান করবেন–এরূপ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এর বিপরীত উম্মত স্বীয় পয়গম্বরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুসন্ধান করবে–এরূপ কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই এটি নিশ্চিতরূপে ঋণাত্মক বিষয়। এখানে সম্ভাবনাযুক্ত বিষয়কে নিশ্চিত বিষয়ের সমপর্যায়ে গণ্য করে ঋণাত্মক করা হয়েছে, যাতে এর ঋণাত্মক বিষয় হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়।) নতুবা (তাদেরকে বহিষ্কার করার কারণে) আপনি অসঙ্গত আচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। এবং (আমি মু'মিনদের দরিদ্র ও কাফিরদের ধনাঢ্য করে রেখেছি, যা বাহ্যত অনুমানের বিপরীত। এর কারণ এই যে,) এভাবেই আমি (তাদের মধ্য থেকে) এক (অর্থাৎ কাফিরদের)-কে অন্যদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি (অর্থাৎ এ কর্মপন্থা দ্বারা কাফিরদের পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য) যাতে তারা (মু'মিনদের সম্পর্কে) বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে (বাছাই করে) আল্লাহ্ তা'আলা সীয় অনুগ্রহ দান করেছেন ? (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের জন্য কি তাদেরকেই বাছাই করেছেন ? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত নন? (এ দরিদ্ররা স্বীয় নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ, সত্যান্বেষণে ব্যাপৃত সত্যধর্ম ও স্বীকৃতির দ্বারা

সম্মানিত। পক্ষান্তরে ধনাঢ্যরা অকৃতজ্ঞতা ও কুফরে লিপ্ত। ফলে এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত।) এবং যখন তারা আপনার কাছে আসে, যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস রাখে ; তখন আপনি (তাদেরকে সুসংবাদ শোনানোর জন্য) বলে দিন ঃ (তোমাদের উপর সর্বপ্রকার বিপদাপদ পতিত হবে), তোমরা (সেগুলো থেকে নিরাপদে ও শান্তিতে থাক)। আর একথাও যে, তোমাদের পালনকর্তা (স্বীয় কৃপায়) অনুগ্রহ করা (এবং তোমাদের নিয়ামত দান করা) নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত করেছেন। (এমনকি) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করে (যা) অজ্ঞতাবশত (হয়ে যায় ; কেননা, আদেশের বিরোধিতা করা কার্যগত অজ্ঞতা। কিন্তু) অনন্তর এর পরে তওবা করে এবং (ভবিষ্যতে নিজ কর্ম) সংশোধন করে (তওবা ভঙ্গ করার পর পুনরায় তওবা করাও এর অন্তর্ভুক্ত) তবে আল্লাহ্ তা'আলা (তার জন্যও) অত্যন্ত ক্ষমাশীল, (অর্থাৎ গুনাহর শাস্তিও ক্ষমা করে দেবেন।) করুণাময় (অর্থাৎ নানা রকম নিয়ামতও দেবেন।) এবং (যেভাবে আমি এ ক্ষেত্রে মু'মিন ও কাফিরদের অবস্থা ও পরিণতি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি) এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি (যাতে মু'মিনদের তরীকাও পরিষ্কার হয়ে যায়) এবং যাতে অপরাধীদের তরীকা (ও) প্রকাশ করে দেওয়া হয় (এবং সত্য ও মিথ্যা ফুটে ওঠার কারণে সত্যান্বেষীর পক্ষে সত্য উপলব্ধি করা সহজ হয়ে যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অহংকার ও মূর্খতা দূরীকরণ, মান অপমানের ইসলামী মাপকাঠি ঃ ইসলামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই ঃ যারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মনুষ্যত্ব কাকে বলে তা জানে না ; বরং মানুষকে জগতের বিভিন্ন জানোয়ারের মধ্যে এমন একটি সজ্ঞান জানোয়ার মনে করে, যে অন্য জানোয়ারদের অধীনস্থ ও প্রভাবাধীন করে স্বীয় সেবাদাসে পরিণত করেছে, তাদের মতে মানব জীবনের লক্ষ্য পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ ও অন্যান্য জৈবিক অনুভূতিকে ব্যবহার করা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে ? জীবনের লক্ষ্য যখন শুধু তাই হয়, তখন জগতে ভাল-মন্দ, ছোটবড়, সম্মানিত ও অপমানিত, ভদ্র ও ইতর পরিচয়ের মাপকাঠি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, যার কাছে পানাহার ও ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, সেই কৃতকর্মা, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং যার কাছে এসব বস্তু স্বল্পমাত্রায় আছে সে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অকৃতকর্মা।

সত্য বলতে কি, এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত হওয়ার জন্য সচ্চরিত্রের ও সৎকর্মের কোন প্রয়োজনই নেই, বরং যে কর্ম ও চরিত্র এ জৈবিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক তাই সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র।

এ কারণেই নবী-রাসূলদের এবং তাঁদের আনীত ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষা ছিল এই যে, এ জীবনের পর আরেকটি চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন রয়েছে, সে জীবনের সুখ-শান্তি যেমন পূর্ণ ও চিরস্থায়ী, তেমনি কষ্ট এবং শাস্তিও পূর্ণ ও চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবন স্বয়ং লক্ষ্য নয়, বরং পরজীবনে যে যে বিষয় উপকারী তা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আসল লক্ষ্য।

رہا مرنے کی تیاری میں مصروف

مرا کام اور اس دنیا میں تھا کیا

মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জন্তু-জানোয়ারকে পরজীবনের চিন্তা করতে হয় না, কিন্তু জ্ঞানী ও সচেতন ব্যক্তিদের মতে পরজীবনের সংশোধনই মানুষের সর্ববৃহৎ

চিন্তা। এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্রতা ও নীচতা এবং সম্মান ও অপমানের মাপকাঠী অধিক পানাহার কিংবা অধিক ধন-সম্পদ আহরণে হবে না, বরং সচ্চরিত্র ও সৎকর্মই হবে আভিজাত্যের একমাত্র মাপকাঠি। পরকালের সম্মান এগুলোর উপরই নির্ভরশীল।

জগদ্বাসী যখনই নবী-রাসূলদের নির্দেশাবলী, শিক্ষা এবং পরকাল-বিশ্বাসের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে, তখনই তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিও সামনে এসে গেছে অর্থাৎ শুধু অন্ন ও উদরই মান-অপমান, ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয়েছে। যারা এতে সফলকাম তারা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হয়েছে এবং যারা এতে ব্যর্থ কিংবা অসম্পূর্ণ, তারা দরিদ্র, সম্মানহীন, নীচ ও লাঞ্ছিত বলে পরিগণিত রয়েছে।

তাই সর্বকালে শুধু পার্থিব জীবনের গোলক-ধাঁধায় আবদ্ধ মানুষ বিত্তবানদের সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং দীনদরিদ্র বিত্তহীনদের সম্মানহীন ও নীচ বলে গণ্য করেছে। এ মাপকাঠির ভিত্তিতেই হযরত নূহ (আ)-এর কওম বিশ্বাস স্থাপনকারী দরিদ্রদের নীচ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিল ঃ আমরা এ নীচদের সাথে একত্রে বসতে পারি না। আপনি যদি আমাদের কোন পয়গাম শোনাতে চান, তবে দরিদ্র ও নিঃস্বদের আগে দরবার থেকে বহিষ্কার করুন।

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ — অর্থাৎ এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ যত সব ছোট লোক আপনার অনুসারী? হযরত নূহ (আ) তাদের এ হৃদয়বিদারক উক্তির জওয়াবে পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে বললেনঃ

وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلاَّ عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۔

অর্থাৎ আমি তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নই। কাজেই তারা নীচ কি ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত, তার মীমাংসা করতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মের স্বরূপ ও হিসাব আমার পালনকর্তাই জানেন। তিনি অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কে জ্ঞাত।

হযরত নূহ (আ) এভাবে মূর্খ ও অহংকারী এবং ভদ্রতা ও নীচতার স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের চিন্তাধারাকে একটি সুস্পষ্ট বাস্তব সত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি বলে দিলেন ঃ ভদ্র ও নীচ শব্দগুলো তোমরা ব্যবহার কর ঠিকই, কিন্তু এগুলোর স্বরূপ তোমাদের জানা নেই। তোমরা শুধু বিত্তবানকে ভদ্র আর দরিদ্রকে নীচ বলে থাক, অথচ বিত্ত ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি নয়। এর মাপকাঠি হচ্ছে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র। এ স্থলে হযরত নূহ (আ) বলতে পারতেন যে, সৎকর্ম ও সচ্চারিত্রের মাপকাঠিতে এরা তোমাদের চাইতে অধিক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত। কিন্তু পয়গম্বরসুলভ প্রচারপদ্ধতি তাঁকে এরূপ বলার অনুমতি দেয়নি। এরূপ বললে প্রতিপক্ষ উত্তেজিত হয়ে উঠত। তাই শুধু এতটুকু বলেছেন যে, নীচতা তো ক্রিয়াকর্মের উপর ভিত্তিশীল। আমি তাদের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত নই। তাই তাদের ভদ্র বা নীচ হওয়ার ফয়সালা করতে পারি না।

নূহ (আ)-এর পরও সর্বযুগের দুনিয়ার অহংকারী লোকরা দরিদ্রদের নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত আখ্যায়িত করে এসেছে, যদিও তারা সচ্চরিত্র ও সৎকর্মের দিক দিয়ে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত ছিল। এরাই স্বীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও উত্তম চরিত্রের কারণে প্রতি যুগে আম্বিয়া (আ)-এর আহবানে সর্ব

প্রথম সাড়া দিয়েছেন। এমনকি, জগতের ধর্মীয় ইতিহাসের পর্যালোচকদের মতে কোন পয়গম্বরের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ এই যে, তার প্রাথমিক অনুসারী হয়েছে সমাজের দরিদ্র স্তরের লোক। এ কারণেই মহানবী (সা)-এর পত্র পেঁয়ে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর সত্যতা যাচাই করার জন্য পরিচিতজনদের কাছে তাঁর সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এই ঃ তাঁর অধিকাংশ অনুসারী দরিদ্র জনগণ না সমাজের উচ্চস্তরের লোক ? যখন তাঁকে জানান হয় যে, দরিদ্র জনগণই তাঁর অধিকাংশ অনুসারী, তখন তিনি মন্তব্য করেন هم اتباع الرسل পয়গম্বরদের প্রাথমিক অনুসারী এরাই হয়ে থাকে।

মহানবী (সা)-এর আমলে আবারো এ প্রশ্নই দেখা দেয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এরই উত্তর বিশেষ নির্দেশসহ উল্লিখিত হয়েছে।

ইবনে কাসীর ইমাম ইবনে জরীরের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, ওতবা, শায়বা, ইবনে-রবিয়া, মুত' এম ইবনে আদী, হারেস ইবনে নওফেল প্রমুখ কতিপয় কোরাইশ সর্দার মহানবী (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের নিকট এসে বলল ঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)-এর কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তাঁর চারপাশে সর্বদা এমন সব লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় যারা লালিত-পালিত হতো। এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে যোগদান করতে পারি না। আপনি তাঁকে বলে দিন, যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি।

আবূ তালিব মহানবী (সা)-কে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলে হযরত ওমর (রা) মত প্রকাশ করে বললেন ঃ এতে অসুবিধা কি ? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অকপট বন্ধুবর্গই। কোরাইশ সর্দারদের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আয়াত অবতরণের পর হযরত ফারূকে আযম (রা)কে 'আমার মত ভ্রান্ত ছিল'-এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

যে দরিদ্রদের সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন হযরত বিলাল হাবশী (রা), সোহায়েব রূমী (রা), আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা), আবূ হোযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রা), উসায়দের মুক্ত ক্রীতদাস সহীহ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা), মিকদাদ ইবনে আমর (রা), মসউদ ইবনুল কারী (রা), যুশ-শিমালাইন (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে-কিরাম। তাঁদের সম্মান ও ভদ্রতার সনদ আল্লাহ্র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই কোরআনের অন্যত্র এর প্রতি জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ـ

এতে রাসূলে করীম (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "আপনি নিজেকে তাদের মধ্যে নিবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-বিকাল অর্থাৎ সর্বদা আন্তরিকতার সাথে স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে। আপনি স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর কামনায় তাদেরকে বাদ দিয়ে কারও প্রতি নিবদ্ধ করবেন না এবং এমন লোকের আনুগত্য করবেন না, যাদের অন্তরকে আমি আমার যিকর থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যারা স্বীয় রিপুর কামনা-বাসনার অনুসারী এবং সীমালংঘন করাই যাদের কাজ।"

আলোচ্য আয়াতে দরিদ্রদের প্রশংসায় বলা হয়েছে তারা সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌কে ডাকে। এতে প্রচলিত বাক-পদ্ধতি অনুযায়ী 'সকাল-বিকাল' বলে দিবারাত্রির সব সময়কে বোঝানো হয়েছে এবং ডাকা বলে ইবাদত করা বোঝানো হয়েছে। দিবারাত্রির ইবাদতের সাথে يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, আন্তরিকতাবিহীন ইবাদতের কোনই মূল্য নেই।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে তাদের হিসাব আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাবও তাদের দায়িত্বে নয়। ইবনে আতিয়্যা, যামাখশারী (র) প্রমুখের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এতে حِسَابِهِمْ ও عَلَيْهِمْ-এর সর্বনাম দ্বারা মুশরিক সর্দারদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা দরিদ্র মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি করত। আয়াতে মহানবী (সা)- কে বলা হয়েছে, এরা বিশ্বাস স্থাপন করুক বা না করুক আপনি দরিদ্র মুসলমানদের তুলনায় এদের পরওয়া করবেন না। কেননা এদের হিসাবের দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত করা হয়নি, যেমন আপনার হিসাবের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়নি। যদি এ দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত করা হতো অর্থাৎ তাদের মুসলমান না হওয়ার কারণে আপনাকে জবাবদিহি করতে হতো, তবে না হয় আপনি তাদের খাতিরে দরিদ্র মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন। যখন এরূপ নয় তখন তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেওয়া প্রকাশ্য অবিচার। এমন করলে আপনি অবিচারকারীদের মধ্যে গণ্য হবেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি এমনিভাবে একজনকে অন্যজনের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলে রেখেছি, যাতে কাফিররা আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও ক্ষমতার এ তামাশা দেখে যে, যে দরিদ্র মুসলমানদেরকে তারা ঘৃণার চোখে দেখত, রাসূলের অনুসরণ করে তারা কোন স্তরে পৌঁছে গেছে এবং ইহকালে ও পরকালে তারা কিরূপ সম্মানের অধিকারী হয়েছে এবং যাতে তারা এ বিষয়েও আলোচনা করে যে, আমাদের অভিজাত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে এ গরীবরাই কি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নিয়ামতের যোগ্য ছিল?

هر دم مش بر من دل سوخته لطف دگر است
ایں گدایی که چه شائسته انعام افتاد

কাশ্‌শাফ প্রণেতা আল্লামা যামাখশারী (র) প্রমুখের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কাফিরদের এ উক্তি দরিদ্র মুসলমানদের মাধ্যমে গৃহীত পরীক্ষারই ফল। তারা এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থ্যের বিকাশ দেখে তাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত ছিল যে, ভদ্রতা ও নীচতা অর্থ-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সচ্চরিত্র ও সৎকর্মের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু তারা তা না করে উল্টো আল্লাহ্ তা'আলাকে দোষারোপ করতে থাকে যে,

সম্মানের যোগ্য ছিলাম আমরা, অথচ আমাদেরকে বাদ দিয়ে তাদেরকে কেন সম্মানিত করা হলো ? এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় আসল তাৎপর্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল নন ? উদ্দেশ্য এই যে, যারা অনুগ্রহদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ তারাই প্রকৃতপক্ষে ভদ্র ও সম্মানিত এবং তারাই নিয়ামত ও সম্মানের যোগ্য। পক্ষান্তরে তারা সম্মানের যোগ্য নয়, যারা দিবারাত্র নিয়ামতদাতার নিয়ামতে গড়াগড়ি সত্ত্বেও তাঁর অবাধ্য।

কতিপয় নির্দেশ ঃ উল্লিখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বোঝা যায় ঃ প্রথমত কারও ছিন্নবস্ত্র কিংবা বাহ্যিক দুরবস্থা দেখে তাকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করার অধিকার কারও নেই। প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন লোকও থাকেন যারা আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অনেক দুর্দশাগ্রস্ত, ধূলি-ধূসরিত লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র প্রিয়। তাঁরা যদি কোন কাজের আবদার করে বসেন যে, এটা 'এরূপ হবে' তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে আবদার অবশ্যই পূর্ণ করেন।

দ্বিতীয়ত শুধু পার্থিব ধন-দৌলতকে ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি মনে করা মানবতার অবমাননা। এর প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম।

তৃতীয়ত কোন জাতির সংস্কারক ও প্রচারকের জন্য ব্যাপক প্রচারকার্যও জরুরী অর্থাৎ পক্ষ-বিপক্ষ, মান্যকারী ও অমান্যকারী সবার কাছেই স্বীয় বক্তব্য প্রচার করতে হবে। কিন্তু যারা তার শিক্ষার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তা পালন করে চলবে, তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। অন্যের কারণে তাদেরকে পেছনে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করা জায়েয নয়। উদাহরণত অমুসলমানদের মধ্যে প্রচার কার্যের জন্য অজ্ঞ মুসলমানদের শিক্ষাদান ও সংশোধনকে পেছনে ফেলে দেওয়া উচিত নয়।

চতুর্থত, আল্লাহ্র নিয়ামত কৃতজ্ঞতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিয়ামতের আধিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার পক্ষে অপরিহার্য।

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ ... —আয়াত সম্পর্কে তফসীরবিদদের উক্তি দ্বিবিধ। অধিকাংশের মতে এ আয়াতগুলোও পূর্ববর্তী আয়াত ও ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সমর্থনে তাঁরা এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন যে, কোরাইশ সর্দাররা আবূ তালিবের মাধ্যমে দাবি জানাল যে, আপনার মজলিসে দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোকে থাকে। তাদের কাতারে বসে আপনার কথাবার্তা শুনতে পারি না। আমাদের আগমনের সময় যদি তাদের মজলিস থেকে সরিয়ে দিতে পারেন, তবে আমরা আপনার কথাবার্তা শুনব ও চিন্তা-ভাবনা করব।

এতে হযরত ফারুকে-আযম (রা) পরামর্শ দিলেন যে, এ দাবি মেনে নিতে অসুবিধা কি? মুসলমানরা তো অকৃত্রিম বন্ধু আছেই। তাদেরকে কিছুক্ষণ দূরে সরে থাকতে বলে দেওয়া হবে। সম্ভবত এভাবে কোরাইশ সর্দাররা আল্লাহ্র কালাম শুনবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে।

কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতে এ পরামর্শের বিপক্ষে নির্দেশ আসে যে, কখনও এমনটি করা যাবে না। এমন করা অন্যায় ও অবিচার। এ নির্দেশ অবতীর্ণ হলে ফারুকে আযম (রা) নিজের ভুল

বুঝতে পারেন। তিনি ভীত হয়ে পড়েন যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়ে হয়ত তিনি মহা অন্যায় করে ফেলেছেন। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতের সারমর্ম এই যে, আপনাকে অতীত ভুলের জন্য পাকড়াও করা হবে না বলে তাদেরকে শান্ত করে দিন। শুধু তাই নয়, পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অসংখ্য নিয়ামতের ওয়াদাও শুনিয়ে দিন। তার দরবারের এ আইন সম্পর্কেও বলে দিন যে, যখন কোন মুসলমান অজ্ঞতাবশত কোন মন্দ কাজ করে বসে, অতঃপর ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে নেয় এবং ভবিষ্যতে সংশোধন হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীত গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং ভবিষ্যতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নিয়ামত থেকেও তাকে বঞ্চিত করবেন না। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়াতগুলো পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত বিশেষ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ এসব আয়াতের বিষয়বস্তুকে একটি স্বতন্ত্র নির্দেশনামা হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ বিষয়বস্তু তাদের সম্পর্কে, যারা অজ্ঞতাবশত কোন গুনাহ্ করে ফেলে এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়।

চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, উপরোক্ত উভয়বিধ উক্তিতে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। কেননা, সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন মজীদের কোন নির্দেশ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও যদি তার ভাষা ও বিষয়বস্তু ব্যাপক হয়, তবে সে নির্দেশটি শুধু সে বিশেষ ঘটনার সাথেই সম্পৃক্ত থাকে না বরং এটি ব্যাপক নির্দেশের রূপ পরিগ্রহ করে। তাই যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে তবুও এ নির্দেশ একটি ব্যাপক বিধির মর্যাদা রাখে, যা প্রত্যেক গুনাহগারের বেলায় প্রযোজ্য, যে গুনাহ্ করার পর স্বীয় ভুল বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যত কর্ম সংশোধন করে নেয়।

এবার আয়াতসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেখুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ .

অর্থাৎ আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, এমন লোক যখন আপনার কাছে আসে (এখানে ايات-এর অর্থ কোরআনের আয়াত হতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও কুদরতের সাধারণ নিদর্শনাবলীও হতে পারে।) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)- কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে سلام عليكم বলে সম্বোধন করুন। এখানে سلام عليكم এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে ঃ এক. তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সালাম পৌছিয়ে দিন, যাতে তাদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান বোঝা যায়। এতে করে ঐ সব দরিদ্র মুসলমানের মনোবেদনার চমৎকার প্রতিকার হয়ে গেছে, যাদেরকে মজলিস থেকে হটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব কোরাইশ সর্দাররা করেছিল। দুই. আপনি তাদেরকে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের ভুলত্রুটি হয়ে থাকলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তারা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ—বাক্যে এ অনুগ্রহের উপর আরও অনুগ্রহ ও নিয়ামত দানের ওয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মুসলমানদের বলে দিন ঃ তোমাদের পালনকর্তা দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কাজেই খুব ভীত ও অস্থির হয়ো না। এ বাক্যে প্রথমত رب (পালনকর্তা) শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের বিষয়বস্তুকে যুক্তিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পালনকর্তা। এখন জানা কথা যে, কোন পালনকর্তা স্বীয় পালিতদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর رب শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাও এমন ভঙ্গিতে যে, তোমাদের পালনকর্তা দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। কাজেই কোন ভাল ও সৎ লোকের দ্বারাই যখন ওয়াদা খেলাফী হতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীনের দ্বারা তা কেমন করে হতে পারে? বিশেষ করে যখন ওয়াদাটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়।

সহীহ্ বোখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের ভাগ্যের ফয়সালা করলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে আরশে রেখে দিলেন। তাতে লেখা রয়েছে ঃ ان رحمتى غلبت على غضبى। অর্থাৎ আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে গেছে।

হযরত সালমান (রা) বলেন ঃ আমি তওরাতে লিখিত দেখেছি, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের সবকিছু সৃষ্টি করলেন, তখন 'রহমত' (দয়া) গুণটিকে একশ' ভাগ করে এক ভাগ সমগ্র সৃষ্ট জীবকে দান করলেন। মানুষ, জীবজন্তু ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দয়ার যে সব লক্ষণ দেখা যায়, তা ঐ এক ভাগেরই ক্রিয়া। পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে এবং প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যে পারস্পরিক সহানুভূতি, ভালবাসা ও দয়া পরিলক্ষিত হয়, তা ঐ এক ভাগ দয়ারই ফলশ্রুতি। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ দয়া আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য রেখেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে একে নবী করীম (সা)-এর হাদীসরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই অনুমান করা যায় যে, সৃষ্ট জীবের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দয়া কিরূপ ও কতটুকু।

এটা জানা কথা যে, কোন মানুষ এমনকি ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্যের উপযুক্ত ইবাদত ও আরাধনা করতে পারে না এবং মাহাত্ম্য বিরোধী আনুগত্য জগদ্বাসীর দৃষ্টিতেও পুরস্কারের কারণ হওয়ার পরিবর্তে অসন্তুষ্টির কারণ বলে গণ্য হয়। এ হচ্ছে আমাদের ইবাদত, আরাধনা ও পুণ্যকর্মের অবস্থা। আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্বের সাথে তুলনা করে দেখলে এগুলো গুনাহ্র চাইতে কম নয়। তদুপরি সত্যিকার গুনাহ্ ও পাপ থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয় (الا من عصمه الله তবে আল্লাহ্ যাকে মুক্ত রাখেন)। এমতাবস্থায় একটি লোকের পক্ষেও আযাব থেকে রেহাই পাওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক মানুষের উপর সদা সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত নিয়ামত বর্ষিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এসব হচ্ছে ঐ দয়ারই ফলশ্রুতি, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন।

তওবা দ্বারা প্রত্যেক গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় ঃ এরপর একটি বিধির আকারে দয়ার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ

اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًاۢ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٠

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত কোন মন্দ কাজ করে বসে, এরপর তওবা করে এবং স্বীয় কাজ সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল; তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। আর তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং নিয়ামতও দান করবেন।

আয়াতের 'অজ্ঞতা' শব্দ দ্বারা বাহ্যত কেউ ধারণা করতে পারে যে, গুনাহ্ ক্ষমা করার ওয়াদা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অজ্ঞতাবশত কোন গুনাহ্ হয়ে যায়, জেনেশুনে গুনাহ্ করলে হয়তো এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা, এ স্থলে 'অজ্ঞতা' বলে অজ্ঞতার কাজ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এমন কাজ করে বসে, যার পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তির পক্ষেই কেবল তা করা সম্ভব। এর জন্য বাস্তবে অজ্ঞ হওয়া জরুরী নয়। স্বয়ং جهالت (অজ্ঞতা) শব্দেই এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে جهل শব্দের পরিবর্তে جهالت-এর ব্যবহার সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই করা হয়েছে। কেননা, جهل শব্দটি علم (জ্ঞান)-এর বিপরীত এবং جهالت শব্দটি حلم ووقار (সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য)-এর বিপরীত। অর্থাৎ جهالت শব্দটি বাকপদ্ধতিতে কার্যগত অজ্ঞতার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যখনই কোন গুনাহ্ হয়ে যায়, তা কার্যগত অজ্ঞতার কারণেই হয়। তাই কোন কোন বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে অজ্ঞ। এখানে কার্যগত অজ্ঞতাই বোঝানো হয়েছে। এর জন্য অজ্ঞান হওয়া জরুরী নয়। কেননা, কোরআন পাক ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তওবা দ্বারা প্রত্যেক গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় —অমনোযোগিতা ও অজ্ঞতাবশত হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক দুর্মতি ও প্রবৃত্তির তাড়নাবশতই হোক।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এই আয়াতে দু'টি শর্তাধীনে গুনাহ্গারদের সম্পর্কে ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা হয়েছে। এক. তওবা অর্থাৎ গুনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ انما التوبة الندم—অর্থাৎ অনুশোচনার নামই হলো তওবা।

দুই. ভবিষ্যতের জন্য আমল সংশোধন করা। কয়েকটি বিষয় এ আমল সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং কৃত গুনাহর কারণে কারও অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসম্ভব তা পরিশোধ করা, তা আল্লাহ্র অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার। আল্লাহর অধিকার যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ফরয কর্মে ত্রুটি করা। আর বান্দার অধিকার যেমন কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করা ও ভোগ করা, কারও ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা, কাউকে গালি-গালাজের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

তাই তওবার পূর্ণতার জন্য যেমন অতীত গুনাহর জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, ভবিষ্যতের জন্য কর্ম সংশোধন করা এবং গুনাহর নিকটবর্তী না হওয়া জরুরী,

তেমনিভাবে যেসব নামায ও রোযা অমনোযোগিতাবশত তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা, যে যাকাত দেওয়া হয়নি, তা এখন দিয়ে দেওয়া, হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে থাকলে এখন তা আদায় করে নেওয়া, নিজে করতে সক্ষম না হলে বদলী হজ্জ করানো প্রভৃতি বিষয়ও অপরিহার্য। যদি জীবদ্দশায় বদলী হজ্জ ও অন্যান্য কার্যের পুরোপুরি সুযোগ না মেলে তবে ওসীয়ত করে যাওয়া যাতে ওয়ারিস ব্যক্তিরা তার ফরযসমূহের ফিদিয়া (বিনিময়) ও বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করে। মোটকথা, কর্ম সংশোধনের জন্য শুধু ভবিষ্যৎ কর্ম সংশোধন করাই যথেষ্ট নয়। বিগত ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করাও জরুরী।

এমনিভাবে যদি কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে হস্তগত করে থাকে, তবে তা ফেরত দিতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। কাউকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তারও ক্ষমা নিতে হবে। যদি ক্ষমা নেওয়া সম্ভবপর না হয়-উদাহরণত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা যায় কিংবা তার ঠিকানা অজ্ঞাত হয়, তবে তার জন্য নিয়মিতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে। এতে আশা করা যায়, সে সন্তুষ্ট হবে এবং ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি পাবে।

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ لَا
أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي
عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ
عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

(৫৬) আপনি বলে দিন ঃ আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ইবাদত কর। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের খুশীমত চলব না। কেননা, তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না। (৫৭) আপনি বলে দিন ঃ আমার কাছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যে বিষয়টি ত্বরিত সংঘটনের দাবি করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কারও নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৫৮) আপনি বলে দিন ঃ যদি আমার কাছে তা থাকত, যা

তোমরা শীঘ্র সংঘটিত হওয়ার জন্য দাবি করছ, তবে আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ কবেই চুকে যেত। আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (হঠকারীদেরকে) বলে দিন ঃ আমাকে (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে) সেসবের (অর্থাৎ বাতিল উপাস্যদের ইবাদত করতে বারণ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্কে (অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদতকে) ছেড়ে যাদের ইবাদত কর। (তাদের পথভ্রষ্টতা প্রকাশ করার জন্য) আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের (মিথ্যা) ধারণাসমূহের অনুসরণ করব না। কেননা, যদি (নাউযুবিল্লাহ) আমি এমন করি, তখন পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না। আপনি (তাদেরকে আরও) বলে দিন আমার কাছে তো (ইসলাম ধর্ম সত্য হওয়ার) একটি (প্রকৃষ্ট) প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে যা আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (আমি প্রাপ্ত হয়েছি; অর্থাৎ কোরআন মজীদ-এটি আমার মু'জিযা এবং এ দ্বারা আমার সত্যতা প্রমাণিত হয়) অথচ তোমরা (বিনা কারণে) এর প্রতি মিথ্যারোপ কর। (অর্থাৎ তোমরা যে বলে থাক-ইসলাম ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে আমাদের তা অস্বীকার করার কারণে আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হোক কিংবা অন্য কোন কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হোক। অন্য আয়াতে তাদের এ উক্তি বর্ণিত হয়েছেঃ

إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ
أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔

(এর উত্তর এই যে,) তোমরা যে বস্তু শীঘ্র দাবি করছ ((অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) তা আমার কাছে (অর্থাৎ আমার সামর্থ্যের মধ্যে) নেই। আল্লাহ ছাড়া কারও নির্দেশ চলে না (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তি অবতরণের নির্দেশ হয়নি, অতএব আমি কিরূপে শাস্তি দেখাব?) আল্লাহ তা'আলা সত্যকে (প্রমাণসহ) বর্ণনা করে দেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। সেমতে তিনি আমার রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণ (হিসাবে) কোরআন মজীদ প্রেরণ করেছেন (এবং অন্যান্য প্রকাশ্য মু'জিযা দেখিয়েছেন। বিশুদ্ধ প্রমাণরূপে এটাই যথেষ্ট। অতএব, তোমাদের ফরমায়েশী মু'জিযা প্রকাশ করার কোনই প্রয়োজন নেই। তাই আপাতত শাস্তি অবতরণ করে মীমাংসা করেন নি) আপনি বলে দিন ঃ যদি আমার কাছে (অর্থাৎ আমার সামর্থ্যের মধ্যে) তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্র দাবি করছ (অর্থাৎ শাস্তি), তবে (এখন পর্যন্ত) আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ (যে কোন দিনই) মীমাংসা হয়ে যেত। বস্তুত আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবহিত রয়েছেন (যে, কার সাথে কখন কি ব্যবহার করা হবে)।

যোগসূত্র ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে কাফিরদের পক্ষ থেকে শীঘ্র আযাব অবতারণের দাবি ও তার উত্তর خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ (শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী) বাক্যে এবং আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ শক্তি-সামর্থ্য أَعْلَمُ بِالظَّالِمِيْنَ (অত্যাচারীদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।) বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۭ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۭ وَمَا تَسْقُطُ
مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ
كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ
يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۭ حَتّٰٓى اِذَا
جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى
اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۭ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۣ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾

(৫৯) আর তার কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না;; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশ পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না, কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। (৬০) তিনিই রাত্রিবেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুত্থিত করেন-যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। অনন্তর তারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে। (৬১) তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমনকি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয় এবং এতে তারা কোন ত্রুটি করে না। (৬২) অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আল্লাহ তা'আলার কাছে (অর্থাৎ তাঁর সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভাব্য) অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার রয়েছে (তন্মধ্যে যে বিষয়কে যখন, যে পরিমাণ ইচ্ছা, প্রকাশ করেন। আযাবের বিভিন্ন প্রকারও এর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, এসব বিষয়ের উপর অন্য কারও সামর্থ্য নেই। এসব বিষয়ের পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য যেমন বিশেষভাবে তাঁরই তেমনিভাবে এগুলোর পরিপূর্ণ জ্ঞানও অন্য কারও নেই। সেমতে এসব গোপন ভাণ্ডারকে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না এবং

স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তিনি সবই পরিজ্ঞাত রয়েছেন। কোন পত্র (পর্যন্ত বৃক্ষ থেকে) পতিত হয় না, কিন্তু তিনি তাও জানেন এবং কোন শস্যকণা (পর্যন্ত) মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য (ফল ইত্যাদির মত) পতিত হয় না, কিন্তু এ সবই প্রকাশ্য গ্রন্থে (অর্থাৎ লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ) রয়েছে। আর তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাত্রিবেলায় (নিদ্রার সময়) তোমাদের (অনুভূতি ও চেতনা সম্পর্কিত) আত্মাকে ক্ষণিকের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দেন এবং যা কিছু তোমরা দিবসে কর তা (সর্বদা) জানেন অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুত্থিত করেন, যাতে (নিদ্রা ও জাগরণের এ চক্র দ্বারা পার্থিব জীবনের) নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়। অনন্তর তাঁরই (অর্থাৎ আল্লাহরই) দিকে (মৃত্যুর পর) তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা (দুনিয়াতে) করছিলে (এবং তদনুযায়ী পুরস্কার, প্রতিদান ও শাস্তি প্রদান করবেন)। আর (তিনিই স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা) স্বীয় দাসদের উপর প্রতাপান্বিত এবং (হে বান্দা, তোমাদের উপর (তোমাদের কৃতকর্ম ও প্রাণের) রক্ষণাবেক্ষণকারী (ফেরেশতা) প্রেরণ করেন (যারা সারা জীবন তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন এবং তোমাদের প্রাণেরও হিফাযত করেন)। এমনকি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন (সে সময়) আমার প্রেরিতরা (অর্থাৎ প্রেরিত ফেরেশতারা) তার আত্মা হস্তগত করে নেয় এবং এতে সামান্যও ত্রুটি করে না (বরং যখন হিফাযতের নির্দেশ ছিল, তখন হিফাযতই করেছিল এবং যখন মৃত্যুর নির্দেশ আসে, তখন হিফাযতকারী ফেরেশতারা আত্মা করায়ত্তকারী ফেরেশতাদের সাথে একত্র হয়ে যায়।) অতঃপর সবাই স্বীয় সত্যিকার প্রভুর দিকে প্রত্যর্পিত হবে। শুনে রাখ (সে সময়) ফয়সালা আল্লাহ তা'আলারই (কার্যকরী) হবে (এবং কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না) এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র : সারা বিশ্বে যত ধর্মমত প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে একত্ববাদের বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, শুধু আল্লাহর সত্তাকে এক ও অদ্বিতীয় জানার নামই একত্ববাদ নয়, বরং পূর্ণত্বের যত গুণ আছে, সবগুলোতেই তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা এবং তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুকে এসব গুণে অংশীদার ও সমতুল্য মনে না করাকে একত্ববাদ বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী হচ্ছে জীবন, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, শ্রবণ, দর্শন, বাসনা, ইচ্ছা, সৃষ্টি, অন্নদান ইত্যাদি। তিনি এসব গুণে এমন পরিপূর্ণ যে, কোন সৃষ্ট জীব কোন গুণে তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। এসব গুণের মধ্যেও দু'টি গুণ সব চাইতে বিখ্যাত। এক. জ্ঞান ; এবং দুই. শক্তি-সামর্থ্য। তাঁর জ্ঞান বিদ্যমান-অবিদ্যমান, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ছোট-বড়, অণু-পরমাণু সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত এবং তার শক্তি-সামর্থ্যও সবকিছুতে পরিবেষ্টিত। উল্লিখিত দু'আয়াতে এ দু'টি গুণই বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টি গুণ এমন যে, যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং চিন্তায় উপস্থিত রাখে, তার পক্ষে গুনাহ ও অপরাধ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বলা বাহুল্য কথায়, কাজে ওঠা-বসায় এমনকি প্রতি পদক্ষেপে যদি কারও চিন্তায় একথা উপস্থিত থাকে যে, একজন সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান তাকে দেখছেন এবং তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এবং মনের ইচ্ছা ও কল্পনা পর্যন্ত জানেন তবে এ উপস্থিত জ্ঞান কখনও তাঁকে সর্ব শক্তিমানের

অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে দেবে না। তাই আলোচ্য আয়াত দু'টি মানুষকে পূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তার ক্রিয়া কর্ম ও চরিত্র সংশোধন করা ও সংশোধিত রাখার একটি অমোঘ ব্যবস্থাপত্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

مفاتح শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন مَفْتَحٌ ও مِفْتَحٌ উভয়টিই হতে পারে। مَفْتَح-এর অর্থ ভাণ্ডার এবং مِفْتَح-এর অর্থ চাবি ; আয়াতে উভয় অর্থ হওয়ার অবকাশ রয়েছে।তাই কোন কোন তফসীরবিদ ও অনুবাদক مفتح-এর অনুবাদ করেছেন ভাণ্ডার, আবার কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদের সারকথা এক। কেননা, 'চাবির মালিক' বলেও 'ভাণ্ডারের মালিক' বোঝানো যায়।

কোরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ ঃ غيب শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বোঝানো হয়, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেন নি।-(মাযহারী) প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐসব অবস্থা ও ঘটনা, যা কিয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণত কে কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, কোথায় মরবে; কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিযিক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন কোথায় কি পরিমাণ হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐ ভ্রূণ, যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারও জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী, না কুশ্রী, সৎস্বভাব না বদস্বভাব। এমনি ধরনের আরও যেসব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করা সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে।

عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ —এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহ্রই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায় ও করায়ত্ত থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তার করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা, অর্থাৎ কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে—তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কোরআনপাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ.

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ করি।

মোটকথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার নজীরবিহীন জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠাও প্রমাণিত হয়েছে এবং সামর্থ্যগত পরাকাষ্ঠাও। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জ্ঞান ও সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী عنده শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বৈশিষ্ট্যর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট উক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য বলা হয়েছে ঃ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ —অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ অবহিত নয়।

তাই এ বাক্য দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে ঃ এক. আল্লাহ্ তা'আলার পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ের উপর সামর্থ্যবান হওয়া। এবং দুই. তাঁকে ছাড়া অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর এরূপ জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জিত না হওয়া।

কোরআনের পরিভাষায় غيب শব্দের অর্থ পূর্বে তফসীরে-মাযহারীর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ যেসব বিষয় এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও কোন সৃষ্ট জীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে অদৃশ্য বিষয়ের প্রশ্নে জনসাধারণের মনে বাহ্য দৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু غيب শব্দটি মানুষ সাধারণত আভিধানিক অর্থেই বুঝে। ফলে যে বস্তু আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, তাকেও সাধারণ মানুষ غيب বলে অভিহিত করে, যদিও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি বিদ্যমান থাকে। এর ফলে নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উদাহরণত জ্যোতির্বিদ্যা, ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, গণনাবিদ্যা কিংবা হস্তরেখা বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা 'কাশফ ও ইলহাম' (সত্য স্বর্গীয় প্রেরণার মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞান) দ্বারা কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জেনে ফেলে অথবা মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং তা অনেকাংশে সত্যেও পরিণত হয়-এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'ইলমে-গায়ব' তথা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোরআন পাক 'ইলমে-গায়ব'কে আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে।

উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা 'কাশফ ও ইলহামে'র মাধ্যমে যদি কোন বান্দাকে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কোরআনের পরিভাষায় তাকে 'ইলমে-গায়ব' বলা যায় না। এমনিভাবে উপকরণ ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাও কোরআনী পরিভাষা অনুযায়ী 'ইলমে-গায়ব' নয়, যেমন আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা নাড়ি দেখে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে দেওয়া। কারণ, আবহাওয়া বিভাগ কিংবা কোন হাকীম-ডাক্তার এসব খবর দেওয়ার সুযোগ তখনই পায়, যখন এসব ঘটনার উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়, কিন্তু স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণের নিকট সেগুলো অজানা থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এ কারণেই আবহাওয়া বিভাগ, একমাস দু'মাস পর যে বৃষ্টি হবে, তার খবর আজ দিতে পারে না। কেননা, এখনও পর্যন্ত এ বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি। এমনিভাবে কোন হাকীম-ডাক্তার আজ নাড়ি দেখে বছর-দু'বছর পূর্বে কিংবা পরে সেবনকৃত ঔষধ কিংবা পথ্যের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ, স্বভাবত এর কোন ক্রিয়া নাড়িতে থাকে না।

মোটকথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেওয়া হয়। লক্ষণাদি ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য বিষয় থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে

পরিণত হয়ে যায়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না; শক্তিশালী হয়ে ওঠার পরই সবার চোখে ফুটে ওঠে।

এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্ত্বেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়। ইল্‌ম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা ইল্‌ম বটে, কিন্তু 'গায়ব' নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। বলা বাহুল্য, একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর গতি হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই, যেমন আমরা কোন রেলগাড়ীর কিংবা উড়োজাহাজের স্টেশনে কিংবা বিমান বন্দরে পৌঁছার খবর দিয়ে দেই। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবি করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। একশ'টি মিথ্যার ভিতর থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণ্ডিত্য নয়।

গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র না কন্যা-এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। শতকরা দু'চারটি ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবাকি ব্যাপার। কোন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এক্স-রে মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার এর মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা জানা যাবে। কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক্ষেত্রে এক্স-রে যন্ত্রপাতিও ব্যর্থ।

মোটকথা, কোরআনের পরিভাষায় যাকে 'গায়ব' বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ ছাড়া কারও জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবত যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃতপক্ষে 'গায়ব' নয় যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুন তাকে 'গায়ব' বলেই অভিহিত করা হয়।

এমনিভাবে কোন রাসূল ও নবীকে ওহীর মাধ্যমে এবং ওলীকে কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে যে কিছু কিছু অদৃশ্য বিষয়ের ইল্‌ম দেওয়া হয়, দেওয়ার পর তা আর গায়ব থাকে না। কোরআনে একে গায়ব না বলে اَنْبَاءِ الْغَيْبِ (গায়েবের খবর) বলা হয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত রয়েছে ঃ تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ তাই আলোচ্য আয়াত لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ অর্থাৎ অদৃশ্যের ভাণ্ডার আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না-এতে কোনরূপ প্রশ্ন ও ব্যতিক্রমের অবকাশ নেই।

এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলার 'আলিমুল-গায়ব' বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার বিশেষ গুণটি বিধৃত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যসমূহে এর বিপরীত দৃশ্য অর্থাৎ উপস্থিত ও বিদ্যমান বিষয়সমূহ জ্ঞাত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী ; কোন অণু-পরমাণুও এ জ্ঞানের বাইরে নয়। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। কোন বৃক্ষের কোন পাতা ঝরে না, সেটা তিনিই জানেন। এমনিভাবে যে শস্যকণা মাটির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে থাকে, তাও তিনি জানেন এবং সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটি আর্দ্র ও শুষ্ক কণা তাঁর জ্ঞানে ও লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মোটকথা, জ্ঞান সম্পর্কিত দু'টি বিষয় একান্তই আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। কোন ফেরেশতা, কোন রাসূল কিংবা কোন সৃষ্ট জীব এতে তাঁর অংশীদার নয়। একটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ও অপরটি সমগ্র দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান। কোন অণু-পরমাণুও এ জ্ঞানের অগোচরে নয়। প্রথম আয়াতে এ দু'টি বিশেষ গুণই বর্ণিত হয়েছে। এর প্রথম বাক্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য ঃ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যসমূহে সমগ্র দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান বর্ণনা করে প্রথমে বলা হয়েছে ঃ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অর্থাৎ স্থলে ও জলে যা রয়েছে তা আল্লাহ্ ত'আলাই জানেন। 'স্থলে ও জলে' বলে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও দৃশ্য জগৎ বোঝানো হয়েছে; যেমন সকাল ও বিকাল বলে সম্পূর্ণ সময় এবং পূর্ব ও পশ্চিম বলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ বোঝানো হয়। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত।

অতঃপর বিষয়টির আরও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানগত ভাবে সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিবেষ্টন করা শুধু এ-ই নয় যে, বড় বড় বস্তুগুলোর খবরই তিনি জানেন; বরং প্রত্যেক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম এবং গোপন থেকে গোপনতম বস্তুও তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا–অর্থাৎ সারা জাহানে কোন বৃক্ষের এমন কোন পাতা ঝরে না, যা তাঁর জানা নেই। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক পাতা ঝরার পূর্বে, ঝরার সময় এবং ঝরার পর তিনি জানেন। তাঁর জানা আছে যে, বৃক্ষের প্রত্যেকটি পাতা কতবার নড়া-চড়া করবে, কখন এবং কোথায় ঝরবে। অতঃপর কোন কোন অবস্থা অতিক্রম করবে। ঝরার কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তার আগাগোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা। কেননা, বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া হচ্ছে পাতার ক্রমবিকাশ ও বনজ জীবনের সর্বশেষ স্তর। তাই শেষ অবস্থা উল্লেখ করে আগা গোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ–অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের গভীরতায় ও অন্ধকারে যে শস্যকণা পড়ে রয়েছে, তাও তাঁর জানা আছে। প্রথমে বৃক্ষপত্র উল্লেখ করা হয়েছে, যা সাধারণ দৃষ্টির সামনে ঝরে, এরপর শস্যকণা উল্লেখ করা হয়েছে, যা কৃষক ক্ষেতে বপন করে কিংবা আপনা-আপনি মাটির গভীরতায় ও অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে, অতঃপর আল্লাহ্র জ্ঞান সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পরিব্যাপ্ত হওয়া আদ্র ও শুষ্ক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এসব বিষয় আল্লাহ্র কাছে প্রকাশ্য গ্রন্থে লিখিত আছে। কারও কারও মতে 'প্রকাশ্য গ্রন্থ' বলে 'লওহে-মাহফুয' বোঝানো হয়েছে এবং কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্র জ্ঞান। একে 'প্রকাশ্য গ্রন্থ' বলার কারণ এই যে, লিখিত বিষয়বস্তু যেমন ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানও সমগ্র সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে শুধু আনুমানিক নয়-সুনিশ্চিত।

সৃষ্ট জগতের কোন কণাও তাঁর অবগতির বাইরে নয়–এ ধরনের সর্বব্যাপী জ্ঞান যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য কোরআন পাকের অনেক আয়াত সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। সূরা লোকমানে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ، اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ .

অর্থাৎ সরিষা পরিমাণ কোন শস্যকণা যদি পাথরের বুকে বিজড়িত থাকে অথবা আকাশে কিংবা ভূপৃষ্ঠে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকেও একত্র করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। আয়াতুল-কুরসীতে আছেঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ .

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষের সামনের ও পশ্চাত্যের সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। সব মানুষ একত্র হয়ে তাঁর জ্ঞানের মধ্য থেকে একটি বিষয়কেও বেষ্টন করতে পারে না। তবে যতটুকু জ্ঞান আল্লাহ্ কাউকে দিতে চান।" সূরা ইউনুসে আছে ঃ

لَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ .

অর্থাৎ আসমান ও যমীনে এক কণা পরিমাণ বস্তুও আপনার পালনকর্তার জ্ঞান থেকে পৃথক নয়। সূরা তালাকে আছে ঃ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْمًا

—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সর্ববিষয়কে বেষ্টন করে রয়েছে।

এমনিভাবে অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান (যাকে কোরআনে অদৃশ্য বিষয় বলা হয়েছে এবং যার ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) কিংবা সমগ্র সৃষ্ট জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ। কোন ফেরেশতা কিংবা রাসূলের জ্ঞানকে এরূপ সর্বব্যাপী মনে করা খ্রিস্টানদের মত রাসূলকে আল্লাহ্র স্তরে উন্নীত করা ও আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করার শামিল, যা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী শিরক। সূরা শু'আরায় শিরকের স্বরূপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ . اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা বলবে ঃ আল্লাহ্র কসম, আমরা ঘোর পথ-ভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে (অর্থাৎ মূর্তিদেরকে) বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য করে নিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলদের এবং বিশেষভাবে শেষ নবী (সা)-কে হাজারো লাখো অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং সব ফেরেশতা ও পয়গম্বরের চাইতে বেশি দান করেছিলেন। কিন্তু এটা জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলার সমান কারও জ্ঞান নয় এবং হতেও পারে না। নতুবা খ্রিস্টানদের মত রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি হবে। তারা রাসূলকে আল্লাহ্র সমতুল্য করে দিয়েছে, যার নাম শিরক (নাউযুবিল্লাহ্)।

এ পর্যন্ত প্রথম আয়াত বর্ণিত হলো। এতে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সম্পর্কিত গুণের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা প্রত্যেক অদৃশ্য, দৃশ্য ও প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কিত গুণ ও তাঁর সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এ গুণটিও তাঁর সত্তার বৈশিষ্ট্য। বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى .

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতে তোমাদের আত্মা এক প্রকার করায়ত্ত করে নেন এবং পুনরায় প্রত্যুষে জাগ্রত করে দেন, যাতে তোমাদের নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করে দেওয়া হয়। সারাদিন তোমরা যা কিছু কর, তা সবই তিনি জানেন। আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের ফলেই মানুষের জন্ম, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের একটা নমুনা প্রত্যহ সামনে আসতে থাকে। হাদীসে নিদ্রাকে 'মৃত্যুর ভাই" বলা হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, নিদ্রা মানুষের সব শক্তিকে মৃত্যুর মতই নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রা, অতঃপর জাগরণের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে মানুষকে হুঁশিয়ার করেছেন যে, যেভাবে প্রতি রাতে ও প্রতি সকালে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত মৃত্যু বরণ করে জীবিত হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত অবলোকন করে, এমনিভাবে ঘটবে সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যু। অতঃপর সামগ্রিক জীবন লাভকেও বুঝে নাও, যাকে হাশর বলা হবে। যে সত্তা প্রথমোক্তটি করতে পারেন, শেষোক্তটি করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

অতঃপর তোমাদেরকে আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কৃতকর্ম বলে দেবেন অর্থাৎ কৃতকর্মের হিসাব হবে এবং তদানুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি প্রদান করা হবে।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়বস্তুরই আরও বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল বান্দার উপর প্রবল প্রতাপান্বিত। তিনি বান্দাকে যতদিন জীবিত রাখতে চান, ততদিন তার জন্য দেহরক্ষী ফেরেশতা প্রেরণ করেন, ফলে তার ক্ষতি করার সাধ্য কারও থাকে না। অতঃপর যখন জীবনের নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয়ে যায়, তখন এ দেহরক্ষী ফেরেশতাদলই তার মৃত্যুর উসিলা হয়ে যায় এবং তার মৃত্যুর উপকরণ সংগ্রহে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না, বরং رُدُّوا إِلَى اللهِ অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত করা হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতির সামনে উপস্থিত এবং সারা জীবনের হিসাবের কথা কল্পনা করলে কার সাধ্য আছে যে, সফলকাম হবে এবং শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতিই শুধু নন, বান্দাদের মাওলা এবং প্রভুও। তিনি প্রতি ক্ষেত্রে বান্দাকে সাহায্য করবেন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ নিশ্চয় ফয়সালা এবং নির্দেশ তাঁরই। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, একটিমাত্র সত্তা অগণিত মানুষের হিসাব সমাধা করবেন কিভাবে? তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ অর্থাৎ নিজের কাজের সাথে তুলনা করে আল্লাহ্র কাজকে বোঝা মূর্খতা বৈ নয়। তিনি অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ
اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ
كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

(৬৩) আপনি বলুন ঃ কে তোমাদের স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহ্বান কর যে, যদি আপনি আমাদের এ থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৬৪) আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের তা থেকে মুক্তি দেন এবং সব দুঃখ-বিপদ থেকে। তথাপি তোমরা শিরক কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ কে তোমাদেরকে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকার (অর্থাৎ দুঃখ বিপদ) থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে (মুক্তির জন্য, কখনও) বিনীতভাবে এবং (কখনও) গোপনে আহবান কর (এবং বল) যে, (হে আল্লাহ্) যদি তুমি আমাদেরকে এ (অন্ধকার) থেকে (এখনকার মত) মুক্তি দিয়ে দাও, তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (অর্থাৎ বড় কৃতজ্ঞতা হচ্ছে একত্ববাদ মেনে চলা—আমরা তা মেনে চলব। এ প্রশ্নের উত্তর যেহেতু নির্দিষ্ট এবং তারাও অন্য উত্তর দেবে না, তাই) আপনি (ই) বলে দিন যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন (যখনই মুক্তি পাও) এবং (শুধু উল্লিখিত অন্ধকার থেকেই কেন,) সব দুঃখ-বিপদ থেকে (তিনিই তো উদ্ধার করেন, কিন্তু) তোমরা (এরূপ যে,) তবুও (মুক্তি পাওয়ার পর যথারীতি) অংশীবাদিতা করতে থাক (যা চূড়ান্ত পর্যায়ের অকৃতজ্ঞতা অথচ ওয়াদা করেছিলে কৃতজ্ঞতার। মোটকথা, দুঃখ-বিপদে তোমাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা একত্ববাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপর অস্বীকার গ্রহণযোগ্য নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্র জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা এবং নজীরবিহীন বিস্তৃতি বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এতদুভয়ের কয়েকটি চিহ্ন ও নমুনা বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম আয়াতে ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। অর্থ অন্ধকার। ظلمات البر والبحر এর অর্থ স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহ। অন্ধকারের অনেক প্রকার রয়েছে ঃ রাত্রির অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার, ধূলাবালির অন্ধকার, সমুদ্রের ঢেউয়ের অন্ধকার ইত্যাদি সব প্রকার বোঝাবার জন্য ظلمات শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অন্ধকার মানুষের প্রতি একটি নিয়ামত। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে অকেজো করা ছাড়াও মানুষের অগণিত দুঃখ-বিপদাপদের কারণ হয়ে যায়। তাই আরবদের বাক-পদ্ধতিতে ظلمة শব্দটি দুঃখ ও বিপদাপদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতেও সাধারণ তফসীরবিদরা এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের হুঁশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেবদেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্কে আহবান কর, কখনও প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং কখনও মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কার্যনির্বাহী মনে করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। কেননা, দেবদেবীরা বিপদেই যখন কাজে আসে না, তখন তাদের পূজাপাট আমরা কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে তোমাদের বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা। কেননা, তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন দেবদেবী এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি। তাই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন ঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন, বরং অন্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনিই উদ্ধার করবেন। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দেবদেবীর পূজা-পার্বণ শুরু করে দাও। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাত্মক মূর্খতা।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে ঃ এক. আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি-সামর্থ্য, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্যবান। দুই. সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই করায়ত্ত এবং তিন. একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীবন দেবদেবীর পূজাকারীরাও যখন বিপদে পতিত হয়, তখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই আহবান করে এবং তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ করে।

শিক্ষণীয় ঃ মুশরিকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাসঘাতকতার দিক দিয়ে যত বড় অপরাধই হোক কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষার চাবুক বিশেষ। আমরা মুসলমানরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিপদের সময়ও তাঁকে স্মরণ করি না বরং আমাদের সব ধ্যান-ধারণা বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আমরা যদিও মূর্তি ও দেবদেবীকে স্বীয় কার্যনির্বাহী মনে করি না কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, উপকরণ ও যন্ত্রপাতিও আমাদের কাছে দেবদেবীর চাইতে কম নয়। এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, আল্লাহ্ তা'আলার অপার মহিমার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর আমাদের নেই।

বিপদাপদের আসল প্রতিকার ঃ আমরা প্রত্যেক অসুখে শুধু ডাক্তার ও ঔষধকে এবং প্রত্যেক ঝড়-তুফান-বন্যায় শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মত্ত হয়ে পড়ি যে, স্রষ্টার কথা চিন্তাই করি না। অথচ কোরআন পাক বারবার সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, পার্থিব বিপদাপদ সাধারণত মানুষের কুকর্মের ফল এবং পারলৌকিক শাস্তির একটা অতি সাধারণ নমুনা। এসব বিপদাপদ মুসলমানদের জন্য এক প্রকার রহমত। কারণ, বিপদাপদ দিয়েই অমনোযোগী মানুষদের সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনও স্বীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে যত্নবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। এ বিষয়বস্তুটি বোঝানোর জন্যই কোরআন পাক বলে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۔

অর্থাৎ আমি তাদের পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই পরকালের বড় শাস্তির পূর্বে–যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۔

অর্থাৎ তোমাদেরকে যে বিপদাপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল। আল্লাহ তা'আলা অনেক কুকর্ম ক্ষমা করে দেন।–(শুরা)

এ আয়াতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ কারও গায়ে কোন কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আঁচড় লাগলে কিংবা কারও কোথাও পদস্খলন ঘটলে কিংবা কারও রোগ-ব্যথা দেখা দিলে তা সবই কোন-না-কোন গুনাহের প্রতিফল মনে করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অনেক গুনাহ ক্ষমাও করে দেন।

বায়যাভী (র) বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গুনাহগাররা যেসব রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তা সবই গুনাহের ফল। কিন্তু নিষ্পাপ ও পাপমুক্তদের রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্য তাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া এবং জান্নাতে তাদেরকে উচ্চ স্তর দান করা হয়ে থাকে।

মোটকথা এই যে, পাপ থেকে মুক্ত নয়-এরূপ সাধারণ লোকেরা যে কোন অসুখ বিসুখ, বিপদাপদ কষ্ট ও অস্থিরতায় পতিত হয়, তা সবই পাপের ফলশ্রুতি।

এ থেকে আরও জানা যায় যে, সব বিপদাপদ, অস্থিরতা, দুর্ঘটনা ও সংকটের আসল ও সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকতে কৃতসংকল্প হওয়া এবং বিপদমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছেই দোয়া করা।

এর অর্থ এই নয় যে, বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, ঔষধ-পত্র, চিকিৎসা এবং বিপদমুক্তির জন্য বস্তুগত কলাকৌশল অনর্থক। বরং উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত কার্যনির্বাহী আল্লাহ তাআলাকেই মনে করতে হবে এবং বস্তুগত সাজ-সরঞ্জামকেও তাঁরই নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করতে হবে। কেননা, সব সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তাঁরই সৃজিত এবং তাঁরই প্রদত্ত নিয়ামত! এগুলো

তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা করে। অগ্নি, বাতাস, পানি, মৃত্তিকা এবং পৃথিবীর সব শক্তি তাঁর নির্দেশের অনুগামী; তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে অগ্নি দাহন করতে পারে না, পানি নির্বাপণ করতে পারে না, কোন ঔষধ ক্রিয়া করতে পারে না এবং কোন পথ্য রোগীর ক্ষতি সাধন করতে পারে না। মওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন ঃ

خاك وباد وآب وآتش بنده اند

بامن وتو مرده، باحق زنده اند

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামের পিছনে পড়েছে, তখন সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের অস্থিরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی

বিচ্ছিন্নভাবে কোন ঔষধ কিংবা ইঞ্জেকশনের উপকার প্রমাণিত হওয়া কিংবা কোন বস্তুগত কলাকৌশলের সাফল্য অর্জন করা অমনোযোগিতা ও পাপের সাথেও সম্ভবপর। কিন্তু যখন সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন এসব বস্তু ব্যর্থ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমান যুগে মানুষকে আরাম দেওয়া ও কষ্ট দূর করার জন্য কত রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম যে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। পঞ্চাশ বছর আগের মানুষ এসব বস্তুর কল্পনাও করতে পারত না। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য নতুন নতুন দ্রুত ক্রিয়াশীল ঔষধপত্র, নানা রকমের ইঞ্জেকশন এবং বড় বড় সুদক্ষ ডাক্তার ও স্থানে স্থানে হাসপাতালের প্রাচুর্য কার না জানা আছে। পঞ্চাশ-ষাট বছরের আগের মানুষ এগুলো থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত মানুষ আজকের মত এত বেশি রুগ্ন ও দুর্বল ছিল না। এমনিভাবে আজ ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধির জন্য নানা রকমের টীকা রয়েছে। দুর্ঘটনার কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য অগ্নি-নির্বাপক ইঞ্জিন, বিপদ মুহূর্তে তাৎক্ষণিক সংবাদ প্রেরণ ও তাৎক্ষণিক সাহায্যের উপায়াদি ও আসবাবপত্রের প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু এসব বস্তুগত সাজ-সরঞ্জাম যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষ দুর্ঘটনা ও বিপদাপদের শিকার পূর্বের তুলনায় বেশি হচ্ছে। এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, বিগত যুগে স্রষ্টার প্রতি অমনোযোগিতা ও প্রকাশ্য অবাধ্যতা এত অধিক ছিল না, যতটুকু বর্তমানকালে রয়েছে। বিগত যুগে আরাম-আয়েশের সাজ-সরঞ্জামকে আল্লাহ তা'আলার দান মনে করে কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু আজকের মানুষ বিদ্রোহের মনোভাব নিয়ে এগুলো ব্যবহার করতে সচেষ্ট। তাই যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

মোটকথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মুশরিকরা আল্লাহ্কেই স্মরণ করে—এ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও কষ্ট দূর করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম ও কলাকৌশলের চাইতে অধিক আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই মু'মিনের কাজ। নতুবা এর পরিণতি যা হচ্ছে তাই হবে অর্থাৎ সব কলাকৌশল সামগ্রিক হিসাবে উল্টো দিকে যাচ্ছে। বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার সব কৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু বন্যা আসে এবং বারবার আসে। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার

নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করা হচ্ছে কিন্তু রোগ-ব্যাধি রোজ রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা চলছে এবং বাহ্যত তা কার্যকরীও মনে হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে পাগলা ঘোড়া ছুটেই চলেছে। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ঘুষ, চোরা কারবার প্রভৃতি দমন করার জন্য সব সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল ব্যবহার করছে; কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আফসোস! আজ ব্যক্তিগত ও বাহ্যত লাভ-লোকসানের ঊর্ধ্বে উঠে অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে আমাদের বস্তুগত কলাকৌশল ব্যার্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বরং এগুলো আমাদের বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এরপর কোরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলাকৌশলকেও তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত হিসাবে ব্যবহার করা। এ ছাড়া নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَّسْتُ
عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৫) আপনি বলুন ঃ তিনিই শক্তিমান, যিনি তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখি করে দেবেন এবং একে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করবেন। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি– যাতে তারা বুঝে নেয়। (৬৬) আপনার সম্প্রদায় একে মিথ্যা বলছে, অথচ তা সত্য। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের উপর নিয়োজিত নই। (৬৭) প্রত্যেক খবরের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নেবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (আরও) বলুন ঃ (তিনি যেমন মুক্তি দিতে সক্ষম, তেমনি) তিনিই এ বিষয়ে শক্তিমান, যিনি তোমাদের প্রতি (তোমাদের কুফর ও শিরকের কারণে) কোন শাস্তি তোমাদের উপর দিক থেকে প্রেরণ করবেন (যেমন, প্রস্তর, বাতাস কিংবা তুফান, বৃষ্টি) কিংবা পদতল (মৃত্তিকা) থেকে (প্রকাশ করবেন ; যেমন ভূমিকম্প কিংবা নিমজ্জিত হওয়া। এসব শাস্তির অবতরণ আল্লাহ ছাড়া কারও ইচ্ছাধীন নয়। ইহকালে কিংবা পরকালে কোন না কোন সময়

এরূপ হবে।) কিংবা তোমাদেরকে (স্বার্থের দ্বন্দ্ব দ্বারা বিভিন্ন) দল-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে (পরস্পরের) মুখোমুখি করে দেবেন (অর্থাৎ যুদ্ধে লিপ্ত করে দেবেন এবং তোমাদের একে অন্যের (প্রতি সংঘর্ষের স্বাদ) আস্বাদন করাবেন। (এর এক একটি তোমাদের উপর আপতিত করবেন অথবা সব বিপদাপদ একত্র করে দেবেন। মোটকথা, মুক্তিদান করা কিংবা শাস্তি প্রদান করা উভয় কাজেই তিনি শক্তিমান। হে মোহাম্মদ (সা) আপনি দেখুন তো আমি কি (কি) ভাবে (একত্ববাদের) প্রমাণাদি বিভিন্ন দিক থেকে বর্ণনা করি! সম্ভবত তারা বুঝে যাবে এবং (শাস্তি দিতে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিমান হওয়া এবং কুফর-শিরকের কারণে শাস্তি হয় জেনেও) আপনার সম্প্রদায় (কুরাইশরা এবং আরবরাও) এ (শাস্তি)-কে মিথ্যা জ্ঞান করে (এবং শাস্তি না হওয়ায় বিশ্বাস করে) অথচ তা নিশ্চিত (বাস্তবে পরিণত হবে। তারা একথা শুনে বলতে পারে যে, কখন হবে?) আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের উপর (শাস্তি অবতারণ করার জন্য) নিয়োজিত নই (যে, আমার বিস্তারিত খবর জানা থাকবে কিংবা ব্যাপারটি আমার ইচ্ছাধীন হবে। তবে) প্রত্যেক খবরের (মর্ম) বাস্তবায়িত হওয়ার একটি সময় (আল্লাহ্র জ্ঞানে নির্দিষ্ট) আছে এবং অচিরেই তোমরা অবগত হবে (যে, সে শাস্তি এসে গেছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সুবিস্তৃত জ্ঞান ও নজীরবিহীন শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ তিনিই দূর করতে পারেন এবং বিপদ মুহূর্তে যে তাঁকে আহ্বান করে, সে তাঁর সাহায্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। কেননা, সমগ্র সৃষ্ট জগতের উপর তাঁর শক্তি-সামর্থ্য কামেল ও পরিপূর্ণ এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর দয়াও অসাধারণ। তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এরূপ শক্তি-সামর্থ্য নেই এবং সমগ্র সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া ও মমতা নেই।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের অপর পিঠ বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে-কোন আযাব ও যে-কোন বিপদ দূর করতে যেমন সক্ষম তেমনিভাবে তিনি যখন কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যে-কোন শাস্তি দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার শাসনকর্তাদের ন্যায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী দরকার হয় না এবং কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا .

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি উপর দিক থেকে কিংবা পদতল থেকে কোন শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেবেন এবং একেকে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন।

আল্লাহ্র শাস্তির তিনটি প্রকার ঃ এখানে তিন প্রকার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে ঃ এক. যা উপর দিক থেকে আসে, দই. যা নিচের দিক থেকে আসে এবং তিন. যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের

আকারে সৃষ্টি হয় عذابا শব্দটিকে تنوين সহ نكره উল্লেখ করে ব্যাকরণের দিক দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তিন প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

তফসীরবিদরা বলেন ঃ উপর দিক থেকে আযাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উম্মত সমূহের মধ্যে অনেক রয়েছে। নূহ (আ)-এ সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, আদ জাতির উপর ঝড়ঝঞ্ঝা চড়াও হয়েছিল, লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈলের উপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। আবরাহার হস্তি-বাহিনী যখন মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকূল দ্বারা তাদের উপর কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চর্বিত ভূষির ন্যায় হয়ে যায়।

এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নিচের দিক থেকে আযাব আসারও বিভিন্ন প্রকার অতিবাহিত হয়েছে। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি উপরের আযাব বৃষ্টির আকারে এবং নিচের আযাব ভূ-তল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার আযাবে পতিত হয়েছিল। ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আযাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারুন স্বীয় ধনভাণ্ডারসহ এ আযাবে পতিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ উপরের আযাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং নীচের আযাবের অর্থ নিজ চাকর, নওকর ও অধীনস্থ কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতক, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসাৎকারী হওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কতিপয় উক্তি থেকেও উপরোক্ত তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। মেশকাত শরীফে এ উক্তি বর্ণিত রয়েছে ঃ كما تكونون يؤمر عليكم অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্ম যেমন ভাল কিংবা মন্দ হবে, তেমনি শাসকবর্গ তোমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা সৎ ও আল্লাহর বাধ্য হলে তোমাদের শাসকবর্গও দয়ালু এবং সুবিচারক হবে। পক্ষান্তরে তোমরা কুকর্মী হলে তোমাদের শাসকবর্গও নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী হবে। প্রসিদ্ধ উক্তি أَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ-এর অর্থ তাই।

মেশকাতে উল্লিখিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

—'আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ্। আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি সব বাদশাহর প্রভু। সব অন্তর আমার করায়ত্ত। আমার বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি বাদশাহ ও শাসকদের অন্তরে তাদের প্রতি স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দিই। পক্ষান্তরে আমার বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে তাদের প্রতি কঠোর করে দিই। তারা তাদেরকে সব রকম নির্যাতন করে। তাই শাসকবর্গকে মন্দ বলে নিজের সময় নষ্ট করো না বরং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন কর, যাতে আমি তোমাদের সব কাজ ঠিক করে দিই।

এমনিভাবে আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

যখন আল্লাহ তা'আলা কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম সহকারী দান করেন যাতে প্রশাসক কোন ভুল করে ফেললে সে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সঠিক

কাজ করলে সে তার সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যখন কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার জন্য অমঙ্গল অবধারিত হয়, তখন মন্দ লোকদের তার পরামর্শদাতা ও অধীনস্থ করে দেওয়া হয়।

এসব হাদীস ও আলোচ্য তফসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে যেসব কষ্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা উপর দিককার আযাব এবং যে কষ্ট অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ করতে হয়, সেগুলো নীচের দিককার আযাব। এগুলো কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং আল্লাহ্র আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি! হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ যখন আমি কোন গুনাহ্ করে ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চাকর, আরোহণের ঘোড়া ও বোঝা বহনের গাধার মেযাজেও অনুভব করি। এরা সবাই আমার অবাধ্যতা করতে থাকে। মওলানা রুমী বলেন ঃ

خلق را باتو چنیں بدخو کنند
تا ترا ناچار رو آنسو کنند

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে তোমার উর্ধ্বতন শাসকবর্গ কিংবা অধঃস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে তোমাকে কষ্ট দায়ক কাজ-কারবারের বাহ্যিক আযাব দান করে প্রকৃতপক্ষে তোমার গতিধারা নিজের দিকে ফিরিয়ে দিতে চান—যাতে তুমি সতর্ক হয়ে স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন করে পরকালের বড় শাস্তি থেকে বেঁচে যাও।

মোটকথা, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর তফসীর অনুযায়ী শাসকবর্গের অত্যাচার ও নিপীড়ন উপর দিকের আযাব এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের বেঈমানী, কর্তব্যে অবহেলা ও বিশ্বাসঘাতকতা নিচের দিকের আযাব। উভয়টিরই প্রতিকার এক। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম পর্যালোচনা করলে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা পরিহার করলে সর্বশক্তিমান এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবেন যাতে এ বিপদ দূর হয়ে যাবে। নতুবা শুধু বস্তুগত কলাকৌশল দ্বারা এগুলো সংশোধনের আশা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়। সর্বদাই এর অভিজ্ঞতা হচ্ছে ঃ

خویش را دیدیم ورسوائی خویش
امتحان ما مکن اے شاہ بیش

উপর দিকের ও নীচের দিকের আযাবের যে বিভিন্ন তফসীর বর্ণিত হলো প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত عذاب শব্দটি আসলে সবগুলো তফসীরকে পরিব্যাপ্ত করে। আকাশ থেকে বর্ষিত প্রস্তর, রক্ত, অগ্নি ও বন্যা এবং শাসকবর্গের অত্যাচার-নিপীড়ন—এগুলো সব উপর দিকের আযাবের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ভূ-পৃষ্ঠে দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাতে কোন সম্প্রদায়ের তলিয়ে যাওয়া কিংবা ভূ-গর্ভের পানি স্ফীত হয়ে তাতে নিমজ্জিত হওয়া কিংবা অধীনস্থ কর্মচারীদের হাতে বিপদে পতিত হওয়া—এগুলো সব নীচের দিকের আযাবের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আযাব হচ্ছে ঃ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا—অর্থাৎ তোমরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে এবং একদল অন্য দলের জন্য আযাব হয়ে যাবে। এতে يلبسكم শব্দটি لبس ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ গোপন করা, আবৃত

করা। এ অর্থেই لباس ঐ কাপড়কে বলা হয়, যা মানুষের দেহকে আবৃত করে এবং এ কারণেই التباس। সন্দেহ ও অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যেখানে কোন বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়।

شيع শব্দটি شيعة-এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী ও অনুগামী। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ-অর্থাৎ নূহ (আ)এর অনুসারী হলেন ইবরাহীম (আ)। সাধারণ প্রচলিত ভাষা ও বাক-পদ্ধতিতে شيعة শব্দটি এমন দলকে বলা হয়, যারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্র হয় এবং এ উদ্দেশ্যে একে অন্যের সহায়ক হয়। অধুনা প্রচলিত ভাষায় এর স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ হচ্ছে দল বা পার্টি।

তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে ঃ এক প্রকার আযাব এই যে, জাতি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের সম্বোধন করে বললেন ঃ لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض। অর্থাৎ তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফির হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে। —(মাযহারী)

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে চলতে চলতে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়লাম। অনেকক্ষণ দোয়া করার পর তিনি বললেন ঃ আমি পালনকর্তার কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি ঃ এক. আমার উম্মতকে যেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ দোয়া কবূল করেছেন। দুই. আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ দোয়াও কবূল করেছেন। তিন. আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহে ধ্বংস না হয়। আমাকে শেষ পর্যন্ত এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। —(মাযহারী)

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। এতে তিনটি দোয়ার মধ্যে একটি এই যে, আমার উম্মতের উপর এমন শত্রুকে চাপিয়ে দেবেন না, যে সবাইকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। এ দোয়া কবূল হয়েছে। অপর দোয়া এই যে, তারা যেন পরস্পরে মারমুখী না হয়ে পড়ে। এরূপ দোয়া করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর উপর বিগত উম্মতদের ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোন ব্যাপক আযাব আগমন করবে না, কিন্তু একটি আযাব দুনিয়াতে তাদের উপরও আসতে থাকবে। এ আযাব হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রতি ক্ষেত্রেই হুঁশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে।

সূরা হূদের এক আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ অর্থাৎ তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।

এতে বোঝা গেল যে, যারা পরস্পরে (শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী।

এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দলবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا অর্থাৎ যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না।

এসব আয়াত ও হাদীসের সারমর্ম এই যে, মতবিরোধ অত্যন্ত অশুভ ও নিন্দনীয় বিষয়। আজ জাগতিক ও ধর্মীয়, সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবনতি ও ধ্বংসের কারণ চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, তাদের অধিকাংশ বিপদাপদের কারণ পারস্পরিক মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা। আমাদের কুকর্মের পরিণতি হিসেবেই এ আযাব আমাদের উপর সওয়ার হয়ে গেছে। এ জাতির ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' এ কালেমায় বিশ্বাসী পৃথিবীর যে কোন অংশে বসবাসকারী, যে কোন ভাষা, ভাষী, যে কোন বর্ণ ও বংশের সাথে সম্পর্কশীল, সবাই ছিল পরস্পরে ভাই ভাই। পাহাড় ও সমুদ্রের দুর্গম পথ তাদের ঐক্যে প্রতিবন্ধক ছিল না। বংশ, বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য তাদের পথে বাধা ছিল না। তাদের জাতীয় ঐক্য ও কালেমার সাথেই জড়িত ছিল। আরবী, মিসরী, তুর্কী 'হিন্দী, চীনার বিভাগ ছিল শুধু পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য। মরহুম-ইকবালের ভাষায় ঃ

درویش خدا مست نشر قی ہے نہ غربی

گھراس کا نہ دہلی نہ اصفہان نہ سمرقند

আজ বিজাতির অশুভ চক্রান্ত ও অব্যাহত প্রচেষ্টা আবার তাদেরকে বংশ-ভাষা ও দেশভিত্তিক জাতীয়তায় বিভক্ত করে দিয়েছে। এর পর প্রত্যেক জাতি ও দল নিজেদের মধ্যেও অনৈক্য এবং বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং বিজাতিকেও ক্ষমার চোখে দেখা যে জাতির অঙ্গভূষণ ছিল, ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যে জাতি বৃহত্তম স্বার্থ থেকেও হাত গুটিয়ে নিত, আজ সেই জাতির অনেকেই সামান্য ও নিকৃষ্ট বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ঈমানের বৃহত্তম সম্পর্ককে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। হীন স্বার্থ ও বাসনার এ দ্বন্দ্বই জাতির জন্য অশুভ এবং দুনিয়াতে জঘন্য শাস্তিতে পরিণত হয়েছে।

হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বুঝে নেওয়া দরকার যে, যে মতবিরোধ মূলনীতি ও বিশ্বাস ক্ষেত্রে হয় কিংবা হীন স্বার্থ ও কুবাসনার কারণে হয় তাকেই কোরআন পাকে আল্লাহ্‌র আযাব ও আল্লাহ্‌র রহমতের পরিপন্থী বলা হয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত ইজতিহাদের মূলনীতি অনুসরণ করে শাখাগত মাস'আলাসমূহে প্রথম শতাব্দী থেকে সাহাবী, তাবেয়ী ও ফিকহবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ চলে এসেছে, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ মতবিরোধে উভয় পক্ষ কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমা থেকে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে এবং প্রত্যেকের নিয়ত কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলী পালন করা। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যায় এবং তদ্বারা শাখাগত মাস'আলা বের করার কাজে ইজতিহাদ ও মতের বিরোধ দেখা দেয়। এ ধরনের মতবিরোধকে এক হাদীসে রহমত আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

জামে-সগীর গ্রন্থে নসর মুকাদ্দাসী (র) বায়হাকী (র) ইমামুল-হারামাইনের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, اختلاف امتى رحمة। আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমতস্বরূপ। উম্মতে মুহাম্মাদীর এ বৈশিষ্ট্যের কারণ এই যে, এ উম্মতের হক্কানী আলিম ও ফিকহবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ হবে, তা সব সময় কোরআন ও সুন্নাহর নীতি অনুযায়ী হবে, সদুদ্দেশ্যে ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে হবে–জাঁকজমক ও অর্থোপার্জনের হীন স্বার্থ এ মতবিরোধকে উস্কানি দেবে না। ফলে তা যুদ্ধ-বিগ্রহেরও কারণ হবে না। বরং জামে সগীরের টীকাকার আল্লামা আবদুর রউফ মানাভী (র)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ফিকহবিদদের বিভিন্ন মত ও পথ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের বিভিন্ন শরীয়তের অনুরূপ হবে। বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সবগুলো শরীয়ত ছিল আল্লাহ্ তা'আলারই মনোনীত। এমনিভাবে মুজতাহিদদের বিভিন্ন পথকে কোরআন ও সুন্নাহর নীতি অনুযায়ী হওয়ার কারণে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধান বলা হবে।

এ ইজতিহাদী মতবিরোধের দৃষ্টান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মধ্যে ঠিক তেমন, যেমন শহরের প্রধান সড়কগুলোকে যাতায়াতকারীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। এক অংশে বাস চলে, অন্য অংশে অন্য গাড়ী কিংবা ট্রাক। এমনিভাবে সাইকেল আরোহী ও পথচারীদের জন্য পৃথক জায়গা থাকে, একই সড়ককে কয়েক ভাগে বিভক্ত করাও বাহ্যত একটি বিরোধের দৃশ্য। কিন্তু যেহেতু সবার গতি একই দিকে এবং প্রত্যেক ভাগের যাত্রী একই গন্তব্য স্থলে পৌছবে, তাই পথের এ বিরোধ ক্ষতিকর হওয়ার পরিবর্তে যাতায়াতকারীদের জন্য উপকারী ও রহমত স্বরূপ।

এ কারণেই মুজতাহিদ ইমাম ও ফিকহবিদরা এ বিষয়ে একমত যে, ফিকহবিদদের উদ্ভাবিত কোন পথই বাতিল নয়। যারা এসব পথ অনুসরণ করে অন্যদের পক্ষে তাদেরকে গুনাহগার বলা বৈধ নয়। মুজতাহিদ ইমাম ও ফিকহবিদদের মাযহাবের যে বিভিন্নতা, এর সারকথা এর চাইতে বেশি কিছু নয় যে, একজন মুজতাহিদ যে পথ অবলম্বন করেছেন তা-ই তাঁর মতে প্রবল। কিন্তু এর বিপরীতে অন্য মুজতাহিদের পথকেও তিনি বাতিল বলেন না; বরং একজন অপরজনকে সম্মান করেন। সাহাবী ও তাবেয়ী ফিকহবিদ এবং ইমাম চতুষ্টয়ের অসংখ্য ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে, অনেক মাস'আলায় ভিন্ন মাযহাব ও জ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত আলোচনা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। কলহ-বিবাদ, হিংসা ও শত্রুতার কোন আশংকাই সেখানে ছিল না। এসব মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যেও যে পর্যন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ধর্মপরায়ণতা বিদ্যমান ছিল, তাঁদের পারস্পরিক ব্যবহারও এমনি ছিল।

এ মতবিরোধ হচ্ছে রহমতই রহমত। এটি সাধারণ মানুষের সুবিধা বৃদ্ধিতে সহায়ক এবং অনেক শুভ পরিণতির বাহক। বাস্তবে মাস'আলার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বর্ণনাকারীদের মতবিরোধ সীমার ভিতরে থাকলে মোটেই ক্ষতিকর নয়, বরং মাস'আলার বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তুলতে ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছতে সহায়তা করে। সততাপরায়ণ বুদ্ধিজীবীরা একত্রে বসলে কোন মাস'আলাতেই মতবিরোধ হবে না– এটা অসম্ভব। বোধশক্তিহীন, নির্বোধ কিংবা অধর্মপরায়ণ বুদ্ধিজীবীদের পক্ষেই এটা সম্ভব, যারা গোষ্ঠীগত স্বার্থের খাতিরে বিবেকের বিরুদ্ধে ঐকমত্য প্রকাশ করে থাকে।

যে মতবিরোধ সীমার ভিতরে থাকে (অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর অকাট্য ও বিশ্বাসগত মাস'আলায় না হয়ে শাখাগত ইজতিহাদী মাস'আলায় হয়, যাতে কোরআন ও সুন্নাহ নীরব কিংবা অস্পষ্ট) এবং বিবাদ-বিসম্বাদ ও ঝগড়া-ঝাটির কারণ না হয় তা ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী এবং নিয়ামত ও রহমত। উদাহরণত সৃষ্ট জগতের সব বস্তুর আকার-আকৃতি, রঙ, গন্ধ এবং বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা বিভিন্ন রূপ। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আছে। মানব জাতির মেজাজ, পেশা, কর্ম ও বসবাসের পদ্ধতিতে বিভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু সব বিভিন্নতা দুনিয়ার শ্রীবৃদ্ধিতে এবং অসংখ্য উপকারিতা সৃষ্টিতে সহায়ক।

অনেক লেখক এ বাস্তব সত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা ফিকহবিদদের বিভিন্ন মাযহাব এবং আলিমদের বিভিন্ন ফতোয়াকেও ঘৃণার চোখে দেখে। তাদেরকে বলতে শোনা যায় যে, আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলে আমরা কোথায় যাব ? অথচ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার। একজন রোগীর ব্যাপারেও চিকিৎসকদের মধ্যে মতবিরোধ হতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় আমরা কি করি ? আমাদের ধারণায় যে চিকিৎসক অধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ, আমরা তাকেই চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করি এবং এজন্য ডাক্তারদের মন্দ বলি না। মোকদ্দমার উকীলদের মধ্যেও মতের পার্থক্য দেখা দেয়। আমরা যে উকীলকে অধিক যোগ্য ও অভিজ্ঞ মনে করি, তার পরামর্শ মতই কাজ করি এবং অন্য উকীলদের কুৎসা গেয়ে ফিরি না। এ ক্ষেত্রেও এ নীতি অনুসরণ করা উচিত। কোন মাস'আলায় আলিমদের ফতোয়া বিভিন্ন রূপ হয়ে গেলে সাধ্যমত অনুসন্ধান করার পর যে আলিম জ্ঞান ও আল্লাহ ভীতিতে শ্রেষ্ঠ মনে হয়, তাঁর ফতোয়া অনুসরণ করতে হবে, অন্য আলিমদের কুৎসা প্রচার করা যাবে না।

হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (র) 'এলামুল-মুকিয়ীন' গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ দক্ষ মুফতী নির্বাচন এবং মতবিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতে অধিক জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু মুফতীর ফতোয়াকে অগ্রাধিকার দান-এ কাজ প্রত্যেক মাস'আলা প্রার্থী মুসলমানের একান্ত দায়িত্ব। আলিমদের অনেকগুলো ফতোয়ার মধ্য থেকে কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া তার কাজ নয়, কিন্তু মুফতী ও আলিমদের মধ্যে যিনি তার মতে অধিক জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু তাঁর ফতোয়া মেনে চলা অবশ্যই তার কাজ, কিন্তু অপরাপর মুফতী ও আলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে পারবে না। এ দায়িত্ব পালন করার পর সে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। ফতোয়াদাতা কোন ভুল করে থাকলে, তজ্জন্য সে-ই দায়ী হবে।

মোটকথা এই যে, যে কোন মতবিরোধ সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও যে-কোন মতৈক্য সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয় ও কাম্য নয়। যদি চোর, ডাকাত ও বিদ্রোহীরা একজোট হয়ে পরস্পরে একমত হয়ে যায়, তবে তাদের এ ঐকমত্য যে নিন্দনীয় ও জাতির পক্ষে মারাত্মক, তা কে না জানে। এ ঐক্যবদ্ধতার বিপক্ষে জনগণ ও পুলিশের পক্ষ থেকে যে কোন প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম পরিচালিত হবে, তা নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ও উপকারী।

বোঝা গেল যে, মতবিরোধের মধ্যে এবং কোন এক মত মেনে চলার মধ্যে কোন অনিষ্ট নেই; বরং যত্সব অনিষ্ট অন্যের সম্পর্কে কুধারণা ও কটূক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে। এটি জ্ঞানবুদ্ধি ও ধার্মিকতার দৈন্যদশা এবং কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার বাহুল্যের ফলশ্রুতি। কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এ দোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তাদের জন্য রহমতের মতবিরোধও আযাবের মতবিরোধে পর্যবসিত হয় এবং বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে মারামারি,

হানাহানি এমনকি, খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনা, কটূক্তি ও পীড়াদায়ক কথাবার্তাকে মাযহাবের পৃষ্ঠপোষকতা জ্ঞান করে। অথচ এ ধরনের বাড়াবাড়ির সাথে মাযহাবের কোন সম্পর্কই নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) এ জাতীয় কলহ-বিবাদে লিপ্ত হতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। সহীহ হাদীসসমূহে একে পথভ্রষ্টতার কারণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। —(তিরমিযী), ইবনে মাজাহ)

দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্বজন অর্থাৎ কোরাইশদের সত্য-বিরোধিতা উল্লেখ করে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আযাব কবে আসবে--তাদের এ প্রশ্নের জওয়াবে আপনি বলে দিন ঃ আমি এ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নই। প্রত্যেক বিষয়ের একটি সময় আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত রয়েছে। সময় উপস্থিত হলে তা অবশ্যই হবে এবং এর ফলাফল তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ
وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ
لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا
يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ
الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۚ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ
الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ
قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ
وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

(৬৮) যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর আর যালিমদের সাথে উপবেশন করবেন না। (৬৯) এদের যখন বিচার হবে তখন পরহিযগারদের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না; কিন্তু তাদের দায়িত্ব উপদেশ দান করা--যাতে ওরা ভীত হয়। (৭০) তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমনভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় যে আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা সমগ্র জগতকেও বিনিময়স্বরূপে প্রদান করে, তবু তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা নিজেদের কৃতকর্মে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্য উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে--কুফরের কারণে। (৭১) আপনি বলে দিন ঃ আমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুকে আহবান করব, যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না আর আমরা কি পশ্চাৎপদে ফিরে যাব, এরপর যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন ? ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শয়তানরা বনভূমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে--সে উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। তার সহচররা তাকে পথের দিকে ডেকে বলছে ঃ এস, আমাদের কাছে। আপনি বলে দিন ঃ নিশ্চয় আল্লাহর পথই সুপথ। আমরা আদিষ্ট হয়েছি যাতে স্বীয় পালনকর্তার আজ্ঞাবহ হয়ে যাই। (৭২) এবং তা এই যে, নামায কায়েম কর ও তাঁকে ভয় কর। তাঁর সামনেই তোমরা একত্রিত হবে। (৭৩) তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন ঃ হয়ে যা, অতঃপর হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, যারা আমার নিদর্শনাবলী (ও নির্দেশাবলী) সম্বন্ধে ছিদ্রান্বেষণ করছে, তখন তাদের (নিকট বসা) থেকে বিমুখ হও, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয় এবং যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়, (অর্থাৎ এ ধরনের মজলিসে বসার নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকে) তবে (যখন স্মরণ হয়) স্মরণ হওয়ার পর আর অত্যাচারীদের সাথে উপবেশন করো না (তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কর) এবং (যদি এরূপ মজলিসে যাওয়ার কোন জাগতিক কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজন থাকে, তবে এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে,) যারা (বিনা প্রয়োজনে এরূপ মজলিসে যাওয়াসহ অন্যান্য শরীয়ত-নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে) সংযম অবলম্বন করে, তাদের উপর এদের (অর্থাৎ ভর্ৎসনাকারী মিথ্যারোপকারীদের) বিচারের (এবং ভর্ৎসনার গুনাহের) কোন প্রভাব পড়বে না (অর্থাৎ প্রয়োজনবশত এসব মজলিসে গমনকারীরা গুনাহগার হবে না)। কিন্তু তাদের দায়িত্ব (সামর্থ্য থাকলে) উপদেশ দান করা—সম্ভবত তারাও (অর্থাৎ ভর্ৎসনাকারীরাও এসব গর্হিত বিষয় থেকে) সংযম অবলম্বন করবে (ইসলাম গ্রহণ করে হোক কিংবা তাদের খাতিরে হোক) এবং (মিথ্যারোপের মজলিসেরই কোন বিশেষত্ব নেই, বরং) এরূপ লোকদেরকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর, যারা নিজেদের (এ) ধর্মকে (যা মেনে চলা তাদের দায়িত্বে ফরয ছিল, অর্থাৎ ইসলামকে) ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে (অর্থাৎ এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে) এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে (অর্থাৎ এর ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আছে এবং পরকাল অবিশ্বাস করে। ফলে এ ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভয়াবহ পরিণাম দৃষ্টিগোচর হয় না) এবং (পরিত্যাগ করা ও সম্পর্কচ্ছেদ করার সাথে সাথে তাদেরকে) এ কোরআন দ্বারা (যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে) উপদেশও দান কর–যাতে কেউ স্বীয় কুকর্মের কারণে (আযাবে) এমনভাবে জড়িত না হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং অবস্থা এই হয় যে, যদি (ধরে নেওয়া যাক) সারা জগতকে বিনিময়রূপে প্রদান করে (যে, প্রতিদানে আযাব থেকে বেঁচে যাবে) তবুও তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না (কাজেই উপদেশে এ উপকার আছে যে, কুকর্মের পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার হতে পারে, পরে মান্য করা বা অমান্য করা তার কাজ, সেমতে) তারা (বিদ্রূপকারীরা) এমনই যে, (উপদেশ মেনে নেয়নি এবং) স্বীয় (কু-) কর্মের কারণে (আযাবে) জড়িত হয়ে পড়েছে, (পরকালে এ আযাব এভাবে প্রকাশ পাবে যে,) তাদের অত্যন্ত উত্তপ্ত (ফুটন্ত) পানি পান করতে হবে এবং (এ ছাড়াও এবং এভাবেও) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে স্বীয় কুফরের কারণে (কেননা, আসল কুকর্ম এটাই, বিদ্রূপ ছিল এর একটি শাখা) আপনি (সব মুসলমানের পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে) বলে দিন ঃ আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত (তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে) এমন বস্তুর আরাধনা করব, যে (আরাধনা করলে) আমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং আরাধনা না করলে) আমাদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না। (অর্থাৎ উপকার ও ক্ষতি করার শক্তিই রাখেন না। আয়াতে মিথ্যা উপাস্য বোঝানো হয়েছে। তাদের কারও তো মূলতই শক্তি নেই এবং যাদের কিছু আছে, তাদেরও সত্তাগতভাবে নেই। অথচ যে উপাস্য হবে, তার মধ্যে কমপক্ষে মিত্র ও শত্রুর উপকার ও ক্ষতি করার শক্তি থাকা উচিত। অতএব আমরা কি এমন বস্তুসমূহের আরাধনা করব?) এবং (নাঊযুবিল্লাহ) আমরা কি (ইসলাম থেকে) পশ্চাৎপদে ফিরে যাব এর পর যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের (সৎ-)

পথপ্রদর্শন করেছেন (অর্থাৎ প্রথমত, শিরক স্বয়ংই মন্দ, এরপর বিশেষত ইসলাম গ্রহণের পর তা আরও নিন্দনীয়। নতুবা আমাদের এমন দৃষ্টান্ত হবে) যেমন কোন ব্যক্তিকে শয়তান কোন বনভূমিতে বিভ্রান্ত করে বিপথগামী করে দিয়েছে এবং সে উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে (এবং) তার কিছু সহচরও ছিল, যারা তাকে ঠিক পথের দিকে (ডেকে ডেকে) আহ্বান করছে যে, (এদিকে) আমাদের কাছে এস (কিন্তু সে চরম হতবুদ্ধিতার কারণে বুঝেও না এবং আসেও না। মোটকথা এ সেই ব্যক্তি যে ঠিক পথে ছিল, কিন্তু জঙ্গলের ভূতের হাতে পতিত হয়ে বিপথগামী হয়ে গেছে এবং তার সঙ্গীরা এখনও তাকে পথে আনার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে আসছে না,—আমাদের অবস্থাও তেমনি হয়ে যাবে। আমরাও ইসলামের পথ থেকে অর্থাৎ পথপ্রদর্শক পয়গম্বর থেকে পৃথক হয়ে যাব এবং পথভ্রষ্টকারীদের কবলে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। এরপরও পথপ্রদর্শক পয়গম্বর শুভেচ্ছাবশত আমাদের ইসলামের প্রতি আহবান করতে থাকবেন, কিন্তু আমরা পথভ্রষ্টতা পরিত্যাগ করব না। অর্থাৎ তোমাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করে আমরা কি নিজেদের জন্য এমন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করব ?) আপনি (তাদের) বলে দিন ঃ (যখন এ দৃষ্টান্ত থেকে জানা গেল যে, পথ থেকে বিপথগামী হওয়া মন্দ এবং এটা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্র (প্রদর্শিত) পথই সুপথ (এবং তা হচ্ছে ইসলাম। অতএব ইসলামকে ত্যাগ করাই বিপথগামী হওয়া। সুতরাং আমরা তা কিরূপে ত্যাগ করতে পারি?) এবং (আপনি বলে দিন যে, আমরা শিরক কিরূপে করতে পারি) আমাদের (তো) আদেশ করা হয়েছে যেন আমরা স্বীয় পালনকর্তার পুরোপুরি আনুগত্যশীল হয়ে যাই (যা ইসলামেই সীমাবদ্ধ) এবং এই (আদেশ করা হয়েছে) যে, নামায প্রতিষ্ঠিত কর (যা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার স্পষ্টতম লক্ষণ) এবং (আদেশ করা হয়েছে যে,) তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহকে) ভয় কর (অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণ করো না। শিরক হচ্ছে সর্ববৃহৎ বিরুদ্ধাচরণ।) এবং তাঁরই (আল্লাহরই) দিকে তোমাদের সবাইকে কিয়ামতের দিন (কবর থেকে বের করে) একত্র করা হবে। (সেখানে মুশরিকদের শিরকের ফল ভোগ করতে হবে) এবং তিনিই (আল্লাহ্ তা'আলাই) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন (এতে প্রধান ফায়দা এই যে, এ দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রমাণ দেওয়া হয়। সুতরাং এটিও একত্ববাদের একটি প্রমাণ।) এবং (পূর্বে تحشرون বলে হাশর অর্থাৎ কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। একেও অসম্ভব মনে করো না। কেননা, আল্লাহ্র শক্তির সামনে তা এত সহজ যে) যেদিন আল্লাহ তা'আলা বলে দেবেন (হাশর) তুই হয়ে যা, ব্যাস তা (হাশর তৎক্ষণাৎ) হয়ে যাবে। তাঁর (এ) কথা ক্রিয়াশীল (ব্যার্থ হয় না) এবং হাশরের দিন যখন শিঙ্গায় (আল্লাহ্র আদেশে দ্বিতীয়বার ফেরেশতার) ফুঁৎকার করা হবে, তখন সকল আধিপত্য (সত্যিকারভাবেও, বাহ্যতও) বিশেষ করে তাঁরই (আল্লাহ তা'আলারই) হবে (এবং তিনি স্বীয় আধিপত্যের বলে একত্ববাদী ও অংশীবাদীদের ফয়সালা করবেন) তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্য বিষয় ও প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত (সুতরাং মুশরিকদের কর্ম এবং অবস্থাও তাঁর জানা আছে) এবং তিনিই প্রজ্ঞাময় (তাই প্রত্যেককেই উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন এবং তিনিই) সর্বজ্ঞ (কাজেই তাঁর কাছ থেকে কোন কিছু গোপন করা সম্ভব নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বাতিলপন্থীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গুনাহ সেই কাজ যারা

করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গুনাহ্। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এর বিবরণ এরূপ ঃ

প্রথম আয়াতে يخوضون শব্দটি خوض থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পানিতে অবতরণ করা ও পানিতে চলা। বাজে ও অনর্থক কাজে প্রবেশ করাকেও خوض বলা হয়।

কোরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণত এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ এবং فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তাই خوض فى الايات-এর অনুবাদ ও স্থলে 'ছিদ্রান্বেষণ' (অর্থাৎ দোষ খোঁজাখুঁজি করা) কিংবা 'কলহ করা'-করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য প্রবেশ করে এবং ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। নবী করীম (সা)-ও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করাও সাধারণ মুসলমানদের শোনানোর জন্য। নতুবা তিনি এর আগে কখনও এরূপ মজলিসে যোগদান করেন নি। কাজেই কোন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না।

অতঃপর মিথ্যাপন্থীদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে; এক. মজলিস ত্যাগ করা, দুই. সেখানে থেকেও অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া-তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা। কিন্তু আয়াতের শেষে যা বলা হয়েছে তাতে প্রথম প্রকারই বোজানো হয়েছে, অর্থাৎ মজলিসে বসা যাবে না সেখান থেকে উঠে যেতে হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ ভুলক্রমে তাদের মজলিসে যোগদান করে ফেল-নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহ্র আয়াত ও রাসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ-উভয় অবস্থাতেই যখনই স্মরণ হয় তখনই মজলিস ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গুনাহ্। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমি তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

ইমাম রাযী তফসীরে কবীর-এ বলেন ঃ এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গুনাহর মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জানমাল কিংবা ইজ্জতের আশংকা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্য পন্থা অবলম্বন করাও জায়েয। উদাহরণত অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক—ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয়-তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ-অর্থাৎ 'যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়।' এখানে সাধারণ মুসলমানের প্রতি সম্বোধন হয়ে থাকলে তাতে কোন আপত্তির বিষয় নেই। কেননা, ভুল করা ও বিস্মৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের মুদ্রাদোষ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

প্রতি যদি সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ্‌র রাসূলও যদি ভুল করেন এবং বিস্মৃত হন, তবে তাঁর শিক্ষার প্রতি আস্থা কিরূপে থাকতে পারে ?

উত্তর এই যে, বিশেষ কোন তাৎপর্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীরাও (আ) ভুল করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে ওহীর মাধ্যমে তাঁদের ভুল সংশোধন করে দেয়া হতো। ফলে তাঁরা ভুলের উপর কায়েম থাকতেন না; তাই পরিণামে তাঁদের শিক্ষা ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মোটকথা, আয়াতের এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোন ভ্রান্ত কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ رفع عن امتى الخطاء وما استكرهوا عليه—অর্থাৎ আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গুনাহ্ এবং যে কাজ অপরে জোর-জবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গুনাহ্ থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে।

ইমাম জাসসাস (র) আহকামুল-কোরআনে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল কিংবা শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিস বর্জন করা মুসলমানদের উচিত। হ্যাঁ, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নেই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাসসাস (র) মাস'আলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গুনাহ; তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরী লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় জালিমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনও যুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোন শর্ত আয়াতে নেই।

কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَاتَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ—অর্থাৎ অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে-কিরাম (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে তবে আমরা মসজিদে-হারামে নামায ও তওয়াফ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা, তারা সর্বদাই সেখানে বসে থাকে (এটি মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা) এবং ছিদ্রান্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۔

—অর্থাৎ যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে-হারামে গেলে দুষ্ট লোকদের কুকর্মের কোন দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেওয়া। সম্ভবত দুষ্টেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে।

তৃতীয় আয়াতেও প্রায় একই বিষয়বস্তুর উপর আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا এখানে ذر শব্দটি وذر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে কোন কিছুকে পরিত্যাগ করা। আয়াতের অর্থ এই ঃ আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে ঃ এক. তাদের জন্য সত্যধর্ম ইসলাম প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। দুই. তারা আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক।

এর পর বলা হয়েছে ঃ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا–অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ! অর্থাৎ তাদের যাবতীয় লক্ষঝক্ষ ও ঔদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং পরকাল বিস্মৃত। পরকাল ও কিয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনও এসব কাণ্ড করত না।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দু'টি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ এক. উল্লিখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধনাত্মকভাবে তাদেরকে কোরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং আল্লাহ তা'আলার আযাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরী।

আয়াতের শেষে আযাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে اَنْ تُبْسَلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া।

কোন ভুল কিংবা কারও প্রতি অত্যাচার করে বসলে সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। প্রথমত স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ্ অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ কার্যকরী হবে না এবং কোন অর্থ-সম্পদ গ্রহন করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা বিনিময় স্বরূপ চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ٠

অর্থাৎ "এরা ঐ লোক, যাদেরকে কুকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্য দেওয়া হবে।" অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ পানি তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে।

এ শেষ আয়াত দ্বারা আরও জানা গেল যে, যারা পরকালের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্য মারাত্মক। তাদের সংসর্গে ওঠা-বসাকারীও পরিণামে তাদের অনুরূপ আযাবে পতিত হবে।

উল্লিখিত আয়াত তিনটির সারমর্ম মুসলমানদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এটি যে কোন মানুষের জন্যই বিষতুল্য। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমত বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়, বরং মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ করতে থাকে। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি প্রথমবার গুনাহ্ করে, তখন তার মানসপটে একটি কাল দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে কাল দাগ যেমন প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি সে-ও গুনাহের কারণে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুনাহ্ করে চলে এবং অতীত গুনাহের জন্য তওবা করে না, তখন একের পর এক কাল দাগ পড়তে থাকে, এমনকি, নূরোজ্জ্বল মানসপট সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এর ফলশ্রুতিতে ভালমন্দের পার্থক্য থাকে না। কুরআন পাকে رَانَ শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ কুকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে। ফলে ভালমন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাই লোপ পেয়েছে।

চিন্তা করলে বোঝা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই মানুষকে এ অবস্থায় পৌঁছায়। نعوذ بالله منهم এ কারণেই অভিভাবকদের কর্তব্য ছেলেপুলেদেরকে এ ধরনের পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

পরবর্তী তিন আয়াতেও শিরকের খণ্ডন এবং একত্ববাদ ও পরকাল সপ্রমাণের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, যা অনুবাদ থেকেই বোঝা যায়।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ
فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا
رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا

رَبِّىْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾

(৭৪) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আ) পিতা আযরকে বললেন ঃ তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর ? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিপতিত। (৭৫) আমি এরূপভাবেই ইবরাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম—যাতে যে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। (৭৬) অনন্তর যখন রাজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বলল ঃ এটি আমার পালনকর্তা। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন বলল ঃ আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না। (৭৭) অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল ঃ এটি আমার পালনকর্তা। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল ঃ যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৭৮) অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল, বলল ঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। (৭৯) আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই। (৮০) তাঁর সাথে তাঁর সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে বলল ঃ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ ; অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না– তবে আমার পালনকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তা প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি

চিন্তা কর না ? (৮১) যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় কর, অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। অতএব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর সে সময়টিও স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা আযরকে বললেন ঃ তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছ ? নিশ্চয় আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে (যারা এ বিশ্বাসে তোমার সাথে শরীক) প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখছি। [তারকাদের সম্পর্কে কথোপকথন পরে বর্ণিত হবে। মাঝখানে পূর্বাপর সম্বন্ধ থাকার কারণে ইবরাহীম (আ)-এর সুস্থ চিন্তা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার বিষয় ব্যক্ত করা হচ্ছে] এবং আমি এরূপ (পরিপূর্ণ) ভাবেই ইবরাহীম (আ)-কে নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তুসমূহ (তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে) প্রদর্শন করিয়েছি যাতে সে (স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে) জ্ঞানী হয়ে যায় এবং যাতে (তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির ফলে) নিশ্চিত বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (অতঃপর বিতর্কের পরিশিষ্টে তারকাদের সম্পর্কে কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ইতিপূর্বে প্রতিমাদের সম্পর্কে কথোপকথন শেষ হয়েছে–) অনন্তর (সেইদিন কিংবা অন্য কোন দিন) যখন রজনীর অন্ধকার তাঁর উপর (এমনিভাবে অন্য সবার উপরও) সমাচ্ছন্ন হলো, তখন সে একটি তারকা নিরীক্ষণ করল (যে, ঝিকিমিকি করছে) সে (স্বজাতিকে সম্বোধন করে) বলল ঃ (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার (ও তোমাদের) পালনকর্তা (এবং আমার অবস্থার পরিচালক। খুব ভাল ; অল্পক্ষণের মধ্যেই আসল স্বরূপ জানা যাবে। সেমতে অল্পক্ষণ পর তারকাটি দিগন্তে অস্তমিত হলো।) অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে বলল ঃ আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না। (ভালবাসা পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করার অপরিহার্য পরিণতি। সুতরাং সারকথা এই যে, আমি এটাকে পালনকর্তা মনে করি না।) অতঃপর (সে রাত্রিতেই কিংবা অন্য কোন রাত্রিতে) যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে (উদিত হতে) দেখল, তখন (পূর্বের ন্যায়ই) বলল ঃ এটি আমার (ও তোমাদের) পালনকর্তা (এবং অবস্থার উত্তম পরিচালক, এবার অল্পক্ষণের মধ্যে এর দশাও দেখে নাও। সেমতে চন্দ্রও অস্তমিত হয়ে গেল।) অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে বলল ঃ যদি আমার (সত্যিকার) পালনকর্তা আমাকে পথপ্রদর্শন না করতে থাকেন, (যেমন এ পর্যন্ত করে এসেছেন) তবে আমিও (তোমাদের ন্যায়) বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর (অর্থাৎ চাঁদের ঘটনা তারকার ঘটনার রাত্রিতে হলে কোন এক রাত্রির প্রত্যূষে, আর যদি চাঁদের ঘটনা তারকার ঘটনার রাত্রিতে না হয়, তবে চাঁদের ঘটনার রাত্রির প্রত্যূষে কিংবা এছাড়া অন্য কোন রাত্রির প্রত্যূষে) যখন সূর্যকে (খুব চাকচিক্য সহকারে) ঝলমল করতে করতে উদিত হতে দেখল, তখন (প্রথমোক্ত দু'বারের মতই আবার) বলল ঃ (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার (ও তোমাদের) প্রভু (এবং অবস্থার পরিচালক এবং এটি তো সবগুলোর উল্লিখিত তারকাসমূহের) মধ্যে বৃহত্তর। (এতেই আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এহেন পালনকর্তাও যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে ছোটদের তো কথাই নেই। মোটকথা, দিনের শেষে সূর্যও মুখ লুকাল।) অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে বলল ঃ হে

আমার সম্প্রদায় ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত (এবং তৎপ্রতি ঘৃণা পোষণ ! অর্থাৎ বিমুক্ততা প্রকাশ করছি ; বিশ্বাসগতভাবে তো সদা সর্বদা মুক্তই ছিলাম।) আমি (সব তরীকা থেকে) একমুখী হয়ে স্বীয় (বাহ্যিক ও আন্তরিক) আনন ঐ সত্তার প্রতি (আকৃষ্ট করে তোমাদের কাছে প্রকাশ) করছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি (তোমাদের ন্যায়) অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত নই। (বিশ্বাস, উক্তি ও কর্ম কোন দিক দিয়েই না)। অতঃপর তার সাথে তার সম্প্রদায় [অনর্থক) বিতর্ক করতে লাগল (তারা বলতে লাগল ঃ এটা প্রাচীন প্রথা وَجَدْنَا اٰبَاۤءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ অর্থাৎ বাপদাদা চৌদ্দপুরুষকে এদের আরাধনা করতে দেখেছি। মিথ্যা উপাস্যদেরকে অস্বীকার করার কারণে তারা তাঁকে একথা বলে ভীতিপ্রদর্শনও করল যে, এরা তোমাকে বিপদে জড়িত করে দিতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জওয়াব..... وَلَا اَخَافُ দ্বারা একথা বোঝা যায়।] সে (প্রথম কথার উত্তরে) বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্ববাদ) সম্পর্কে আমার সাথে (মিথ্যা) বিতর্ক করছ ? অথচ তিনি আমাকে (বিশুদ্ধ প্রমাণের মাধ্যমে) পথপ্রদর্শন করেছেন যা আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত করেছি। (শুধু প্রাচীন প্রথা হওয়াই এ প্রমাণের জওয়াব হতে পারে না। সুতরাং এ কথা বলে দাবি সপ্রমাণ করা তোমাদের পক্ষে ফলদায়ক নয় এবং আমার পক্ষে ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়) আর (দ্বিতীয় কথার উত্তরে বললেন ঃ) তোমরা যেসব বিষয়কে (আরাধনার যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অংশীদার স্থির করে রেখেছ, আমি তাদেরকে ভয় করি না (যে তারা আমাকে কোন কষ্ট দিতে পারে। কেননা তাদের মধ্যে 'কুদরত' তথা শক্তিই নেই। কারও মধ্যে থাকলেও শক্তির স্বাতন্ত্র্য নেই) কিন্তু আমার পালনকর্তা যদি কিছু ইচ্ছা করেন, (তবে তা ভিন্ন কথা– তা হয়ে যাবে, কিন্তু এতে মিথ্যা উপাস্যদের শক্তি কিভাবে প্রমাণিত হয় এবং তাদেরকে ভয় করারই বা কি প্রয়োজন পড়ে ? এবং) আমার পালনকর্তা (যেমন সর্বশক্তিমান ঃ উপরোক্ত বিষয়াদি থেকে তা জানা গেছে, তেমনি তিনি) প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞানের (অর্থাৎ জ্ঞানসীমার) মধ্যে বেষ্টন (ও) করে আছেন। (মোটকথা শক্তি ও জ্ঞান তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তোমাদের উপাস্যদের শক্তিও নেই, জ্ঞানও নেই) তোমরা (শোন এবং) তবুও কি চিন্তা কর না ? (এবং আমার ভয় না করার কারণ যেমন এই যে, তোমাদের উপাস্যরা জ্ঞান ও শক্তির ব্যাপারে শূন্যগর্ভ, তেমনি এ কারণও তো আছে যে, আমি কোন ভয়ের কাজ করিওনি। এমতাবস্থায়) আমি এগুলোকে কেন ভয় করব, যাদেরকে তোমারা (আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আরাধনার যোগ্য হওয়া এবং পালকত্বের বিশ্বাসে) অংশী স্থির করেছ, অথচ (তোমাদের ভয় করা উচিত, দু কারণে ঃ এক . তোমরা ভয়ের কাজ অর্থাৎ শিরক করেছ, যা শাস্তিযোগ্য। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা যে সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান, তা জানা হয়ে গেছে। কিন্তু) তোমরা এ বিষয়ে (অর্থাৎ এ বিষয়ের শাস্তিকে) ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করেছ, যাদের (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি কোন (শব্দগত কিংবা অর্থগত) প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। উদ্দেশ্য এই যে, ভয় করা উচিত তোমাদের ; কিন্তু উল্টো আমাকে ভয় দেখাচ্ছ–) অতএব (এ বিবৃতির পরে চিন্তা করে বল, উল্লিখিত উভয় দলের মধ্যে) শান্তি লাভের (অর্থাৎ ভয়-ভীতিতে পতিত না হওয়ার) অধিক যোগ্য কে ? (এবং ভয়ও তা, যা বাস্তবে ধর্তব্য অর্থাৎ পরকালের) যদি তোমরা (কিছু) জ্ঞান রাখ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে মুশরিকদের সম্বোধন এবং প্রতিমা পূজা ছেড়ে আল্লাহ্র আরাধনার আহ্বান বর্ণিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্বানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গিতে স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন সমগ্র আরবদের পিতামহ। তাই গোটা আরব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একটি তর্কযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমা ও তারকা-পূজার বিপক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা আযরকে বললেন ঃ তুমি স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম 'আযর'–এ কথাই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তার নাম 'তারেখ' বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে 'আযর' তার উপাধি। ইমাম রাযী (র) এবং কিছুসংখ্যক পূর্ববর্তী আলিম বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম 'তারেখ' এবং চাচার নাম 'আযর' ছিল। তাঁর চাচা আযর নমরূদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর মুশরিক হয়ে যান। চাচাকে পিতা বলা আরবী বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি। এ রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা বলা হয়েছে। যারকানী (র) 'মাওয়াহিব" গ্রন্থের টীকায় এর পক্ষে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহ্বান ঃ আযর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা হোন কিংবা চাচা– সর্বাবস্থায় বংশগত দিক দিয়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। সেমতে তিনি সর্বপ্রথম সাফা পর্বতে আরোহণপূর্বক সত্য প্রচারের জন্য পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করেন।

তফসীরে বাহরে-মুহীত-এ বলা হয়েছে ঃ এতে বোঝা যায় যে, পরিবারের কোন সম্মানিত ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথে থাকে, তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহ্বান করা সম্মানের পরিপন্থী নয়, বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবি তা-ই। আরও জানা গেল যে, সত্য প্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকট-আত্মীয়দের থেকে শুরু করা পয়গম্বরদের সুন্নত।

দ্বিজাতি তত্ত্ব ঃ এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে বললেন ঃ তোমার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত রয়েছে। মুশরিক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র পথে যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশগত জাতীয়তা যদি মুসলিম জাতীয়তার পরিপন্থী হয়, তবে মুসলিম জাতীয়তার বিপরীতে সব জাতীয়তাই বর্জনীয়।

هزار خويش كه بيگانه از خدا باشد
فدائے يك تن بيگانه كا شنا باشد

কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা তাঁর পদাংক অনুসরণ করে। বলা হয়েছে ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءَاؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য। তাঁরা স্বীয় বংশগত ও দেশগত স্বজনদের পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শত্রুতার প্রাচীর ততদিন খাড়া থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে সমবেত না হও।

বল বাহুল্য—এ দ্বিজাতি তত্ত্বই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করেন। উম্মতে মুহাম্মদী ও অন্য সব উম্মত নির্দেশানুযায়ী এ পন্থাই অবলম্বন করেছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ জাতীয়তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদায় হজ্জের সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কোন্ জাতীয় লোক ? উত্তর হলো ঃ نَحْنُ قَوْمٌ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ আমরা মুসলমান জাতি। (বুখারী) এতে ঐ সত্যিকার ও কালজয়ী জাতীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। হযরত ইবরাহীম (আ) এখানে পিতাকে সম্বোধন করার সময় স্বজনদের পিতার দিকে সম্বন্ধ করে স্বীয় অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন ঃ يَا قَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ হে আমার কওম, আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। এখানে এই ইঙ্গিতই করা হয়েছে, যদিও বংশ ও দেশ হিসাবে তোমরা আমার জাতি, কিন্তু তোমাদের মুশরিকসুলভ ক্রিয়াকর্ম আমাকে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য করেছে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্বজনরা ও তাঁর পিতা দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিমা পূজাও করত এবং নক্ষত্র পূজাও। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) এ দু'টি প্রশ্নেই পিতা ও স্বজাতির সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজাও পথভ্রষ্টতা। পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ আরাধনার যোগ্য নয়। মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ মর্যাদা ও সুউচ্চ জ্ঞান-গরিমা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ .

অর্থাৎ আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তুসমূহ প্রদর্শন করেছি, যাতে সে সব বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয় এবং তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলশ্রুতিই পরবর্তী আয়াতসমূহে একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বর্ণিত হয়েছে।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا - قَالَ هٰذَا رَبِّىْ অর্থাৎ এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হলো এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন ঃ এ নক্ষত্র আমার পালনকর্তা। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে। কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে হযরত ইবরাহীম (আ) জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন ঃ لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ — اٰفِلِيْنَ শব্দ افول থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অস্ত যাওয়া।

উদ্দেশ্য এই যে, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালবাসি না। যে বস্তু আল্লাহ্ কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হওয়া উচিত। মাওলানা রুমী নিম্নলিখিত কবিতায় এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

خلیل آسا در ملك یقین زن
نوائے لا احب الافلین زن

এরপর অন্য কোন রাত্রিতে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় স্বজনদেরকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন ঃ (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন, যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন না করতে থাকতেন তবে আমিও তোমাদের মত পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও আরাধনার যোগ্য নয়।

এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোন সত্তা, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথ প্রদর্শন করা হয়।

এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেন ঃ (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা এবং বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতিসত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন ঃ

يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ—অর্থাৎ হে আমার জাতি, আমি তোমাদের এসব মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করেছ।

অতঃপর এ স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং সেই সত্তা আমাদের

সবার পালনকর্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে 'আল্লাহ্য়ে ওয়াহদাহু লা-শরীকের' দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আ) পয়গম্বরসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথমবারেই তাদের নক্ষত্র-পূজাকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যা দেন নি, বরং এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলে। তবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রথমবারেই কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে দেন। কেননা, মূর্তিপূজা যে একটি অযৌক্তিক পথভ্রষ্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্র-পূজার ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না।

নক্ষত্র-পূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণের সারমর্ম এই যে, যে বস্তু পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা নিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য শক্তির অধীন, সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-প্রকৃতিতে স্বাধীন নয়—অন্য কারও নির্দেশ অনুসরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) এসব অবস্থার মধ্য থেকে শুধু নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্য অস্তমিত হওয়াকে এখানে উল্লেখ করেছেন। কেননা, এগুলোর অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলির এক প্রকার পতনরূপে গণ্য হয়। যে যুক্তি-প্রমাণ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গম্বররা সাধারণত সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন করেন। তাঁরা দার্শনিকসুলভ তাত্ত্বিক আলোচনার পেছনে বেশি পড়েন না ; বরং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্বোধন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্য অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উদয় এবং তৎপরবর্তী অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেত।

প্রচারকদের জন্য কয়েকটি নির্দেশ ঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ বিতর্ক-পদ্ধতি থেকে ওলামা ও ইসলাম প্রচারকগণের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অর্জিত হয়। প্রথম এই যে, প্রচার ও সংশোধনের কাজে সবক্ষেত্রে কঠোরতা সমীচীন নয় এবং সবক্ষেত্রে নম্রতাও সমীচীন নয়। বরং প্রত্যেকটিরই একটা বিশেষ ক্ষেত্র ও সীমা রয়েছে। প্রতিমা-পূজার ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ) কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। কেননা, এর ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্তু নক্ষত্র-পূজার ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন নি, বরং বিশেষ দূরদর্শিতার সাথে আসল স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। কেননা, নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষমতাহীনতা স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাদের ক্ষমতাহীনতার মত সুস্পষ্ট নয়। এতে বোঝা গেল যে, জনসাধারণ যদি এমন কোন ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়, যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সাধারণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নয়, তবে আলিম ও প্রচারকের উচিত, কঠোরতার পরিবর্তে তাদের সন্দেহ ভঞ্জনের পন্থা অবলম্বন করা।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, সত্য প্রকাশের বেলায় এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) জাতিকে একথা বলেন নি যে, তোমরা এরূপ কর ; বরং নিজের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এসব

উদয় ও অস্তের আবর্তে নিপতিত বস্তুকে উপাস্য স্থির করতে পারি না। তাই আমি স্বীয় আনন এমন সত্তার দিকে ফিরিয়েছি, যিনি এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা। উদ্দেশ্য তাই ছিল যে, তোমাদেরও এরূপ করা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট সম্বোধনে বিরত থাকেন– যাতে তারা জেদের বশবর্তী না হয়ে পড়ে। এতে বোঝা গেল যে, যেভাবে ইচ্ছা, সত্য কথা বলে দেওয়াই সংস্কারক ও প্রচারকরে দায়িত্ব নয়, বরং কার্যকরী ভঙ্গীতে বলা জরুরী।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ
مَنْ نَشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ
كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ
وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ
وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ آبَائِهِمْ
وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾
ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا
لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا
لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

(৮২) যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। (৮৩) এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (৮৪) আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং

ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহ্‌কে পথ-প্রদর্শন করেছি– তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাঊদকে, সোলায়মানকে, আইউবকে, ইউসূফকে, মূসাকে ও হারূনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৮৫) আরও যাকারিয়াকে, ইয়াহ্‌ইয়াকে, ঈসাকে এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৬) এবং ইসমাঈলকে, ইয়াসা'কে, ইউনুসকে, লূতকে–প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। (৮৭) আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভাইদেরকে ; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। (৮৮) এটি আল্লাহ্‌র হিদায়ত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ পথে চালান। যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত। (৮৯) তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও নবুয়ত দান করেছি। অতএব যদি এরা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্য এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (আল্লাহ্‌র প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই (কিয়ামতে) শান্তি এবং তারাই (দুনিয়াতে) সুপথগামী। (এরা হচ্ছে একমাত্র একত্ববাদীর দল–অংশীবাদীরা নয়। অংশীবাদীরা কোন না কোন সত্তাকে উপাস্য হিসাবে মান্য করে, এদিক বিবেচনায় যদিও আভিধানিক অর্থে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু শিরকও করে। ফলে তাদের বিশ্বাস শরীয়তসম্মত নয়। একত্ববাদীরাই যখন শান্তি লাভের যোগ্য, তখন স্বয়ং তোমাদের ভয় করা উচিত। অনন্তর আমাকে তাদের সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা অনুচিত। কেননা, তোমাদের উপাস্যরা ভয়ের যোগ্য নয় ; আমিও কোন ভয়ের কাজ করিনি এবং দুনিয়ার ভয় ধর্তব্যও নয়। তোমাদের অবস্থা এ তিন দিক থেকেই ভীতিজনক) এবং এটি [অর্থাৎ এ যুক্তি যা ইবরাহীম (আ) একত্ববাদ সপ্রমাণ করার জন্য কায়েম করেছিলেন] আমার (প্রদত্ত) যুক্তি ছিল, যা আমি ইবরাহীম (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। [যখন আমার প্রদত্ত ছিল তখন অবশ্যই উচ্চস্তরের ছিল। ইবরাহীম (আ)-এরই কি বিশেষত্ব] আমি (তো) যাকে ইচ্ছা, (জ্ঞানগত ও কর্মগত) মর্যাদায় সমুন্নত করি। (সেমতে সব পয়গম্বরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (অর্থাৎ প্রত্যেকের অবস্থা ও যোগ্যতা জানেন এবং প্রত্যেককেই তার উপযুক্ত পরাকাষ্ঠা দান করেন) এবং [আমি ইবরাহীম (আ)-কে যেমন জ্ঞান ও কর্মের ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা দান করেছি তেমনি আপেক্ষিক পরাকাষ্ঠাও প্রদান করেছি ; অর্থাৎ তাঁর ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন পুরুষদের মধ্যে অনেককেই পরাকাষ্ঠা দান করেছি। সেমতে] আমি তাঁকে (এক পুত্র) ইসহাক দান করেছি এবং (এক পৌত্র) ইয়াকুব দান করেছি। (এতে অন্য সন্তান নেই বোঝা যায় না এবং উভয় জনের মধ্যে) প্রত্যেককেই আমি (সৎ) পথ প্রদর্শন করেছি এবং ইবরাহীমের পূর্বে আমি নূহ্ (আ)-কে [যার সম্পর্কে খ্যাত আছে যে, তিনি ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বপুরুষ এবং তাঁর পূর্বপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব অধঃস্তন পুরুষের মধ্যেও ক্রিয়াশীল থাকে, সৎ] পথ প্রদর্শন করেছি এবং তাঁর [ইবরাহীম

(আ)-এর আভিধানিক, প্রচলিত কিংবা শরীয়তগত] সন্তানদের মধ্যে (শেষ পর্যন্ত যারা উল্লিখিত হয়েছেন সবাইকে সৎ পথ প্রদর্শন করেছি অর্থাৎ) দাউদ (আ)-কে এবং (তাঁর পুত্র) সোলায়মান (আ)-কে এবং আইউব (আ)-কে এবং ইউসুফ (আ)-কে এবং মূসা (আ)-কে এবং হারুন (আ)-কে (সৎপথ প্রদর্শন করেছি,) এবং (যখন তারা সৎপথে চলেছেন, তখন আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদানও দিয়েছি-যেমন সওয়াব ও অধিক নৈকট্য। আমি সৎকাজের জন্য যেমন তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছি,) তেমনিভাবে (আমার চিরন্তন রীতি এই যে,) আমি সৎকর্মীদেরকে (উপযুক্ত) প্রতিদান দিয়ে থাকি এবং আরও (আমি সৎপথ প্রদর্শন করেছি,) যাকারিয়া (আ)-কে এবং (তাঁর পুত্র) ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-কে (এবং এরা) সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আরও (আমি সৎপথ প্রদর্শন করেছি) ইসমাঈল (আ)-কে এবং ইয়াসা (আ)-কে এবং ইউনুস (আ)-কে এবং লূত (আ)-কে এবং (তাদের মধ্যে) প্রত্যেককেই (তৎকালীন) সারা বিশ্বের উপর (নবুয়ত দ্বারা) গৌরবান্বিত করেছি এবং আরও তাদের (উল্লিখিতদের) কিছুসংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে (সৎপথ প্রদর্শন করেছি) এবং আমি তাদের (সকল)-কে সরল পথ (অর্থাৎ সত্য ধর্ম) প্রদর্শন করেছি, (যে ধর্ম তাদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছিল,) আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে যা) সুপথ (হয়ে থাকে) তা এই (ধর্ম)। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ পথ প্রদর্শন (অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার ব্যবস্থা) করেন (বর্তমানে যারা আছে তাদেরকেও এই অর্থে এ পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যে পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ; গন্তব্যস্থলে পৌঁছা না পৌঁছা তাদের কাজ; কিন্তু তাদের কেউ কেউ এ পথ পরিত্যাগ করে শিরক অবলম্বন করেছে) এবং (শিরক এতদূর ঘৃণিত যে, যারা পয়গম্বর নয়, তাদের তো কথাই নেই) যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তারা (উল্লিখিত পয়গম্বররা) ও (নাউযুবিল্লাহ্) শিরক করতেন, তবে তারা যা কিছু (সৎ) কর্ম করতেন, তাদের জন্য সব ব্যর্থ হয়ে যেত। (পরের আয়াতে নবুয়তের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে,) এরা (যারা উল্লিখিত হয়েছেন) এমন ছিলেন যে, আমি তাদের (সমষ্টি)-কে (ঐশী) গ্রন্থ, হিকমত এবং নবুয়ত দান করেছিলাম। (কাজেই নবুয়ত কোন অভিনব বিষয় নয় যে, মক্কার কাফিররা আপনাকে অস্বীকার করবে। কেননা, এর অনেক নযীর আছে। অতএব যদি (নযীর থাকা সত্ত্বেও) তারা (আপনার) নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে (আপনি দুঃখিত হবেন না, কেননা) আমি তার (অর্থাৎ স্বীকার করার) জন্য এমন সম্প্রদায় স্থির করেছি (অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার) যারা এতে অবিশ্বাস করবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্বীয় পিতা ও নমরূদের সম্প্রদায়ের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এতে প্রতিমা পূজা ও নক্ষত্র পূজার বিরুদ্ধে নিশ্চিত সাক্ষ্য -প্রমাণ বর্ণনা করার পর তিনি স্বজাতিকে বলেছিলেন ঃ তোমরা আমাকে ভীতি প্রদর্শন করছ যে, প্রতিমাদেরকে অস্বীকার করলে তারা আমাকে ধ্বংস করে দেবে। অথচ প্রতিমাদের ভয় করা উচিত নয়। কেননা, তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুকে বরং সৃষ্ট বস্তুর হাতে তৈরি প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে কঠোর অপরাধ করেছ। এছাড়া আল্লাহ্

তা'আলা যে সর্বজ্ঞ ও শক্তিমান, তাও কোন বুদ্ধিমানের অজানা নয়। এমতাবস্থায় তোমরাই বল, শাস্তি লাভের যোগ্য কারা এবং কাদের ভয় করা উচিত ?

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর বিশ্বাসের সাথে কোনরূপ যুলুমকে মিশ্রিত না করে। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কিরাম চমকে উঠেন এবং আরয করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোন যুলুম করেনি ? এ আয়াতে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য বিশ্বাসের সাথে যুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কি ? মহানবী (সা) উত্তরে বললেন ঃ তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'যুলুম' বলে শিরককে বোঝানো হয়েছে। দেখ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (নিশ্চয়ই শিরক বিরাট যুলুম)। কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাপ্ত।

মোটকথা এই যে, যারা প্রতিমা, প্রস্তর, বৃক্ষ, নক্ষত্র, সমুদ্র ইত্যাদির পূজা করে তারা নির্বুদ্ধিতাবশত এগুলোকে ক্ষমতাশালী মনে করে এবং ধারণা করে, এরা হয়তো কোন ক্ষতি করে ফেলবে-এ কারণে এদের আরাধনা ত্যাগ করতে ভয় পায়। হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের নিগূঢ় কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভালমন্দ সবকিছু করার ব্যাপার সর্বশক্তিমান। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে বিপদ হবে- অথচ এ ভয় তো তোমরা কর না। পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞানও নেই, শক্তিও নেই-তাদের পক্ষ থেকে বিপদের ভয় কর-এটা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি ? একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা উচিত। যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোন বিপদাশংকা নেই।

এ আয়াতে وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ বলা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী যুলুমের অর্থ শিরক- সাধারণ গুনাহ্ নয়। কিন্তু ظلم শব্দটি نكره ব্যবহার করায় আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ যাবতীয় শিরকই এর অন্তর্ভুক্ত। يلبسوا শব্দটি لبس থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোন প্রকার শিরক মিশ্রিত করে ; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁর যাবতীয় গুণসহ স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্যকে কোন কোন ঐশী গুণের বাহক মনে করে, সে ঈমান থেকে খারিজ।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরিক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শিরক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরিক, যে কোন প্রতিমার পূজাপাঠ করে না এবং ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করে, কিন্তু কোন ফেরেশতা কিংবা রাসূল কিংবা ওলীকে আল্লাহ্র কোন কোন বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে। সুতহরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা ওলীদেরকে এবং তাদের মাযারকে 'মনোবাঞ্ছা পূরণকারী' বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যত মনে করে যে, আল্লাহ্র ক্ষমতা

যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে, আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে ঃ نعوذ بالله منه

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ স্বজাতির বিরুদ্ধে বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আ) যে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেছেন এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দিয়েছেন, এটা ছিল আমারই অবদান। আমিই তাঁকে বিশুদ্ধ মতবাদ দান করেছি এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বলে দিয়েছি। কেউ যেন স্বীকার, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বাগ্মিতার জন্য গর্বিত না হয়। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কারও নৌকা তীরে ভিড়ে না। নিছক মানববুদ্ধিই সত্যোপলব্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। যুগে যুগেই দেখা যাচ্ছে যে, বড় বড় সুনিপুণ দার্শনিক পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং অনেক অশিক্ষিত মূর্খ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও মতবাদের অনুসারী হয়। মওলানা রুমী (র) চমৎকার বলেছেন ঃ

بے عنایاتِ حق وخاصانِ حق

گر ملك باشد سیه هستش ورق

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ অর্থাৎ আমি যার ইচ্ছা মর্যাদা সমুন্নত করে দিই। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) সারা বিশ্বে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে যে সম্মানের আসন লাভ করেছেন, ইহুদী, খ্রিস্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ নির্বিশেষে সবাই যে তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, তাও আমারই দান। এতে কারও স্বকীয়তার প্রভাব নেই।

এরপর ছয়টি আয়াতে সতের জন পয়গম্বরের তালিকা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বপুরুষ, অধিকাংশই তার সন্তান-সন্ততি এবং কেউ কেউ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র। এসব আয়াতে একদিকে তাঁদের সুপথ প্রাপ্ত হওয়া, পুণ্যবান হওয়া এবং সরল পথে থাকার কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলাই ধর্মের কাজের জন্য মনোনীত করেছেন। অপরদিকে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র পথে স্বীয় পিতা, স্বদেশ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালের উচ্চ মর্তবা ও চিরস্থায়ী শান্তির পূর্বে দুনিয়াতেও তাঁকে উত্তম স্বজন এবং উত্তম দেশ দান করেছেন। কেননা, তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, সবাই তাঁরই সন্তান-সন্ততি ছিলেন। হযরত ইসহাক (আ) থেকে যে শাখা বের হয়, তাতে বনী ইসরাঈলের সব পয়গম্বর রয়েছেন এবং দ্বিতীয় যে শাখা হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে বের হয়, তাতে সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন, নবিয়্যুল আম্বিয়া, খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা সবাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। এতে আরও জানা গেল যে সম্মান, আপমান এবং মুক্তি ও শাস্তি যদিও প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজেরই ক্রিয়া-কর্মের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন নবী বা ওলী থাকা সন্তান-সন্ততির মধ্যে কোন আলিম এবং পুণ্যবান থাকাও একটি বড় নিয়ামত। এর দ্বারাও মানুষের উপকার হয়।

আয়াতে উল্লিখিত সতের জন পয়গম্বরের তালিকায় একজন অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই তার সন্তান-সন্ততি। বলা হয়েছে ঃ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ

....دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করার কারণে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কন্যা পক্ষের সন্তান অর্থাৎ পৌত্র নন-দৌহিত্র। অতএব, তাঁকে বংশধর কিরূপে বলা যায় ? অধিকাংশ আলিম ও ফিকহ্‌বিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, ذريت শব্দটি পৌত্র ও দৌহিত্র সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা বলেন যে, হযরত হোসাইন (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধরভুক্ত।

দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লূত (আ) সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি সন্তানভুক্ত নন, বরং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। এর উত্তরও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ পরিভাষায় পিতৃব্যকে পিতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্র বলা সুবিদিত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র অবদানসমূহ বর্ণনা করে এ আইন ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন। অপর দিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা। সাথে অন্যকে আরাধনায় শরীক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব তোমরা যদি মুহাম্মদ (সা)-এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত।

অষ্টম আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে মহানবী (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَافِرِيْنَ.

অর্থাৎ আপনার কিছুসংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা আপনার নবুয়ত স্বীকার করার জন্য আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি। তারা অবিশ্বাস করবে না। মহানবী (সা)-এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এ 'বিরাট জাতির' অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত তাঁদের সবার জন্য গর্বের সামগ্রী। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসার স্থলে তাঁদের উল্লেখ করেছেন। اللّٰهم اجعلنا منهم واحشرنا فى زمرتهم

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ
أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ؕ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَمَا قَدَرُوا
اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ إِذْ قَالُوْا مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ

أَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ
قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ
اٰبَآؤُكُمْ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩١﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ
مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ
وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ
شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ
غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ
تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا
خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ
فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۗ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾ ع

(৯০) এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশ মাত্র। (৯১) তারা আল্লাহ্কে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি যখন তারা বলল ঃ আল্লাহ্ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেন নি। আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ ঐ গ্রন্থকে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল ? যা জ্যোতি বিশেষ এবং মানবমণ্ডলীর জন্য হিদায়েত স্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্ত পত্রে রেখে লোকদের জন্য প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানত না। আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক

বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন। (৯২) এ কুরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি ; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা স্বীয় নামায সংরক্ষণ করে। (৯৩) ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে ঃ আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবি করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে বের কর স্বীয় আত্মা। অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ তোমরা আল্লাহ্‌র উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে। (৯৪) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ যেরূপ আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবি ছিল যে তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবি উধাও হয়ে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি যে দুঃখিত না হওয়ার এবং ধৈর্য ধারণ করার কথা বলি, এর কারণ এই যে, সব পয়গম্বর তাই করেছেন। সেমতে উল্লিখিত) এরা এমন ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা (এ ধৈর্যের) পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব (এ ব্যাপারে) আপনিও তাদের (ধৈর্যের) পথ অনুসরণ করুন। (যেহেতু আপনাকেও এ বিষয়বস্তুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেননা, তাদের সাথে আপনার কোন লাভ-লোকসান জড়িত নেই যে, আপনি দুঃখিত ও অধৈর্য হবেন, তাই এ বিষয়বস্তু প্রকাশ করার জন্য প্রচার কার্যের সময়) আপনি (এ কথাও) বলে দিন যে, আমি তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ কোরআন প্রচারের) জন্য কোন বিনিময় চাই না (যা পেলে লাভ এবং না পেলে ক্ষতি হয়– আমি নিঃস্বার্থ উপদেশ দিই)। এ (কোরআন) তো শুধু সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশ (যা পালন করলে তোমাদের উপকার এবং পালন না করলে তোমাদেরই ক্ষতি) এবং তারা (অবিশ্বাসকারীরা) আল্লাহ্ তা'আলাকে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত করেনি, যখন তারা (গাল ভরে) বলে দিল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু (অর্থাৎ কোন গ্রন্থ) এখনও অবতীর্ণ করেন নি। (এরূপ উক্তি করা অকৃতজ্ঞতা। কেননা এ থেকে নবুয়তের প্রশ্নটি অস্বীকার করা জরুরী হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি নবুয়ত অস্বীকার করে সে আল্লাহ্‌কে মিথ্যারোপ করে, অথচ আল্লাহ্‌কে সত্য জ্ঞান করা ফরয। সুতরাং উপরোক্ত উক্তি দ্বারা ফরয কৃতজ্ঞতায় ত্রুটি করা হয়। এ হচ্ছে তথ্য ভিত্তিক উত্তর। পরবর্তী বাক্যে জব্দ করার জন্য বলা হচ্ছে–) আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ (বল তো) ঐ গ্রন্থ কে অবতীর্ণ করেছে, যা মূসা (আ) আনয়ন করেছিলেন (অর্থাৎ তওরাত, যাকে তোমরাও মান্য কর) যার অবস্থা এই যে, তা (স্বয়ং) জ্যোতি (সদৃশ সুস্পষ্ট) এবং (যাদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য এসেছিল, সেই) মানব-মণ্ডলীর জন্য (শরীয়ত বর্ণনা করার কারণে) উপদেশস্বরূপ–যাকে তোমরা (হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার

জন্য) বিক্ষিপ্ত পত্রে রেখে দিয়েছ, যা (অর্থাৎ যতটুকু পত্র ইচ্ছা) প্রকাশ করছ (অর্থাৎ যাতে তোমাদের স্বার্থবিরোধী কোন কথা নেই) এবং বহুলাংশকে (অর্থাৎ যেসব পত্রে স্বার্থবিরোধী কথা লিপিবদ্ধ আছে সেগুলোকে) গোপন করছ ? (এ গ্রন্থের মাধ্যমে) তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষাদান করা হয়েছে, যা (গ্রন্থ প্রাপ্তির পূর্বে) তোমরা (অর্থাৎ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যেসব বনী ইসরাইল বিদ্যমান ছিল) জানতে না এবং তোমাদের (নিকটবর্তী) পূর্ব পুরুষরা জানত না। [উদ্দেশ্য এই যে, যে তওরাতকে প্রথমত তোমরা মান্য কর, দ্বিতীয়ত জ্যোতি ও হিদায়েত হওয়ার কারণে যা মান্য করার যোগ্য, তৃতীয়ত যা সর্বদা তোমাদের ব্যবহারে আছে, যদিও ব্যবহারটি লজ্জাজনক–কিন্তু এর কারণে অস্বীকার করার অবকাশ তো নেই এবং চতুর্থত তোমাদের পক্ষে তা খুব বড় নিয়ামত এবং অনুগ্রহের সামগ্রী, যার দৌলতে তোমরা আলিম হয়েছ, এ দিক দিয়েও একে অস্বীকার করার জো নেই। এখন বল, এ গ্রন্থটি কে অবতীর্ণ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর সুনির্দিষ্ট। কারণ, তারাও অন্য কোন উত্তর দিত না, তাই স্বয়ং মহানবী (সা)-কে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে] আপনি (তাই) বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা (উল্লিখিত গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছেন। (এতে তাদের ব্যাপক দাবি বাতিল হয়ে গেল।) অতঃপর (এ উত্তর শুনিয়ে) তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন। (অর্থাৎ আপনার কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে গেছে। –না মানলে আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি নিজেই বুঝে নেব।) এবং (তাওরাত যেমন আমার অবতীর্ণ গ্রন্থ, তেমনিভাবে) এ (কোরআন)-ও (যাকে অসত্য প্রমাণ করা ইহুদীদের উপরোক্ত উক্তির আসল উদ্দেশ্য–) এমন গ্রন্থ, যাকে আমি (আপনার প্রতি) অবতীর্ণ করেছি, যা (কল্যাণ ও) বরকত বিশিষ্ট। (সেমতে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও মেনে চলা ইহকাল ও পরকালে সাফল্যের কারণ এবং) পূর্ববর্তী (অবতীর্ণ) গ্রন্থসমূহের (আল্লাহ্র গ্রন্থ হওয়ার) সত্যতা প্রমাণকারী। (অতএব, আমি এ কোরআন সৃষ্ট জীবের উপকার ও আল্লাহ্র গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অবতীর্ণ করেছি। এবং (এ কারণে অবতীর্ণ করেছি যে,) যাতে আপনি (এর মাধ্যমে) মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদের (বিশেষভাবে আল্লাহ্র শাস্তির) ভয় প্রদর্শন করেন (যার বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং ব্যাপক ভয়ও প্রদর্শন করেন যে, لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا এবং (আপনার ভয় প্রদর্শনের পর যদিও সবাই বিশ্বাস স্থাপন না করে, কিন্তু) যারা পরকালে (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে (যদ্দারা শাস্তির শংকা হয়, তা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা জাগে এবং সর্বদা ঐতিহাসিক কিংবা যৌক্তিক যে কোন প্রমাণের মাধ্যমে সত্য নির্ধারণ ও মুক্তির পথ অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়) তারা তো এর (অর্থাৎ কোরআনে) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে (ই) এবং (বিশ্বাসের সাথে সাথে এর কাজকর্মও যথারীতি সম্পাদন করে। কেননা, বিশ্বাস ও কর্ম উভয়ের উপর পূর্ণ মুক্তির ওয়াদা নির্ভরশীল। সেমতে) তারা স্বীয় নামায সংরক্ষণ করে।(যা দৈনিক পাঁচবার করা হয়। এমন কঠিন ইবাদতই যখন তারা সংরক্ষণ করে, তখন অন্য সহজ ইবাদত যা মাঝে মাঝে করতে হয়, তা অবশ্যই পালন করবে। মোটকথা, কেউ মানুক বা না মানুক––আপনি তজ্জন্য চিন্তিত হবেন না। যারা নিজের মঙ্গল চাইবে, তারা মানবে– যারা চাইবে না, তারা মানবে না। আপনি নিজের কাজ করুন)। এবং ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম কে হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ (আরোপ) করে (এবং সাধারণ নবুয়ত কিংবা বিশেষ নবুয়ত অস্বীকার করে ; যেমন পূর্বে কারও উক্তি বর্ণিত

হয়েছে ঃ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ এবং কেউ কেউ বলত ঃ اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا (কিংবা দাবি করে যে, আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার কাছে কোন কিছুর ওহী আসেনি (যেমন, মুসায়লামা প্রমুখ)। এবং (এমনভাবে তার চাইতে বড় যালিম কে) যে দাবি করে যে, যেরূপ কালাম আল্লাহ্ তা'আলা [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাবি অনুযায়ী] নাযিল করেছেন, এমনি কালাম আমিও অবতীর্ণ করে (দেখিয়ে) দিই। (যেমন, নযর প্রমুখ বলত। মোটকথা, এরা সবাই বড় যালিম।) আর (যালিমদের অবস্থা এই যে,) যদি আপনি (তাদেরকে) তখন দেখেন (তবে ভয়ংকর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে) যখন [উল্লিখিত জালিমরা মৃত্যুর (আত্মিক) যন্ত্রণায় (নিপতিত) হবে এবং (মৃত্যুর) ফেরেশতারা (যারা মালাকুল মওতের সহকর্মী–তাদের আত্মা বের করার জন্য তাদের দিকে) স্বীয় হস্ত (প্রসারিত করে) বলে যাবে (যে,) হ্যাঁ, (শীঘ্র) তোমাদের আত্মা বের কর (কোথায়) লুকিয়ে ফিরতে—দেখ) আজ (মৃত্যুর সাথেই) তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। (অর্থাৎ সে শাস্তিতে শারীরিক কষ্ট ও আত্মিক অবমাননা–দুইই আছে।) কারণ, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা বলতে (যেমন وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ এবং اُوْحِىَ اِلَىَّ سَاُنْزِلُ ইত্যাদি।) এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ থেকে (যা হিদায়েতের উপায় ছিল, মেনে নেওয়ার ব্যাপারে) অহংকার করতে (এ অবস্থা হবে মৃত্যুর সময়) এবং (কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ) তোমরা আমার কাছে (বন্ধু ও সাহায্যকারী) থেকে নিঃসঙ্গ (হয়ে) এসেছ (এবং এমনভাবে এসেছ) যেমন আমি প্রথমবার (জগতে) তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম। (অর্থাৎ দেহে বস্ত্র ছিল না এবং পায়ে জুতা ছিল না) এবং আমি তোমাদের যা (দুনিয়াতে সাজ-সরঞ্জাম) দিয়েছিলাম, (যে কারণে তোমরা আমাকে ভুলে গিয়েছিলে) তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ (সাথে কিছুই আনতে পারলে না। উদ্দেশ্য এই যে, পার্থিব ধন-সম্পদের ভরসা করো না। এগুলো এখানেই থেকে যাবে।) এবং (তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীয় মিথ্যা উপাস্যদের সুপারিশের ভরসা করত। অতএব) আমি তোমাদের সাথে (এক্ষণে) তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাতে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবেও তারা তোমাদের সাথে নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা দাবি করতে যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে (আমার) অংশীদার। (অর্থাৎ আরাধনার ব্যাপারে তোমরা আমার সাথে যে ব্যবহার করতে, তাদের সাথে তাই করতে।) বাস্তবিকই তোমরা (এবং তাদের) পরস্পরের সম্পর্কে ছিন্ন হয়ে গেছে। (অর্থাৎ আজ তোমরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তারা তোমাদের প্রতি। এমতাবস্থায় কি সুপারিশ করবে) এবং তোমাদের (উল্লিখিত) সব দাবি অতীতে বিলীন হয়ে গেছে, (কোন কাজেই আসেনি। কাজেই এখন বিপদের অন্ত থাকবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট অবদান এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদা উল্লিখিত হয়েছিল। এতে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতিকে এবং বিশেষভাবে মক্কা ও আরববাসীদের কার্যত একথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নেয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে প্রিয়তম বস্তু বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে আসল প্রতিদান তো কিয়ামতের পর জান্নাতেই পাবে, কিন্তু

দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন মর্তবা ও ধন-সম্পদ দান করেন, যার সামনে দুনিয়ার সব ধন-সম্পদ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। উদাহরণত হযরত ইবরাহীম (আ) পিতা-মাতা, দেশ ও জাতি সবই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিসর্জন দেন। অতঃপর খানায়ে কা'বা নির্মাণের মহান কাজের জন্য সিরিয়ার তৃণ সজ্জিত শস্য-শ্যামল ভূমি পরিত্যাগ করে মক্কার বালুকাময় ধূসর মরুভূমিতে বসতি স্থাপন করেন। স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিজনভূমিতে ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হলে অনতিবিলম্বে তা পালন করেন। একমাত্র আদরের পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ দেওয়া হলে যথাসাধ্য তা পালন করে দেখান।

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র জন্য স্বজাতি ও স্বগোত্র পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আম্বিয়া (আ)-এর একটি বিরাট দল লাভ করেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর সন্তান-সন্ততি। তিনি ইরাক ও সিরিয়া পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আল্লাহ্র ঘর, নিরাপদ শহর, উম্মুল কুরা অর্থাৎ মক্কা লাভ করেন। তাঁর জাতি তাঁকে লাঞ্ছিত করতে চাইলে এর বিনিময়ে তিনি সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানবজাতির ইমাম ও নেতারূপে বরিত হন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একমত।

এ ক্ষেত্রে সতের জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশই ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে দীনের খিদমতের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে মক্কাবাসীদের শোনানো হয়েছে যে, কোন জাতির পূর্ব-পুরুষরা শুধু পিতৃ-পুরুষ হওয়ার কারণেই অনুসরণীয় হতে পারে না যে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে হবে। আরবদের সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে, যার অনুসরণ করা হবে যে নিজেও বিশুদ্ধ পথে আছে কি না। তাই আম্বিয়া (আ)-এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ অর্থাৎ এরাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। এরপর বলেছেন ঃ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ অর্থাৎ আপনিও তাদের হিদায়েত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন।

এতে দু'টি নির্দেশ রয়েছে ঃ এক. আরববাসী ও সমগ্র উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পৈতৃক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের পদাংক অনুসরণ কর।

দুই. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনিও পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের পন্থা অবলম্বন করুন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আম্বিয়া (আ)-এর শরীয়তসমূহে শাখাগত ও আংশিক বিভিন্নতা পূর্বেও ছিল এবং ইসলামেও তাঁদের থেকে ভিন্ন অনেক বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। এমতাবস্থায় মহানবী (সা)-কে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের পথ অনুসরণের নির্দেশ দানের অর্থ কি? দ্বিতীয় আয়াতের মর্ম এবং বিভিন্ন হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এর উত্তর এই যে, এখানে সব শাখাগত ও আংশিক বিধি-বিধানে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, বরং দীনের মূলনীতি একত্ববাদ, রিসালত ও পরকালে তাদের পথ অনুসরণ করা

উদ্দেশ্য। এগুলো কোন পয়গম্বরের শরীয়তেই পরিবর্তিত হয়নি। আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত একই বিশ্বাস এবং একই পথ অব্যাহত রয়েছে। যেসব শাখাগত বিধানে পরিবর্তন করা হয়নি, সেগুলোতেও অভিন্ন কর্মপন্থা রয়েছে এবং যেসব বিধানের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা পালিত হয়েছে।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাখাগত ব্যাপারেও পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের কর্মপন্থা অনুসরণ করতেন। (মাযহারী ইত্যাদি)

এরপর মহানবী (সা)-কে বিশেষভাবে একটি ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বররাও করেছেন। ঘোষণাটি এই ঃ قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটি করার জন্য যেসব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোন ফিস বা পারিশ্রমিক চাই না। তোমরা এসব নির্দেশ মেনে নিলে আমার কোন লাভ নেই এবং না মানলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ও শুভেচ্ছার বার্তা। শিক্ষা ও প্রচার কার্যের জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সব যুগে সব পয়গম্বরের অভিন্ন নীতি ছিল। প্রচারকার্য কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব লোকের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যারা বলেছিল আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কখনও কোন গ্রন্থ অবতীর্ণই করেন নি, গ্রন্থ ও রাসূল প্রেরণ ব্যাপারটি মূলত ভিত্তিহীন।

ইবনে কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি মূর্তি পূজারীদের উক্তি হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। কেননা, তারা কোন গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোন কালেই ছিল না। অন্যান্য তফসীরকারের মতে এটি ইহুদীদের উক্তি। আয়াতের বর্ণনা-পরম্পরা বাহ্যত এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিপন্থী ছিল। ইমাম বগভী (র)-এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল, ইহুদীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়েছিল এবং তাকে ধর্মীয় পদ থেকে অপসারিত করেছিল।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছেন ঃ যারা এমন বাজে কথা বলেছে তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে চেনে নি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হতো না। যারা সর্বাবস্থায় ঐশী গ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তওরাত তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির একজন হর্তাকর্তা হয়ে বসে আছ, সে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে ? আরও বলে দিন ঃ তোমরা এমন বক্রগামী যে, যে তওরাতকে তোমরা ঐশী গ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা একে বাঁধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোন পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পার। তওরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইহুদীরা সেগুলো তওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল। আয়াতের শেষে تَجْعَلُوْنَهُ قَرَاطِيْسَ বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। قراطيس শব্দটি قرطاس-এর বহুবচন। এর অর্থ কাগজের পাতা।

এরপর তাদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاؤُكُمْ অর্থাৎ কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে তওরাত ও ইঞ্জীলের চাইতেও অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও জানা ছিল না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ না করে থাকলে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে ? এ প্রশ্নের উত্তর তারা কি দেবে ; আপনিই বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই অবতীর্ণ করেছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন।

তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا .

অর্থাৎ তওরাত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ–একথা যেমন তারাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কোরআনও আমি অবতীর্ণ করেছি। কোরআনের সত্যতার জন্য তাদের পক্ষে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জীলে অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। তওরাত ও ইঞ্জীলের পর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন এ জন্য দেখা দেয় যে, এ গ্রন্থদ্বয় বণী ইসরাইলের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের অপর শাখা বনী-ইসমাঈল যারা আরব নামে খ্যাত এবং উম্মুল-কুরা অর্থাৎ মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করে, তাদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন বিশেষ পয়গম্বর ও গ্রন্থ এ যাবত অবতীর্ণ হয়নি। তাই এ কোরআন বিশেষভাবে তাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। মক্কা মোয়াযযমাকে কোরআন পাক 'উম্মুল-কুরা' বলেছে। অর্থাৎ বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। এছাড়া এ স্থানটিই সারা বিশ্বের কিবলা এবং মুখ ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু।–(মাযহারী)

উম্মুল-কুরার পর وَمَنْ حَوْلَهَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ .

অর্থাৎ যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায সংরক্ষণ করে। এতে ইহুদী ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ যা ইচ্ছা, মেনে নেওয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা এবং এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরি করা–এটি পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে,

আল্লাহ্ভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরওয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

চিন্তা করলে দেখা যায় পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ভীতি এবং পরকালভীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কোরআন পাকের কোন সূরা বরং কোন রুকূ এমন নেই, যাতে পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ
الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿৯৫﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿৯৬﴾ وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿৯৭﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿৯৮﴾

(৯৫) নিশ্চয় আল্লাহ্ই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। ইনিই আল্লাহ্ অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ ? (৯৬) তিনি প্রভাত-রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ। (৯৭) তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন–যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি। (৯৮) আর তিনিই তোমাদের একমাত্র জীবসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা, স্থিতি ও গচ্ছিত হওয়ার স্থল। নিশ্চয় আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য, যারা চিন্তা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী (অর্থাৎ মৃত্তিকায় পোতার পর তিনিই বীজ ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন।) তিনি জীবিত (বস্তু)-কে মৃত (বস্তু) থেকে বের করেন

(যেমন, বীর্য থেকে মানুষ জন্মগ্রহণ করে।) এবং তিনি মৃত (বস্তু)-কে জীবিত (বস্তু) থেকে বের করেন। (যেমন মানুষের দেহ থেকে বীর্য প্রকাশ পায়।) ইনিই আল্লাহ্! (যার এমন শক্তি)। অতঃপর তোমরা (তাঁর আরাধনা ছেড়ে) কোথায় (অন্যের আরাধনার দিকে) উল্টো চলে যাচ্ছ ? তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি থেকে) প্রভাতের উন্মেষক (অর্থাৎ রাত্রি শেষ হয় এবং প্রভাত ফুটে ওঠে।) এবং তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন। (অর্থাৎ সব শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষ রাত্রিতে নিদ্রা যায় এবং আরাম লাভ করে)। আর সূর্য ও চন্দ্রকে (অর্থাৎ এদের গতিকে) হিসাবের জন্য রেখেছেন (অর্থাৎ এদের গতি বিধিবদ্ধ। ফলে সময় নিরূপণ করা সহজ হয়)। এটি (অর্থাৎ এদের গতি বিধিবদ্ধ হওয়া) ঐ সত্তার-নির্ধারণ, যিনি (সর্ব) শক্তিমান, (এরূপ গতিশীলতা সৃষ্টি করার শক্তি তাঁর আছে এবং) জ্ঞানময় (এ গতিশীলতার উপযোগিতা ও রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন। তাই এ বিশেষ ভঙ্গিতে সৃজন করেছেন। এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের (উপকারের) জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন। (উপকার এই যে) যাতে এদের দ্বারা (রাত্রির) অন্ধকারে—স্থলে এবং জলেও পথপ্রাপ্ত হও। নিশ্চয় আমি (এসব একত্ববাদ ও নিয়ামত দানের) প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। যদিও সবার কাছেই তা পৌঁছাবে; কিন্তু উপকারী) তাদের জন্য (-ই হবে) যারা (ভালমন্দের কিছু খবর রাখে। কেননা, এরাই চিন্তা-ভাবনা করে।) এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের (সবাই)-কে এক ব্যক্তি [অর্থাৎ আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর পরবর্তীতে বংশবৃদ্ধির পরম্পরা এভাবে চলে এসেছে যে, তোমাদের প্রত্যেককে ধাতুর স্তরে] এক জায়গায় বেশিদিন অবস্থানের (অর্থাৎ জননীর গর্ভাশয়) এবং এক জায়গায় অল্পদিন অবস্থানের (অর্থাৎ পিতার মেরুদণ্ড) لقوله تعالى من بين الصلب নিশ্চয় আমি (একত্ববাদ ও নিয়ামতদানের এসব) প্রমাণাদি (ও) খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, (কিন্তু এর উপকারও পূর্বের ন্যায়) তাদের জন্য (-ই হবে,) যারা বুদ্ধিবিবেচনার অধিকারী। (এ হচ্ছে- يخرج الحى... বাক্যের বিশদ বর্ণনা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের হঠকারিতা ও অপরিণামদর্শিতা বর্ণিত হয়েছিল। এসব দোষের আসল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা। তাই আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এ রোগের প্রতিকারার্থ স্বীয় বিস্তৃত জ্ঞান ও মহান শক্তির কয়েকটি নমুনা এবং মানুষের প্রতি নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখ করেছেন। এতে সামান্য চিন্তা করলেই প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ব্যক্তি স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও তাঁর অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য স্বীকার না করে থাকতে পারবে না। তখন সে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এ বিরাট কীর্তি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারও হতে পারে না।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বীজ ও আঁটি অঙ্কুরকারী। এতে আল্লাহ্র শক্তি-সামর্থ্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। শুষ্ক বীজ ও শুষ্ক আঁটি ফাঁক করে তার ভেতর থেকে শ্যামল ও সতেজ বৃক্ষ বের করে দেওয়া একমাত্র জগৎ স্রষ্টারই কাজ—এতে কোন মানুষের চেষ্টা ও কর্মের

কোন প্রভাব নেই। আল্লাহ্‌র শক্তির বলে বীজ ও আঁটির ভেতর থেকে যে নাজুক অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই কৃষকের সকল চেষ্টার মূল বিষয়। লাঙল চষে মাটি নরম করা, সার দেওয়া, পানি দেওয়া ইত্যাদি কর্মের ফল এর চাইতে বেশি কিছু নয় যে, অঙ্কুরের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা যেন না থাকে। এ ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেটে বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্‌গম হওয়া, অতঃপর তাতে রঙ-বেরঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফল-ফুলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরি করতে অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে মানবীয় কর্মের কোন প্রভাব নেই। তাই কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ۝

অর্থাৎ তোমরা কি ঐ বীজগুলোকে দেখ না, যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও ? এগুলো থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন কর, না আমি করি ?

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে ঃ

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۝

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু যেন, বীর্য ও ডিম—এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন—যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়।

এরপর বলেছেন ঃ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ—অর্থাৎ এগুলো সবই এক আল্লাহ্‌র কাজ। অতঃপর একথা জেনেশুনে তোমরা কোন্ দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ ? তোমরা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ – فالق শব্দের অর্থ ফাঁককারী এবং اصباح শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। فالق الاصباح-এর অর্থ প্রভাতকে ফাঁককারী; অর্থাৎ গভীর অন্ধকারের চাদর ফাঁক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জিন, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তি ব্যর্থ। প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জীন, মানব, ফেরেশতা অথবা অন্য কোন সৃষ্ট জীব হতে পারে না, বরং এটি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ।

রাত্রিকে সৃষ্ট জীবের আরামের জন্য প্রাকৃতিক ও বাধ্যতামূলক নির্ধারণ একটি বিরাট নিয়ামত ঃ এর পর বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا—سَكَنٌ শব্দটি سكون থেকে উদ্ভূত। যেখানে পৌঁছে মানুষ শান্তি, স্বস্তি ও আরাম লাভ করে, তাকেই سكن বলা হয়। একারণেই মানুষের বাসগৃহকে কোরআনে سكن বলা হয়েছে ঃ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا কেননা কুঁড়েঘর হলেও মানুষ সেখানে পৌঁছে স্বভাবতই স্বস্তি ও আরাম বোধ করে। কাজেই আলোচ্য বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রিকে প্রত্যেক প্রাণীর জন্য আরামদায়ক করেছেন। فَالِقُ الْإِصْبَاحِ বাক্যে ঐসব নিয়ামতের বর্ণনা ছিল, যা মানুষ দিবালোকে অর্জন করে—রাত্রির অন্ধকারে

নয়। এরপর جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ দিনের বেলা সব কাজ-কারবার করে বিধায় দিবালোক যেমন একটি বিরাট নিয়ামত, তেমনি রাত্রির অন্ধকারকেও মন্দ মনে করো না। এটিও একটি বড় নিয়ামত। রাত্রে সারাদিনের শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষ আরাম করে পরদিন আবার নবোদ্যমে কাজ করার যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা মানবপ্রকৃতি অব্যাহত পরিশ্রম সহ্য করতে পারত না।

রাত্রির অন্ধকারকে আরামের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া একটি স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং আল্লাহ্ তা'আলার অজেয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এ নিয়ামতটি প্রত্যহ অযাচিতভাবে পাওয়া যায়। তাই এটি যে কত বিরাট নিয়ামত ও অনুগ্রহ, সেদিকে মানুষ ভ্রূক্ষেপও করে না। চিন্তা করুন, যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট করত, তবে কেউ হয়ত সকাল আটটায়, কেউ দুপুর বারটায়, কেউ বিকাল চারটায় এবং কেউ রাতের বিভিন্ন অংশে ঘুমাবার ইচ্ছা করত! ফলে দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অহরহ মানুষ কাজ-কারবার ও শ্রমে লিপ্ত থাকত এবং মিল-ফ্যাক্টরী সর্বক্ষণ চালু থাকত। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে নিদ্রিতদের নিদ্রায় এবং কর্মীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটত। কেননা কর্মীদের হট্টগোলে নিদ্রিতদের নিদ্রা ভেঙে যেত এবং নিদ্রিতদের অনুপস্থিতি কর্মীদের কাজ বিঘ্নিত করত। এ ছাড়া নিদ্রিতদের এমন সব অনেক কাজ বাদ পড়ে যেত, যা নিদ্রার সময়ই হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি শুধু মানুষের উপরই নয়—প্রত্যেক প্রাণীর উপর রাত্রিবেলায় নিদ্রাকে এমনভাবে চাপিয়ে দিয়েছে যে, সবাই কাজকর্ম ছেড়ে ঘুমাতে বাধ্য। সন্ধ্যার সাথে সাথেই যাবতীয় পশু-পাখী ও চতুষ্পদ জীব-জন্তু নিজ নিজ বাসস্থান ও গৃহের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতিটি মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে কাজ ছেড়ে বিশ্রামের চিন্তা করে। সমগ্র বিশ্বে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও বিশ্রামে সাহায্য করে। কেননা অধিক আলোতে স্বভাবতই সুনিদ্রা আসে না।

চিন্তা করুন, যদি সারা বিশ্বের রাষ্ট্র ও জনগণ আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে নিদ্রার কোন সময় নির্দিষ্ট করতে চাইত, তবে প্রথমত তাতে কত যে, অসুবিধা দেখা দিত তার ইয়ত্তা নেই। দ্বিতীয়ত সব মানুষ যদি কোন চুক্তি অনুসরণ করে নিদ্রা যেত, তবে জন্তু-জানোয়ারকে কে চুক্তি অনুসরণে বাধ্য করতে পারত। তারা নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করত এবং নিদ্রিত মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র তছনছ করে ফেলত। আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিই বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের উপর নির্দিষ্ট এক সময়ে নিদ্রা চাপিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দিয়েছে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

সৌর ও চান্দ্র হিসাব ঃ বলা হয়েছে ঃ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا — حُسْبَانٌ একটি ধাতু। এর অর্থ হিসাব করা, গণনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীন রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বছর, মাস, দিন, ঘন্টা এমনকি মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতিবিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতিবিধিতে এক মিনিট বা

এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। এদের কলকব্জা মেরামতের জন্য কোন ওয়ার্কশপের প্রয়োজন হয় না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকতাও দেখা দেয় না। এ উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষ পথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে ঃ

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ.

হাজারো বছরে এদের গতিতে এক সেকেণ্ড পার্থক্য হয় না। পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং কলকব্জা মেরামতের জন্য কয়েক দিন বা কয়েক ঘন্টার বিরতি দেখা যেত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনি চলে না, বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা রয়েছে। কিন্তু اے روشنی طبع تو بر من بلا شــدی (হে মনের ঔজ্জ্বল্য। তুমি আমার জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছ।) এসব গোলকের অপরিবর্তনীয় ও অটল ব্যবস্থা মানুষের দৃষ্টিকে হতচকিত ও নিজের দিকে আকৃষ্ট করে দিয়েছে। ফলে মানুষ একথা ভুলে গেছে যে, کوئی محبوب هے اس پردہ زنگاری مــیں (এ রঙিন পর্দার অন্তরালে কোন প্রেমাস্পদ রয়েছে) ঐশী গ্রন্থ, পয়গম্বর ও রাসূলরা এ সত্য উদ্ঘাটন করার জন্যই অবতীর্ণ হন।

কোরআন পাকের এ বাক্য আরও ইঙ্গিত করছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং এ দুটিই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত। এটা ভিন্ন কথা যে, সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সুবিধার্থে এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে দূরে রাখার জন্য ইসলামী বিধি-বিধানে চান্দ্র মাস ও বছর ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ইসলামী তারিখ এবং ইসলামী বিধান পুরোপুরিভাবে চান্দ্র হিসাবের উপর নির্ভরশীল, তাই এ হিসাবকে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। প্রয়োজন বশত সৌর ও অন্যান্য হিসাবও ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু চান্দ্র হিসাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেওয়া পাপের কারণ। এতে রমযান কিংবা যিলহজ্জ ও মহররম কবে হবে–তা অজ্ঞাত হয়ে যাবে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ تَقْــدِيْرُ الْعَــزِيْزِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা–যাতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয় না–একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই অপরিসীম শক্তির কারসাজি, যিনি পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সব ব্যাপারে জ্ঞানী।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পেছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, জল ও স্থলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আজ বৈজ্ঞানিক কল-কব্জার যুগেও মানুষ নক্ষত্রপুঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়।

এ আয়াতেও মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোন একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিচরণ করছে। এরা স্বীয় অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আত্ম-প্রবঞ্চিত।

آناں که بجز روئے تو جائے نگر انند
کوته نظر انند چه کوته نظر انند

এরপর বলেছেন : قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ –অর্থাৎ আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদের জন্য। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও আল্লাহ্‌কে চেনে না, তারা বেখবর ও অচেতন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে : وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ — مستقر শব্দটি قرار থেকে উদ্ভূত। কোন বস্তুর অবস্থান স্থলকে مستقر বলা হয়। مستودع শব্দটি وديعت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কারও কাছে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রেখে দেওয়া। অতএব مستودع ঐ জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রাখা হয়।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্য একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি স্বল্পকালীন অবস্থান স্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কোরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এ ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন : مستودع ও مستقر যথাক্রমে মাতৃগর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন : কবর ও পরলোক। এছাড়া আরও বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কোরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কাজী সানাউল্লাহ্ পানীপথী (র) তফসীর মাযহারীতে বলেছেন : مستقر হচ্ছে পরলোকের বেহেশত ও দোযখ। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পরকাল অবধি সবগুলো স্তর। তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক, কিংবা কবর ও বরযখই হোক–সবগুলোই হচ্ছে مستودع অর্থাৎ সাময়িক অবস্থান-স্থল। কোরআন পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। আয়াতে বলা হয়েছে : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ –অর্থাৎ তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। এর সারমর্ম এই যে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাফির সদৃশ। বাহিক্য স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়েও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করতে থাকে।

مسافر هوں کہاں جانا ہے نا واقف هوں منزل سے
ازل سے پھرتے پھرتے گور تك پہنچا هوں مشکل سے

বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং জগতের তামাশায় মত্ত হয়ে যারা আসল বাসস্থান এবং আল্লাহ্ ও পরকালকে ভুলে যায়, শেষ এ আয়াতে তাদের চোখ খুলে দেওয়া হয়েছে–যাতে তারা প্রকৃত সত্য অনুধাবন করে এবং দুনিয়ার প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পায়। মাওলানা জামী (র) চমৎকার বলেছেন ঃ

همه اندر زمن ترا زین است
که تو طفلی وخانه رنگین است

وَهُوَ الَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ
انظُرُوٓا إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَأٓيَٰتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتٍ
بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ
يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

(৯৯) তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙুরের বাগান, যয়তুন-আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর–যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর–নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য। (১০০) তারা জিনদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র জন্য পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও সমুন্নত, তাদের বর্ণনা থেকে। (১০১) তিনি

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে ? অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই ? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। (১০২) ইনিই আল্লাহ্–তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তিনি (আল্লাহ্) আকাশ থেকে (অর্থাৎ আকাশের দিক থেকে) পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি এ (একই পানি) দ্বারা রঙ-বেরঙের সর্বপ্রকার উদ্ভিদ (মাটি থেকে) উৎপন্ন করেছি, (একই পানি ও মাটি থেকে এত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করা, যাদের রঙ, গন্ধ, স্বাদ ও উপকারিতায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে, আল্লাহ্র কুদরতের কত বিস্ময়কর কারসাজি!) অতঃপর আমি এ (কুঁড়ি) থেকে (যা প্রথমে মাটি ভেদ করে নির্গত হয় এবং হলদে রঙ হয়) সবুজ শাখা বহির্গত করেছি--এ (শাখা) থেকে আমি উৎপাদন করি যুগ্ম বীজ। (এ হচ্ছে শস্যের অবস্থা فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى বাক্যে সংক্ষেপে তা উল্লিখিত হয়েছে।) এবং খেজুরের কাঁদি থেকে ফলের গুচ্ছ বের করি, যা (ফলভারে) নিচে নুয়ে পড়ে এবং (এ পানি দ্বারাই আমি) আঙুরের বাগান (উৎপন্ন করেছি) এবং যয়তুন আনার (বৃক্ষ উৎপন্ন করেছি) যা (কতক আনার ও কতক যয়তুন ফলের আকার আকৃতি, পরিমাণ ও রঙ ইত্যাদির দিক দিয়ে) একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত এবং (কতক) একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যহীন। প্রত্যেকটির ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় (তখন সম্পূর্ণ কাঁচা, বিস্বাদ ও অব্যবহারযোগ্য হয়) এবং (অতঃপর) এর পরিপক্কতা লক্ষ্য কর (তখন সবগুণে পরিপূর্ণ হয়। এটিও আল্লাহ্র কুদরতের বহিঃপ্রকাশ) এ (গুলোর) মধ্যে (-ও একত্ববাদের) প্রমাণাদি (বিদ্যমান) রয়েছে— (প্রচারের দিক দিয়ে যদিও সবার জন্য, কিন্তু উপকৃত হওয়ার দিক দিয়ে) তাদের (-ই) জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন (-এবং চিন্তা) করে। (এ হচ্ছে ফল-মূলের বর্ণনা, যা সংক্ষেপে وَخَلَقَهُمْ বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছিল)।

এবং তারা (মুশরিকরা স্বীয় বিশ্বাস মতে) শয়তানদের (সেই) আল্লাহ্র (যার গুণাবলী ও কর্ম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) অংশীদার স্থির করে রেখেছে (ফলে তাদের প্ররোচনায় তারা শিরক করে এবং আল্লাহ্র বিপরীতে তাদেরকে মেনে চলে)। অথচ তাদেরকে (স্বয়ং তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও) আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন (যখন স্রষ্টা অন্য কেউ নয়, তখন উপাস্যও অন্য কেউ না হওয়া উচিত।) এবং তারা (কতক মুশরিক) আল্লাহর জন্য (স্বীয় বিশ্বাসে) পুত্র ও কন্যা বিনা প্রমাণে গড়ে নিয়েছে [যেমন খ্রিস্টানরা মসীহ (আ)-কে এবং কতক ইহুদী হযরত ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র এবং আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যারূপে অভিহিত করত।] তিনি পবিত্র ও সমুন্নত তাদের বর্ণনা থেকে--(অর্থাৎ তাঁর অংশীদার এবং পুত্র-কন্যা হওয়া থেকে) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। (অর্থাৎ নাস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী এবং অন্য কোন আদি স্রষ্টা নেই। সুতরাং উপাস্যও অন্য কেউ হবে না। এতে অংশীদার না থাকা বোঝা গেল। সন্তান না থাকার প্রমাণ এই যে,

সন্তানদের স্বরূপ তিনটি ঃ এক. স্বামী-স্ত্রী থাকা, দুই. উভয়ের মিলন এবং তিন. জীবিত বস্তু সৃষ্টি হওয়া। অতএব) কিরূপে আল্লাহ্‌র সন্তান হতে পারে, যখন তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই এবং তিনি (যেমন তাদেরকে পয়দা করেছেন ঃ وَخَلَقَهُمْ এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ এমনি ভাবে) তিনি সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং (তিনি যেমন একক স্রষ্টা, তেমনি এ বিষয়েও তিনি একক যে) তিনি সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। (আদি-অন্ত সবদিক দিয়েই। এ গুণেও তাঁর কোন অংশীদার নেই। জ্ঞান ব্যতীত সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং এতদ্দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, অন্য কোন স্রষ্টা নেই।) ইনি (যার গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে) আল্লাহ্— তোমাদের পালনকর্তা। তাঁকে ছাড়া আরাধনার যোগ্য কেউ নেই। সবকিছুর স্রষ্টা (যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এসব গুণ যখন আল্লাহ্‌র-ই,) অতএব তোমরা তাঁর (-ই) আরাধনা কর এবং তিনি (-ই) সবকিছুর সম্পাদনকারী। (অন্য কোন সম্পাদনকারীও নেই। সুতরাং তাঁর আরাধনা করলে তোমরা সত্যিকারভাবে উপকৃত হবে—অন্যে কি দেবে? মোটকথা, স্রষ্টাও তিনি, সর্বজ্ঞ তিনি এবং সম্পাদনকারীও তিনি। এ সবের দাবিও এই যে, উপাস্যও তিনিই হবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুতে অভিনব শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে। এখানে তিন প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ এক. ঊর্ধ্বজগৎ, দুই. অধঃ জগৎ এবং তিন. শূন্যজগৎ। অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী শূন্যজগতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ। প্রথমে অধঃজগতের বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ এক. মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের বর্ণনা এবং দুই. মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। প্রথমোক্তটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এটি অপরটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং অপরটি যেহেতু আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই কিছুটা সূক্ষ্ম। সেমতে বীর্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা চিকিৎসকদের অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কশীল। এর বিপরীতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ। এর পর শূন্যজগতে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ সকাল ও বিকাল। এর পর ঊর্ধ্বজগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পুনঃ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পূর্বে এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উল্লিখিত হয়েছিল, এবার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনার শ্রেণী বিন্যাসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার শ্রেণী বিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণীদের বর্ণনা অগ্রে রাখা হয়েছে এবং উদ্ভিদের বর্ণনা পরে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, এ বিস্তারিত বর্ণনায় নিয়ামত প্রকাশের ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তাই منعم عليه যাদেরকে নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তারা উদ্দিষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিন্যাস বহাল রয়েছে ; অর্থাৎ শস্যের অবস্থা বীজ ও আঁটির বর্ণনার আগে এনে এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে আরও একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। তা এই যে, সূচনার দিক থেকে বৃষ্টি ঊর্ধ্বজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধঃজগতের এবং দূরত্ব অতিক্রমের দিক দিয়ে শূন্য জগতের বস্তু।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾
قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا
دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا
جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾

(১০৩) কোন কিছুরই দৃষ্টিসীমা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না, অবশ্য তিনি সকলের দৃষ্টিকেই পেতে ও বেষ্টন করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। (১০৪) তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। (১০৫) এমনিভাবে আমি নিদর্শনাবলী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি--যাতে তারা না বলে যে, আপনি তো এগুলো অধ্যয়ন করে বলছেন এবং যাতে আমি একে সুধীবৃন্দের জন্য খুব পরিব্যক্ত করে দেই। (১০৬) আপনি ঐ পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (১০৭) যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তারা শিরক করত না। আমি আপনাকে তাদের রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহীও নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাঁর সর্বজ্ঞ হওয়া এবং এ গুণে একক হওয়া এরূপ যে,) তাঁকে কারও দৃষ্টিসীমা বেষ্টন করতে পারে না–(ইহকালেও না এবং পরকালেও না। ইহকালে তাঁকে দর্শন করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। শরীয়তের বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত। পরকালে বিভিন্ন প্রমাণ অনুযায়ী জান্নাতীরা যদিও তাঁকে দর্শন করবে, কিন্তু দৃষ্টি দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টন করা সম্ভব হবে না। যে দৃষ্ট বস্তুর বাহ্যিক অবস্থা দর্শনেন্দ্রীয় দ্বারা বেষ্টন করা অসম্ভব, তার অভ্যন্তরীণ স্বরূপ বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা বেষ্টন করা ততোধিক অসম্ভব। কেননা, বাহ্যিক অবস্থার চাইতে আভ্যন্তরীণ স্বরূপ অধিকতর সূক্ষ্ম এবং বিবেক-বুদ্ধিও দর্শনেন্দ্রিয়ের চাইতে অধিকতর ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্ত।) এবং তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) সকল দৃষ্টিকে (সেগুলো তাঁকে বেষ্টন করতে অক্ষম, অবশ্যই)

বেষ্টন করেন। (এমনিভাবে অন্যান্য বস্তুকেও জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করেন—وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) এবং (তিনি সবাইকে বেষ্টন করেন এবং তাঁকে কেউ বেষ্টন করে না—এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে যে,) তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। (অন্য কেউ নয়। জ্ঞানের এ গুণে আল্লাহ্ তা'আলা একক। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে,) নিশ্চয় এবার তোমাদের পালনকর্তার কাছ থেকে সত্য দর্শনের উপায়াদি (অর্থাৎ একত্ববাদ ও রিসালতের যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণাদি) এসে গেছে। অতএব যে (এগুলো দ্বারা সত্যকে) প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজের উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজের ক্ষতি করবে এবং আমি তোমাদের (অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্মের) পর্যবেক্ষক নই। (অর্থাৎ অশালীন কাজ করতে না দেওয়া যেমন পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব তদ্রূপ নয়। আমার কাজ শুধুমাত্র প্রচার করা।) এবং (দেখ) এমনি (উত্তম)-রূপে আমি নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করি (যাতে আপনি সবাইকে পৌঁছে দেন এবং) যাতে তারা (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা বিদ্বেষবশত একথা) না বলে যে, আপনি তো (কারও কাছ থেকে এসব বিষয়বস্তু) পড়ে নিয়েছেন। (উদ্দেশ্য এই যে, যাতে তাদেরকে আরও জব্দ করা যায় যে, আমি তো এমন বিস্তারিতভাবে সত্যকে প্রমাণিত করতাম, পক্ষান্তরে তোমরা অর্থহীন বাহানা তালাশ করতে) এবং যাতে আমি একে (অর্থাৎ কোরআনের বিষয়বস্তুকে) সুধীবৃন্দের জন্য খুব পরিব্যক্ত করে দিই। (অর্থাৎ কোরআন অবতরণের উপকার তিনটি ঃ এক. যাতে আপনি প্রচারকার্যের পুরস্কার লাভ করেন, দুই. যাতে অবিশ্বাসীরা অধিক অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং তিন. সুধীবৃন্দ ও সত্যান্বেষীদের সামনে সত্য ফুটে ওঠে। সুতরাং) আপনি (কে মানে, কে মানে না তা দেখবেন না বরং) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে পথে চলার প্রত্যাদেশ হয়েছে, সে পথ অনুসরণ করুন। (এ পথে চলার জন্য এ বিশ্বাসই প্রধান যে,) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ উপাসনার যোগ্য নেই এবং (এতে অটল থেকে) মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য করবেন না (যে, আফসোস, তারা ইসলাম গ্রহণ করল না কেন?) এবং (লক্ষ্য না করার কারণ এই যে,) যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা শিরক করত না (কিন্তু তাদের দুষ্কর্মের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে সাজা দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন। তাই এর কারণ সংগ্রহ করে দিয়েছেন এমতাবস্থায় আপনি এ চিন্তা করবেনই কেন!) আমি আপনাকে তাদের (ক্রিয়াকর্মের) তত্ত্বাবধায়ক করিনি এবং আপনি (দুষ্কর্মের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে) ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন। (অতএব তাদের অপরাধসমূহের তদন্ত এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ভার যখন আপনাকে অর্পণ করা হয়নি, তখন আপনি উদ্বিগ্ন হবেন কেন?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে ابصار। শব্দটি بصر-এর বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি ادراك। শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ স্থলে ادراك। শব্দের অর্থ 'বেষ্টন করা' বর্ণনা করেছেন।—(বাহরে-মুহীত)

এতে আয়াতের অর্থ এই হয় যে জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীবজন্তুর দৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহ্র সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা

সমগ্র সৃষ্ট জীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। এক. সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারও দৃষ্টি এমনকি সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এ যাবত পৃথিবীতে যত মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা ও শয়তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দণ্ডায়মান হয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভবপর নয়।-(মাযহারী)

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হতে পারে। নতুবা আল্লাহ্ জীবজন্তুর দৃষ্টিকেও এত শক্তি দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জন্তুর ক্ষুদ্রতম চক্ষুও পৃথিবীর বৃহত্তম মণ্ডলকে দেখতে পারে এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে। সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ ? এদের বিপরীতে পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্ব কিছুই নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু এসব গ্রহকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে।

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয় বিশেষ। এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহেরই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা বুদ্ধি ও ধারণার বেষ্টনীরও ঊর্ধ্বে। দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁর জ্ঞান কিরূপে অর্জিত হতে পারে ?

تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا

بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے

(তুমি অন্তরে জাগরিত হও, বিবেকে ধরা দাও না। আমার বুঝতে বাকি নেই যে, এটাই তোমার পরিচয়)।

আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী অসীম। মানবিক ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও কল্পনা সসীম। এটা সবাই জানে যে, কোন অসীমকে কোন সসীম নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে না। তাই বিশ্বের যত বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক যুক্তিতর্কের নিরিখে স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলীর অনুসন্ধান ও গবেষণায় জীবনপাত করেছেন এবং যত সূফী মনীষী 'কাশফ' (অন্তর্দৃষ্টি) ও 'ইলহাম' (ঐশী জ্ঞান)-এর আলো নিয়ে এ ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি এবং পেতে পারে না। মওলানা রূমী (র) বলেন ঃ

دُور بینانِ بارگاہِ الست

غیر ازیں پے نہ بردہ اند کہ ھست

শেখ সাদী (র) বলেন ঃ

چہ شبہا نشستم دریں سیر گم

کہ حیرت گرفت آستینم کہ قم

স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা ঃ মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পারে কি না, এ সম্পর্কে আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস এই যে, এ জগতে এটা সম্ভবপর নয়। এ

কারণেই হযরত মূসা (আ) যখন رَبِّ أَرِنِيْ (হে পরওয়ারদিগার, আমাকে দেখা দাও) বলে আল্লাহ্‌কে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল ঃ لَنْ تَرَانِيْ (তুমি কস্মিনকালেও আমাকে দেখতে পারবে না।) হযরত মূসা (আ)-ই যখন এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোন জিন ও মানুষের সাধ্য কি। তবে পরকালে মু'মিনরা আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। একথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ –কিয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে।

তবে কাফির ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহ্‌কে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কোরআনের এক আয়াতে আছে ঃ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ –অর্থাৎ কাফিররা সেদিন স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে আড়ালে ও বঞ্চিত থাকবে।

পরকালে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ ঘটবে–হাশরে অবস্থানকালেও এবং জান্নাতে পৌঁছার পরও। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্‌র সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নিয়ামত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা যেসব নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরও কোন নিয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দেব। জান্নাতীরা নিবেদন করবে ঃ ইয়া আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশি আমরা আর কি চাইব। তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ হবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ্, মুসলিমে হযরত সোহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

বুখারীর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে সাহাবীদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ (পরকালে) তোমরা স্বীয় পালনকর্তাকে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে।

তিরমিযী ও মুসনাদে আহ্‌মদের এক হাদীসে ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে জান্নাতে মর্যাদা দান করবেন তাঁদেরকে প্রতিদিন সকাল-বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন।

মোটকথা, এ জগতে কেউ আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না এবং পরকালে সব জান্নাতী এ নিয়ামত লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মে'রাজের রাতে যে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই সাক্ষাৎ। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র) বলেন ঃ আকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানকেই জগৎ বা দুনিয়া বলা হয়। আকাশের উপরে পরকালের স্থান। সেখানে পৌঁছে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পার্থিব সাক্ষাৎ বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন থাকে যে ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ –আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতেই পারে না। এমতাবস্থায় কিয়ামতে কিরূপে দেখবে? এর উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌কে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আয়াতের অর্থ এটা নয়, বরং অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তাঁর সত্তাকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ, তাঁর সত্তা অসীম এবং মানুষের দৃষ্টি সসীম।

কিয়ামতের দেখাও চতুর্দিক বেষ্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন সহ্য করার মত শক্তি মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে সর্বাবস্থায় দেখা হতে পারে না। পরকালে এ শক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও সাক্ষাৎ হতে পারবে। কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সত্তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দেখা তখনও হতে পারবে না।

আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় গুণ যে, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণুকণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্ট জগত ও তাঁর অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনও হয়নি এবং হতে পারে না। কেননা, এটা আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

এরপর ইরশাদ হয়েছে ঃ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ–আরবী অভিধানে لطيف শব্দটি দু' অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ এক দয়ালু, দুই. সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না কিংবা জানা যায় না।

خبير শব্দের অর্থ, যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ সূক্ষ্ম। তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্ট জগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে لطيف শব্দের অর্থ দয়ালু নেওয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও তাই সব গুনাহ্‌র কারণেই পাকড়াও করেন না।

দ্বিতীয় আয়াতের بصائر শব্দটি بصيرت এর বহুবচন। এর অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান। অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আয়াতে بصائر বলে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ ও উপায়াদিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌছে গেছে। অর্থাৎ কোরআন, রাসূল (সা) ও বিভিন্ন মু'জিযা আগমন করেছে এবং তোমরা রাসূলের চরিত্র, কাজকারবার ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়।

অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজের উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। অর্থাৎ মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রাসূল (সা)-এর দায়িত্ব নয়, যেমনটি তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব হয়ে থাকে। রাসূলের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পৌছিয়ে দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা, না করা মানুষের দায়িত্ব।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ ও রিসালতের যেসব প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, তৃতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ অর্থাৎ আমি এমনিভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রমাণাদি বর্ণনা করে থাকি।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ –এর মর্ম এই যে, হিদায়েতের সব সাজ-সরঞ্জাম, মু'জিযা, অনুপম প্রমাণাদি–যেমন, কোরআন –একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য কালাম রচনা করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত জিন ও মানবকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে–সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে-কোন হঠকারী অবিশ্বাসীরও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পদতলে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে دَرَسْتَ অর্থাৎ এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনি কারও কাছ থেকে অধ্যয়ন করে নিয়েছেন।

সাথে সাথেই বলা হয়েছে وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ–এর সারমর্ম এই যে, সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্য এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মোটকথা এই যে, হিদায়েতের সরঞ্জাম সবার সামনে রাখা হয়েছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা এ দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথ-প্রদর্শক হয়ে গেছেন।

চতুর্থ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে ঃ কে মানে, আর কে মানে না–আপনি তা দেখবেন না। আপনি স্বয়ং ঐ পথ অনুসরণ করুন যা অনুসরণ করার জন্য পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। এ প্রত্যাদেশ প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্য পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন গ্রহণ করল না।

পঞ্চম আয়াতে এর কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শিরক করতে পারত না। কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণে তিনি ইচ্ছা করেন নি, বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান করতে পারেন ? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন। কাজেই তাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে আপনার উদ্বিগ্ন না হওয়াই উচিত।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط
كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ص ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ
لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ط قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ لا أَنَّهَا إِذَا

جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا

بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١٠﴾ وَلَوْ اَنَّنَا

نَزَّلْنَاۤ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ

شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ

بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ

فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

(১০৮) তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারাও ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্কে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করত। (১০৯) তারা জোর দিয়ে আল্লাহ্র কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনি বলে দিন ঃ নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্র কাছেই আছে। হে মুসলমানগণ। তোমাদের কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই ? (১১০) আমি ঘুরিয়ে দেব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দেব। (১১১) আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদের অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয় ; কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (১১২) এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেওয়ার জন্য একে অপরকে চাকচিক্যময় কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাপবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন। (১১৩)যাতে চাকচিক্যময় বাক্যের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয়, যারা পরকালে

বিশ্বাস করে না এবং তারা একেও পছন্দ করে নেয় যাতে ঐসব কাজ করে, যা তারা করছে।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তোমরা তাদের (অর্থাৎ সেই মিথ্যা উপাস্যদেরকে) গালি দিও না, তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তওহীদকে) উপেক্ষা করে যার উপাসনা করে। (যদি তোমরা এমন কর) তাহলে অজ্ঞতাবশত সীমালংঘন করে(অর্থাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে) তারা আল্লাহ্‌কে গালি দেবে। বস্তুত এরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের যে সাথে সাথে শাস্তি দেওয়া হয় না, সেজন্য বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, আমি (দুনিয়াতে তা) এমনিভাবে (যেমন হচ্ছে) সকল ধর্মাবলম্বীর দৃষ্টিতে তাদের কর্ম (ভাল হোক কিংবা মন্দ) সুশোভিত করে রেখেছি। (অর্থাৎ এমন সব কারণ সংঘটিত হয়ে যায়, যদ্দরুন প্রত্যেকের কাছে তার ধর্ম পছন্দনীয় মনে হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ জগৎ আসলেই একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। কাজেই এখানে শাস্তি দেওয়া জরুরী নয়।) অতঃপর (অবশ্য যথাসময়ে) স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদের (সবাইকে) যেতে হবে। অনন্তর (তখন) তারা (দুনিয়াতে) যা কিছু করত, তিনি তা তাদেরকে বলে দেবেন (এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবেন)। এবং তারা (অধিবাসীরা) স্বীয় কসমে খুব জোর দিয়ে আল্লাহ্‌র কসম খেয়েছে যে, যদি তাদের (অর্থাৎ আমাদের) কাছে তাদের প্রার্থিত (নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে) কোন নিদর্শন আসে, তবে তারা (অর্থাৎ আমরা) অবশ্যই তৎপ্রতি (অর্থাৎ নিদর্শনের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করবে। (অর্থাৎ নিদর্শন প্রকাশকারীর নবুয়ত মেনে নেবে।) আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ নিদর্শনাবলী সব আল্লাহ্‌র করায়ত্ত, (তিনি যেভাবে ইচ্ছা, সেগুলো পরিচালনা করবেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ করা এবং ফরমায়েশ করা অন্যায়। কেননা, কোন্ নিদর্শনটি প্রকাশ হওয়া উপযুক্ত এবং কোন্‌টি প্রকাশ না হওয়া উপযুক্ত তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তবে পয়গম্বর প্রেরণের সময় কোন নিদর্শন প্রকাশ করা উপযুক্ত তা নিশ্চিত। আল্লাহ্ তা'আলা রিসালতে মুহাম্মদীর সত্যতার অনেক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। এগুলোই যথেষ্ট। এ হচ্ছে তাদের ফরমায়েশের জওয়াব।) এবং (মুসলমানদের ধারণা ছিল এই যে, এসব নিদর্শন প্রকাশ হলে ভালই হয়। এতে সম্ভবত তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। তাই মুসলমানদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে,) তোমরা কি খবর রাখ (বরং আমি খবর রাখি) যে, তারা (ফরমায়েশী) নিদর্শন যখন আসবে (চরম শত্রুতাবশত) তখনও বিশ্বাস স্থাপন করবে না এবং (তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে) আমিও তাদের অন্তরকে (সত্যান্বেষণের ইচ্ছা থেকে) এবং তাদের দৃষ্টিকে (সত্য দর্শন থেকে) ঘুরিয়ে দেব। (আর তাদের এ বিশ্বাস স্থাপন না করা এমন) যেমন তারা এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি (যা একটি বিরাট মু'জিযা) প্রথমবার (যখন আগমন করেছিল) বিশ্বাস স্থাপন করেনি। (কাজেই এখন বিশ্বাস না করাকে অসম্ভব মনে করো না) এবং (تقليب ابصار অর্থাৎ দৃষ্টিকে অকেজো করে দেওয়ার অর্থ বাহ্যিক تقليب নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে,) আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় (ও কুফরে) উদ্‌ভ্রান্ত (অস্থির) থাকতে দেব, (বিশ্বাস স্থাপনের তৌফিক হবে না। এটা অভ্যন্তরীণ تقليب) এবং (তাদের হঠকারীতা এরূপ যে,) আমি যদি (একটি নয়, কয়েকটি এবং বিরাট বিরাট ফরমায়েশী নিদর্শনও প্রকাশ

করতাম; উদাহরণত) তাদের কাছে ফেরেশতাদের প্রেরণ করতাম (যেমন তারা বলে ঃ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ) এবং তাদের সাথে মৃতরা (জীবিত হয়ে) কথাবার্তা বলত (যেমন তারা বলে ঃ فَأْتُوا بِآبَائِنَا) এবং (তারা তো শুধু এতটুকুই বলে যে, تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا) আমি (এতটুকুতে ক্ষান্ত হতাম না বরং) সমস্ত (অদৃশ্য) বিষয়কে (জান্নাত, দোযখ ইত্যাদিসহ) তাদের কাছে তাদের চোখের সামনে এনে একত্র করতাম, (যে, তারা খোলাখুলি দেখে নিত) তবুও তারা কস্মিনকালেও বিশ্বাস স্থাপন করত না, কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান (এবং তাদের বিধিলিপি পরিবর্তন করে দেন,) তবে ভিন্ন কথা। (অতএব তাদের হঠকারিতা ও দুষ্টামির অবস্থা যখন এই এবং তারা নিজেরাও তা জানে যে, কখনও তাদের বিশ্বাস স্থাপন করার ইচ্ছা নেই, তখন নিষ্ফল হওয়ার কারণে নিদর্শনাবলীর ফরমায়েশ না করাই সঙ্গত ছিল) কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খতা করছে (যে, বিশ্বাস স্থাপনের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনর্থক ফরমায়েশ করে চলছে। এটা স্বতঃসিদ্ধ মূর্খতা) এবং (তারা যে আপনার সাথে শত্রুতা করে—এটা নতুন কিংবা আপনার ব্যাপারেই নয়; বরং তারা আপনার সাথে যেমন শত্রুতা করে) এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর শত্রুরূপে অনেক শয়তান সৃষ্টি করেছিলাম–কিছু মানব (যাদের সাথে তাদের আসল কাজকর্ম ছিল) এবং কিছু জিন (ইবলীস ও তার বংশধর) তন্মধ্যে কেউ কেউ (অর্থাৎ ইবলীস ও তার বাহিনী) অন্য কিছু সংখ্যককে (অর্থাৎ কাফির মানুষের মনে) মুখরোচক বিষয়ের ওয়াসওয়াসা প্রদান করত প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে। (অর্থাৎ কুফর ও বিরুদ্ধাচরণের কথাবার্তা যা বাহ্যত পছন্দনীয় হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল মারাত্মক একটা প্রতারণা। যখন এটা নতুন নয়, তখন এ জন্য দুঃখ করবেন না যে, তারা আপনার সাথে এরূপ ব্যবহার কেন করে। আসলে এতে কিছু রহস্যও রয়েছে। তাই তাদের এসব কাজ করার সামর্থ্যও হয়ে গেছে) এবং আল্লাহ্ যদি (এরূপ) চাইতেন, (যে, তারা এরূপ কাজ করতে সমর্থ না হোক,) তবে তারা এরূপ কাজ করতে পারত না। (কিন্তু কোন কোন রহস্যের কারণে তাদেরকে এ সামর্থ্য দান করা হয়েছে।) অতএব (যখন এতে এ উপকারিতা রয়েছে, তখন) তাদেরকে এবং তাদের (ধর্ম সম্পর্কে) মিথ্যাপবাদ রটনাকে আপনি ছেড়ে দিন (এ চিন্তায় পড়বেন না। আমি স্বয়ং নির্দিষ্ট সময়ে এর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করব। উপরোক্ত রহস্য ও প্রজ্ঞাসমূহের মধ্যে এটিও অন্যতম)। এবং (শয়তানরা কাফিরদের এজন্য কুমন্ত্রণায় নিক্ষেপ করত) যাতে এর প্রতি (অর্থাৎ প্রতারণামূলক বাক্যের প্রতি) তাদের অন্তর আকৃষ্ট হয় যারা পরকালে (যথোপযুক্ত) বিশ্বাস করে না। (উদ্দেশ্য, কাফির সম্প্রদায় ; যদিও তারা আহলে-কিতাব, কেননা তারাও পরকালে যথোপযুক্ত বিশ্বাস করে না। যদি করত তবে নবুয়ত অস্বীকার করার দুঃসাহস করত না। কেননা, তজ্জন্য কিয়ামতে শাস্তি প্রদান করা হবে।) এবং যাতে (অন্তর আকৃষ্ট হওয়ার পর তাকে (আন্তরিক বিশ্বাস দ্বারাও) পছন্দ করে নেয় এবং যাতে (বিশ্বাসের পর) ঐসব কাজ (-ও) করতে থাকে, যা তারা করত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাস'আলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়।

ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে নযুল এই ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতৃব্য আবূ তালিব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রুতায়, নির্যাতনে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিক সর্দাররা মহা ফাঁপরে পড়ে যায়। তারা পারস্পরিক বলাবলি করতে থাকে ঃ আবূ তালিবের মৃত্যু আমাদের জন্য কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করি, তবে এটা আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পরিপন্থী হবে। লোকে বলবে ঃ আবূ তালিব জীবিত থাকতে তো তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, এখন একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখনও সময় আছে , চল আমরা সকলে মিলে স্বয়ং আবূ তালিবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নিই।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান জানে যে, আবূ তালিব মুসলমান না হলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ মহব্বত ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রুদের মোকাবিলায় সব সময় তাঁর ঢাল হয়ে থাকতেন।

কতিপয় কোরাইশ সর্দারের পরামর্শক্রমে আবূ তালিবের কাছে যাওয়ার জন্য একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হলো। আবূ সুফিয়ান, আবূ জাহেল, আমর ইবনে আস প্রমুখ সর্দার এ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্য মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। সে আবূ তালিবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিনিধিদলকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিল।

তারা আবূ তালিবকে বলল ঃ আপনি আমাদের মান্যবর সর্দার। আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদের মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা উপাস্য করবেন ; আমরা কিছুই বলব না।

আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাছে ডেকে বললেন ঃ এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আপনারা কি চান ? তারা বলল ঃ আমাদের বাসনা, আপনি আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আচ্ছা, যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নিই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের প্রভু হয়ে যাবেন এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে ?

আবূ জাহেল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ঃ এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবূ তালিবও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কালেমা ছাড়া অন্য কোন কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কালেমা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ চাচাজান, আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কোন কালেমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও

আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কোরাইশ সর্দারদের নিরাশ করে দিলেন।

এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল ঃ হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদের মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকে গালি দেব এবং ঐ সত্তাকেও, আপনি নিজেকে যার রাসূল বলে দাবি করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ .

অর্থাৎ আপনি ঐ প্রতিমাদের মন্দ বলবেন না, যাদের তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহ্‌কে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে।

এখানে لَا تَسُبُّوْا শব্দটি سب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশব কালেও কোন মানুষকে বরং কোন জন্তুকেও কখনও গালি দেননি। সম্ভবত কোন সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোন কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। কোরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদের গালিগালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরাও আপনার আল্লাহ্‌কে গালিগালাজ করব।

এতে কোরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কোন কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হচ্ছিল ; যেমন বলা হয়েছে ঃ

مَا جَعَلْنَاكَ — اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ — اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا এবং مَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ—এসব বাক্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছিল, আপনি এমন করুন কিংবা এমন করবেন না। অতঃপর এ আয়াতে সম্বোধণকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে لَا تَسُبُّوْا বলা হয়েছে। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো কখনও কাউকে গালি দেন নি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করলে তা তাঁর মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। তাই ব্যাপক সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সব সাহাবায়ে কিরামও এ ব্যাপারে সাধারণ হয়ে যান। (বাহ্‌রে মুহীত)

এখন প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। অথচ এসব আয়াত রহিত নয় ; অদ্যাবধি এগুলো তিলাওয়াত করা হয়।

উত্তর এই—কোরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসাবে কোন সত্য ফুটিয়ে তোলার জন্য তা বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারও মনে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদের মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষায় বিশেষ বাকপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনও কোন বিষয়ের তথ্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি আলোচনা করা হয় ; যেমন

সাধারণত আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না।

এমনিভাবে কোরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতাও ফুটে উঠে। বলা হয়েছে ঃ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ। অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা--সবাই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়-পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কুপরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। ফিকহ্‌বিদরা বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নাজায়েয হবে। যেমন মকরূহ স্থানসমূহে কোরআন তিলাওয়াত যে নাজায়েয তা সবাই জানে। (রূহুল মা'আনী)

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এবং কোরআন পাকে পূর্বে এরূপ কোন বাক্য উচ্চারিত হয়নি, যাকে গালি বলা যায় এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হওয়ার আশংকা ছিল না। তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

এ ঘটনা এবং এ সম্পর্কিত কোরআনী নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান এ থেকে বের হয়েছে।

কোন পাপের কারণ হওয়াও পাপ ঃ উদাহরণত একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ এবং কোন না কোন স্তরে প্রশংসনীয় হয় কিন্তু সে কাজ করলে যদি কোন ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ প্রতিমাদের মন্দ বলা কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবত মূলত তা সওয়াব এবং প্রশংসনীয়ও বটে কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে আশংকা দেখা দেয় যে, প্রতিমা পূজারীরা আল্লাহ্ তা'আলাকে মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদের মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসে এর আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত রয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন ঃ জাহিলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায় কা'বাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কোরাইশরা তার পুনর্নির্মাণ করে। এ পুনর্নির্মাণে কয়েকটি বিষয়ে প্রাচীন ইবরাহিমী ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে। প্রথমত কা'বার যে অংশকে 'হাতীম' বলা হয়, তাও কা'বা গৃহের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু পুনর্নির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত কা'বা গৃহের পূর্ব

ও পশ্চিম দিকে দু'টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জাহিলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটিমাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে, যাতে কা'বাগৃহে প্রবেশ তাদের ইচ্ছানুযায়ী হতে পারে। প্রত্যেকেই যেন বিনা বাধায় প্রবেশ করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বললেন ঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ইবরাহীম (আ)-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দিই। কিন্তু আশংকা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ আরব জাতি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে। কা'বা গৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবি রেখেছি।

এটা জানা কথা যে, কা'বাগৃহকে ইবরাহিমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি ইবাদত ও সওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশংকা আঁচ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতি জানা গেল যে, কোন বৈধ বরং সওয়াবের কাজেও যদি কোন অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এতে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে আবূ মনসুর কর্তৃক একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর জিহাদ ও কাফির নিধন ফরয করেছে। অথচ কাফির নিধনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো এই যে, কোন মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা করলে কাফিররাও মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। এখানে জিহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জিহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কুরআন তিলাওয়াত, আযান ও নামাযের প্রতি অনেক কাফির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। অতএব আমরা কি তাদের এ ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজেদের ইবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নেব ?

এর জওয়াবও স্বয়ং আবূ মনসুর থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি জরুরী শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই যে, ফাসাদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরী কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয়। যেমন মিথ্যা উপাস্যদেরকে মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোন উদ্দেশ্য সম্পৃক্তযুক্ত নয়। এমনিভাবে কা'বগৃহের নির্মাণকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলোর কারণে যখন কোন ধর্মীয় অনিষ্টের আশংকা দেখা দিয়েছে, তখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোন ইসলামী উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে তাতে কোন অনিষ্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না। বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যদ্দূর সম্ভব অনিষ্টের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী (র) ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র) উভয়েই এক জানাযার নামাযে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। নিকটে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরও সমাবেশ হয়েছে। এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র) সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (র) বললেন ঃ জনসাধারণের ভ্রান্ত কর্মপন্থার

কারণে আমরা জরুরী কাজ কিভাবে ত্যাগ করতে পারি ? জানাযার নামায ফরয। উপস্থিত অনিষ্টের কারণে তা ত্যাগ করা যায় না।। তবে অনিষ্ট দূরীকরণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে।

এ ঘটনাটিও রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে উদ্ভূত মূলনীতির সারমর্ম এই যে, যে কাজ নিজ সত্তার বৈধ বরং ইবাদত, কিন্তু শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি তা করলে ফ্যাসাদ বা অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে তা বর্জন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কাজটি শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণেও তা বর্জন করা যাবে না।

এ মূলনীতি অনুসরণ করে ফিক্‌হবিদরা হাজারো বিধান ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ পিতা যদি অবাধ্য পুত্র সম্পর্কে একথা জানেন যে, তাকে কোন কাজ করতে বললে অস্বীকার করবে এবং বিরুদ্ধাচরণ করবে—যদ্দরুন তার কঠোর গুনাহ্‌গার হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি করতে বা না করতে বলার পরিবর্তে উপদেশের ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন ঃ অমুক কাজটি করলে খুবই ভাল হতো। এভাবে অস্বীকার অথবা বিরুদ্ধাচরণ করলেও একটি নতুন অবাধ্যতার গুনাহ্ পুত্রের উপর বর্তাবে না। —(খোলাসাতুল ফাতাওয়া)

এমনিভাবে কাউকে ওয়াজ-উপদেশ দানের ক্ষেত্রেও যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, সে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোন কুকাণ্ড করে বসবে যদ্দরুন আরও অধিকতর গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তবে তাকে উপদেশ প্রদান না করাই উত্তম। ইমাম বোখারী (র) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন ঃ

باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس فيقعوا فى اشد منه .

অর্থাৎ মাঝে মাঝে বৈধ বরং উত্তম কাজও এজন্য পরিত্যাগ করা হয় যে, তাতে স্বল্পবুদ্ধি জনগণের কোন ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। তবে শর্ত এই যে, কাজটি ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয়।

কিন্তু যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত– ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ অথবা অন্য কোন প্রকার ইসলামী বৈশিষ্ট্য হবে– তা করলে যদিও কিছু স্বল্পজ্ঞানী লোক ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ কাজ কখনো ত্যাগ করা যাবে না। বরং অন্য পন্থায় তাদের ভুল বোঝাবুঝি ও ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের কারণে কাফিররা উত্তেজিত হয়ে উঠত, কিন্তু এ কারণে এসব ইসলামী বৈশিষ্ট্য কখনও ত্যাগ করা হয়নি। স্বয়ং আলোচ্য আয়াতের শানে-নযুলে বর্ণিত আবূ জাহেল প্রমুখের ঘটনার সারমর্ম তাই ছিল যে, কোরাইশ সর্দাররা তওহীদ প্রচার ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন যে, তারা যদি চন্দ্র ও সূর্য এনে আমার হাতে রেখে দেয় তবুও আমি তওহীদ প্রচার ত্যাগ করতে পারি না।

তাই এ মাস'আলাটি এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়, তবুও তা কখনও ত্যাগ করা যাবে না। অবশ্য যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যা ত্যাগ করলে কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ অপরের ভুল বোঝাবুঝি অথবা ভ্রান্তির আশংকার কারণে পরিত্যাগ করা যাবে না।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুস্পষ্ট মু'জিযা ও আল্লাহ্ তা'আলার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখা সত্ত্বেও হঠকারী লোকেরা সেগুলো দ্বারা উপকৃত হয়নি এবং নিজেদের অস্বীকৃতি ও জেদের উপর অটল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা স্বীয় জেদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বিশেষ বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবি করেছে ; যেমন ইবনে জরীর (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী কোরাইশ সর্দাররা দাবি উত্থাপন করেছে যে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মু'জিযা আমাদেরকে দেখাতে পারেন, তবে আমরা আপনার নবুয়ত মেনে নেব এবং মুসলমান হয়ে যাব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আচ্ছা, শপথ কর, যদি এ মু'জিযা প্রকাশ পায় তবে তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে। তারা শপথ করল। তিনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করার জন্য দাঁড়ালেন যে, এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন যে, আপনি চাইলে আমি এক্ষুণি এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিব। কিন্তু আল্লাহ্র আইনানুযায়ী এর পরিণাম হবে এই যে, এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে ব্যাপক আযাব নাযিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। তারা বিশেষ কোন মু'জিযা দাবি করার পর তা দেখানো হয়েছে। এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহ্র গযব ও আযাব নাযিল হয়েছে। দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই দয়াপরবশ হয়ে বললেন ঃ এখন আমি এ মু'জিযার দোয়া করব না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ এতে কাফিরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা প্রার্থিত মু'জিযা প্রকাশিত হলে মুসলমান হওয়ার জন্য শপথ করল। এর পরবর্তী اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ আয়াতে তাদের উক্তির জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, মো'জিযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। যেসব মু'জিযা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল এবং যেসব মু'জিযা দাবি করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম। কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবি করার কোন অধিকার নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রিসালতের দাবিদার এবং এ দাবির পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য মু'জিযা আকারে উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবি করা, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ; যেমন আদালতে কোন বিবাদী বাদীর উপস্থিত করা সাক্ষীদের অযোগ্যতা প্রমাণ

না করেই দাবি করে বসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য মানি না। অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে মেনে নেব। বাদীর এ উদ্ভট দাবির প্রতি কোন আদালতই কর্ণপাত করবে না।

এমনিভাবে নবুয়ত ও রিসালতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও মু'জিযা প্রকাশিত হওয়ার পর এগুলো খণ্ডন না করা পর্যন্ত তাদের এরূপ বলার অধিকার নেই যে, আমরা তো অমুক ধরনের মু'জিযা দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করব।

এরপর শেষ অবধি আয়াতসমূহে মুসলমানদের সম্বোধন করে আদেশ করা হয়েছে যে, নিজে সত্য ধর্মে কায়েম থাকা এবং অপরের কাছে তা শুদ্ধরূপে পৌঁছিয়ে দেওয়াই হচ্ছে তোমাদের দায়িত্ব। এরপরও যদি তারা হঠকারিতা করে, তবে তাদের চিন্তায় মাথা ঘামানো উচিত নয়। কেননা, জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান করা উদ্দেশ্য নয়। যদি তা উদ্দেশ্য হতো, তবে আল্লাহ্‌র চাইতে শক্তিশালী কে ? তিনি নিজেই সবাইকে মুসলমান করে দিতে সক্ষম। এসব আয়াতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দান করার জন্য আরও বলা হয়েছে যে, আমি যদি তাদের প্রার্থিত মু'জিযাসমূহও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিই, তবও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তাদের অস্বীকৃতি কোন ভুল বোঝাবুঝি ও অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং জেদ ও হঠকারিতার কারণে । কোন মু'জিযা দ্বারা এর প্রতিকার হবার নয়। সবশেষে وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আমি তাদের প্রার্থিত মু'জিযাসমূহ দেখিয়ে দিই ; বরং এর চাইতেও বেশি—ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দিই, তবুও তারা মানবে না। পরবর্তী দু' আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শত্রুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরেরও অব্যাহতভাবে শত্রু ছিল। অতএব আপনি এতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।

أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۗ وَالَّذِينَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ
عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ إِنْ يَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيلِهٖ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

(১১৪) তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান

করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আপনি সংশয় প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১১৫) আপনার পালনকর্তার বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুসমন্বিতভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১১৬) আর আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। (১১৭) আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয় এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তাঁর পথে অনুগমন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনি বলে দিন ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে রিসালতে মতবিরোধ সম্পর্কিত যে ব্যাপার রয়েছে আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে আমি যার দাবিদার এবং তোমরা তার অবিশ্বাসী —এ বিষয়ের ফয়সালা শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে এভাবে হয়ে গেছে যে, তিনি আমার দাবির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ কোরআন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা এরপরও মেনে নিচ্ছ না।) তবে কি (তোমরা চাও যে, আমি আল্লাহ্র এ ফয়সালাকে যথেষ্ট মনে না করি এবং) আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি ? অথচ তিনি এমন (পূর্ণ ফয়সালা করেছেন) যে, একটি গ্রন্থ (যা স্বীয় অলৌকিকতায়) স্বয়ংসম্পূর্ণ, তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। (এটি স্বীয় অলৌকিকতার কারণে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। অতএব অলৌকিকতা ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়া—এর দু'টি হচ্ছে এর পূর্ণতা। এছাড়া অন্যান্য দিক দিয়েও এটি পূর্ণ। আর এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং হিদায়েত ও শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর জন্য যথেষ্ট। সেমতে) এর (পূর্ণতার তৃতীয় এক) অবস্থা এই যে, (ধর্মীয় ক্ষেত্রে) এর (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়বস্তুসমূহ খুব বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আর (এর পূর্ণতার চতুর্থ অবস্থা এই যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এর আগাম সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এটি এর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ারই লক্ষণ। সেমতে) আমি যাদেরকে গ্রন্থ (অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জীল) দান করেছি, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এটি (অর্থাৎ কুরআন) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাস্তব সত্যসহ প্রেরিত হয়েছে। (একথা সবাই জানে যে, এটা সত্য। কিন্তু এরপরও যারা সত্যভাষী ছিল, তারাই তা প্রকাশ করেছে, যারা হঠকারী ছিল, তারা প্রকাশ করেনি।) অতএব আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (পূর্ণতার পঞ্চম অবস্থা এই যে,) আপনার পালনকর্তার (এ) কালাম সত্য ও সুষম হওয়ার দিক দিয়ে (-ও) সম্পূর্ণ। (অর্থাৎ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সত্যতা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের সমতা এর মধ্যে নিহিত। পূর্ণতার ষষ্ঠ অবস্থা এই যে,) তাঁর (এ) কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই (অর্থাৎ কারও পরিবর্তন ও বিকৃতকরণের ব্যাপারে আল্লাহ্ এর সংরক্ষক— وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ বস্তুত (এমন পূর্ণ প্রমাণ পেয়েও যারা মুখে ও অন্তরে এর প্রতি মিথ্যারোপ করে) তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের কথাবার্তা) শ্রবণ করেছেন (এবং তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে) খুব ভাল করেই জানেন (সময় হলে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন)। আর (সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও) পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এমনি (অবিশ্বাসী পথভ্রষ্ট রয়েছে) যে, যদি

(ধরে নিন) আপনি তাদের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র (সরল) পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে, (কেননা, তারা নিজেরাও বিপথগামী। সেমতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) তারা শুধু ভিত্তিহীন কল্পনারই অনুসরণ করে এবং (কথাবার্তায়) সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা বলে। (আর তাদের বিপরীতে আল্লাহ্‌র কিছুসংখ্যক বান্দা সরল পথেও রয়েছেন। আর) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদেরকে (-ও) খুব ভাল জানেন, যারা তার (প্রদর্শিত সরল) পথ থেকে বিপথগামী হয়। আর তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তার (প্রদর্শিত) পথের অনুসরণ করে (অতএব, বিপথগামীরা শাস্তি পাবে এবং সরল পথের অনুসারীরা পুরস্কৃত হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আলোচিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কোরআনের সত্য ও অভ্রান্ত হওয়ার পক্ষে খোলাখুলি মু'জিযা ও প্রমাণাদি দেখা ও জানা সত্ত্বেও হঠকারিতাবশত বিশেষ বিশেষ ধরনের মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি করে। কোরআন পাক তদের বক্র দাবির উত্তরে বলেছে যে, তারা যে সব মু'জিযা এখন দেখতে চায়, সেগুলো প্রকাশ করাও আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু হঠকারীরা এগুলো দেখার পরও অবাধ্যতা পরিহার করবে না। আল্লাহ্‌র চিরাচরিত আইনানুসারে অতঃপর এর ফলশ্রুতি হবে এই যে, সবাইকে আযাব গ্রাস করে নেবে।

এ কারণেই দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রার্থিত মু'জিযা প্রকাশ করতে দয়াবশত অস্বীকার করেন এবং যেসব মু'জিযা এ যাবত তাদের সামনে এসে গিয়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, যাতে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাক সত্য এবং আল্লাহ্‌র কালাম।

প্রথম আয়াতের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে রিসালত ও নবুয়তে মতবিরোধ সম্পর্কিত ব্যাপার বিদ্যমান। আমি রিসালতের দাবিদার এবং তোমরা অবিশ্বাসী। শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে আমার পক্ষে এ বিষয়ের ফয়সালা এভাবে দেওয়া হয়ে গেছে যে, আমার দাবির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি হচ্ছে স্বয়ং কোরআনের অলৌকিকতা। কোরআন বিশ্বের সকল জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, এটি আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার ব্যাপারে যদি কারও সন্দেহ থাকে তবে সে এ কালামের একটি ছোট সূরা কিংবা আয়াতের অনুরূপ সূরা কিংবা আয়াত উপস্থিত করে দেখাক। এ চ্যালেঞ্জের জওয়াবে সমগ্র আরব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জানমাল, সন্তান-সন্ততি, ইযযত-আবরূ সবকিছু কুরবান করেছিল, তাদের মধ্য থেকে একটি লোকও এমন বের হলো না, যে কোরআনের মোকাবিলায় দু'টি আয়াতও রচনা করে দেখিয়ে দিতে পারে। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, যিনি কোথাও কারও কাছে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন নি– তিনি এমন বিস্ময়কর কালাম জনসমক্ষে পেশ করলেন, যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব বরং সমগ্র বিশ্ব অক্ষম হয়ে পড়েছে। সত্য গ্রহণের জন্য এ খোলাখুলি মু'জিযাটি যথেষ্ট ছিল না কি ? এটি প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ফয়সালা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল এবং কোরআন আল্লাহ্‌র সত্য কালাম।

প্রথম আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَمًا—অর্থাৎ তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ ফয়সালার পর আমি অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি ? না, তা হতে পারে না। এরপর কোরআন পাকের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কোরআনের সত্যতা এবং আল্লাহ্র কালাম হওয়ারই প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا—এতে কোরআন পাকের চারটি বিশেষ পূর্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে ঃ এক. কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। দুই. এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলৌকিক গ্রন্থ–এর মোকাবিলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। তিন. যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। চার. পূর্ববর্তী আহ্লে-কিতাব ইহুদী ও খ্রিষ্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা একথা প্রকাশ করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি।

কোরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ—অর্থাৎ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না। যেমন স্বয়ং তিনি বলেন ঃ আমি কোন সময় সন্দেহ করিনি এবং প্রশ্ন করিনি– (ইবনে কাসীর) এতে বোঝা গেল যে, এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য লোককে শোনানোই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে, তখন অন্য আর কে সন্দেহ করতে পারে ?

দ্বিতীয় আয়াতে কোরআন পাকের আরও দু'টি বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও কোরআন পাক যে আল্লাহ্র কালাম-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে ঃ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই।

تَمَّتْ শব্দে সম্পূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং كَلِمَتُ رَبِّكَ বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। (বাহ্রে মুহীত) কোরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু'প্রকার। এক. যাতে বিশ্ব-ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, অবস্থা, সৎকাজের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎকাজের জন্য শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং দুই. যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ দুই প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোরআন পাকের صِدْقًا وَّعَدْلًا দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। صدق এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে। অর্থাৎ কোরআনে যেসব ঘটনা, অবস্থা, ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনরূপ ভ্রান্তির আশংকা নেই। عدل-এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্

তা'আলার সব বিধান عـدل তথা ন্যায়বিচারভিত্তিক। عـدل শব্দের দুটি অর্থ ঃ এক. ইনসাফ, যাতে কারও প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা না হয়। দুই. সমতা ও সুষমতা। অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান সম্পূর্ণরূপে মানবিক প্রবৃত্তির অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, মানবিক প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই, যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন না। আলোচ্য আয়াতে تَمَّتْ শব্দ ব্যবহার করে আরও বলা হয়েছে যে, কোরআনে শুধু صـدق وعـدل বিদ্যমানই নয়, বরং কোরআন এ সব গুণে সবদিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কোরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশ্বের সকল জাতি, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক—একথাটি একমাত্র আল্লাহ্ রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর হতে পারে। জগতের কোন আইনসভা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুযায়ী কোন আইন রচনা করতে পারে না। প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আইন রচনা করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার পর সুবিচার ও সমতার পরিপন্থী দেখা গেলে সেগুলো পরিবর্তন করতে হয়। ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার বিষয়টি মানুষের চিন্তা-কল্পনারও অনেক ঊর্ধ্বে। এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কালামেই সম্ভবপর। তাই কোরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি (অর্থাৎ কোরআনের বর্ণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, পুরস্কারের ওয়াদা এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সবই সত্য, এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই। কোরআন বর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক। এগুলোতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণ লংঘন নেই।) কোরআন যে আল্লাহ্র কালাম —তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কোরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্র কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই। পরিবর্তনের এক প্রকার হচ্ছে যে, এতে কোন ভুল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করা। আল্লাহ্র কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনেরই ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন ঃ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অর্থাৎ আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, এ রক্ষাব্যূহ ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে ? কোরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শত্রুদের সংখ্যাও এর অনুসারীদের তুলনায় বেশি ছিল, কিন্তু এর একটি যের ও যবর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো হয়নি। অবশ্য

একটি তৃতীয় প্রকার পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনকে রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন—এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বশেষ পয়গম্বর এবং কোরআন সর্বশেষ গ্রন্থ। একে রহিতকরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই। কোরআনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ তারা যেসব কথাবার্তা বলছে, আল্লাহ্ সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন। তিনি প্রত্যেকের কার্যের প্রতিফল দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কোরআন একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ—উদ্দেশ্য এই যে, সংখ্যাধিক্যের ভীতি স্বভাবতই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ফলে মানুষ তাদের আনুগত্য করতে থাকে। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে ঃ

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের নির্দেশ মান্য করেন, তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে। কেননা, তারা বিশ্বাস ও মতবাদে শুধুমাত্র কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছনে চলে এবং বিধি-বিধানে একমাত্র ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা চালিত হয়।

মোটকথা, আপনি তাদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে তাদের সাথে একাত্মতার কথা চিন্তাও করবেন না। কারণ এরা সবাই নীতিহীন ও বিপথগামী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্র পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং যারা আল্লাহ্র পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদের সবাইকে জানেন। অতএব, তিনি বিপথগামীদের যেমন শাস্তি দেবেন, তেমনি সরল পথের অনুসারীদেরও পুরস্কৃত করবেন।

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ
اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ

وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَکۡسِبُوۡنَ الۡاِثۡمَ سَیُجۡزَوۡنَ بِمَا کَانُوۡا یَقۡتَرِفُوۡنَ ﴿۱۲۰﴾
وَلَا تَاۡکُلُوۡا مِمَّا لَمۡ یُذۡکَرِ اسۡمُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ وَاِنَّہٗ لَفِسۡقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّیٰطِیۡنَ
لَیُوۡحُوۡنَ اِلٰۤی اَوۡلِیٰٓـِٕہِمۡ لِیُجَادِلُوۡکُمۡ ۚ وَاِنۡ اَطَعۡتُمُوۡہُمۡ اِنَّکُمۡ لَمُشۡرِکُوۡنَ ﴿۱۲۱﴾

(১১৮) অতঃপর যে জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ কর-- যদি তোমরা তাঁর বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও। (১১৯) কোন্ কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়, অথচ আল্লাহ্ ঐ সব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্য হারাম করেছেন ; কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও। অনেক লোক স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা অন্যকে বিপথগামী করতে থাকে। আপনার পালনকর্তা সীমা অতিক্রমকারীদের যথার্থই জানেন। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গুনাহ্ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা গুনাহ্ করছে, তারা অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। (১২১) যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না ; এ ভক্ষণ করা গুনাহ্। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্রত্যাদেশ করে- যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে وَاِنۡ تُطِعۡ শব্দে বিপথগামীদের অনুসরণ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশেষ বিষয়ে অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘটনাটি যবেহকৃত ও অ-যবেহকৃত জন্তুর হালাল হওয়া সম্পর্কিত। ঘটনা এই যে, কাফিররা মুসলমানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলল যে, তোমরা অদ্ভুত লোক বটে, আল্লাহ্র মারা জন্তুকে তো তোমরা খাও না, কিন্তু নিজের মারা অর্থাৎ যবেহ করা জন্তুর মাংস খেতে দ্বিধা কর না। (আবূ দাউদ, হাকেম) কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে এ সন্দেহ বর্ণনা করেন। এতে আলোচ্য আয়াতসমূহ لَمُشۡرِکُوۡنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

উত্তরের সারমর্ম এই যে তোমরা মুসলমান--আল্লাহ্র বিধি-বিধান মেনে চলতে সংকল্পবদ্ধ। কোন্‌টি হারাম আর কোন্‌টি হালাল তা আল্লাহ্ তা'আলা বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন। অতএব, এ বর্ণনা অনুযায়ী চলতে থাক। হালাল বস্তুকে হারাম এবং হারাম বস্তুকে হালাল হওয়ার সন্দেহ করো না এবং মুশরিকদের কুমন্ত্রণার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না।

এ উত্তর সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা এই যে, মূলনীতি সপ্রমাণের জন্য যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু মূলনীতি প্রমাণিত হয়ে গেলে তার বাস্তবায়ন ও শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে دلائل نقليه অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রমাণাদিই যথেষ্ট, যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদির

প্রয়োজন নেই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর। কারণ এতে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কেননা, শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণাদির অবকাশ নেই। তবে কোন সত্যান্বেষী আন্তরিক সন্তুষ্টি প্রত্যাশীর সামনে অকাট্য প্রমাণাদি প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করে দিলে ক্ষতি নেই। কিন্তু বিতর্কের ক্ষেত্রে তা না করে আপন কাজে মগ্ন হওয়া এবং আপত্তিকারীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাই বাঞ্ছনীয়। হ্যাঁ, আপত্তিকারী যদি কোন শাখার যুক্তিগত অকাট্য প্রমাণের পরিপন্থি হওয়া প্রমাণ করতে চায়, তবে তার উত্তর দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু মুশরিকদের এ সংশয় সৃষ্টিতে এমন কোন আশংকাই নেই। তাই এর উত্তরে শুধু মুসলমানদের উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী সম্বোধন করা হয়েছে যে, এসব বাজে কথায় কান দিয়ো না। সত্যে বিশ্বাসী ও কর্মী হয়ে থাক। এ হিসাবে আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের সন্দেহের স্পষ্ট ভাষায় উত্তর না দেওয়াতে কোনরূপ আপত্তি করা যায় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে كُلُوْا অর্থাৎ খাওয়ার আদেশ ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ এবং لَا تَأْكُلُوْا অর্থাৎ খাওয়ার নিষেধে لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত নিয়ম ও অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ–যবেহ করার সময় হবে এবং لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ দু'ভাবে হবে এক. যবেহ না করা ; এবং দুই. যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করা। অতএব, উত্তরের সারমর্ম এই যে, দু'টি বিষয়ের সমষ্টির উপরই হালাল হওয়া নির্ভরশীল ঃ এক. যবেহ, যা অপবিত্র রক্ত বের করে দিয়ে জন্তুকে পবিত্র করে দেয়। এ অপবিত্রতাই হালাল না হওয়ার কারণ ছিল। দুই. আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা। এটি বরকতের কারণ এবং রক্তবিশিষ্ট জন্তুসমূহের হালাল হওয়ার শর্ত। কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রাপ্তির জন্য পরিপন্থী বিষয়কে দূর করা এবং শর্ত বিদ্যমান দুইটিই জরুরী। অতএব এতদুভয়ের সমষ্টি দ্বারা বৈধতা প্রমাণিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বে যখন জানা গেল যে, কাফিরদের অনুসরণ নিন্দনীয়) অতএব যে (হালাল) জন্তুর উপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহ্র নাম (শরীকবিহীনভাবে) উচ্চারিত হয় তা থেকে (নির্বিঘ্নে) ভক্ষণ কর। (এবং তাকে অনুমোদিত ও হালাল মনে কর—) যদি তোমরা তাঁর বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও। (কেননা, হালালকে হারাম মনে করা বিশ্বাসের পরিপন্থী।) এবং কোন (বিশ্বাসজনিত) কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহ্র নাম (শরীকবিহীনভাবে) উচ্চারিত হয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা (অন্য আয়াতে) ঐসব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু তাও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়। (আল্লাহ্র নামে যবেহ করা জন্তু হারামের সে বিবরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমতাবস্থায় তা ভক্ষণ করতে বিশ্বাসগত দ্বিধা কেন ? মুশরিকদের সন্দেহ সৃষ্টির প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করো না, কেননা,) নিশ্চয়ই অনেক লোক (তাদের মধ্যে এরাও, যারা নিজের সাথে অন্যান্যকেও) স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞতাবশত বিপথগামী করে (কিন্তু কতদিন তারা এ কাজ করবে।) এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা (ঈমানের) সীমা অতিক্রমকারীদের (যাদের মধ্যে এরাও রয়েছে,) খুব পরিজ্ঞাত আছেন। (সুতরাং একযোগে শাস্তি দেবেন।) এবং তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গুনাহ্ পরিত্যাগ কর। (উদাহরণত হালালকে

হারাম মনে করা প্রচ্ছন্ন গুনাহ্। এর বিপরীতটিও তেমনি) নিশ্চয় যারা গুনাহ্ করছে, তারা অতি সত্বর (কিয়ামতে) তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে এবং যেসব জন্তুর উপর (উল্লিখিত নিয়মে) আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত না হয়, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না (যেমন, মুশরিকদের এমন জন্তু ভক্ষণ করা) এবং নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়নি এমন জন্তু ভক্ষণ করা) দুষ্কর্ম। (মোটকথা, বর্জন ও গ্রহণ কোন কিছুতেই তাদের অনুসরণ করো না।) এবং (তাদের সন্দেহ-সংশয় ভ্রূক্ষেপযোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে,) অবশ্যই শয়তানরা তাদের (এসব) বন্ধুদের (এবং অনুসারীদের এসব সন্দেহ) শিক্ষা দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে (অনর্থক) তর্ক করে। অর্থাৎ প্রথমত এসব সন্দেহ) কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত এগুলোর উদ্দেশ্য শুধু তর্ক-বিতর্ক করা। তাই এসব ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়।) বস্তুত যদি তোমরা (আল্লাহ্ না করুক) তাদের (বিশ্বাস অথবা কর্মে) আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। (কারণ, এতে আল্লাহ্র শিক্ষার উপর অন্যের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, অথচ উভয় শিক্ষাকে সমতুল্য মনে করাও শিরক। অর্থাৎ তাদের আনুগত্য শিরকতুল্যই মন্দ কাজ। তাই এর ভূমিকা অর্থাৎ ভ্রূক্ষেপ করা থেকেও বিরত থাকা কর্তব্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ —এ বাক্যে ইচ্ছাধীন যবেহ ও নিরুপায় অবস্থার যবেহ –উভয় প্রকার যবেহকেই বোঝানো হয়েছে। নিরুপায় অবস্থার যবেহ হচ্ছে তীর, বাজপক্ষী ও কুকুরের শিকার করা জন্তু। এগুলো ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করলে এদের শিকার করা জন্তু জীবিত না পাওয়া গেলেও তাকে যবেহ করা জন্তু বলেই মনে করতে হবে। অবশ্যই জীবিত পাওয়া গেলে ইচ্ছাধীনভাবে যবেহ করতে হবে। যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণও দুই প্রকার হতে পারে—এক. সত্যিকার উচ্চারণ এবং দুই. অসত্যিকার ও নির্দেশগত উচ্চারণ। যেমন, মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক ভুলক্রমে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করে যবেহ করা। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ভুলক্রমে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করলেও তা উপরোক্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং হালাল হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারণ না করলে হারাম হবে।

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

---

(১২২) আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে—যেখান থেকে বের হতে পারছে না ? এমনিভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত (অর্থাৎ পথভ্রষ্ট) ছিল পরে আমি তাকে জীবিত (অর্থাৎ মুসলমান) করেছি এবং তাকে এমন একটি আলোকে (অর্থাৎ ঈমান) দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। (অর্থাৎ আলোকটি সর্বদা তার সাথে থাকে। ফলে সে সব রকম ক্ষতি; যেমন পথভ্রষ্টতা ইত্যাদি থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ঘোরাফেরা করে) সে কি (দুরবস্থায়) ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে (পথভ্রষ্টতার) অন্ধকারে (নিমজ্জিত) রয়েছে (এবং) তা থেকে বের হতে (অর্থাৎ মুসলমান হতে) পারছে না? (এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কুফর অন্ধকার সদৃশ হওয়া সত্ত্বেও সে তা থেকে কেন বের হয় না। কারণ এই যে, মু'মিনদের কাছে যেমন তাদের ঈমান ভাল মনে হয়।) তেমনিভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতেও তাদের কাজকর্ম (কুফর ইত্যাদি) সুশোভিত মনে হয়। (এ কারণেই মক্কার কাফিররা—যারা আপনার কাছে অনর্থক দাবি-দাওয়া, সন্দেহ ও তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন করে, তারা স্বীয় কুফরকে সুশোভিত মনে করেই তাতে অবিচল রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে উল্লিখিত হয়েছিল যে, ইসলামের শত্রুরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআন পাকের খোলাখুলি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও জেদ ও হঠকারিতাবশত নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করে। অতঃপর কোরআন ব্যক্ত করেছে যে, যদি তারা বাস্তবিকই সত্যান্বেষী হতো, তবে এ যাবত যেসব মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য পর্যাপ্তের চাইতেও বেশি ছিল। অতঃপর সেসব মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কোরআনে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের কিছু অবস্থা, চিন্তাধারা, উভয়ের সু ও কুপরিণামের বর্ণনা, মু'মিন ও কাফির এবং ঈমান ও কুফরের স্বরূপ উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। মু'মিন ও কাফিরের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত দ্বারা এবং ঈমান ও কুফরের দৃষ্টান্ত আলোক ও অন্ধকার দ্বারা দেওয়া হয়েছে। এগুলো কোরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত। এগুলোতে কবিত্ব নেই—আছে সত্যের উদ্ঘাটন।

মু'মিন জীবিত আর কাফির মৃত ঃ এ দৃষ্টান্তে মু'মিনকে জীবিত এবং কাফিরকে মৃত বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির মধ্যে জীবনের প্রকার ও রূপরেখা যদিও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু বিষয়টি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না যে, এদের মধ্যে প্রত্যেকের জীবনই কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত। প্রকৃতি প্রত্যেকের মধ্যে সে লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নিহিত রেখেছে أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ কোরআনের এ বাক্যে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব জাহানের প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পূর্ণরূপে পথ প্রদর্শন করেছেন। এ পথ প্রদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক সৃষ্ট জীব নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে তা পালন করে যাচ্ছে। কর্তব্য পালনই তাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রমাণ। এদের মধ্যে যে বস্তু যখন যে অবস্থায় স্বীয় কর্তব্য পালন ত্যাগ করে, তখন সে জীবিত নয়– মৃত। পানি যদি স্বীয় কর্তব্য পিপাসা নিবারণ ও ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি ছেড়ে দেয় তবে তাকে পানি বলা যায় না। আগুন জ্বালানো-পোড়ানো ছেড়ে দিলে আগুন থাকবে না। বৃক্ষ ও ঘাস উৎপন্ন হওয়া, বেড়ে

ওঠা অতঃপর ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়া ত্যাগ করলে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ থাকবে না। কেননা, সে স্বীয় জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগ করেছে। ফলে সে নিষ্প্রাণ মৃতের মত হয়ে গেছে।

সমগ্র সৃষ্ট জগতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি ? সে যদি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়, তবে সে জীবিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। নতুবা তার স্বরূপ একটি মৃতদেহের চাইতে বেশি কিছু নয়।

এখন দেখতে হবে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি ? উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী একথা সুনির্দিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন করে যায়, তবে সে জীবিত নতুবা মৃত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। যেসব জ্ঞানপাপী পণ্ডিত মানুষকে জগতের একটি স্বউদ্‌গত ঘাস কিংবা একটি চালাক ধরনের জন্তু বলে সাব্যস্ত করেছে, যাদের মতে, মানুষ ও গাধার মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই এবং যারা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ এবং অবশেষে মরে যাওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে সম্বোধনের যোগ্য নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কশীল মনীষীবৃন্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত। এটা জানা কথা যে, যার জীবনের লক্ষ্য সেরা ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তাকেই সেরা ও উত্তম বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে যে, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, বসবাস ও পরিধানের ব্যাপারে অন্যান্য জীব-জন্তুর চাইতে মানুষের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। বরং অনেক জীবজন্তু মানুষের চাইতে উত্তম ও বেশি পানাহার করে, মানুষের চাইতে ভাল। প্রাকৃতিক পোশাক পরিবৃত এবং মানুষের চাইতে উৎকৃষ্ট আলো-বাতাসে বসবাস করে। নিজের লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারে প্রত্যেক জন্তু বরং প্রত্যেক উদ্ভিদ বেশ সচেতন। উপকারী বস্তু অর্জন এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা তারা রাখে। এমনিভাবে অপরের উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীবজন্তু ও উদ্ভিদ বাহ্যত মানুষের চাইতেও অগ্রে। তাদের মাংস, চামড়া, অস্থি রস এবং বৃক্ষের শিকড় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু সৃষ্ট জীবের জন্য উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষের মাংস, চামড়া, লোম, অস্থির রগ ইত্যাদি কোন কাজেই আসে না।

এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে 'সৃষ্টির' সেরা পদে অভিষিক্ত হয়েছে ? সত্যোপলব্ধির মনযিল এবার কাছেই এসে গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, উপরোক্ত বস্তুসমূহের বুদ্ধি ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাভ-লোকসান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্য উপকারী দেখা যায়। পার্থিব জীবনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে– এ ক্ষেত্রে জড় পদার্থ ও উদ্ভিদের তো কথাই নেই, কোন বৃহত্তম হুঁশিয়ার জন্তুর জ্ঞানচেতনাও কাজ করে না এবং এ ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোন বস্তুই কারও উপকারে আসে না। ব্যস, এ ক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ করতে হবে এবং এর দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্ট জীব থেকে তার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে পারে।

জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন্ বস্তু উপকারী এবং কোন্ বস্তু ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক। অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্য উপকারী বস্তুসমূহ

অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা ; অপরকে এসব উপকারী বস্তুসমূহের প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া যাতে চিরস্থায়ী সুখ, আরাম ও শান্তির জীবন অর্জিত হয়। যখন মানব জীবনের লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌঁছাতে হবে তখন কোরআনে এ দৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, ঐ ব্যক্তিই জীবিত যে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বের আদিঅন্ত ও এর সামগ্রিক লাভ-লোকসানকে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে। কেননা, নিছক মানবিক জ্ঞান—বুদ্ধি কখনও এ কাজ করেনি এবং করতে পারেও না। বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিক অবশেষে একথা স্বীকার করেছেন। মওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন ঃ

زیرکان موشگافان دهی

کرده هر خرطوم خط ابلهی

আল্লাহ্র প্রত্যাদেশের অনুসারী ও মু'মিন ব্যক্তিই যখন জীবনের লক্ষ্যের দিক দিয়ে জীবিত, তখন একথাও বোঝা গেল, যে ব্যক্তি এরূপ নয়, সে মৃত বলেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য। মওলানা রুমীর ভাষায় জীবনের লক্ষ্য হলো ঃ

زندگی از بهر طاعت وبندگی است

بے عبادت زندگی شرمندگی است

آدمیت لحم وشحم وپوست نیست

آدمیت جز رضائے دوست نیست

এটি ছিল মু'মিন ও কাফিরের কোরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত। মু'মিন জীবিত আর কাফির মৃত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঈমান ও কুফরের আলো ও অন্ধকার দ্বারা দেওয়া হয়েছে।

ঈমান আলো ও কুফর অন্ধকার ঃ ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয়— বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আলো ও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তের স্বরূপ ফুটে উঠবে। আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা এবং উপকারী বস্তুসমূহকে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন ঈমানকে দেখুন। সেটি একটি নূর, যার আলো সমগ্র আকাশ, ভূ-পৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত। একমাত্র ও আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সবকিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে ঃ যার কাছে এ নূর থাকে, সে নিজেও সব ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে পারে। পক্ষান্তরে যার কাছে এ আলো নেই ; সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত। সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা জীবনের দিক দিয়ে কোন্ বস্তু উপকারী এবং কোন্ বস্তু অপকারী সে তা বাছাই করতে পারে না। শুধু হাতের কাছের বস্তুসমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের পরিবেশ। কাফির ব্যক্তি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোন খবরই সে রাখে না। এ জীবনের লাভ-লোকসানের কোন অনুভূতিও তার নেই।

কুরআন পাক এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যই বলেছে ঃ

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ তারা বাহ্যিক পার্থিব জীবন এবং এর লাভ-লোকসান যৎসামান্য বুঝে, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে এরা একেবারেই গাফিল।

অন্য এক আয়াতে পূর্ববর্তী কাফির সম্প্রদায়সমূহের কথা উল্লেখ করার পর কোরআন বলে ঃ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে এমন তীব্র গাফিল ব্যক্তিরা এ জগতে বোকা ও নির্বোধ ছিল না ; বরং তারা ছিল উর্বর মস্তিষ্ক ও প্রগতিবাদী। কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার ঔজ্জ্বল্য শুধু জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিপাটিতেই কাজে লাগতে পারত। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এর কোন প্রভাব ছিল না।

এ বিবরণ শোনার পর আলোচ্য আয়াতটি পুনরায় পাঠ করুন ঃ

اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ـ

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত অর্থাৎ কাফির ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি অর্থাৎ মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন একটি নূর অর্থাৎ ঈমান দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে বের হতে পারে না। অর্থাৎ কুফরের অন্ধকারসমূহে পতিত। সে নিজেই নিজের লাভ-লোকসান চেনে না, অপরের কি উপকার করবে।

ঈমানের আলোর উপকার অন্যেরাও পায় ঃ আয়াতে نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ বলে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈমানের আলো শুধু মসজিদ. খানকাহ্, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হুজরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ নূর প্রাপ্ত হয়, সে একে নিয়ে জনসমাবেশে চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌঁছায়। আলো কোন অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। একটি মিটিমিটি প্রদীপও অন্ধকারে নতি স্বীকার করে না, তবে প্রদীপের আলো দূর পর্যন্ত পৌঁছে না। কিরণ প্রখর হলে দূরে পৌঁছে এবং নিস্তেজ হলে অল্প স্থান আলোকিত করে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই সে অন্ধকার ভেদ করে। অন্ধকার তাকে ভেদ করতে পারে না। অন্ধকার যে আলোকে ভেদ করে, সে আলোই নয়। এমনিভাবে যে ঈমান কুফরের কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের নূর মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সর্বযুগে মানুষের সাথে আছে।

এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু না কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর মালিক চায় না যে, অন্য কেউ এ আলোর দ্বারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার লাভের ইচ্ছা করেনি, কিন্তু কারো সাথে আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবে সবাই তা দ্বারা উপকৃত হবে। এমনিভাবে মু'মিনের ঈমান দ্বারা অন্যরাও কিছু-না-কিছু উপকার লাভ করে, সে অনুভব করুক বা না করুক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ

এসব স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্ত্বেও কাফিরদের কুফরে অটল থাকার কারণ এই যে, هر كس بخيال خويش خبطے دارد (প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা বাতিক পোষণ করে)। শয়তান ও মানসিক প্রবৃত্তি তাদের মন্দ কাজকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে রেখেছে—এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি। (নাউযুবিল্লাহ্ মিনহু)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٤﴾ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

(১২৩) আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি—যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। (১২৪) যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, তখন বলে ঃ আমরা কখনই মানব না, যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহ্‌র রাসূলগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ্ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অতি সত্বর আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে। (১২৫) অতঃপর আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ—অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন—যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এটা কোন নতুন বিষয় নয় ; মক্কার সর্দাররা যেমন এসব অপরাধ করে যাচ্ছে এবং তাদের প্রভাবে অন্যরাও এতে সায় দিচ্ছে) এমনিভাবে আমি (পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও)

প্রত্যেক জনপদে সেখানকার সর্দারদের (প্রথমে) অপরাধকারী করেছি, (এরপর তাদের প্রভাবে জনগণও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে) যাতে তারা সেখানে (পয়গম্বরদের ক্ষতি করার জন্য) চক্রান্ত করে। (ফলে তাদের শাস্তিযোগ্য হওয়ার বিষয়টি দিবালোকের মত প্রকটিত হয়ে যায়।) এবং তারা (নিজ ধারণায় অপরকে ক্ষতিগ্রস্থ করলেও বাস্তবে) নিজেদের সাথেই চক্রান্ত করছে। (কেননা, এর শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে।) আর (চূড়ান্ত মূর্খতার কারণে) তারা (এর) কিছুই খবর রাখে না। (কাফিরদের অপরাধ এতই বেড়ে গেছে যে,) যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, (স্বীয় অলৌকিকতার কারণে তা নবুয়ত সপ্রমাণে যথেষ্ট হলেও তারা) তখন বলে ঃ আমরা (এ নবীর প্রতি) কখনই বিশ্বাস স্থাপন করব না, যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা (অর্থাৎ যেসব প্রত্যাদেশ, সম্বোধন কিংবা ঐশী গ্রন্থ) আল্লাহ্র রাসূলরা প্রাপ্ত হন। (যাতে আমাদের পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ থাকবে। তাদের এ উক্তি যে বিরাট অপরাধ, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, মিথ্যারোপ, হঠকারিতা, অহংকার, ধৃষ্টতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ উক্তি খণ্ডন করে বলেন,) আল্লাহ্ তা'আলাই এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় (ওহী সহকারে) স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। (সবাই কি এ গৌরব লাভের যোগ্য হয়েছে ঃ تا نبخشد خدائے بخشندہ যে পর্যন্ত দাতা আল্লাহ্ দান না করেন ?) অতঃপর (এ অপরাধের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে যে,) যারা এ অপরাধ করছে অতি সত্বর তারা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে (অর্থাৎ পরকালে) লাঞ্ছনা ভোগ করবে (যেমন তারা নিজেদের নবীর মোকাবিলায় সম্মান ও নবুয়তের যোগ্য মনে করেছিল)। কঠোর শাস্তি (পাবে) তাদের চক্রান্তের কারণে, অতএব, (পূর্বে মু'মিন ও কাফিরের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে জানা গেল যে) আল্লাহ্ যাকে (মুক্তির) পথ প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে (অর্থাৎ অন্তরকে) ইসলামের জন্য (অর্থাৎ ইসলাম কবূল করার জন্য) উন্মুক্ত করে দেন (ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করতে ইতস্তত করে না। এটাই পূর্বোল্লিখিত নূর।) এবং যাকে (সৃষ্টিগত ও বিধিগতভাবে) বিপথগামী রাখতে ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে (অর্থাৎ অন্তরকে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে) সংকীর্ণ (এবং) অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন, (ইসলাম গ্রহণ করা তার কাছে এমন কঠিন বিপদ বলে মনে হয়, যেন) আকাশে আরোহণ করে। (অর্থাৎ আকাশে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু করতে পারে না। ফলে বিরক্তিবোধ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয়। সুতরাং এ ব্যক্তি যেমন আরোহণ করতে পারে না) এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্ তাদের উপর (যেহেতু তাদের কুফর ও চক্রান্তের কারণে) অভিশাপ নিক্ষেপ করেন (তাই তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছিল যে, এ জগত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে সৎকর্মের সাথে যেমন কিছু পরিশ্রম, কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে। তেমনি মন্দ কর্মের সাথে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ এবং কামনা-বাসনার ধোঁকা সংযুক্ত রয়েছে। এ ধোঁকা পরিণামদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে তাদের মন্দ কাজকেই সুশোভিত করে রাখে। জগতের অনেক চতুর ব্যক্তিও এ ধোঁকায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটাও এ পরীক্ষারই এক পিঠ যে, পৃথিবীর আদিকাল থেকে প্রত্যেক জনপদের সর্দার ও ধনী ব্যক্তিরাই বাস্তব সত্য ও পরিণাম ফল থেকে উদাসীন হয়ে ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হয়ে অপরাধ করে থাকে এবং জনসাধারণ বড় লোকদের পেছনে চলা এবং তাদের অনুসরণ করাকেই সৌভাগ্য ও সাফল্য গণ্য করে। আম্বিয়া (আ) ও তাঁদের নায়েব আলিম ও মাশায়েখরা তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং পরিণামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলে বড় লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করে। এসব চক্রান্ত বাহ্যত পয়গম্বর, আলিম ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধে হলেও পরিণামের দিক দিয়ে এগুলোর শাস্তি স্বয়ং তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং প্রায়শ দুনিয়াতেও তা প্রকাশ পায়।

এতে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যাতে তারা বড়লোক ও ধনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, যেন তাদের পেছনে চলার অভ্যাস না করে, যেন পরিণামদর্শিতা অবলম্বন করে এবং ভালমন্দ যেন নিজেই চিনে নেয়।

এছাড়া আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কোরাইশ সর্দারদের বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। এটা নতুন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরও এ ধরনের লোকের সাথে পালা পড়েছে। পরিণামে এরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে এবং আল্লাহ্র বাণী সমুন্নত হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে কোরাইশ সর্দারদের একটি সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। হঠকারিতা, বিদ্রূপ ও পরিহাসের ভঙ্গিতে তারা এসব কথাবার্তা বলেছিল। এরপর তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন যে, কোরাইশ প্রধান আবু জাহেল একবার বলল যে, যে আবদে মানাফ গোত্রের [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোত্রের] সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করেছি এবং কখনও পেছনে পড়িনি। কিন্তু এখন তারা বলে ঃ তোমরা ভদ্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সমতুল্য হতে পারবে না। আমাদের পরিবারে একজন নবী আগমন করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ হতে ওহী আসে। আবু জাহেল বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, আমরা কোনদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে তাদের অনুরূপ ওহী আসে। আয়াত وَاِذَا جَاۤءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ এর মর্মার্থ তাই-ই।

নবুয়ত সাধনালব্ধ বিষয় নয় বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি মহান পদ ঃ কোরআন পাক এ উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছে ঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, রিসালত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধেরা মনে করে রেখেছে যে, নবুয়ত বংশগত আভিজাত্য কিংবা গোত্রীয় সর্দারী ও ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুয়ত হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে রিসালত অর্জন করতে পারে না। এটা খাঁটি আল্লাহ্র দান। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, রিসালত ও নবুয়ত উপার্জন করার বস্তু নয় যে, জ্ঞানগত ও কর্মগত গুণাবলী অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা যাবে। আল্লাহ্র বন্ধুত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও কেউ নবুয়ত লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহ্র এ খাঁটি অনুগ্রহ আল্লাহ্র জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বান্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরী যে, আল্লাহ্ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তাঁর চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে গঠন করা হয়।

আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

سَيُصِيبُ الَّذِينَ اَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ۔

এখানে صغار শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ অপমান ও লাঞ্ছনা। এ বাক্যের অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোত্র সর্দার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতিসত্বর তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। আল্লাহ্র কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে।

'আল্লাহ্র কাছে'—এর এক অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহ্যত তারা সর্দার ও সম্মানিত হলেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং পরকালেও। যেমন পয়গম্বরদের শত্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাঁদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানিত বলে খুব আস্ফালন করত, তারা একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয় অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবূ জাহেল, আবূ লাহাব প্রমুখ কোরাইশ সর্দারের শোচনীয় অবস্থা বিশ্বাসীদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। মক্কা বিজয়ের ঘটনা তাদের সবার কোমর ভেঙে দেয়।

দীন সম্পর্কে অন্তর খুলে দেওয়া এবং এর লক্ষণাদি ঃ তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হিদায়েত প্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্টতায় অটল ব্যক্তিদের কিছু চিহ্ন ও লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়েত দিতে চান, তার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে شرح صدر অর্থাৎ অন্তর খুলে দেওয়ার তফসীর জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে একটি আলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার অন্তর সত্যকে নিরীক্ষণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় (সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘৃণা করতে থাকে।) সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ এরূপ ব্যক্তিকে চেনার মত কোন লক্ষণ আছে কি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, লক্ষণ এই

যে, এরূপ ব্যক্তির সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা পরকাল ও পরকালের নিয়ামতের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সে পার্থিব অন্যায় কামনা-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ـ

অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্টতায় রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা।

তফসীরবিদ কলবী বলেন ঃ তার অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে সত্য ও সৎকর্মের জন্য কোন পথ থাকে না। হযরত ফারুকে আযম (রা) থেকেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র যিকির থেকে তার মন বিমুখ থাকে এবং কুফর ও শিরকের কথা-বার্তায় নিবিষ্ট হয়।

সাহাবায়ে কিরাম দীনের ব্যাপারে উন্মুক্ত অন্তর ছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গ এবং প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বের জন্য মনোনীত করেছিলেন। ইসলামী বিধি-বিধানে তাঁরা খুব কমই সন্দেহ ও সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তাঁরা সারা জীবনে যেসব প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাগুনতি কয়েকটি মাত্র। কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংসর্গের কল্যাণে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা তাঁদের অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে তাঁরা شرح صدر তথা বক্ষ উন্মুক্তকরণের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁদের অন্তর আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা সত্যকে অতি সহজে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাঁদের অন্তরে পথ খুঁজে পেতো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ থেকে যতই দূরত্ব বাড়তে থাকে, সন্দেহ ও সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে।

সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা ঃ আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। তাঁরা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়।

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں
ڈور کو سلجھا رہاھے پر سرا ملتا نہیں

দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আল্লাহ্কে পায় না। সে সূতা ভাঁজ করে, কিন্তু সূতার মাথা খুঁজে পায় না।

সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নিয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ-সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ দোয়া করার আদেশ দিয়েছে ঃ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের প্রতি ধিক্কার দেন। তাদের অন্তরে সত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾
لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ
الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓـؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ
وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۭ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

(১২৬) আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ! আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছি। (১২৭) তাদের জন্যই তাদের পালনকর্তার কাছে নিরাপদ গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু, তাদের কর্মের কারণে। (১২৮) যেদিন আল্লাহ্ সবাইকে একত্র করবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা লোকদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা পরস্পর পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেনঃ আগুন হলো তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে ; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (পূর্বে যে ইসলামের কথা বলা হয়েছে,) এটাই (অর্থাৎ এ ইসলামই) আপনার পালনকর্তার (বর্ণিত) সরল পথ। (এ পথে চললেই মুক্তি পাওয়া যায়। এরই উল্লেখ রয়েছে فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ বাক্যে। এ সরল পথের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ (ভাবে) বর্ণনা করেছি (যাতে তারা এর অলৌকিকতা দৃষ্টে একে সত্য মনে করে এর বিষয়বস্তু বাস্তবায়িত করে মুক্তি লাভ করে। এ সত্য মনে করা এবং তদনুযায়ী কাজ করাই পূর্ণ সরল পথ। কিন্তু যারা উপদেশ গ্রহণের চিন্তাই করে না, তাদের

জন্য এটিও যথেষ্ট নয় এবং অন্য প্রমাণাদিও যথেষ্ট নয়। অতঃপর উপদেশ গ্রহণকারীদের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন এর আগে একাধিক বাক্যে অমান্যকারীদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকট (পৌঁছে) নিরাপদ (অর্থাৎ শান্তি ও স্থায়িত্বের) আশ্রয় (অর্থাৎ জান্নাত) রয়েছে এবং আল্লাহ্ তাদের বন্ধু তাদের (সৎ) কর্মের কারণে। আর (ঐ দিনটিও স্মরণযোগ্য) যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে একত্র করবেন (এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে শয়তান জিন, কাফিরদের উপস্থিত করে শাসিয়ে বলা হবে ঃ) হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের (অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার) ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছ (এবং তাদের পদে পদে বিভ্রান্ত করেছ। এমনিভাবে মানুষদের জিজ্ঞেস করা হবে ঃ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ মোটকথা শয়তান- জিনেরাও স্বীকার করবে) এবং যেসব লোক তাদের (শয়তান-জিনদের) বন্ধু, তারা (-ও) বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা (আপনি ঠিকই বলেছেন, বাস্তবিকই) আমরা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা (এ পথভ্রষ্টতার কাজে মানসিক) ফল লাভ করেছিলাম। (পথভ্রান্ত মানুষ স্বীয় কুফর ও শিরকের বিশ্বাসে আনন্দ পায় এবং পথভ্রষ্টকারী শয়তানরা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে প্রশান্তি লাভ করে।) এবং (প্রকৃতপক্ষে আমরাও কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিলাম।তাই তাদের পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কিন্তু আমাদের এ অবিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। সেমতে আপনি আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা সেই নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়েছি (অর্থাৎ কিয়ামত এসে গেছে।) আল্লাহ্ তা'আলা (সব জিন ও মানব কাফিরদের) বলবেন ঃ তোমাদের বাসস্থান হলো দোযখ, সেখানে তোমরা সর্বদা অবস্থান করবে। (নিষ্কৃতির কোন পথ ও উপায় নেই।) কিন্তু যদি আল্লাহ্ (বের করতে) চান, তবে ভিন্ন কথা। (অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তা চাইবেন না। অতএব চিরকাল এতেই থাকবে।) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে সবার অপরাধ জেনে নেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপযুক্ত শাস্তি দেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا অর্থাৎ এটা আপনার পালনকর্তার সরল পথ। এখানে (এটা) শব্দ দ্বারা ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতে কোরআনের দিকে এবং ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে ইসলামের দিকে ইশারা করা হয়েছে-(রুহুল মা'আনী।) উদ্দেশ্য এই যে, আপনাকে প্রদত্ত কোরআন কিংবা ইসলাম আপনার পালনকর্তার পথ অর্থাৎ এমন পথ, যা আপনার পালনকর্তা স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির করেছেন এবং মনোনীত করেছেন।এখানে পথকে পালনকর্তার দিকে সম্পৃক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন ও ইসলামের যে কর্মব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেওয়া হয়েছে, তা পালন করা আল্লাহ্ তা'আলার উপকারের জন্য নয়, বরং পালনকারীদের উপকারের জন্য পালনকর্তার দাবির ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে এমন শিক্ষাই দান করা উদ্দেশ্য যা তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

এখানে رب শব্দকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁর প্রতি এমন এক বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশ করা হয়েছে যার রসাস্বাদ বিশেষ ব্যক্তিরাই অনুভব করতে পারেন। কেননা পালনকর্তা ও উপাস্যের সাথে কোন বান্দার সামান্যতম সম্বন্ধ অর্জিত হয়ে যাওয়াও তার জন্য পরম গৌরবের বিষয়। তদুপরি যদি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার দিকে সম্বন্ধ করে বলেন যে, আমি তোমার, তখন তার সৌভাগ্যের সীমা পরিসীমা থাকে না। হযরত হাসান নিযামী (র)-এ স্তরে অবস্থান করে বলেন ঃ

بندہ حسن بصد زبان گفت کہ بندہ توام
تو زبان خود بگو کہ بندہ نواز کیستی

এরপর مُسْتَقِيْمًا শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনের এ পথই হলো সরল পথ। এখানেও مُسْتَقِيْمًا কে صِرَاطُ এর গুণ হিসেবে উল্লেখ না করে অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব পালনকর্তার স্থিরীকৃত পথ মুস্তাকীম ও সরল হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই।-(রুহুল-মা'আনী, বাহ্‌রে মুহীত)

এরপর বলা হয়েছে ঃ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি।

فَصَّلْنَا শব্দটি تَفْصِيْلٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক এক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক করে বিশদভাবে বর্ণনা করা। এভাবে গোটা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। অতএব تفصيل-এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মৌলিক মাস'আলাগুলোকে পরিষ্কার ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি এতে কোন সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতা রাখিনি। এতে ; لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোরআনের বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হলেও তদ্দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা করে ; জেদ, হঠকারিতা এবং পৈতৃক প্রথার নিশ্চল অনুসরণের প্রাচীর যাদের সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ —অর্থাৎ উপরোক্ত ব্যক্তি, যার মুক্ত মনে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ কোরআনী নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে 'দারুস-সালাম'-এর পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে 'দার' শব্দের অর্থ গৃহ এবং 'সালাম' শব্দের অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা। কাজেই 'দারুস-সালাম' এমন গৃহকে বলা যায়, যেখানে কষ্ট, শ্রম, দুঃখ, বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির সমাগম নেই। নিঃসন্দেহে এটা জান্নাতই হতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম। দারুস-সালামের অর্থ আল্লাহ্‌র গৃহ। আল্লাহ্‌র গৃহ বলতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। অতএব সার অর্থ আবারও তাই হয় যে, এমন গৃহ যাতে শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি

বিদ্যমান। জান্নাতকে দারুস-সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমাত্র জান্নাতই এমন জায়গা, যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উপদ্রব ও স্বভাববিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে নিরাপদ থাকে। এরূপ নিরাপত্তা জগতে কোন রাজাধিরাজ এবং নবী-রাসূলও কখনও লাভ করেন না। কেননা, ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তির জায়গাই নয়।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে দারুস-সালাম রয়েছে। 'পালনকর্তার কাছে' এর এক অর্থ এই যে, এ দারুস সালাম ইহজগতে নগদ পাওয়া যায় না। কিয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয় পালনকর্তার কাছে যাবে, তখনই তা পাবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস সালামের ওয়াদা ভ্রান্ত হতে পারে না। পালনকর্তা নিজেই এর জামিন। তাঁর কাছে তা সংরক্ষিত রয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দারুস সালামের নিয়ামত ও আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে পালনকর্তার কাছে এ ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে দারুস সালাম লাভ করা কিয়ামত ও পরকালের উপর নির্ভরশীল মনে করা হয় না, বরং পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা এ জগতেও সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দারুস সালাম দান করতে পারেন। ফলে দুনিয়াতে কোন বিপদাপদই তাকে স্পর্শ করে না। যেমন পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও ওলীগণের মধ্যে এর নজীর দেখতে পাওয়া যায়। অথবা পরকালের নিয়ামত তার সামনে উপস্থিত করে তাঁর দৃষ্টিকে এমন সত্যদর্শী করে দেওয়া হয় যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিপদাপদ তার দৃষ্টিতে নিতান্ত নগণ্য প্রতিভাত হতে থাকে। বিপদের পাহাড়ও তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না।

رنج راحت شد چو مطلب شد بزرگ
گرد گله تو تیائے چشم گرگ

এ ধরনের লোকদের সামনে দুনিয়ার কষ্টের বিপরীতে পরকালের নিয়ামতসমূহ এমনভাবে উপস্থিত হয় যে, দুনিয়ার কষ্টও তাদের কাছে সুস্বাদু মনে হতে থাকে। এটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। দেখুন, পরকালের নিয়ামত তো অনেক বড় জিনিস, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখের কল্পনা মানুষের কাছে কত পরিশ্রম ও কষ্টকে সুস্বাদু করে দেয়। মানুষ সুপারিশ ও ঘুষ দিয়ে স্বাধীনতার সুখ বিসর্জন দেয় এবং অধীর আগ্রহ সহকারে এমন চাকুরী ও মজুরির শ্রম অন্বেষণ করে, যা তার নিদ্রা ও সুখের পক্ষে কালস্বরূপ। এ মজুরি পেয়ে গেলে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হয়। কেননা তার সামনে ৩০ দিন পূর্ণ হয়ে গেলে যে বেতন পাবে, তার আনন্দ উপস্থিত থাকে। এ আনন্দ চাকুরী ও মজুরির সব তিক্ততাকে সুস্বাদু করে দেয়। কোরআন পাকের وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ আয়াতের এক তফসীর এরূপও আছে যে, আল্লাহ্‌ভীরুরা দু'টি জান্নাত পাবে। একটি পরকালে আর অপরটি দুনিয়াতে। দুনিয়ার জান্নাত এই যে, প্রথমত, তাদের প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য থাকে। প্রত্যেক কাজ সহজ মনে হতে থাকে এবং কখনও সাময়িক কষ্ট ও অকৃতকার্যতা হলেও পরকালের নিয়ামতের মোকাবেলায় তাও তাদের কাছে সুস্বাদু মনে হয়। ফলে তাও সুখের আকার ধারণ করে।

মোটকথা, এ আয়াতে সৎলোকের জন্য যে দারুস-সালামের কথা বলা হয়েছে, তা পরকালে তো নিশ্চিত ও অবধারিত ; পরন্তু দুনিয়াতেও তাদেরকে দারুস-সালামের সুখ ও আনন্দ দেওয়া যেতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তাদের সৎকর্মের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান। তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যায়।

তৃতীয় আয়াতে হাশরের ময়দানে সব জিন ও মানবকে একত্র করার পর উভয় দলের সাথে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শয়তান জিনদেরকে সম্বোধন করে তাদের অপরাধ ব্যক্ত করবেন এবং বলবেন ঃ তোমরা মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার কাজে বিরাট অংশ নিয়েছ। এর উত্তরে জিনরা কি বলবে, কোরআন তা উল্লেখ করেনি। তবে এটা বোঝা যায় যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র সামনে স্বীকারোক্তি করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি উল্লেখ না করার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ প্রশ্ন শুনে তারা এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, উত্তর দেওয়ার জন্য মুখ খুলতে পারবে না। --(রূহুল-মা'আনী)

এরপর শয়তান মানব অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা শয়তানদের অনুগামী ছিল, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র দরবারে একটি উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রশ্ন যদিও তাদেরকে করা হয়নি, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তাদেরকেও যেন সম্বোধন করা হয়েছিল। কেননা, তারাও শয়তান জিনদের কাজ অর্থাৎ পথভ্রষ্টতা প্রচার করেছিল। এ প্রাসঙ্গিক সম্বোধনের কারণে তারা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, মানবরূপী শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে। তা স্পষ্টত এখানে উল্লেখ করা না হলেও সূরা ইয়াসিনের এক আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ। অর্থাৎ হে আদম সন্তানরা, আমি কি তোমাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে বলি নি যে, শয়তানদের অনুসরণ করো না?

এতে বোঝা যায় যে, এ সময়ে মানুষ শয়তানদেরও প্রশ্ন করা হবে। তারা উত্তরে স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা শয়তানদের কথা মান্য করার অপরাধ করেছি। তারা আরও বলবে ঃ হাঁা, জিন শয়তানরা আমাদের সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের কাছ থেকে এ ফল লাভ করেছে যে, দুনিয়ার মজা লুটবার উপায়াদি শিক্ষা করেছে এবং কোথাও কোথাও জিন শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য পন্থায় তাদের কাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেছে, যেমন মূর্তিপূজারী হিন্দুদের মধ্যে বরং ক্ষেত্র বিশেষে অনেক মূর্খ মুসলমানের মধ্যেও এ পন্থা প্রচলিত আছে, যদ্দ্বারা শয়তান ও জিনদের কাছ থেকে কোন কোন কাজে সাহায্য নেওয়া যায়। জিন শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে যে ফল লাভ করেছে, তা এই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা হয়েছে এবং তারা মানুষকে অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি, তারা মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীকার করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার কারণে আমরা যে মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন তা সামনে এসে গেছে। এ স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ

اَلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ . اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ .

অর্থাৎ তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে, তোমাদের বাসস্থান হবে অগ্নি, যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। তবে আল্লাহ্ কাউকে তা থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। কোরআনের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলাও তা চাইবেন না। তাই অনন্তকালই সেখানে থাকতে হবে।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

(১২৯) এমনিভাবে আমি পাপীদের একে অপরের সাথে যুক্ত করে দেব তাদের কাজকর্মের কারণে। (১৩০) হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বররা আগমন করেন নি; যাঁরা তোমাদের আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদের আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে ঃ আমরা স্বীয় গুনাহ্ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফির ছিল। (১৩১) এটা এ জন্য যে, আপনার পালনকর্তা কোন জনপদের অধিবাসীদের যুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না এমতাবস্থায় যে, তথাকার অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকে। (১৩২) প্রত্যেকের জন্য তাদের কর্মের আনুপাতিক মর্যাদা আছে এবং আপনার পালনকর্তা তাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (দুনিয়াতে যেভাবে পথভ্রষ্টতার দিক দিয়ে সবার মধ্যে সম্পর্ক ও নৈকট্য ছিল) এমনিভাবে (দোযখে) আমি কতিপয় কাফিরকে কতিপয় কাফিরের নিকটে (-ও) একত্রে রাখব তাদের (কুফরী) কাজকর্মের কারণে। (জিন ও মানবকে তাদের পারস্পরিক অবস্থার দিক দিয়ে

এ সম্বোধন করা হয়েছিল। অতঃপর প্রত্যেককে তার বিশেষ ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে সম্বোধন করা হচ্ছে যে,) হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, (এবার বল তোমরা যে কুফর ও অস্বীকার করছিলে) তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন করেন নি, যাঁরা তোমাদের আমার (বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কিত) বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদের আজকের এ দিনের ভীতি প্রদর্শন করতেন? (অতঃপর কি কারণে তোমরা কুফর থেকে বিরত হওনি ?) তারা বলবে ঃ আমরা সবাই নিজেদের বিরুদ্ধে (অপরাধ) স্বীকার করছি। (আমাদের কাছে কোন ওযর ও সাফাই নেই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপস্থিত বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ) এবং পার্থিব জীবন তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে (তারা পার্থিব ভোগ-বিলাসকে প্রধান উদ্দেশ্য মনে করে রেখেছে--পরকালের চিন্তাই নেই) এবং (এর পরিণামে সেখানে) তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করবে যে, তারা (অর্থাৎ আমরা) কাফির ছিলাম (এবং ভুল করেছিলাম। কিন্তু সেখানে স্বীকার করলে কি হবে ? দুনিয়াতে সামান্য মনোযোগী হলে এ অশুভ দিন কি দেখতে হতো ? পূর্বে পয়গম্বর প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। অতঃপর পয়গম্বর প্রেরণে আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে যে) এটা (অর্থাৎ পয়গম্বর প্রেরণ) এ জন্য আপনার পালনকর্তা কোন জনপদের অধিবাসীদের (তাদের) কুফরের কারণে (দুনিয়াতেও) এমতাবস্থায় ধ্বংস করেন না যে, জনপদবাসীরা (পয়গম্বর না আসার কারণে আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে) অজ্ঞাত থাকে। (অতএব পরকালের শাস্তি তো আরও কঠোর। এটা পয়গম্বর প্রেরণ করা ছাড়া কিছুতেই হতে পারত না। তাই আমি পয়গম্বরদের প্রেরণ করি--যাতে তারা অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। এরপর যার শাস্তি হয়,, যথা যোগ্য কারণেই হয়। সেমতে বলা হচ্ছে) এবং (যখন পয়গম্বর আগমন করে এবং তারা অপরাধ জানতে পারে, তখন যে যেরূপ করবে) প্রত্যেকের (জিন, মানব এবং সব অসতের জন্য (শাস্তি ও পুরস্কারের) পদমর্যাদা আছে, তাদের কৃতকর্মের কারণে এবং আপনার পালনকর্তা তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত নন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে نُوَلِّي শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. পরস্পরকে যুক্ত করে দেওয়া ও নিকটবর্তী করে দেওয়া এবং দুই. শাসক হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে উভয় প্রকার অর্থই বর্ণিত আছে।

হাশরে কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে দল গঠিত হবে—জাগতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় ঃ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ্ (রা) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মানুষের দল ও পার্টি, বংশ, দেশ, কিংবা বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে হবে না : বরং কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে হবে।আল্লাহ্র আনুগত্যশীল মুসলমান যেখানেই থাকবে মুসলমানদের সাথী হবে এবং অবাধ্য কাফির যেখানেই থাকবে, সে কাফিরদের সাথী হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্যই থাকুক না কেন।

এরপর মুসলমানদের মধ্যেও সৎ ও ধার্মিকেরা ধার্মিকদের সাথে থাকবে এবং পাপী ও কুকর্মীদেরকে কুকর্মীদের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হবে। সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا

النُّفُوسُ زُوِّجَتْ। অর্থাৎ মানবকুলের যুগল ও দল তৈরি করে দেওয়া হবে। এর উদ্দেশ্যও তাই যে, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে হাশরবাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

হযরত ওমর ফারূক (রা) এ আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ সৎ কিংবা অসৎ এক ধরনের আমলকারীদের একত্র করে দেওয়া হবে। সৎ লোকদের সাথে জান্নাতে এবং অসৎ লোকেরা অসৎদের সাথে জাহান্নামে পৌঁছবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থনে হযরত ওমর (রা) কোরআন পাকের أُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করেছেন। এ আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই যে, কিয়ামতের দিন আদেশ হবে ঃ জালিমদের এবং তাদের অনুরূপ আমলকারীদের জাহান্নামে একত্র কর।

আলোচ্য আয়াতের সার-বিষয়বস্তু এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কতক যালিমকে অন্য যালিমদের সাথে যুক্ত করে একদলে পরিণত করে দেবেন–বংশগত ও দেশগতভাবে তাদের মধ্যে যতই দূরত্ব থাক না কেন।

অন্য এক আয়াতে একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ মানুষের মধ্যে বংশ, দেশ, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে যে জাগতিক ও আনুষ্ঠানিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, হাশরের মাঠে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বলা হয়েছে ঃ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ–অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও ঐকমত্য পোষণকারী ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দুনিয়ার সংঘবদ্ধ কাজ-কারবারে কর্ম ও চরিত্রের প্রভাব ঃ জাগতিক আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক সংগঠনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিয়ামতের দিন তো সুস্পষ্টভাবে সবারই দৃষ্টিগোচর হবে, দুনিয়াতেও এর সামান্য নমুনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে সৎ লোকের সম্পর্ক সৎ লোকদের সাথে স্থাপিত হয় এবং তাদেরই দল ও সমাজের সাথে জড়িত থাকে। ফলে তাদের সামনে সৎকর্মের বিভিন্ন পথ খুলতে থাকে এবং তার সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে। এমনিভাবে অসৎ ব্যক্তির সম্পর্ক তার মত অসৎ ব্যক্তিদের সাথেই স্থাপিত হয়। সে তাদের মধ্যে ওঠাবসা করে। তাদের সংসর্গে তার অসৎ কর্ম ও অসচ্চরিত্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সামনে সৎকর্মের দ্বার রুদ্ধ হতে থাকে। এটা তার মন্দকর্মের নগদ সাজা, যা এ দুনিয়াতেই সে পায়।

মোটকথা এই যে, সৎ ও অসৎ কর্মের এক প্রতিদান ও শাস্তি তো পরকালে পাওয়া যাবে এবং এক প্রতিদান ও শাস্তি এ জগতে নগদ পাওয়া যায়। তা এই যে, সৎ ব্যক্তি সৎ সহকর্মী, সৎ ও ধার্মিক সাথী পেয়ে যায়, যারা তার কাজকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলে। পক্ষান্তরে অসৎ ব্যক্তির সহকর্মীও তার মতই হয়ে থাকে, যারা তাকে আরও গভীর গর্তে ধাক্কা দিয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন বাদশাহ্ ও শাসনকর্তার প্রতি প্রসন্ন হলে তাকে সৎ মন্ত্রী ও সৎ কর্মচারী দান করেন। ফলে তার রাজ্যের সব কাজ-কর্ম ঠিক-ঠাক ও উন্নত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা কারও প্রতি অপসন্ন হলে সে অসৎ সহকর্মী ও অসৎ কর্মচারী পায়। সে কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করলেও কুলিয়ে উঠতে পারে না।

এক যালিম অপর যালিমের হাতে শাস্তি ভোগ করে ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা نُوَلِّىْ শব্দের প্রথমোক্ত অর্থের দিক দিয়ে বর্ণিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের, ইবনে

যায়েদ (রা), মালেক ইবনে দীনার (র) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের তফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা একজন যালিমকে অপর যালিমের উপর শাসক হিসাবে চাপিয়ে দেন এবং এভাবে এককে অপরের হাতে শাস্তি দেন।

এ বিষয়বস্তুও স্বস্থানে সঠিক ও নির্ভুল এবং কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ كما تكونون كذالك يؤمر عليكم অর্থাৎ তোমরা যেরূপ হবে তোমাদের উপর তদ্রূপ শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে। তোমরা যালিম ও পাপাচারী হলে তোমাদের শাসনকর্তাও যালিম এবং পাপাচারীই হবে। পক্ষান্তরে তোমরা সাধু ও সৎকর্মী হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শাসনকর্তারূপে সাধু, দয়ালু ও সুবিচারক লোকদের মনোনীত করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল চান, তখন তাদের উপর সর্বোত্তম শাসক নিযুক্ত করেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন কোন সম্প্রদায়ের অমঙ্গল চান, তখন তাদের উপর নিকৃষ্টতম শাসক ও বাদশাহ্ চাপিয়ে দেন এবং তাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেন।

ইবনে-কাছীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ من اعـان ظالما سلطه الله عليـه—অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর অত্যাচারে তাকে সাহায্য করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এ জালিমকেই তার উপর চাপিয়ে দেন। তার হাতেই তাকে শাস্তি দেন। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এ প্রশ্নটি হাশরের ময়দানে জিন ও মানবকে করা হবে। প্রশ্নটি এই তোমরা কি কারণে কুফর ও আল্লাহ্র অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে ? তোমাদের কাছে কি আমার পয়গম্বর পৌঁছেনি ? সে তো তোমাদের মধ্য থেকেই ছিল এবং আমার আয়াতসমূহ তোমাদের পাঠ করে শোনাত, আজকের দিনের উপস্থিতি এবং হিসাব-কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত। এর উত্তরে তাদের সবার পক্ষ থেকে পয়গম্বরদের আগমন, আল্লাহ্র বাণী পৌঁছানো এবং এতদসত্ত্বেও কুফরে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভ্রান্ত কর্মের কোন কারণ ও হেতু তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়নি, বরং আল্লাহ্ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ভোগ-বিলাস ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। ফলে তারা একেই সবকিছু মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয় আকবর এলাহাবাদীর ভাষায় ঃ

تهی فقط غفلت هی غفلت ، عیش کادن کچه نه تها
هم اسے سب کچه سمجهتے تهے وه لیکن کچه نه تها

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদের কুফর ও শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ মুছে অস্বীকার করবে এবং পালনকর্তার দরবারে কসম খেয়ে মিথ্যা বলবে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَـــا كُنَّا

مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তার কসম, আমরা কখনও মুশরিক ছিলাম না। অথচ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ সহকারে স্বীয় কুফর ও শিরক স্বীকার করে নেবে। অতএব আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা অস্বীকার করবে। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন। হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নেবেন। আল্লাহ্র কুদরতে সেগুলো বাক শক্তি প্রাপ্ত হবে। সেগুলো পরিষ্কারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে দেবে। তখন জিন ও মানব জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান, জিহবা সবই ছিল আল্লাহ্র গুপ্ত পুলিশ যারা সব কাজ-কারবার ও অবস্থার অভ্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর অস্বীকার করার জো থাকবে না। তখন তারা সবাই পরিষ্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নেবে।

জিনদের মধ্যেও কি পয়গম্বর প্রেরিত হন ঃ দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন তোমাদের মধ্য থেকে আমার পয়গম্বর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি ? এতে বোঝা যায় যে, মানব জাতির পয়গম্বর রূপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জিন জাতির পয়গম্বর রূপে জিন প্রেরিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে হাদীস ও তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন, রাসূল ও নবী একমাত্র মানবই হয়েছে। জিন জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রাসূল হয়নি ; বরং মানব রাসূলের স্বজাতির কাছে পৌছানোর জন্য জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিযুক্ত হয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে মানব-রাসূলদের দূত ও বার্তাবহ ছিল। অপ্রকৃতভাবে তাদেরকেও রাসূল বলে দেওয়া হয়। যেসব তফসীরবিদ এ কথা বলেন, তাঁদের প্রমাণ ঐসব আয়াত, যেগুলোতে জিনদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নবীর বাণী অথবা কোরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কাছে পৌছিয়েছে। উদাহরণত وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ এবং সূরা জিনের আয়াত قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ইত্যাদি।

কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে একদল আলিম এ বিয়েরও প্রবক্তা যে, শেষ নবী (সা)-এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রাসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন। মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে মানব-রাসূল এবং জিন জাতির বিভিন্ন স্তরে জিন-রাসূলই আগমন করতেন। শেষনবী (সা)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিনদের একমাত্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন ; তাও কোন এক বিশেষ কালের জন্য নয় বরং কিয়ামত অবধি সমস্ত জিন ও মানব তাঁর উম্মত এবং তিনিই সবার রাসূল।

জিনদেরই হিন্দুদের কোন রাসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা ঃ কালবী, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এ উক্তিই পছন্দ করেছেন। কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেন ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম (আ)-এর পূর্বে জিনদের রাসূল জিনদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হতো। যখন একথা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে জিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানব জাতির

মত বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরীয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহ্র বিধান পৌঁছানোর জন্য পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য।

কাযী সানাউল্লাহ (র) আরো বলেন ঃ ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরোনো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুসৃত অবতারনের সে যুগেরই লোক বলে উল্লেখ করে। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা এ জিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং তাদেরই আনীত নির্দেশাবলী পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমনি ধরনের। কারও অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত-পা, কারও হাতীর মত শুঁড়। এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি ধারণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জিন জাতির রাসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের নির্দেশাবলীর সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শিরক ও মূর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যদি আসল ধর্মগ্রন্থ এবং জিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলীও বিদ্যমান থাকত তবুও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাব ও রিসালতের পর তাও রহিত হয়ে যেত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থের তো কথাই নেই।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও জিনদের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করা আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোন জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে পূর্বাহ্নে পয়গম্বরদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং হিদায়েতের আলো প্রেরণ করা হয়।

চতুর্থ আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মানব ও জিন জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। এসব পদমর্যাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান ও শাস্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ
بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ مَا
تُوعَدُونَ لَآتٍ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا
عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ
الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ
الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا

الشُّرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ
وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

(১৩৩) আপনার পালনকর্তা অমুখাপেক্ষী, করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে দেবেন এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত করবেন ; যেমন তোমাদের অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) যে বিষয়ের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা অক্ষম করতে পারবে না। (১৩৫) আপনি বলে দিন ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। অচিরেই জানতে পারবে যে, পরিণাম গৃহ কে লাভ করে। নিশ্চয় যালিমরা সুফলপ্রাপ্ত হবে না। (১৩৬) আল্লাহ্ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে ঃ এটা আল্লাহ্র এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের তা তো আল্লাহ্র দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহ্র তা উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আপনার পালনকর্তা (পয়গম্বরদেরকে এজন্য প্রেরণ করেন না যে, তিনি নাঊযুবিল্লাহ্ ইবাদতের মুখাপেক্ষী। তিনি তো) সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। (তবে রাসূল প্রেরণের কারণ এই যে, তিনি) করুনাময়ও বটে। (স্বীয় করুণায় রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, যাতে তাঁদের মাধ্যমে মানুষ লাভ-লোকসান ও ক্ষতিকর বস্তুসমূহ জানতে পারে, অতঃপর লাভজনক বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে পারে। আর ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত থাকতে পারে। সুতরাং এতে বান্দারই উপকার। আল্লাহ্র অমুখাপেক্ষীতা এমন যে,) তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের সবাইকে (দুনিয়া থেকে হঠাৎ) উচ্ছেদ করে দেবেন এবং তোমাদের পর যাকে (অর্থাৎ যে সৃষ্টজীবকে) ইচ্ছা তোমাদের স্থলে (দুনিয়াতে) অভিষিক্ত করবেন ; যেমন (এর নজীর পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে যে,) তোমাদেরকে (অর্থাৎ যারা এখন বিদ্যামান রয়েছে) অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন। (যাদের অস্তিত্ব কোথাও নেই এবং তোমরা তাদেরই স্থলে বিদ্যমান। এমনিভাবে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এ ধারা পর্যায়ক্রমে চলছে। আমি ইচ্ছা করলে সহসাই তা করতে পারি। কেননা কারও থাকা না থাকায় আমার কোন কাজ বন্ধ থাকে না। অতএব পয়গম্বর প্রেরণ আমার কোন অভাব মোচনের জন্য নয়, বরং তোমাদেরই অভাব মোচনের জন্য। তোমাদের উচিত তাঁদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, তাঁদের অনুসরণ করে সৌভাগ্য অর্জন করা এবং কুফর ও অবিশ্বাসের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা। কেননা) যে বিষয়ে (পয়গম্বরদের মাধ্যমে) তোমাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়, অর্থাৎ কিয়ামত ও শাস্তি) তা অবশ্যই আগমন করবে এবং (যদি মনে কর যে, কিয়ামত আগমন করলেও আমরা কোথাও

পলায়ন করব–ধরা পড়ব না, যেমন দুনিয়াতে শাসকবর্গের অপরাধীরা মাঝে মাঝে এমন করতে পারে, তবে মনে রেখো) তোমরা (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে পারবে না (যে, তাঁর হাতে ধরা পড়বে না। যদি সত্য নির্ধারণে প্রমাণাদি সত্ত্বেও কেউ মনে করে যে, কুফরের পথই উত্তম–ইসলামের পথ মন্দ, অতএব কিয়ামতের আবার কিসের ভয়, তবে তাদের উত্তরে) আপনি (শেষ কথা) বলে দিন ঃ হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আপন অবস্থানুযায়ী কাজ কর, আমিও (স্বস্থানে) কাজ করছি। বস্তুত অচিরেই তোমরা জানতে পারবে এ জগতের (অর্থাৎ এ জগতের কাজকর্মের) পরিণতি কার জন্য শুভ (আমাদের জন্য, না তোমাদের জন্য) ? এটা নিশ্চিত যে, অত্যাচারীরা কখনও (পরিণামে) সুফল পাবে না। (আর আল্লাহ্‌র প্রতি জুলুম তথা তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা হলো সর্ববৃহৎ অপরাধ। বিশুদ্ধ প্রমাণাদিতে সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যেতে পারে যে, ইসলামের পথে অত্যাচার আছে, না কুফরের পথে। যে ব্যক্তি প্রমাণাদিতেও চিন্তা করে না, তাকে এতটুকু বলে দেওয়া যথেষ্ট যে, فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ অতি সত্বর এ কুকর্মের পরিণতি জানতে পারবে।) আর আল্লাহ্ তা'আলা যেসব শস্যক্ষেত্র (ইত্যাদি) এবং জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) সেগুলো থেকে কিছু অংশ আল্লাহ্‌র নামে নির্ধারণ করেছে; (এবং কিছু অংশ প্রতিমাগুলোর নামে নির্ধারণ করেছে ; অথচ এগুলো সৃষ্টি করার মধ্যে কোন অংশীদার নেই) এবং নিজ ধারণা অনুসারে তারা বলে যে, এটা আল্লাহ্‌র (যা অতিথি, মুসাফির, ফকির, মিসকীন ইত্যাদি সাধারণ খাতে ব্যয় হয়) আর এটা আমাদের অংশী উপাস্যদের (যা বিশেষ বিশেষ খাতে ব্যয় হয়)। অতঃপর যে সব বস্তু তাদের উপাস্যদের (নামের) তা তো আল্লাহ্‌র (নামের অংশের) দিকে পৌঁছে না (বরং ঘটনাচক্রে পৌঁছে গেলেও পৃথক করে ফেলা হয়)। পক্ষান্তরে যে বস্তু আল্লাহ্‌র (নামের) তা তাদের উপাস্যদের (নামের অংশের) দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কত মন্দ। (কেননা, প্রথমত আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তু অন্যের নামে কেন যাবে ? দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র অংশ থেকেও হ্রাস করা হয়। এর ভিত্তি যদি ধনাঢ্যতা ও অভাবগ্রস্ততা হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে অভাবগ্রস্ত স্বীকার করে উপাস্য মনে করা আরও বেশি নির্বুদ্ধিতা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, জিন ও মানব জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ে রাসূল ও হিদায়েত প্রেরণ করা আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন রীতি। পয়গম্বরদের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণভাবে সতর্ক না করা পর্যন্ত কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার কারণে কখনও তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বর ও ঐশী গ্রন্থসমূহের অব্যাহত ধারা এ জন্যে ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের ইবাদত ও অনুগত্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন কিংবা তাঁর কোন কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তবে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়াগুণেও গুণান্বিত। সমগ্র বিশ্বকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মেটানোর কারণও তাঁর এ দয়াগুণ। নতুবা বেচারা মানুষ নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, যে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার

রীতিনীতিও জানে না। বিশেষত অস্তিত্বের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মত স্পষ্ট। কোন মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্য দোয়া করেনি এবং অস্তিত্ব লাভের পূর্বে দোয়া করা কল্পনাও করা যায় না। এমনিভাবে অন্তর এবং যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি যেমন হাত পা, মন-মস্তিষ্ক প্রভৃতি এগুলো কোন মানব চেয়েছিল কি ? না তার চাওয়ার মত অনুভূতি ছিল ঃ কিছুই নয়, বরং

ما نبوديم وتقاضا ما نبود
لطفِ تونا گفته مامی شنود

আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন। জগত সৃষ্টি শুধু তাঁর অনুগ্রহের ফল ঃ মোটকথা,আলোচ্য আয়াতে رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ শব্দ দ্বারা বিশ্ব পালনকর্তার অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথে যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি যদিও কারও মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু অমুখাপেক্ষিতার সাথে সাথে তিনি ذُو الرَّحْمَةِ অর্থাৎ করুণাময়ও বটে।

আল্লাহ্ যে কোন মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য ঃ অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্ পাকেরই বিশেষ গুণ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না ; বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হতো। কোরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى অর্থাৎ মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়, তখন অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে মেতে ওঠে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাও চাকর-চাকরানীর মুখাপেক্ষী। বিত্তশালী ও মিল মালিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী। প্রত্যূষে একজন শ্রমিক ও রিক্সাচালক কিছু পয়সা উপার্জন করে অভাব-অনটন দূর করার জন্য যেমন রোজগারের তালাশে বের হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিও শ্রমিক, রিক্সা ও যানবাহনের খোঁজে বের হয়। সর্বশক্তিমান সবাইকে অভাব-অনটনের এক শিকলে বেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী, কারও প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। এরূপ না হলে কোন ধনী ব্যক্তি কাউকে এক পয়সাও দিত না এবং কোন শ্রমিক কারও সামান্য বোঝাও বহন করত না। এটা একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি অমুখাপেক্ষীতা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু, করুণাময়। এস্থলে ذو الرحمة শব্দের পরিবর্তে رحمان কিংবা رحيم শব্দ ব্যবহার করলেও উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়ে যেত ; কিন্তু غنى শব্দের সাথে রহমত গুণ সংযোজনের মাধ্যমে বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য ذو الرحمة ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি غنى ও পুরোপুরি অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি রহমতেরও অধিকারী। এ গুণটিই পয়গম্বর ও ঐশীগ্রন্থ প্রেরণের আসল কারণ।

এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, তেমনি তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক কাজে পরিব্যাপ্ত। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তাঁর কুদরতের কারখানায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দিবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সৃষ্টজগৎকে ধ্বংস করে তদস্থলে

অন্য সৃষ্টজগৎ এমনিভাবে এ মুহূর্তে উদ্ভব করে স্থাপন করতে পারেন। এর একটি নজীর প্রতি যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে। আজ কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাস করছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। যদি আজ থেকে একশ বছর পূর্বেকার অবস্থার দিকে তাকান যায়, তবে দেখা যাবে, তখনও এ পৃথিবী এমনিভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ-কারবার এভাবেই চলত ; কিন্তু তখন বর্তমান অধিবাসী ও কার্য পরিচালনাকারীদের কেউ ছিল না। অন্য এক জাতি ছিল, যারা আজ ভূগর্ভে চলে গেছে এবং যাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান দুনিয়া সে জাতির বংশধর থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاۤءُ كَمَاۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ .

অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। 'নিয়ে যাওয়ার' অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যেন নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। তাই এখানে ধ্বংস করা বা মেরে ফেলার কথা বলা হয়নি ; বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে। এতে পুরোপুরি ধ্বংস ও নাম-নিশানাহীন করে দেওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর দ্বিতীয় আয়াতে অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ وَّمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয়প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা একত্রিত হয়েও আল্লাহ্র সে আযাব প্রতিরোধ করতে পারবে না। তৃতীয় আয়াতে পুনরায় তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ . فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ . اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ .

এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি মক্কাবাসীদের বলে দিন ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! যদি তোমরা আমার কথা না মান, তবে তোমাদের ইচ্ছা, না মান এবং স্বস্থানে স্বীয় বিশ্বাস ও হঠকারিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে থাকব। এতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কে পরকালে মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে। মনে রেখ, যালিম অর্থাৎ অধিকার আত্মসাৎকারী কখনও সফল হয় না।

তফসীরবিদ ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ স্থলে আয়াতে مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ বলা হয়েছে এবং عَاقِبَةُ الدَّارِ الْاٰخِرَةِ বলা হয়নি। এতে বোঝা যায় যে, পরজগতের পূর্বে ইহজগতেও পরিণামে আল্লাহ্র সৎ বান্দারাই সফল হয়ে থাকে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা এর সাক্ষ্য দেয়। অত্যল্পকালের মধ্যেই শক্তিশালী

প্রতাপান্বিত শত্রুরা তাঁদের পদানত হয়ে যায় এবং শত্রুদের দেশ তাঁদের হাতে বিজিত হয়ে যায়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে গোটা আরব উপত্যকা তাঁর অধিকারে এসে যায়। ইয়ামান ও বাহরাইন থেকে শুরু করে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। এরপর তাঁর খলীফা ও সাহাবীদের হাতে প্রায় সমগ্র বিশ্ব ইসলামের পতাকাতলে এসে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার এ ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায় যে, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ অর্থাৎ আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার পয়গম্বররাই জয়ী হব। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ‎.

অর্থাৎ আমি আমার রাসূলদের এবং মু'মিনদের অবশ্যই সাহায্য করব, এ জগতেও এবং ঐ দিনও, যেদিন কাজ-কর্মের হিসাব সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতারা সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

চতুর্থ আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যা কিছু আমদানী হতো তার এক অংশ আল্লাহ্র জন্য এবং এক অংশ উপাস্য দেবদেবীদের নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহ্র নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করা হতো এবং দেবদেবীর অংশ প্রতিমাগৃহের পূজারী রক্ষকদের জন্য ব্যয় করত।

প্রথমত এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদের অংশীদার করা হতো। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহ্র অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত ঃ আল্লাহ্ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোন সময় এমনও হতো যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোন বস্তু আল্লাহ্র অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্য সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্র অংশ থেকে কোন বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলত ঃ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কোরআন পাক তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছে ঃ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ—অর্থাৎ তাদের এ বিচার পদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একদেশদর্শী। যে আল্লাহ্ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমত তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলছুঁতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে।

কাফিরদের হুঁশিয়ারিতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ঃ এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির জন্য হুঁশিয়ারি। এতে ঐসব মুসলমানদের জন্যও শিক্ষার চাবুক রয়েছে, যারা আল্লাহ্র প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বয়স ও সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে। অথচ জীবনের সমস্ত সময় ও

মুহূর্তকে তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য ওয়াক্ফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্য বের করে নেওয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি, এর পরও আল্লাহ্র যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হতো না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, দিবারাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করি, তবে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কাজ-কারবার ও আরাম-আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্ত জের নামায, তেলাওয়াত ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের উপর ফেলে দেই। কোন অতিরিক্তি কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকার হরণ। আল্লাহ্ আমাদের এবং সব মুসলমানকে এহেন কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ
شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ط وَلَوْ شَآءَ
اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ
وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ق لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ
ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ط
سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ج وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ
فِيْهِ شُرَكَآءُ ط سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ط اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ
الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ
اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾ ع

(১৩৭) এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব আপনি তাদের এবং তাদের মনগড়া বুলিকে পরিত্যাগ করুন। (১৩৮) তারা বলে ঃ এসব চতুষ্পদ

জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না, তাদের ধারণা অনুসারে। আর কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ হারাম করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা ভ্রান্ত ধারণাবশত আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না। তাদের মনগড়া বুলির কারণে অচিরেই তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। (১৩৯) তারা বলে ঃ এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য এবং আমাদের মহিলাদের জন্য তা হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তারা সবাই তাতে অংশীদার হয়। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের বর্ণনার শাস্তি দেবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (১৪০) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানের নির্বুদ্ধিতাবশত কোন প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিতই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের কুফর-শিরক সম্পর্কিত ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের কর্মগত ভ্রান্তি ও মূর্খতাসুলভ বিভিন্ন কুপ্রথা উল্লিখিত হয়েছে। বর্ণিত কুপ্রথাসমূহ হচ্ছে এই ঃ

১. তারা খাদ্যশস্য ও ফলের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র এবং কিছু অংশ দেব-দেবীর নামে পৃথক করত। অতঃপর যদি ঘটনাক্রমে আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কিছু পরিমাণ দেব-দেবীদের অংশে মিশে যেত, তবে তা এমনিই থাকতে দিত। পক্ষান্তরে ব্যাপার উল্টো হলে তা তুলে নিয়ে প্রতিমাগুলোর অংশ পুরো করে দিত। এর বাহানা ছিল এই যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত; তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু অংশীদাররা অভাবগ্রস্ত। তাদের অংশ হ্রাস পাওয়া উচিত নয়। এ কুপ্রথাটি আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী আয়াতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. বহীরা, সায়েবা ইত্যাদি জন্তু দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং বলা হতো যে, একাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্ত। এতেও প্রতিমার অংশ ছিল এই যে, তাদের আরাধনা করা হতো এবং আল্লাহ্‌র অংশ ছিল এই যে, একে তাঁর সন্তুষ্টি মনে করা হতো।

৩. মুশরিকরা তাদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করত।

৪. কিছু শস্যক্ষেত্র প্রতিমাদের নামে ওয়াক্‌ফ করে দিত এবং বলত যে, এর উৎপন্ন ফসল শুধু পুরুষরা ভোগ করবে, মহিলাদেরকে কিছু দেওয়া না দেওয়া আমাদের ইচ্ছাধীন। তাদের দাবি করার অধিকার নেই।

৫. চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও তারা এমনি ধরনের কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করত এবং কোন কোন জন্তু শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিত।

৬. তারা যেসব চতুষ্পদ জন্তু প্রতিমাদের নামে ছেড়ে দিত, সেগুলোতে আরোহণ করা কিংবা বোঝা বহন করা সম্পূর্ণ হারাম মনে করত।

৭. বিশেষ কতকগুলো চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা কোন সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করত না, উদাহরণত দুধ দোহন করার সময়, আরোহণ করার সময় এবং যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করত না।

৮. বহিরা কিংবা সায়েবা নামে অভিহিত করে যেসব জন্তু প্রতিমাদের নামে ছেড়ে দিত, সেগুলোকে যবেহ্ করার সময় পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে তাকেও যবেহ্ করত; কিন্তু তা শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম মনে করত। পক্ষান্তরে মৃত বাচ্চা বের হলে তা সবার জন্য হালাল হতো।

৯. কোন কোন জন্তুর দুধও পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম ছিল।

১০. বহিরা, সায়েবা, ওসীলা, হামী–এ চার প্রকার জন্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত।

এসব রেওয়ায়েত দুররে-মনসুর ও রূহুল মা'আনী গ্রন্থে রয়েছে।–(বয়ানুল কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এমনিভাবে অনেক মুশরিকের ধারণায় তাদের (শয়তান) উপাস্যরা নিজ সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে রেখেছে (যেমন মূর্খতাযুগে কন্যাদের হত্যা অথবা জীবন্ত প্রোথিত করার প্রথা প্রচলিত ছিল)–যেন (এ কুকর্ম দ্বারা) তারা (শয়তান উপাস্যরা) তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদের, আযাবের যোগ্য হওয়ার কারণে) বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে বিভ্রান্ত করে দেয় (যে, সর্বদা ভুলের মধ্যেই পতিত থাকে। আপনি তাদের সেসব কুকর্মের কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা,) যদি আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের মঙ্গল) চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব আপনি তাদেরকে এবং তারা যে মনগড়া বুলি আওড়াচ্ছে (যে, আমাদের এ কাজ খুবই ভাল) তাকে এমনিই থাকতে দিন (কোন চিন্তা করবেন না। আমি নিজে বুঝে নেব) এবং তারা (স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী) বলে যে, এ সকল (বিশেষ) চতুষ্পদ জন্তু ও (বিশেষ) শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না (যেমন চতুর্থ ও পঞ্চম কুপ্রথায় উল্লিখিত হয়েছে) এবং (বল যে, এসব বিশেষ) চতুষ্পদ জন্তু, এগুলোতে আরোহণ ও বোঝা বহন হারাম করা হয়েছে (যেমন ষষ্ঠ কুপ্রথায় বর্ণিত হয়েছে) এবং (বলে যে, এসব বিশেষ) চতুষ্পদ জন্তু, এগুলোর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা ঠিক নয়। (সেমতে এ বিশ্বাসের কারণেই সেগুলোর উপর) তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না (যেমন ষষ্ঠ কুপ্রথায় বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয়) শুধু আল্লাহ্‌র উপর ভ্রান্ত ধারণাবশত (বলে। ভ্রান্ত ধারণা এ জন্য যে, তারা এসব বিষয়কে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ মনে করত।) অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণার শাস্তি দিবেন ('অচিরেই' বলার কারণ এই যে, কিয়ামত বেশি দূরে নয় এবং কিছু কিছু শাস্তি তো মৃত্যুর সাথে সাথেই শুরু হয়ে যাবে) এবং তারা (আরও) বলে যে, এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে; (উদাহরণত দুধ ও বাচ্চা) তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য (হালাল) ও মহিলাদের জন্য হারাম এবং যদি তা (পেটের বাচ্চা) মৃত হয়, তবে তাতে (অর্থাৎ তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়ার বৈধতায় নারী ও পুরুষ) সব সমান (যেমন অষ্টম ও নবম কুপ্রথায় উল্লিখিত হয়েছে।) অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের (এ) ভ্রান্ত বর্ণনার শাস্তি দেবেন (এ ভ্রান্ত বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত ভ্রান্ত ধারণারই অনুরূপ। এখন পর্যন্ত শাস্তি না দেওয়ার কারণ এই যে) নিশ্চয় তিনি রহস্যশীল (কোন কোন রহস্যের কারণে সময় দিয়েছেন। এখনই শাস্তি না দেওয়াতে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তিনি জানেন না। কেননা) তিনি মহাজ্ঞানী সবকিছু তাঁর জানা আছে। অতঃপর পরিণতি ও সার কথা হিসেবে বলেন,) নিশ্চিতই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা (উল্লিখিত কাজগুলোকে ধর্ম করে নিয়েছে যে,)

স্বীয় সন্তানদের নির্বুদ্ধিতাবশত কোন (যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণীয়) সনদ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং যেসব (হালাল) বস্তু আল্লাহ্ তাদের পানাহারের জন্য দিয়েছিলেন, সেগুলোকে (বিশ্বাসগতভাবে কিংবা কার্যত) হারাম করে নিয়েছে (যেমন উল্লিখিত কুপ্রথাসমূহে এবং দশম কুপ্রথায় বর্ণিত হয়েছে; কারণ সবগুলোর উদ্দেশ্যই এক। এসব বিষয়) শুধু আল্লাহ্র প্রতি ভ্রান্ত ধারণাবশত হয়েছে (যেমন পূর্বে সন্তান হত্যার এবং চতুষ্পদ জন্তু হারাম করার ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণার কথা পৃথক পৃথকও বলা হয়েছে) নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে (এ পথভ্রষ্টতা নতুন নয়–পুরাতন। কেননা, পূর্বেও) এবং কখনও সুপথগামী হয়নি। (অতএব ضلوا বাক্যে ধর্মমতের সারকথা, ما كانوا বাক্যে এর তাকিদ এবং خسروا বাক্যে কুপরিণাম অর্থাৎ আযাবের সারকথা ব্যক্ত হয়েছে।)

وَهُوَ الَّذِيٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۡ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۭ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٤٢﴾

(১৪১) তিনি উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন–তাও, যা মাচার উপর তুলে দেওয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র–যেসবের স্বাদ বিভিন্ন এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন–একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময় এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। (১৪২) তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীকে। আল্লাহ্ তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তিনিই (আল্লাহ্ পাক) উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন–তাও, যা মাচার উপর চড়ানো হয় (যেমন আঙ্গুর) এবং তাও, যা মাচার উপর চড়ানো হয় না (হয় লতায়িত না হওয়ার কারণে, যেমন কাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষ, না হয় লতায়িত হওয়া সত্ত্বেও চড়ানোর প্রয়োজন না থাকার কারণে,

যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি) এবং খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র (-ও তিনি সৃষ্টি করেছেন), যেগুলোতে বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যবস্তু (অর্জিত) হয় এবং যয়তুন ও ডালিম (-ও) তিনিই সৃষ্টি করেছেন। যেগুলো (ডালিমে ডালিমে) পরস্পরে (এবং যয়তুনে যয়তুনে পরস্পরে রং, স্বাদ, আকার ও পরিমাণের মধ্য থেকে কোন কোন গুণেও) একে অন্যের সাদৃশ্যশীল হয় এবং (কখনও) একে অন্যের সাদৃশ্যশীল হয়ও না। (আল্লাহ্ তা'আলা এসব বস্তু সৃষ্টি করে অনুমতি দিয়েছেন যে,) এগুলোর ফসল ভক্ষণ কর (তখন থেকেও) যখন তা নির্গত হয় (এবং অপক্ক থাকে) এবং (এর সাথে এতটুকু অবশ্যই যে,) তাতে (শরীয়তের পক্ষ থেকে) যে হক ওয়াজিব (অর্থাৎ দান-খয়রাত) তা কর্তনের (আহরণের) দিন (মিসকীনদের দান কর এবং (এ দান করায়ও) সীমা (শরীয়তের অনুমতি) অতিক্রম করো না। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) সীমা (শরীয়তের অনুমতি) অতিক্রমকারীদের পছন্দ করে না এবং (উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র যেমন আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি জীবজন্তুও। সে মতে) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে উচ্চাকৃতিকে (-ও) এবং খর্বাকৃতিকে (-ও) তিনিই সৃষ্টি করেছেন (এবং এগুলো সম্পর্কেও উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রের মত অনুমতি দিয়েছেন যে,) যা কিছু আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন (এবং শরীয়তে হালাল করেছেন, তা) ভক্ষণ কর এবং (নিজের পক্ষ থেকে হারামের বিধান রচনা করে) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সত্যের প্রমাণাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে তোমাদের পথভ্রষ্ট করছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, যালিমরা আল্লাহ্ সৃজিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহে স্বহস্ত নির্মিত নিষ্প্রাণ, অচেতন প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্য পৃথক করত, সেগুলোতে এক অংশ আল্লাহ্ এবং এক অংশ প্রতিমাগুলোর জন্য রাখত। অতঃপর আল্লাহ্র অংশকেও বিভিন্ন ছলছুঁতায় প্রতিমাগুলোর অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার ও তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের বিভিন্ন প্রকার সৃজনের কথা উল্লেখ করে মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন যে, এ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা কেমন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র সাথে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, নিষ্প্রাণ ও অসহায় বস্তুসমূহকে শরীক ও অংশীদার করে ফেলেছে।

অতঃপর তাদের সরলপথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, যখন এসব বস্তু সৃষ্টি করা ও তোমাদের দান করার কাজে কোন অংশীদার নেই তখন ইবাদতে তাদের অংশীদার করা একান্তই অকৃতজ্ঞতা ও যুলুম। যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করে তোমাদের দান করেছেন এবং এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেগুলো ব্যবহার করতে পার, এরপরও যেসব বিষয় তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন, তোমাদের কর্তব্য সেই সব নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় তাঁকে স্মরণে রাখা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। শয়তানী ধ্যান-ধারণা এবং মূর্খতাসুলভ প্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রথম আয়াতে انشاء শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং معروشات—শব্দটি عرش থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ওঠানো এবং উচ্চ করা, معروشات বলে উদ্ভিদের ঐসব লতিকা বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মাচা বা কাঠামোর উপর চড়ানো হয় ; যেমন আঙ্গুর ও কোন শাকসবজি। এর বিপরীতে غير معروشات বলে ঐ সমস্ত বৃক্ষকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর লতা উপরে চড়ানো হয় না; কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ হোক যাদের লতাই হয় না, কিংবা লতাবিশিষ্ট হোক; কিন্তু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না, যেমন তরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি।

نخل শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ, زرع সর্বপ্রকার শস্য, زيتون যয়তুন বৃক্ষকে বলা হয় এবং এর ফলকেও এবং رمان ডালিমকে বলা হয়।

এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দুই প্রকার বর্ণনা করেছেন। এক. যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় এবং দুই. যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় না। এতে আল্লাহ্ চূড়ান্ত রহস্য ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই মাটি, একই পানি এবং একই পরিবেশে কেমন বিভিন্ন প্রকার চারা গাছ সৃষ্টি করেছেন। এরপর এদের ফল তৈরি, সজীবতা এবং এদের মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা উপরে না চড়ানো হয়, ততদিন প্রথমত ফলই ধরে না—যদি ধরেও, তবে তা বাড়ে না এবং বাকি থাকে না; যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, লতা উপরে চড়াতে চাইলেও চড়ে না—চড়লেও ফল দুর্বল হয়ে যায়, যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি। কোন কোন বৃক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর দাঁড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন যে, মানুষের চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবত সম্ভবপর ছিল না। বিরাট রহস্যের অধীনে ফলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বৃক্ষসমূহ বিভিন্নরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কোন ফল মাটিতেই বাড়ে এবং পরিপক্ক হয় আর কোন কোন ফল মাটির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কতক ফলের জন্য উচ্চ শাখায় ঝুলে অবিরাম তাজা বাতাস, সূর্য কিরণ এবং তারকার রশ্মি থেকে রং গ্রহণ করা জরুরী। সর্বশক্তিমান প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

فتبارك الله احسن الخالقين

এরপর বিশেষভাবে খর্জুর বৃক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খর্জুর ফল সাধারণভাবে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এর দ্বারা পূর্ণ খাদ্যের কাজও নেওয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে সাধারণত মানুষের খোরাক এবং জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। এ দু'টি বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ এখানে اكله এর সর্বনাম زرع এবং نخل উভয়ের দিকে যেতে পারে। অর্থ এই যে, খেজুরের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ রয়েছে। শস্যের তো শত শত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ ও উপকারিতা আছেই। একই পানি, বাতাস, একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে এত বিরাট ব্যবধান এবং প্রত্যেক প্রকারের উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যের এমন বিস্ময়কর বিভিন্নতা স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, এদের সৃষ্টিকর্তা এমন এক অচিন্তনীয় সত্তা, যাঁর জ্ঞান ও তাৎপর্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয়।

এরপর আরও দুটি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে ঃ যয়তুন ও ডালিম। যয়তুন একাধারে ফল ও তরকারি হয়ে থাকে। এর তৈল সর্বাধিক পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক। এমনিভাবে ডালিমেরও অনেক গুণাগুণ সবার জানা আছে। এতে দুই প্রকার ফল উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ—অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং ও স্বাদের দিক দিয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ একই রূপ হয় এবং ভিন্ন ভিন্নও হয়। যয়তুনের অবস্থাও তদ্রূপ।

এসব বৃক্ষ ও ফল উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবির পরিপূরক। বলা হয়েছে ঃ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ অর্থাৎ এসব বৃক্ষের ও শস্য ক্ষেত্রের ফসল আহার কর, যখন এগুলো ফলন্ত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন প্রয়োজন মেটাতে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। اِذَآ اَثْمَرَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহ্র নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার—পরিপক্ক হোক বা না হোক।

ক্ষেতের ওশর ঃ দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেওয়া হয়েছে ঃ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ শব্দের অর্থ আন অথবা আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময়কে حصاد বলা হয়। শব্দের সর্বনাম পূর্বোল্লিখিত প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান কর এবং ব্যবহার কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। 'হক' বলে ফকীর-মিসকীনকে দান করা বোঝানো হয়েছে। وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ অর্থাৎ সৎ লোকদের ধন-সম্পদে ফকীর-মিসকীনদের নির্দিষ্ট হক রয়েছে।

এখানে সাধারণ সদকা-খয়রাত বোঝানো হয়েছে, না ক্ষেতের যাকাত-ওশর বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং যাকাত মদীনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরয হয়েছে। তাই এখানে 'হক'-এর অর্থ ক্ষেতের যাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ন বলেছেন এবং حق এর অর্থ যাকাত ও ওশর নিয়েছেন।

তফসীরবিদ ইবনে কাসীর (র) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আরাবী উন্দুলুসী 'আহকামুল কোরআন' এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত মক্কায় অবতীর্ন হোক অথবা মদীনায়, উভয় অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে শস্য ক্ষেত্রের যাকাত অর্থাৎ ওশর অর্থ নেওয়া যেতে পারে। কেননা, তাঁদের মতে যাকাতের নির্দেশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা মুযযাম্মেলের আয়াতে যাকাতের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। তবে যাকাতের পরিমাণ ও নিসাব নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে

শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি হক আরোপ করা হয়েছে। এর পরিমাণ আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। কাজেই পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। মক্কায় পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, ক্ষেত ও বাগানের ফসল অনায়াসে লাভ করার ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই পূর্ব থেকে সৎ লোকের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই অনুসৃত হতো। অর্থাৎ ফসল কাটা ও ফল নামানোর সময় যেসব গরীব-মিসকীন সেখানে উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা হতো। কোন বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। ইসলাম পূর্বকালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ফল ও ফসল এভাবে দান করার প্রথা কোরআন পাকের اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের দু'বছর পর রাসূলুল্লাহ (সা) যেমন অন্যান্য ধনসম্পদের যাকাত ও নিসাবের পরিমাণ ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে ফসলের যাকাতও বর্ণনা করেন। মুয়ায ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে বিষয়টি সব হাদীস গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত রয়েছে ঃ

ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بالسانية فنصف العشر.

অর্থাৎ যেসব ক্ষেতে পানি সেচের ব্যবস্থা নেই, শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব এবং যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব।

ইসলামী শরীয়ত যাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে ফসল উৎপাদনে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার যাকাতের পরিমাণ বেশি আর পরিশ্রম ও ব্যয় পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যাকাতের পরিমাণও সে পরিমাণে হ্রাস পায়। উদাহরণত যদি কেউ কোন লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার পেয়ে বসে কিংবা সোনারূপা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত হয়, তবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে দান করা ওয়াজিব। কেননা এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশি। এরপর বৃষ্টি বিধৌত ক্ষেতের নম্বর আসে। এতে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই এর যাকাত পাঁচ ভাগের একের অর্ধেক অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে।এরপর রয়েছে ঐ ক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মাধ্যমে কিংবা খালের পানি ক্রয় করে সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম ও খরচ বেড়ে যায়। ফলে এর যাকাত তারও অর্ধেক। অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর আসে সাধারণ সোনারূপা ও পণ্যসামগ্রীর পালা। এগুলো অর্জন করতে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যধিক। এ জন্য এগুলোর যাকাত তারও অর্ধেক চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্য কোন নিসাব নির্ধারিত হয়নি। তাই ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাযহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল কম হোক কিংবা বেশি, সর্বাবস্থায় তার যাকাত বের করা জরুরী। সূরা বাকারার যে আয়াতে ক্ষেতের ফসলের যাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোন নিসাব বর্ণিত হয়নি। বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর। এবং ঐ ফসল থেকে, যা আমি তোমাদের জন্য ক্ষেত-খামার থেকে উৎপন্ন করেছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পণ্যসামগ্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর নিসাব প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে যাকাত নেই। ছাগল ১০০ এবং উট ৫-এর কম হলে যাকাত নেই। কিন্তু ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত হাদীসে কোন নিসাব ব্যক্ত করা হয়নি। তাই উৎপন্ন ফসল কমবেশি যাই হোক, তার উপর দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা বিশ ভাগের একভাগ যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ অর্থাৎ সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্র পথে যদি কেউ সমস্ত ধনসম্পদ বরং জীবনও ব্যয় করে দেয়, তবে একে অপব্যয় বলা যায় না, বরং যথার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে এরূপ বলাও কঠিন। এমতাবস্থায় এখানে অপব্যয় করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি ? উত্তর এই যে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে অপব্যয়ের ফল স্বভাবত অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রুটিরূপে দেখা দেয়। যে ব্যক্তি স্বীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে মুক্ত হয়ে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করে, সে সাধারণত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করতে ত্রুটি করে। এখানে এরূপ ত্রুটি করতেই বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ একই ক্ষেত্রে স্বীয় যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে বসে, তবে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরূপে পরিশোধ করবে ? তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয়ও সুষম হওয়া চাই, যাতে সবার প্রাপ্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِىْ
بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ
قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ
الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٤﴾

(১৪৩) সৃষ্টি করেছেন আটটি মর্দ ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় মর্দ হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে ? না যা

উভয় মাদীর পেটে আছে ? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪৪) সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ তিনি কি উভয় মর্দ হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে ? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন ? অতএব সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা ঘোষণা করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে ? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এবং এসব চতুষ্পদ জন্তু, যেগুলোকে তোমরা হালাল করছ) আটটি মর্দ ও মাদী (সৃষ্টি করেছেন;) অর্থাৎ ভেড়ার (ও দুম্বার) মধ্যে দুই প্রকার (একটি মর্দ ও একটি মাদী) এবং ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার (একটি মর্দ ও একটি মাদী) আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ (আচ্ছা বল দেখি) আল্লাহ তা'আলা কি (এ জন্তুদ্বয়ের) উভয় মর্দ হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে (হারাম বলেছেন) ? না কি (ঐ বাচ্চাকে) যা উভয় মাদীর পেটে আছে ? (বাচ্চা মর্দ হোক কিংবা মাদী। অর্থাৎ যে বিভিন্ন প্রকারের হারাম হওয়ার কথা বলছ, আল্লাহ তা'আলা কি এ হারাম করেছেন)? তোমরা আমাকে কোন প্রমাণ দ্বারা বল যদি (নিজ দাবিতে) তোমরা সত্যবাদী হও। (এ হচ্ছে ছোট আকৃতির জন্তু সম্পর্কে বর্ণনা। অতঃপর বড় আকৃতির জন্তুদের বর্ণনা হচ্ছে যে, ভেড়া-ছাগলের মধ্যেও মর্দ ও মাদী সৃষ্টি করেছেন; যেমন বর্ণিত হয়েছে) এবং (এমনিভাবে) উটের মধ্যে দুই প্রকার (একটি মর্দ ও একটি মাদী সৃষ্টি করেছেন) আপনি (তাদেরকে এ সম্পর্কেও) বলুন ঃ (আচ্ছা বল দেখি) আল্লাহ তা'আলা কি (এ জন্তুদ্বয়ের) উভয় মর্দকে হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে (হারাম বরেছেন) ? না কি (ঐ বাচ্চাকে) যা উভয় মাদীর পেটে আছে ? (বাচ্চা মর্দ হোক কিংবা মাদী। এর অর্থও পূর্বের মতই যে, তোমরা যে বিভিন্ন প্রকারে হারাম হওয়ার কথা বলছ, আল্লাহ তা'আলা এসব কি হারাম করেছেন, এর কোন প্রমাণ উপস্থিত করা উচিত। এর দু'টি পন্থা থাকতে পারে ঃ এক. কোন রাসূল বা ফেরেশতার মাধ্যমে হবে কিংবা দুই, সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ তোমাদেরকে এ বিধান দিয়ে থাকবেন। কিন্তু তোমরা তো নবুয়ত ও ওহীতে বিশ্বাসই কর না। সুতরাং একমাত্র দ্বিতীয় পন্থাই থেকে যায়। যদি তাই হয়, তবে বল) তোমরা কি (তখন) উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ হালাল ও হারামের নির্দেশ দিয়েছিলেন ? (এটা সুস্পষ্ট যে, এরূপ দাবিও হতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই) অতএব, (একথা প্রমাণিত হওয়ার পর এটা নিশ্চিত যে,) ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী (ও মিথ্যাবাদী হবে) যে আল্লাহর উপর বিনা প্রমাণে (হালাল ও হারাম সম্পর্কে) মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে যাতে করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে ? (অর্থাৎ এ ব্যক্তি অধিক অত্যাচারী। আর) নিশ্চয় আল্লাহ এ সম্প্রদায়কে (পরকালে জান্নাতের) পথ প্রদর্শন করবেন না (বরং দোযখে প্রেরণ করবেন। অতএব তারাও এ অপরাধে দোযখে যাবে)।

قُلْ لَّآ أَجِدُ فِىْ مَآ أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ إِلَّآ أَنْ
يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهٗ رِجْسٌ
أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ۚ
وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ
ظُهُوْرُهُمَآ أَوِ الْحَوَايَآ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۗ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ
بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾ فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ
وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٧﴾

(১৪৫) আপনি বলে দিন ঃ যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্য, যা সে আহার করে, কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস-এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ, যবেহ করা জন্তু যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালংঘন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু। (১৪৬) ইহুদীদের জন্য আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী। (১৪৭) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে বলে দিন ঃ তোমাদের পালনকর্তা সুপ্রশস্ত করুণার মালিক। তাঁর শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে টলবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন ঃ (যেসব জীবজন্তুর আলোচনা হচ্ছে, এগুলো সম্পর্কে) যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে এসেছে তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্য, যা সে আহার করে (তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী)। কিন্তু (যেসব বস্তু অবশ্যই হারাম

পাই—তা) এই যে, মৃত, (অর্থাৎ যে জন্তু যবেহ করা জরুরী-হওয়া সত্ত্বেও যবেহ্ ছাড়া মারা যায়। কিংবা প্রবাহিত রক্ত কিংবা শূকরের মাংস। কেননা তা (শূকর) সম্পূর্ণ অপবিত্র। (এ কারণেই এর সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপবিত্র ও হারাম। এরূপ অপবিত্রকে 'নাজিসুল আইন' বলা হয়)। কিংবা যা (অর্থাৎ যে জন্তু ইত্যাদি) শেরেকীর মাধ্যমে হয় (তা এভাবে) যে, (নৈকট্য লাভের অভিপ্রায়ে) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয় (এগুলো সব হারাম)। এরপর (ও এতে এতটুকু অনুমতি আছে যে,) যে ব্যক্তি (ক্ষুধায় অত্যধিক) কাতর হয়ে পড়ে, শর্ত এই যে, (খাওয়ার মধ্যে) স্বাদ অন্বেষণকারী না হয় এবং (প্রয়োজনের) সীমাতিক্রমকারী না হয়, তবে (এমতাবস্থায় এসব হারাম বস্তু আহারেও তার কোন গুনাহ হয় না)। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা (এমন ব্যক্তির জন্য) ক্ষমাশীল, করুণাময়। (কারণ, এহেন সংকট মুহূর্তে দয়া করেছেন এবং গুনাহর বস্তু থেকে গুনাহ্ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন)। আর ইহুদীদের জন্য আমি সমস্ত নখরবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু (অর্থাৎ ছাগল ও গরুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের (ইহুদীদের) জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু তা, (অর্থাৎ ঐ চর্বি ব্যতিক্রম ছিল) যা তাদের (উভয়ের) পিঠে কিংবা অন্ত্রে জড়িয়ে থাকে অথবা যা অস্থির সাথে মিলিত থাকে, এগুলো ছাড়া সব চর্বি হারাম ছিল। এসব বস্তু হারাম করা প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না বরং) তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম এবং আমি নিশ্চয়ই সত্যভাষী। অতঃপর (উল্লিখিত তথ্যের পরও) যদি তারা (মুশরিকরা) আপনাকে (নাউযুবিল্লাহ, এ বিষয়ে শুধু এ কারণে) মিথ্যাবাদী বলে (যে তাদের উপর আযাব আসে না) তবে আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ তোমাদের পালনকর্তা সুপ্রশস্ত করুণার মালিক (কোন কোন রহস্যের কারণে দ্রুত আযাব দেন না। কাজেই এতে মনে করো না যে, চিরকাল এমনিভাবে বেঁচে যাবে। যখন নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে, তখন) তাঁর আযাব অপরাধীদের উপর থেকে (কিছুতেই) টলবে না।

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا
مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ
قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ
اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

(১৪৮) এখন মুশরিকরা বলবে ঃ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমনকি, তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন ঃ তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে। যা আমাদের দেখাতে পার ? তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল। (১৪৯) আপনি বলে দিন ঃ অতএব পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহ্রই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করতেন। (১৫০) আপনি বলুন ঃ তোমাদের সাক্ষীদের আন, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে আপনি এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সমতুল্য অংশীদার করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুশরিকরা এখনই বলবে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা (সম্মতি হিসাবে) এটা ইচ্ছা করতেন (যে, আমরা শিরকী ও হারাম না করি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা শিরক না করা ও হারাম না করা পছন্দ করতেন এবং শিরক ও হারাম করাকে অপছন্দ করতেন) তবে না আমরা শিরক করতাম এবং না আমাদের বাপ-দাদা (শিরক করত) এবং না (আমাদের বাপ-দাদা) কোন বস্তুকে (যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) হারাম করতে পারতাম। (এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এ শিরক ও হারাম করার কারণে অসন্তুষ্ট নন। আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দেন যে, এ যুক্তি বাতিল। কারণ, এ দ্বারা পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়। সুতরাং তারা পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। যেভাবে তারা করছে,) এমনিভাবে তাদের পূববর্তীরাও (পয়গম্বরদের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। এমনকি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে যেমন (দুনিয়াতেই; পূর্ববর্তী অধিকাংশ কাফিরদের উপর আযাব নাযিল হয়েছে কিংবা মৃত্যুর পর তো জানা কথাই। এটা এদিকে ইঙ্গিত যে, তাদের কুফরের মোকাবিলায় শুধু মৌখিক উত্তর ও বিতর্কই করা হবে না, বরং পূর্ববর্তী কাফিরদের অনুরূপ কার্যত শাস্তিও দেওয়া হবে-দুনিয়াতেও কিংবা শুধু পরকালে। অতঃপর দ্বিতীয় উত্তর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে) আপনি তাদেরকে বলুন ঃ তোমাদের কাছে কি (এ ব্যাপারে যে, কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা দান সম্মতির লক্ষণ) কোন প্রমাণ আছে ? (যদি থাকে) তবে তা আমাদের সামনে প্রকাশ কর। (আসলে প্রমাণ বলতে কিছুই নেই) তোমরা কেবলমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা সম্পূর্ণ অনুমান করে

কথা বল। (এবং উভয় উত্তর দিয়ে) আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ অতএব (উভয় উত্তর দ্বারা জানা গেল যে,) পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহরই। (ফলে তোমাদের যুক্তি বাতিল হয়ে গেছে) অতএব (এর দাবি তো ছিল এই যে, তোমরা সবাই সৎপথে এসে যেতে। কিন্তু এর তৌফিকও আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে আসে)। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সবাইকে (সৎ) পথ প্রদর্শন করতেন। (কিন্তু অনেক রহস্যের কারণে আল্লাহ কাউকে তৌফিক দিয়েছেন আর কাউকে দেন নি। তবে সত্য প্রকাশ এবং পছন্দ ও ইচ্ছা সবাইকে ব্যাপকভাবে দান করেছেন। অতঃপর ঐতিহাসিক প্রমাণ চেয়ে বলা হয়েছে ঃ) আপনি (তাদেরকে বলুন) ঃ তোমাদের যুক্তিগত প্রমাণের অবস্থা তো তোমরা জানতেই পারলে, এখন কোন বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থিত কর। উদাহরণত স্বীয় সাক্ষীদেরকে আন, যারা (যথারীতি) সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এসব (উল্লিখিত) বিষয় হারাম করেছেন। (যথারীতি সাক্ষ্য ঐ সাক্ষ্যকে বলা হয়, যা চাক্ষুষ দেখার ভিত্তিতে কিংবা চাক্ষুষ দেখার মত নিশ্চয়তা দানকারী অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে হয়। যেমন, أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ বাক্যটি এদিকে ইঙ্গিত করে)। অতঃপর যদি (ঘটনাক্রমে কাউকে মিছেমিছি সাক্ষী করে নিয়ে আসে এবং সে সাক্ষী এ বিষয়ে) সাক্ষ্য (ও) দিয়ে দেয়, তবে (যেহেতু সে সাক্ষ্য নিশ্চিতই রীতি-বিরুদ্ধ এবং কথার তুবড়ি ছাড়া আর কিছুই হবে না। কেননা, সে চাক্ষুষ দেখেওনি এবং চাক্ষুষ দেখার মত অকাট্য প্রমাণও তার নেই, তাই) আপনি এ সাক্ষ্য শুনবেন না এবং (যখন ولا حرمنا এবং كذلك كذب থেকে তাদের মিথ্যারোপকারী হওয়া, অনেক আয়াত থেকে তাদের পরকালে অবিশ্বাসী হওয়া এবং اشركنا থেকে তাদের মুশরিক হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে তখন। হে সম্বোধিত ব্যক্তি) এরূপ লোকদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং পরকালে বিশ্বাস করে না (এবং এ কারণেই নির্ভীক হয়ে সত্যান্বেষণ করে না) এবং তারা (উপাস্য হওয়ার যোগ্যতায়) স্বীয় পালনকর্তার সমতুল্য অন্যকে অংশীদার করে (অর্থাৎ শিরক করে)।

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا

وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۗ
ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا
فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ
وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

(১৫১) আপনি বলুন ঃ এস আমি তোমাদের ঐসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, যেগুলো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না—আমি তোমাদের ও তাদের আহার দিই— নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। (১৫২) ইয়াতীমের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায়—যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওযন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দিই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয় হয়। আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (১৫৩) তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা সংযত হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ এস, আমি তোমাদের ঐসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, যেগুলো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা (অর্থাৎ ঐ বিষয়গুলো) এই যে, এক. আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না। (অতএব অংশীদার করা হারাম হলো) এবং দুই. পিতা-মাতার সাথে সদ্বহার করো (অতএব তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা হারাম হলো) এবং তিন. স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে (যেমন জাহিলিয়াত যুগে প্রায় লোকেরই এরূপ অভ্যাস ছিল) হত্যা করো না (কেননা) আমি তাদের এবং তোমাদের (উভয়কে) জীবিকা (যা নির্ধারিত আছে) প্রদান করব (তারা তোমাদের জন্য নির্ধারিত জীবিকায় অংশীদার নয়। এমতাবস্থায় কেন হত্যা কর ? অতএব হত্যা করা হারাম হলো)। এবং চার. নির্লজ্জতার (অর্থাৎ ব্যভিচারের) যত পন্থা আছে, সেগুলোর কাছেও যেয়ো না (অতএব ব্যভিচার হারাম হলো)। প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য (এগুলোই পন্থা,) এবং পাঁচ, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম

করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু (শরীয়তের) হকের কারণে (হত্যা জায়েয, উদাহরণত কিসাস কিংবা ব্যভিচারের সাজা হিসাবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। অতএব অন্যায় হত্যা হারাম হলো) এ বিষয়ে (অর্থাৎ এসব বিষয়ে) তোমাদের (আল্লাহ্ তা'আলা) জোর নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা (এগুলোকে বুঝ এবং সে অনুপাতে কাজ কর) এবং ছয়. ইয়াতীমের মালের কাছে যেয়ো না (অর্থাৎ তাতে হস্তক্ষেপ করো না) কিন্তু এমনভাবে, (হস্তক্ষেপের অনুমতি আছে) যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম। (উদাহরণত তার কাজে ব্যয় করা, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং কোন কোন অভিভাবকের জন্য ইয়াতীমের স্বার্থে ব্যবসা করারও অনুমতি আছে) যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় (সে সময় পর্যন্ত উল্লিখিত হস্তক্ষেপসমূহেরও অনুমতি রয়েছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে তার মাল তার হাতে সমর্পণ করা হবে, যদি সে নির্বোধ না হয়। অতএব ইয়াতীমের মালে অবৈধ হস্তক্ষেপ হারাম হলো) এবং সাত. ওজন ও মাপ পূর্ণ করো ন্যায় সহকারে (যেন কারও প্রাপ্য তোমার কাছে না থাকে) অতএব ওজন ও মাপে প্রতারণা করা হারাম হলো। এসব বিধান কঠিন নয়। কেননা,) আমি (তো) কাউকে তার সাধ্যের অতীত বিধি-বিধানের কষ্ট (-ও) দিই না। (এমতাবস্থায় এসব বিধানে কেন ত্রুটি করা হবে) ? এবং আট. যখন তোমরা (ফয়সালা অথবা সাক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে কোন) কথা বল, তখন (যাতে) সুবিচার (হয়. এর প্রতি লক্ষ্য) কর যদিও সে) (ঐ ব্যক্তি যার বিপক্ষে তুমি কথা বলছ, তোমার) আত্মীয়ও হয়। (অতএব সুবিচারের পরিপন্থী কথা বলা হারাম হলো)। এবং নয়, আল্লাহ্র সাথে যে অঙ্গীকার কর, (যেমন শপথ, মানত যদি শরীয়তসম্মত হয়) তা পূর্ণ করো (অতএব, অঙ্গীকার পূর্ণ না করা হারাম হলো)। এ বিষয়ে (অর্থাৎ এসব বিষয়ে) তোমাদেরকে (আল্লাহ্ তা'আলা) জোর নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা স্মরণ রাখ (এবং কাজ কর)। এবং এ কথা (ও বলে দিন) যে, (এসব বিধানেরই বিশেষত্ব নয়; বরং) এ ধর্ম (ইসলাম ও তার সমস্ত বিধান) আমার পথ (যার দিকে আমি আল্লাহ্র নির্দেশ আহবান করি) যা (সম্পূর্ণ) সরল (এবং সঠিক)। অতএব এ পথ অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না তাহলে সেসব পথ তোমাদের আল্লাহ্র পথ থেকে (যার দিকে আমি আহবান করি) পৃথক (ও দূরবর্তী) করে দেবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা (এ পথের বিরুদ্ধাচরণে) সংযত হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে প্রায় দু'তিন রুকূতে অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফিল ও মূর্খ মানুষ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তু অবৈধ করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে এবং কোন কোন বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং স্ত্রীদের জন্য হারাম করেছে। আবার কোন কোন বস্তুকে স্ত্রীদের জন্য হালাল, পুরুষদের জন্য হারাম করেছে।

আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে

বলা হয়েছে ঃ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ এ ধর্মই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথের অনুসরণ কর। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনীত ও বর্ণিত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সমস্ত হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মাকরূহ ও মোস্তাহাব বিষয়কে এ ধর্মে ন্যাস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম যে বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে, তাকে হারাম মনে করবে-নিজের পক্ষ থেকে হালাল-হারামের ফতোয়া জারি করবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর আসল লক্ষ্য হচ্ছে হারাম বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করাই ছিল সঙ্গত, কিন্তু কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে ধনাত্মকভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিপরীত করা হারাম।–(কাশশাফ) এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। আয়াতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয় হচ্ছে এই ঃ

১. আল্লাহ তা'আলার সাথে ইবাদত ও আনুগত্যে কাউকে অংশীদার স্থির করা; ২. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা; ৩. দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা; ৪. নির্লজ্জতার কাজ করা; ৫. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা; ৬. ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা; ৭. ওযন মাপে কম দেওয়া; ৮. সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা;৯. আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ না করা; এবং ১০. আল্লাহ্ তা'আলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে এদিক-ওদিক অন্য পথ অবলম্বন করা।

আলোচ্য আয়াতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঃ তওরাত বিশেষজ্ঞ কা'বে আহবার পূর্বে ইহুদী ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে যান। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাব তওরাত বিসমিল্লাহর পর কোরআন পাকের এসব আয়াত দ্বারাই শুরু হয়, যেগুলোতে দশটি হারাম বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, এ দশটি বাক্যই হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছিল।

তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা আলে-ইমরানে মুহকাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের শরীয়তই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোন ধর্ম ও শরীয়তে এগুলোর কোনটিই মনসূখ বা রহিত হয়নি। –(তফসীরে বাহরে-মুহীত)

এসব আয়াত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওসীয়তনামা ঃ তফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মোহরাঙ্কিত ওসীয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ আয়াতগুলো পাঠ করে। এসব আয়াতে ঐ ওসীয়ত বিদ্যমান, যা রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্র নির্দেশে উম্মতকে দিয়েছেন।

হাকেম হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কে আছে, যে আমার হাতে তিনটি আয়াতের আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করবে ? অতঃপর তিনি আলোচ্য তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করে বললেনঃ যে ব্যক্তি এ শপথ পূর্ণ করবে, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহ্র দায়িত্ব।

এবার দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আয়াতত্রয়ের তফসীর লক্ষ্য করুন। আয়াতগুলোর সূচনা এভাবে করা হয়েছে ঃ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ এতে تَعَالَوْا শব্দের অর্থ 'এস'। আসলে উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের লোকদের নিজের কাছে ডাকা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবূল করার মধ্যেই তাদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন ঃ এস, যাতে আমি তোমাদের ঐসব বিষয় পাঠ করে শোনাতে পারি, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত বার্তা। এতে কারও কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোন প্রভাব নেই, যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না কর।

এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানব জাতিই এর আওতাধীন-মু'মিন হোক কিংবা কাফির, আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর।-(বাহ্ রে মুহীত)

সর্বপ্রথম মহাপাপ শিরক, যা হারাম করা হয়েছে ঃ এরূপ সযত্ন সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছে ঃ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ সর্বপ্রথম কাজ এই যে, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক ও অংশীদার করো না। আরবের মুশরিকদের মত দেব-দেবীদের বা মূর্তিকে আল্লাহ মনে করো না। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মত পয়গম্বরদের আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলো না। অন্যদের মত ফেরেশতাদের আল্লাহ্র কন্যা আখ্যা দিয়ো না। মূর্খ জনগণের মত পয়গম্বর ও ওলীদের জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যের আল্লাহ্র সমতুল্য সাব্যস্ত করো না।

শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ঃ তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ এখানে شَيْئًا-এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, 'জলী' অর্থাৎ প্রকাশ্য শিরক ও প্রচ্ছন্ন শিরক-এ প্রকারদ্বয়ের মধ্য থেকে কোনটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে যে, ইবাদত, আনুগত্য অথবা অন্য কোন বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ্ তা'আলার সমতুল্য অথবা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শিরক এই যে, নিজ কাজকর্মে ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ তা'আলাকে কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করা ও কার্যত অন্যান্যকে কার্যনির্বাহী মনে করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এছাড়া লোক দেখানো ইবাদত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্য নামায ইত্যাদি ঠিকমত পড়া, নামযশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা অথবা কার্যত লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শেখ সা'দী (র) এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন ঃ

دریں نوعے از شرک پوشیدہ است
که زیدم بخشید ،وعمرم بخست

অর্থাৎ যায়েদ আমাকে দান করেছে এবং ওমর আমার ক্ষতি করেছে এমন বলার মধ্যেও এক প্রকার প্রচ্ছন্ন শিরক বিদ্যমান। সত্য এই যে, দান ও ক্ষতি সব সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র পক্ষ

থেকেই হয়। যায়েদ কিংবা ওমর হচ্ছে পর্দা, যার ভেতর থেকে দান ও ক্ষতি প্রকাশ পায়। উদ্ধৃত হাদীস অনুযায়ী যদি সারা বিশ্বের জিন ও মানব একত্রিত হয়ে তোমার এমন কোন উপকার করতে চায়, যা আল্লাহ্ তোমার জন্য অবধারিত করেননি, তবে তাদের তা করার সাধ্য নেই। পক্ষান্তরে যদি সারা বিশ্বের জিন ও মানব একজোট হয়ে তোমার এমন কোন ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহ্র অভিপ্রেত নয়, তবে তা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

মোটকথা, প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার শিরক থেকেই বেঁচে থাকা দরকার। প্রতিমা ইত্যাদির পূজাপাট যেমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গম্বর, ওলীদেরকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি গুণে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতম শিরক। আল্লাহ্ না করুন, যদি কারও বিশ্বাস এরূপ হয় তবে তা প্রকাশ্য শিরক। আর বিশ্বাস এরূপ না হয়ে কাজ এরূপ করলে তা হবে প্রচ্ছন্ন শিরক। এ স্থলে সর্বপ্রথম শিরক থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, শিরকের অপরাধ সম্পর্কে কোরআন পাকের সিদ্ধান্ত এই যে, এর ক্ষমা নেই। এ ছাড়া অন্যান্য গুনাহ্র ক্ষমা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এ কারণেই হাদীসে ওবাদা ইবনে সামেত ও আবুদ্দারদা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করো না, যদিও তোমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলা হয় অথবা শূলিতে চড়ানো হয় অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়।

দ্বিতীয় গুনাহ্ পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার : এরপর দ্বিতীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে : وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য এই যে, পিতামাতার অবাধ্যতা করো না। তাদেরকে কষ্ট দিও না ; কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা না করা এবং কষ্ট না দেওয়াই যথেষ্ট নয় ; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ফরয। কোনআন পাকের অন্যত্র একথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

এ আয়াতে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়াকে শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখ বিধানকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা ফয়সালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে : اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতামাতার। অতঃপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে অর্থাৎ বিপরীত করলে শাস্তি পাবে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোনটি ? তিনি উত্তরে বললেন : নামায মুস্তাহাব সময়ে পড়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : এরপর কোনটি উত্তম ? উত্তর হলো : পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। আবার প্রশ্ন হলো : এরপর কোনটি ? উত্তর হলো : আল্লাহ্র পথে জিহাদ।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার বললেন ঃ رغم انفه ، رغم انفه رغم انفه অর্থাৎ সে লাঞ্ছিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে লাঞ্ছিত হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

উদ্দেশ্য এই যে, বার্ধক্যাবস্থায় পিতা-মাতাকে সেবা-যত্ন দ্বারা জান্নাত লাভ নিশ্চিত। ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত, যে জান্নাত লাভের এমন সহজ সুযোগ হাতছাড়া করে ঃ সহজ সুযোগ এজন্য যে, পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি স্বভাবতই মেহেরবান হয়ে থাকেন। সামান্য সেবা-যত্নেই তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিরাট কিছু করার দরকার হয় না। বার্ধক্যের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতা যখন শক্ত-সমর্থ ও সুস্থ থাকেন, নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারেন বরং সন্তানদেরও আর্থিক ও দৈহিক সাহায্য করেন, তখন তাঁরা সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী নন এবং এ সেবা-যত্নের বিশেষ কোন মূল্যও নেই। তাঁরা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন, তখনকার সেবা-যত্নই মূল্যবান হতে পারে।

তৃতীয় হারাম সন্তান হত্যা ঃ আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে পিতা-মাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতা-মাতার দায়িত্ব। জাহিলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে রাখা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ—অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণে স্বীয় সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তোমাদের এবং তাদের —উভয়কে জীবিকা দান করব।

জাহিলিয়াত যুগে এ নিকৃষ্টতম নির্দয়-পাষাণ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে সন্তানদেরকে হত্যা করত। কোরআন পাক এ কুপ্রথা রহিত করে দিয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে তাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে তারা এ ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হতো। সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল তাদের মানসিক রোগ। আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, পানাহার করানো এবং জীবিকা প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নয়। এ কাজ সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার। তোমরা স্বয়ং জীবিকা ও পানাহারে তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি দিলে তোমরা সন্তানদেরকেও দিয়ে থাক। তিনি না দিলে তোমাদের কি সাধ্য যে, একটি গম অথবা চালের দানা নিজে সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক চিরে বীজকে অঙ্কুরিত করা, অতঃপর তাকে বৃক্ষের আকার দান করা, অতঃপর ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করা কার কাজ ? পিতা-মাতা এ কাজ করতে পারে কি ? এগুলো সব সর্বশক্তিমানের কুদরতের কারসাজি। এ কাজে মানুষের কোন হাত নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং চারা গজালে পানি দিতে পারে। কিন্তু ফুল-ফল সৃষ্টিতে তার বিন্দুমাত্রও হাত নেই। অতএব পিতা-মাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা সন্তানদের রিযিক দান করে। বরং আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে পিতা-মাতাও পায় এবং সন্তানরাও। তাই এখানে প্রথমে পিতা-মাতার

উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরও রিযিক দেব এবং তাদেরও। এতে আরও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদের রিযিক এজন্য দেওয়া হয় যাতে তোমরা সন্তানদের পৌছে দাও; এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ انما تنصرون وترزقون بضعفائكم অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল ও অক্ষম লোকদের কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিযিক দান করেন।

সূরা ইসরায়ও বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে রিযিকের ব্যাপারে প্রথমে সন্তানদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ-অর্থাৎ আমি তাদেরও রিযিক দেব তোমাদেরও। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার কাছে রিযিকের প্রথম হকদার দুর্বল ও অক্ষম সন্তানরা। তাদের খাতিরেই তোমাদের দেওয়া হয়।

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন না করা এবং ধর্মবিমুখতার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও এক প্রকার সন্তান হত্যা ঃ আয়াতে বর্ণিত সন্তান হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গুনাহ তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই। চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা না দেওয়া এবং আর চরিত্র গঠন না করা, যদ্দরুন সে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান হত্যার চাইতে কম মারাত্মক নয়। কোরআন পাকের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহকে চেনে না এবং তাঁর আনুগত্য করে না। اَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ-আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে, যারা সন্তানদের কাজকর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয়, যার ফলে ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পারলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করে।

চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজ ঃ আয়াতে বর্ণিত হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ অর্থাৎ প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, যে কোন রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।

فَوَاحِشَ শব্দটি فاحشة-এর বহুবচন। فحش ، فحشاء ও فاحشة সবগুলো ধাতু। এগুলোর অর্থ সাধারণত অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ, যার অনিষ্টতা ও খারাবী সুদূরপ্রসারী। ইমাম রাগেব (র) 'মুফরাদাতুল কোরআন; গ্রন্থে এবং ইবনে আসীর নেহায়াহ গ্রন্থে এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজের নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ

যাবতীয় বড় গুনাহ فحش ও فحشاء-এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তা উক্তি সম্পর্কিত হোক কিংবা কর্ম সম্পর্কিত, বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ। এছাড়া আত্মিক ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার যাবতীয় কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই সাধারণ ভাষায় এ শব্দটি ব্যভিচারের অর্থে ব্যবহৃত হয়, কোরআনের আলোচ্য আয়াতে নির্লজ্জ কাজসমূহের কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে।

ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে যাবতীয় বদভ্যাস, মুখ, হাত-পা ও অন্তরের যাবতীয় গুনাহই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থ ব্যভিচার নেওয়া হলে আয়াতে ব্যভিচার ও তার ভূমিকা এবং কারণসমূহ বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াতেই فواحش-এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فـواحش-এর অর্থ হবে হাত, পা ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন গুনাহ এবং আভ্যন্তরীণ فـواحش-এর অর্থ হবে অন্তর সম্পর্কিত গুনাহ। যেমন, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অকৃতজ্ঞতা, অধৈর্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فواحش-এর অর্থ এমন ব্যভিচার যা প্রকাশ্যে করা হয়। আর আভ্যন্তরীণের অর্থ যে ব্যভিচার গোপনে করা হয়। ব্যভিচারের ভূমিকাও প্রকাশ্য ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। কুনিয়তে পর-নারীকে দেখা, হাতে স্পর্শ করা এবং তার সাথে প্রেমালাপ করা এরই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ব্যভিচার সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, সংকল্প এবং গোপন কৌশল অবলম্বন অভ্যন্তরীণ ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ বাহ্যিক নির্লজ্জতার অর্থ সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকর্ম এবং আভ্যন্তরীণ নির্লজ্জতার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে নির্লজ্জ কাজকর্ম, যদিও সাধারণভাবে মানুষ সেগুলোকে খারাপ মনে করে না কিংবা সেগুলো যে হারাম, তা সাধারণ মানুষ জানে না। উদাহরণত স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পরও তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখে দেওয়া কিংবা হালাল নয় এরূপ মহিলাকে বিবাহ করা।

মোটকথা এই যে, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত গুনাহকে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও যেয়ো না। কাছে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাক, যেখানে গেলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যদ্দ্বারা এসব গুনাহর পথ খুলে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ من حـام حـول حـمى اوشك ان يقع فـيـه অর্থাৎ যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়।

অতএব নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা না করাই হলো সতর্কতা।

পঞ্চম হারাম অন্যায় হত্যা ঃ পঞ্চম হারাম বিষয় হচ্ছে অন্যায় হত্যা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে ন্যায়ভাবে। এ 'ন্যায়ভাবে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের খুন হালাল নয়। এক. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে. দুই. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার কিসাস হিসাবে তাকে হত্যা করা যাবে এবং তিন. সত্য ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে।

খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখনও তিনি তাদেরকে এ হাদীস শুনিয়ে বলেছিলেন ঃ

আল্লাহর রহমতে আমি এ তিনটি কারণ থেকেই মুক্ত। মুসলমান হয়ে তো দূরের কথা জাহিলিয়াত যুগেও আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি, আমি কোন খুন করিনি, স্বীয় ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগ করব—এরূপ কল্পনাও আমার মনে কখনো জাগেনি। এমতাবস্থায় তোমরা আমাকে কি কারণে হত্যা করতে চাও ?

বিনা কারণে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোন অমুসলমানকে হত্যা করাও হারাম, যে কোন ইসলামী দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকে।

তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ্ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে। এই একটি আয়াতে দশটির মধ্যে পাঁচটি হারাম বিষয়ের বর্ণনা দেওয়ার পর বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এসব বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।

ষষ্ঠ হারাম ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা ঃ দ্বিতীয় আয়াতে ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা যে হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ। অর্থাৎ ইয়াতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন ইয়াতীমদের মালকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেওয়ার কাছেও না যায়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে।

তবে ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবত লোকসানের আশংকা নেই—এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরী পন্থা। ইয়াতীমদের অভিভাবকের এ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

এরপর ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ অর্থাৎ সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পণ করতে হবে।

اَشُدّ শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি। আলিমদের মতে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয়। বালক-বালিকার মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে কিংবা বয়স পনর বছর পূর্ণ হয়ে গেলে শরীয়ত মতে তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত বলা হবে।

তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের মালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কি না। যোগ্যতা দেখলে বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ধন-সম্পদ হিফাযত করার দায়িত্ব অভিভাবকের। ইতোমধ্যে যখনই ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এবং কারবারের যোগ্যতা

তার মধ্যে দেখা যাবে, তখনই তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। যদি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্তও তার মধ্যে ঐ যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার মাল তাকেই সমর্পণ করতে হবে যদি সে উন্মাদ না হয়। কোন কোন ইমামের মতে তখনও তার মাল তাকে দেওয়া যাবে না বরং শরীয়তের কাজী (বিচারক) তার মাল সংরক্ষণের জন্য কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করলেন।

এ বিষয়টি কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছেঃ

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ অর্থাৎ ইয়াতীমদের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমরা যদি এরূপ সুমতি দেখ যে, তারা স্বয়ং মালের হিফাযত করতে পারবে এবং কোন কারবারে বিনিয়োগ করতে পারবে, তবে তাদের মাল তাদের হাতে সমর্পণ করে দাও। এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াই মাল সমর্পণের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং মালের হিফাযত ও কাজ-কারবারের যোগ্যতাও শর্ত।

সপ্তম হারাম ওযন ও মাপে ত্রুটি করা ঃ এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওযন ও মাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 'ন্যায়ভাবে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওযন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশি নেবে না। -(রূহুল মা'আনী)

দ্রব্য আদান-প্রদানে ওযন ও মাপ কম-বেশি করাকে কোরআন কঠোরভাবে হারাম সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য সূরা মুতাফফিফীনে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ওযন ও মাপের কাজ করে, তাদেরকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ওযন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহ্র আযাবে পতিত হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর। -(ইবনে কাসীর)

কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করাও ওযন এবং মাপে ত্রুটি করার অনুরূপ ঃ ওযন ও মাপে ত্রুটি করাকে কোরআন পাকে تطفيف বলা হয়েছে। এটা শুধু ওযন করার সময় কমবেশি করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যের প্রাপ্যে ত্রুটি করাও تطفيف এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালিক (র) স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তিকে নামাযের আরকানে ত্রুটি করতে দেখে তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি تطفيف করেছ, অর্থাৎ যথার্থ প্রাপ্য শোধ করনি। এ ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ لكل شيئ وفاء وتطفيف, অর্থাৎ প্রাপ্য পুরোপুরি দেওয়া ও ত্রুটি করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হয়---শুধু ওযন ও মাপের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়।

এতে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি কর্তব্যকর্ম পূর্ণ করে না, সময় চুরি করে কিংবা কাজে ত্রুটি করে সেও উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ; সে কোন মন্ত্রী হোক, প্রশাসক হোক, কিংবা সাধারণ কর্মচারী হোক অথবা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মে নিয়োজিত হোক না কেন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আমি কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দিই না। কোন কোন হাদীসে এর অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সাধ্যমত পুরোপুরি ওযন করে, এতদসত্ত্বেও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ওযনে কমবেশি হয়ে যায় তবে তা মাফ। কেননা, এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ এ বাক্য যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রাপ্য পরিশোধের সময় কিছু বেশি দেওয়াই সতর্কতা–যাতে কমের সন্দেহ না থাকে। যেমন এরূপ স্থলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওযনকারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ زن وارجح অর্থাৎ ওযন কর এবং কিছু ঝুঁকিয়ে ওযন কর। (আহ্মদ, আবূ দাঊদ. তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাধারণ অভ্যাস তাই ছিল। তিনি কারও প্রাপ্য পরিশোধ করার সময় প্রাপ্যের চাইতে কিছু বেশি দেওয়া পছন্দ করতেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি সদয় হন, যে বিক্রয়ের সময় নম্রতা প্রদর্শন করে। অর্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে বেশি দেয় এবং ক্রয়ের সময়ও নম্রতা দেখায় অর্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে বেশি নেয় না ; বরং সামান্য কম হলেও সন্তুষ্ট থাকে।"

কিন্তু দেওয়ার বেলায় বেশি দেওয়া এবং নেওয়ার বেলায় কম হলেও ঝগড়া না করার এ নির্দেশটি নৈতিক--আইনগত নয় যে, এরূপ করতেই হবে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ আমি কাউকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দিই না অর্থাৎ অপরকে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশি পরিশোধ করা এবং নিজের বেলায় কমে সম্মত হওয়া কোন বাধ্যতামূলক আদেশ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ করা সহজ নয়।

অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম ঃ বলা হয়েছে ঃ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى অর্থাৎ 'তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদিও সে আত্মীয় হয়।' এখানে বিশেষ কোন কথার উল্লেখ নেই। তাই সাধারণ তফসীরবিদদের মতে সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যাপারের সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তাই হোক--সব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোকদ্দমার সাক্ষ্যে কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, নিজের পক্ষ থেকে কমবেশি না করে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া--অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা না বলা এবং এতে কারও উপকার কিংবা কারও লোকসানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। মোকদ্দমার ফয়সালায় সাক্ষীদের শরীয়তের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এবং কারও শত্রুতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। এ কারণেই আয়াতে وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যার মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবে কিংবা ফয়সালা করবে, সে তোমার নিকটাত্মীয় হলেও ন্যায় ও সত্যকে কোন অবস্থাতেই হাতছাড়া করবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা প্রতিরোধ করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে আবূ দাউদ ও ইবনে মাযায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

"মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকীর সমতুল্য।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বাক্য তিনবার বলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ ‐

অর্থাৎ মূর্তিপূজার কুৎসিত বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে দূরে সরে থাক,——আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার না করা অবস্থায়।

এমনিভাবে ফয়সালা সম্পর্কে আবূ দাউদ হযরত বারীদা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ উক্তি বর্ণনা করেন। ঃ

কাজী (অর্থাৎ মোকদ্দমার বিচারক) তিন প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার জান্নাতে ও দুই প্রকার জাহান্নামে যাবে। যে কাজী শরীয়তের নীতি অনুযায়ী মামলার তদন্ত করে সত্য ঘটনার জ্ঞান অর্জন করে অতঃপর তদনুযায়ী ফয়সালা করে, সে জান্নাতী। পক্ষান্তরে যে তদন্ত করে সত্য অবগত হওয়ার পর জেনেশুনে অসত্য ফয়সালা করে, সে জাহান্নামী। এমনিভাবে যার কোন জ্ঞান নেই কিংবা তদন্ত ও চিন্তাভাবনায় ত্রুটি করে এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে থেকেই ফয়সালা করে, সেও জাহান্নামে যাবে।

সাক্ষ্য কিংবা ফয়সালায় কারও বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা এবং শত্রুতা ও বিরোধিতার কোন প্রভাব থাকা উচিত নয়——এ বিষয়টি কোরআনের অন্যান্য আয়াতে আরও পরিষ্কার ও তাকিদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ যদিও তোমার নিজের অথবা পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে যায়, তবুও সত্য কথা বলতে কুণ্ঠিত হয়ো না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوْا অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের অসত্য সাক্ষ্য দিতে কিংবা অন্যায় ফয়সালা করতে উদ্বুদ্ধ না করে। পারস্পরিক কথাবার্তায় ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ মিথ্যা না বলা, অসাক্ষাতে পরনিন্দা না করা এবং কষ্টদায়ক কিংবা আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতিকারক কথাবার্তা না বলা।

নবম নির্দেশ ঃ আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা ঃ এ আয়াত নবম নির্দেশ আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা সম্পর্কিত। বলা হয়েছে ঃ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوْا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এর অর্থ ঐ অঙ্গীকারও হতে পারে, যা রূহের জগতে অবস্থান করার সময় প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। তখন সব মানুষকে বলা হয়েছিল أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল ঃ بَلَىٰ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের প্রতিপালক। এ অঙ্গীকারের দাবি হলো এই যে, প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে

কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বাঁচতে হবে। অঙ্গীকারের সারকথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে।

এছাড়া এর অর্থ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গীকারও হতে পারে। বর্ণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর তফসীর করা হচ্ছে এবং যেগুলোতে দশটি নির্দেশ তাকিদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলিমগণ বলেন ঃ নযর, মান্নত ইত্যাদি পূর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। এতে অমুক কাজ করব কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করে। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ অর্থাৎ আল্লাহ্র সৎ বান্দারা মান্নত পূর্ণ করে।

মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের দিক দিয়ে শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এসব কাজের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

তৃতীয় আয়াতে দশম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ـ

অর্থাৎ এ শরীয়তে মুহাম্মদী আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অন্য কোন পথে চল না। কেননা, সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

এখানে هذا শব্দ দ্বারা দীনে ইসলাম অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সূরা আন-আমের প্রতিও ইশারা হতে পারে। কেননা, এতেও ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি তওহীদ, রিসালত এবং মূল বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে। مُسْتَقِيْمًا শব্দটি صراط এর বিশেষণ। কিন্তু ব্যাকরণিক দিক দিয়ে একে حال উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ। এরপর বলা হয়েছে ঃ فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ তখন মনযিলে মকসুদের সোজা পথ হাতে এসে গেছে। তাই এ পথেই চল।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ـ سُبُلْ শব্দটি سَبِيْلٌ এর বহুবচন। এর অর্থও পথ। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা এসব পথে চলো না। কেননা, এসব পথ বাস্তবে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে না। কাজেই যে এসব পথে চলবে সে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে পড়বে।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ কোরআন পাক ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কুরআন ও সুন্নাহ্র

ছাঁচে ঢেলে নিক এবং জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই যে, মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ্কে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও পছন্দের ছাঁচে ঢেলে নিতে চাচ্ছে। কোন আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীত দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুসনাদে দারেমীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সরল রেখা টেনে বললেন ঃ এটা আল্লাহ্র পথ অতঃপর এর ডানে-বামে আরও অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন ঃ এগুলো سبل (অর্থাৎ আয়াতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ পথসমূহ)। তিনি আরও বললেন, এর প্রত্যেকটি পথে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। এরা মানুষকে সরল পথ থেকে সরিয়ে এদিকে আহ্বান করে। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসেবে আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এ বিষয়ে জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযমী হও।

আয়াতদ্বয়ের তফসীর এবং এগুলোতে বর্ণিত দশটি নির্দেশের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হলো। উপসংহারে কোরআন পাকের এ বর্ণনাপদ্ধতির প্রতিও লক্ষ্য করুন যে, উল্লিখিত দশটি নির্দেশকে বর্তমান কালে প্রচলিত আইন গ্রন্থের মত দশ দফায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি ; বরং প্রথমে পাঁচটি নির্দেশ বর্ণনা করার পর বলেছেন ঃ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অতঃপর চারটি নির্দেশ ব্যক্ত করার পর এ تَعْقِلُوْنَ এর স্থলে تَذَكَّرُوْنَ এর পরিবর্তনসহ উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ নির্দেশটি একটি স্বতন্ত্র আয়াতে উল্লেখ করে এ বাক্যটিকেই আবার تَذَكَّرُوْنَ এর স্থলে تَتَّقُوْنَ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন পাকের এ বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনা ভঙ্গিতে বহু তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। প্রথমত এই যে, কোরআন পাক জগতের সাধারণ আইনসমূহের মত একটি শাসকসুলভ আইন নয়, বরং সহৃদয় আইন। তাই প্রত্যেক আইনের সাথে তাকে সহজসাধ্য করার কৌশলও ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়জ্ঞান ও পরকাল চিন্তাই মানুষকে নির্জনে ও জনসমক্ষে আইনের অনুগামী হতে বাধ্য করে। এ কারণেই তিনটি আয়াতের শেষভাগেই এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, যা মানুষের চিন্তাধারাকে বস্তুগত থেকে আল্লাহ্ ও পরকালের দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

প্রথম আয়াতে পাঁচটি নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে ঃ এক. শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা, দুই. পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করা, তিন. সন্তান হত্যা থেকে বিরত থাকা, চার. নির্লজ্জ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং পাঁচ. অন্যায় হত্যা থেকে বিরত হওয়া। এগুলোর শেষে تَعْقِلُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, জাহিলিয়াত যুগে এগুলোকে কেউ দোষ বলে মনে করত না। এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৈতৃক কুপ্রথা ও ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে বুদ্ধিকে কাজে লাগাও।

দ্বিতীয় আয়াতে চারটি নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে ঃ এক. ইয়াতীমদের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করা, দুই. ওজন ও মাপে ত্রুটি না করা, তিন. কথাবার্তায় ন্যায় ও সততার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং চার. আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ করা (যাঁর সাথে তোমরা অঙ্গীকৃত)।

এসব বিষয় পূরণ করা যে জরুরী, তা যে কোন অজ্ঞ লোকও জানে এবং জাহেলিয়াত যুগের কিছু লোক তা পালন করতো ; কিন্তু অধিকাংশই ছিল গাফিল। এ গাফলতির প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্ ও পরকালকে স্মরণ রাখা। তাই এ আয়াতের শেষে تَذَكَّرُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে সরল পথ অবলম্বন করা এবং এর বিপরীত অন্য সব পথ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্ভীতিই মানুষকে রিপু ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিরত রাখতে সহায়ক হতে পারে। তাই এর শেষে تَتَّقُوْنَ বলা হয়েছে।

তিন জায়গাতেই وَصّٰىكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ জোর নির্দেশ। এ কারণেই কোন কোন সাহাবী বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মোহরাঙ্কিত ওসীয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ তিনটি আয়াত পাঠ করে।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿১৫৪﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ
مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿১৫৫﴾ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ
اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ
لَغٰفِلِيْنَ ﴿১৫৬﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى
مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ
يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿১৫৭﴾

(১৫৪) অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নিয়ামত পূর্ণ করার জন্য, প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণের জন্য, হিদায়াতের জন্য এবং করুণার জন্য— যাতে তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়। (১৫৫) এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর—যাতে

ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদছিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ মানুষের সব আমলেরই ওযন হবে, কিন্তু আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ে কাঁদা এমন একটি আমল, যার কোন ওযন হবে না। বরং এর এক ফোঁটা অশ্রুও জাহান্নামের বৃহত্তম আগুন নির্বাপিত করে দেবে।--(মাযহারী)

এক হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে একটি লোক উপস্থিত হয়ে যখন আমলনামায় সৎকর্ম কম দেখবে, তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়বে। তখন হঠাৎ একটি বস্তু মেঘের মত উঠে আসবে এবং তার আমলনামার পাল্লায় এসে পড়বে। তাকে বলা হবে ঃ দুনিয়াতে তুমি মানুষকে মাস'আলা বলতে এবং শিক্ষা দিতে। এ হচ্ছে তোমার সেই আমলের ফল। তোমার এ শিক্ষা এগিয়ে এসেছে এবং যারা এ শিক্ষা অনুযায়ী আমল করেছে, তাদের সবার আমলেও তোমার অংশ রাখা হয়েছে।--(মাযহারী)

তিবরানী ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওযনে দু'টি কীরাত রেখে দেওয়া হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এই কীরাতের ওযন হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান।

তিবরানী জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের আমলের দাঁড়িপাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, তা হবে তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়রূপী সৎকর্ম।

ইমাম যাহাবী (র) হযরত এমরান ইবনে হাছীন (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন— যে কালি দ্বারা দীনী ইল্‌ম ও বিধান সংক্রান্ত বিষয় লেখা হয় তা এবং শহীদদের রক্ত কিয়ামতের দিন ওযন করা হবে। তখন ওযনের ক্ষেত্রে আলিমদের কালী শহীদদের রক্তের চাইতেও ভারী হবে।

কিয়ামতে আমলের ওযন সম্পর্কে এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি এজন্য উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা বিশেষ আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূল্য অনুমান করা যায়।এসব হাদীসদৃষ্টে আমলের ওযনের অবস্থা বিভিন্ন রূপ মনে হয়। কোন কোন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আমলকারী মানুষের ওযন হবে। তারা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী হাল্কা কিংবা ভারী হবে। কোন কোন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আমলনামারই ওযন করা হবে। আবার কোন কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমলসমূহ বস্তুসত্তা বিশিষ্ট হবে এবং সেগুলোর ওযন করা হবে। ইবনে কাসীর এসব হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন ঃ বিভিন্ন রূপে একধিকবার ওযন হওয়াও বিচিত্র নয়। এসব বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। আমল করার জন্য এ স্বরূপ জানা আদৌ জরুরী নয় ; বরং এতটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, আমাদের আমলেরও ওযন হবে। নেক আমলের পাল্লা হালকা হলে আমরা আযাবের যোগ্য হবো। তবে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে স্বীয় কৃপায় কিংবা কোন নবী অথবা ওলীর সুপারিশে ক্ষমা করে দিলে তা ভিন্ন কথা।

যেসব হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন কোন ব্যক্তি শুধু কালেমার বদৌলতে মুক্তি পবে এবং সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে, সেগুলো উপরোক্ত ব্যতিক্রম অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তারা সাধারণ নিয়মের বাইরে বিশেষ কৃপা ও অনুকম্পার কারণে মুক্তি পাবে।

আলোচ্য দু'টি আয়াতে পাপীদেরকে হাশরে লাঞ্ছনা ও আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সত্য গ্রহণ করতে ও তদনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে ঃ বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য এবং মালিকসুলভ ক্ষমতা দান করেছি। অতঃপর তোমাদের জন্য ভোগ্য সামগ্রী উপার্জন করার হাজারো পথ খুলে দিয়েছি। রাব্বুল আলামীন যেন পৃথিবীকে মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে চিত্তবিনোদনের অসবাবপত্র পর্যন্ত সব কিছুর একটা বিরাট গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এর ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। এখন মানুষের কাজ শুধু এতটুকু যে, গুদাম থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বের করে নিয়ে তা ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা করে নেওয়া। সত্য বলতে কি, ভূপৃষ্ঠে গুদামে সংরক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী সুষ্ঠুরূপে বের করা এবং বিশুদ্ধ পন্থায় তা ব্যবহার করাই মানুষের যাবতীয় জ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য। যেসব বোকা ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষ এ গুদাম থেকে মাল বের করার পদ্ধতি জানে না, কিংবা বের করার পর নিয়ম বুঝে না, তারা এর উপকার থেকে বঞ্চিত থাকে। সমঝদার মানুষ এসব নিয়ম-পদ্ধতি বুঝে এ গুদাম থেকে লাভবান হয়।

মোটকথা, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফিল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে ঃ قليلا ما تشكرون অর্থাৎ তোমরা খুব কম লোকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا
اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ
قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ
مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿١٣﴾ قَالَ
اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ
لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا
مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾

(১১) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি—আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করেছে, কিন্তু ইবলীশ ; সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১২) আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সিজদা করতে বারণ করল ? সে বলল ঃ আমি তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (১৩) বললেন ঃ তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। (১৪) সে বলল ঃ আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (১৫) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে সময় দেয়া হলো। (১৬) সে বলল ঃ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকবো। (১৭) এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডানদিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ্ বললেন ঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি (করার আয়োজন করতে আরম্ভ) করেছি (অর্থাৎ আদমের মূল পদার্থ তৈরি করেছি। এ মূল পদার্থ থেকেই তোমরা সবাই সৃজিত হয়েছ) অতঃপর (মূল পদার্থ তৈরি করে) আমি তোমাদের আকার-অবয়ব তৈরি করেছি (অর্থাৎ এ মূল পদার্থের দ্বারা আদমের আকৃতি গঠন করেছি। অনন্তর সে আকৃতিই তার সন্তানদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। এ হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ামত)। অতঃপর (যখন আদম সৃজিত হয়ে গেল এবং সৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর নাম সংক্রান্ত জ্ঞানে বিভূষিত হলো, তখন) আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ (এবার) তোমরা আদমকে সিজদা কর। (এ হচ্ছে সম্মান সংক্রান্ত নিয়ামত)। তখন সবাই সিজদা করল ঃ ইবলীস বাদে, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমি যখন (নিজে) নির্দেশ দিয়েছি, তখন কিসে তোকে সিজদা করতে বারণ করল ? সে বলল ঃ (যে বিষয়টি সিজদা করতে অন্তরায় হয়েছে, তাহলো এই যে,)আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর একে (আদমকে) আপনি মাটি দ্বারা তৈরি করেছেন। এ হচ্ছে শয়তানী যুক্তির প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশ—যা উল্লেখ করা হয়নি তা হলো এই যে, আলোকময় হওয়ার কারণে আগুন মাটির চাইতে উত্তম। তৃতীয় অংশ এই যে, যে উত্তম তার অংশ তথা সন্তান-সন্ততি অনুত্তমের অংশ থেকে উত্তম। চতুর্থ অংশ এই যে, অনুত্তমকে সিজদা করা উত্তমের পক্ষে অনুচিত। এ অংশ চতুষ্টয়ের সমন্বয়ে শয়তান সিজদা না করার পক্ষে এ যুক্তি দাঁড় করাল যে, আমি উত্তম, তাই অনুত্তমকে সিজদা করিনি। কিন্তু প্রথম অংশটি বাদে অবশিষ্ট সবগুলো অংশই ভ্রান্ত। প্রথম অংশটি সাধারণ মানুষের বেলায় এ অর্থে শুদ্ধ যে, মানব সৃজনের প্রধান উপাদান হচ্ছে মাটি। যুক্তির অবশিষ্ট অংশগুলোর ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। কেননা, মাটির তুলনায় আগুনের আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে ; কিন্তু সব দিক দিয়ে আগুনকে শ্রেষ্ঠ বলা অমূলক দাবি বৈ নয়।

এমনিভাবে যে শ্রেষ্ঠ, তার সন্তান-সন্ততির শ্রেষ্ঠত্বও সন্দেহযুক্ত বিষয়। হাজারো ঘটনা এর বিরুদ্ধে বিদ্যমান। সৎ লোকের সন্তান-সন্ততি অসৎ এবং অসৎ লোকের সন্তান-সন্ততিও সৎ হয়ে যায়। এমনিভাবে অধমকে শ্রেষ্ঠের পক্ষে সিজদা করা অনুচিত—একথাটিও ভ্রান্ত। বিভিন্ন উপকারিতা দৃষ্টে এরূপ সিজদা করা মাঝে মাঝে উচিত বলেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ (তুই যখন এতই অবাধ্য, তখন) আকাশ থেকে নিচে নেমে যা। তোর অহংকার করার কোন অধিকার নেই (বিশেষ করে আকাশে থেকে। যেখানে অনুগতদেরই স্থান রয়েছে) তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। (অর্থাৎ দূর হয়ে যা)। নিশ্চয় তুই (এ অহংকারের কারণে) অধমদের অন্তর্ভুক্ত (থেকে গিয়েছিস)। সে বলল ঃ আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবসর দান করুন। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেওয়া হলো। সে বলল ঃ আপনি যেমন আমাকে (তাকবিনী হুকুম অনুযায়ী) বিভ্রান্ত করেছেন, আমি কসম খেয়ে বলছি, তেমনিভাবে আমি তাদের জন্য (অর্থাৎ আদম ও আদম সন্তানদের বিভ্রান্ত করার জন্য) আপনার সরল পথে (যার বাস্তব রূপ হচ্ছে সত্য দীন) বসে যাব। অতঃপর তাদেরকে (চতুর্দিক) থেকে আক্রমণ করব—সম্মুখ থেকেও, পেছন দিক থেকেও, তাদের ডানদিক থেকেও এবং বামদিক থেকেও (অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি করব না—যাতে তারা আপনার ইবাদত করতে না পারে) আর (আমি আমার প্রচেষ্টায় সফলকাম হব। কাজেই) আপনি তাদের অধিকাংশকেই (আপনার নিয়ামতসমূহের প্রতি) কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ তা'আলা বললেন এখান থেকে (অর্থাৎ আকাশ থেকে) লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বের হয়ে যা। (এবং আদম সন্তানদেরকে পথভ্রান্ত করার যে কথা তুই বলছিস, সে সম্পর্কে যা খুশি, তাই কর গিয়ে। আমি সব স্বার্থের উর্ধ্বে। কেউ পথপ্রাপ্ত হলেও আমার কোন লাভ নেই এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলেও আমার কোন ক্ষতি নেই)। তাদের মধ্যে যে তোর অনুগত হবে—নিশ্চয় আমি তোদের দ্বারা (অর্থাৎ ইবলীস ও তার অনুগতদের দ্বারা) জাহান্নামকে পূর্ণ করে দেব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে উল্লিখিত হযরত আদম (আ) ও শয়তানের এ ঘটনা সূরা বাকারায় চতুর্থ রুকূতেও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা হয়েছে। এখানে আরও কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে ইবলীসের দোয়া কবূল হয়েছে কিনা। কবূল হয়ে থাকলে দুটি পরস্পর বিরোধী আয়াতের ভাষায় সামঞ্জস্য বিধান ঃ ইবলীস ঠিক ক্রোধ ও গযবের মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একটি অভিনব প্রার্থনা করে বলেছিল ঃ আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত জীবন দান করুন। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে ঃ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ অর্থাৎ তোকে অবকাশ দেওয়া হলো। দোয়া ও প্রশ্নের ইঙ্গিত এ থেকে বুঝে নেওয়া যায় যে, এ অবকাশ হাশর পর্যন্ত সময়ের জন্যই দেওয়া হয়েছে। কারণ, সে এ প্রার্থনাই করেছিল। কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়নি যে, এখানে উল্লিখিত অবকাশ ইবলীসের আবদার অনুযায়ী হাশর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, না কি অন্য কোন মেয়াদ পর্যন্ত। কিন্তু অন্য আয়াতে এ স্থলে إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ শব্দাবলীও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত

বোঝা যায় যে, ইবলীসের প্রার্থিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্র জ্ঞানে সংরক্ষিত। অতএব সারকথা এই যে, ইবলীসের দোয়া কবূল হলেও আংশিক কবূল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দানের পরিবর্তে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছে। তফসীরে ইবনে জরীরে সুদ্দী থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ

فلم ينظره الى يوم البعث ولكن انظره الى يوم الوقت المعلوم وهو يوم ينفخ فى الصور النفخة الاولى فصعق من فى السماوات ومن فى الارض فمات....

আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে হাশর দিবস পর্যন্ত অবসর দেননি : বরং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ দিন পর্যন্ত, যেদিন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

মোটকথা, শয়তান ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল, দ্বিতীয় বার শিঙ্গা ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত, যখন সব মৃতকে জীবিত করা হবে। একেই পুনরুত্থান দিবস বলা হয়। এ দোয়া হুবহু কবূল হলে যে সময় একমাত্র আল্লাহ্কে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে না এবং كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ–এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার কারণে ইবলীস তখনও জীবিত থাকতো। এ কারণেই তার পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দানের একই দোয়াকে পরিবর্তন করে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত কবূল করা হয়েছে। এর ফলে যেসময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন ইবলীসও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সবাই যখন পুনরায় জীবিত হবে, তখন সে-ও জীবিত হবে।

ইবলীসের এ দোয়া ও كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (পৃথিবীস্থ সবকিছু ধ্বংসশীল) আয়াতের মধ্যে বাহ্যত যে পরস্পর বিরোধিতা ছিল উপরোক্ত বিশ্লেষণের ফলে তাও বিদূরিত হয়ে গেল।

এই বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, يوم البعث (পুনরুত্থান দিবস) ও يوم الوقت المعلوم (নির্দিষ্ট দিবস) দু'টি পৃথক দিন। ইবলীস يوم البعث পর্যন্ত অবসর চেয়েছিল। তা সম্পূর্ণ কবূল হয়নি, বরং একে পরিবর্তন করে يوم الوقت المعلوم অবসর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি পৃথক দিন। প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সময় থেকে জান্নাত ও দোযখে প্রবেশ পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ দিন হবে। এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিতে হবে। এসব বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পর্ক রেখে এ দিনকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা যেতে পারে, উদাহরণত একে يوم نفخ فى الصور (শিঙ্গা ফুঁকার দিন) ও يوم فناء (ধ্বংসের দিন)-ও বলা যায় এবং يوم البعث (পুনরুত্থান দিবস) يوم جزاء (প্রতিদান দিবস) নামেও অভিহিত করা যায়। এতে সব খট্কা দূর হয়ে যায়।

কাফিরদের দোয়াও কবূল হতে পারে কি ঃ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلاَلٍ এ আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, কাফিরের দোয়া কবূল হয় না; কিন্তু ইবলীসের এ ঘটনা ও আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে উপরোক্ত প্রশ্ন দেখা দেয়। উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফিরের দোয়াও কবূল হতে পারে। ফলে ইবলীসের মত মহা কাফিরের দোয়াও কবূল হয়ে গেল। কিন্তু পরকালে কাফিরের দোয়া কবূল হবে না। উল্লিখিত আয়াত وما دعاء الكافرين الا فى ضلال পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

আদম ও ইবলীসের ঘটনার বিভিন্ন ভাষা ঃ কোরআন মজীদে এ কাহিনী কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক জায়গায় প্রশ্ন ও উত্তরের ভাষা বিভিন্ন রূপ। অথচ ঘটনা একটিই। এর কারণ এই যে, আসল ঘটনা সর্বত্র একইরূপে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য বিষয়বস্তু এক থাকার পর ভাষার বিভিন্নতা আপত্তির বিষয় নয়। কেননা, অর্থ ঠিক রেখে যে-কোন ভাষায় বর্ণনা করা দূষণীয় নয়।

আল্লাহ্র সামনে এমন নির্ভীকভাবে কথা বলার দুঃসাহস ইবলীসের কিরূপে হলো ঃ রাব্বুল ইযযত আল্লাহ্র মহান দরবারে তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের কারণে রাসূল কিংবা ফেরেশতাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার সাধ্য ছিল না। ইবলীসের এরূপ দুঃসাহস কিরূপে হলো? আলিমগণ বলেন ঃ এটাও আল্লাহ্ তা'আলার চূড়ান্ত গযবের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্র রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে ইবলীসের সামনে একটি পর্দা অন্তরায় হয়ে যায়। এ পর্দা তার সামনে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও প্রতাপকে ঢেকে দেয় এবং তার মধ্যে নির্লজ্জতা প্রবেশ করিয়ে দেয়।—(বয়ানুল কোরআন ঃ সংক্ষেপিত)

মানুষের উপর শয়তানের হামলা চতুর্দিকে সীমাবদ্ধ নয়—আরও ব্যাপক ঃ আলোচ্য আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্য চারটি দিক বর্ণনা করেছে—অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হলো প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে। তাই উপর কিংবা নিচের দিক থেকে পথভ্রষ্ট করার আশংকা এর পরিপন্থী নয়। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থী নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে।

আলোচ্য আয়াতে শয়তানকে আকাশ থেকে বের হয়ে যাবার নির্দেশটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِيْنَ বাক্যে এবং দ্বিতীয় قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا বাক্যে। সম্ভবত প্রথম বাক্যে প্রস্তাব এবং দ্বিতীয় বাক্যে এর কার্যকারিতা বর্ণিত হয়েছে। —(বয়ানুল কোরআন ঃ সংক্ষেপিত)

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ

لَهُمَا مَا وُۥرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ

إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ

ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَدَلَّىٰهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا

يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ

وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن

لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ

لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ

فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

(১৯) হে আদম ! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গুনাহ্গার হয়ে যাবে। (২০) অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল ঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও এখানকারই চিরকালীন বাসিন্দা। (২১) সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। (২২) অতঃপর প্রতারণা পূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের শত্রু ? (২৩) তারা উভয়ে বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (২৪) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল-ভোগ আছে। (২৫) বললেন ঃ তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আমি আদমকে নির্দেশ দিলাম ঃ) হে আদম (আ)! তুমি এবং তোমার সহধর্মিণী (হাওয়া) জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর যেখান থেকে ইচ্ছা (এবং যা ইচ্ছা) উভয়ে ভক্ষণ কর। তবে (এতটুকু মনে রেখো যে,) এ (বিশেষ) বৃক্ষটির কাছে (ও) যেয়ো না, (অর্থাৎ এর ফল খেয়ো না) অন্যথায় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যারা অন্যায়াচরণ করে। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যাতে (তাদেরকে নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে খাইয়ে) তাদের আবৃত অঙ্গ যা উভয়ের কাছে গোপন ছিল, উভয়ের সামনে প্রকাশ করে দেয়। কেননা, এ বৃক্ষ ভক্ষণের এটাই ছিল প্রতিক্রিয়া–নিজ সত্তার দিক দিয়ে–অথবা নিষেধাজ্ঞার কারণে। (এবং কুমন্ত্রণা ছিল এই যে, সে) বলল ঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের এ বৃক্ষের (ফল ভক্ষণ) থেকে অন্য কোন কারণে নিষেধ করেননি; বরং শুধু এ কারণে যে, তোমরা উভয়ে (এর ফল খেয়ে) কখনো না ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা কোথাও চিরকাল বসবাস কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও! (কুমন্ত্রণার সারমর্ম ছিল এই যে, এ বৃক্ষ খেলে ফেরেশতাসুলভ শক্তি এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু প্রথমদিকে তোমরা এ শক্তিশালী খাদ্য সহ্য করতে সক্ষম ছিলে না। তাই নিষেধ করা হয়েছিল। এখন তোমাদের অবস্থা ও শক্তি অনেক উন্নত। তোমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গে একে সহ্য করার ক্ষমতা হয়ে গেছে। কাজেই পূর্বের নিষেধাজ্ঞা আর বাকি নেই)। এবং (শয়তান) তাদের উভয়ের সামনে (এ বিষয়ে) শপথ করল যে, নিশ্চিত বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের উভয়ের (আন্তরিক) হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর (এমন সব কথা বলে) উভয়কে প্রতারণা পূর্বক নিচে নামিয়ে দিল। (নিচে নামানো অবস্থা ও মতের দিক দিয়েও ছিল। তারা নিজস্ব মত ত্যাগ করে শত্রুর মতের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। অবস্থানের দিক দিয়েও নামানো ছিল। কারণ, জান্নাত থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল)। অতএব তারা বৃক্ষ আস্বাদন করতেই (তৎক্ষণাৎ) উভয়ের আবৃত অঙ্গ পরস্পরের সামনে খুলে গেল (অর্থাৎ জান্নাতের পোশাক খুলে গেল এবং লজ্জিত হলো) এবং (দেহ আবৃত করার জন্য) উভয়ে নিজের (দেহের) উপর জান্নাতের (বৃক্ষের) পাতা মিলিয়ে মিলিয়ে রাখতে লাগল এবং (তখন) তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদের উভয়কে এ বৃক্ষ (খাওয়া) থেকে নিষেধ করিনি এবং একথা বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ? (এর প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকবে)? উভয়ে বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের বড় ক্ষতি করেছি। (পুরোপুরি সতর্ক হইনি এবং চিন্তা-ভাবনা করিনি), যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। আল্লাহ তা'আলা (আদম ও হাওয়াকে) বললেন ঃ তোমরা (জান্নাত থেকে) নিচে (পৃথিবীতে) নেমে যাও–তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের সন্তান-সন্ততি) পরস্পরে একে অন্যের শত্রু হয়ে থাকবে এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বসবাসের স্থান (নির্ধারিত) রয়েছে এবং (জীবিকার উপায়াদি দ্বারা) ফলভোগ করা (নির্ধারিত) রয়েছে বিশেষ সময় পর্যন্ত। (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত)। তিনি (আরও) বললেন ঃ তোমরা সেখানেই জীবন অতিবাহিত করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই (কিয়ামতের দিন) পুনরুত্থিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আদম (আ) ও ইবলীসের যে ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হুবহু এ ঘটনাই সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূতে বিশদ বর্ণনাসহ উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্ভাব্য সব প্রশ্ন ও সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর, পূর্ণ ব্যাখ্যা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিসহ সূরা বাকারার তফসীরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ
ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ
الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ
اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ
لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

(২৬) হে বনি-আদম! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহিযগারীর, পোশাক–এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র কুদরতের অন্যতম নির্দশন, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে। (২৭) হে বনী-আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে–যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আদম সন্তানগণ! (আমার এক নিয়ামত এই যে,) আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছি, যা তোমাদের সতরকেও (অর্থাৎ গুপ্ত অঙ্গকে) আচ্ছাদিত করে এবং (তোমাদের দেহকে) সুসজ্জিতও করে এবং (এ বাহ্যিক পোশাক ছাড়া একটি অন্তরগত পোশাকও তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি, যা) তাক্ওয়ার (অর্থাৎ ধর্মপরায়ণতার পোশাকও)। এটি (বাহ্যিক পোশাক থেকে) (উত্তম (ও বেশি জরুরী)। কেননা, ধর্ম-পরায়ণতার একটি অঙ্গ হিসাবেই বাহ্যিক পোশাকও শরীয়তে কাম্য–আসল উদ্দেশ্য সর্বাবস্থায় ধর্মপরায়ণতার পোশাকই) এটি (অর্থাৎ পোশাক সৃষ্টি করা) আল্লাহ্ তা'আলার (কৃপা ও অনুগ্রহের) নিদর্শনাবলীর অন্যতম যাতে তারা (এ নিয়ামতকে) স্মরণ করে (এবং স্মরণ করে নিয়ামতদাতার যথার্থ আনুগত্য

করে। যথার্থ অনুগত্যকেই ধর্মপরায়ণতার পোশাক বলা হয়েছে)। হে আদম সন্তানেরা! শয়তান যেন তোমাদেরকে কোন অনিষ্টে না ফেলে (অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা ধর্ম ও তাকওয়ার বিপরীত কোন কাজ না করায়)। যেমন, সে তোমাদের দাদা-দাদীকে (অর্থাৎ আদম ও হাওয়া [আ]-কে জান্নাত থেকে বের করিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের দ্বারা এমন কাজ করিয়েছে, যার ফলে তারা জান্নাত থেকে বের হয়ে গেছে এবং বেরও) এমন অবস্থায় (করিয়েছে) যে, তাদের পোশাকও তাদের (দেহ) থেকে খুলিয়ে দিয়েছে-যাতে উভয়কে উভয়ের গুপ্তাঙ্গ দেখিয়ে দেয়। (যা সাধারণ রুচিবান লোকের জন্যও অত্যন্ত লজ্জাকর ও অপমানকর ব্যাপার। মোটকথা, শয়তান তোমাদের পুরাতন শত্রু। তার থেকে খুব সাবধান থাক। বেশি সাবধানতা এজন্য আরও জরুরী যে) সে এবং তার দলবল এমনভাবে তোমাদেরকে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে (সাধারণত দেখ না। (নিঃসন্দেহে এরূপ শত্রু অত্যন্ত মারাত্মক। এ থেকে আত্মরক্ষায় পুরোপুরি যত্নবান হওয়া উচিত। পূর্ণ ঈমান ও তাকওয়া দ্বারাই তা অর্জিত হয়। ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কেননা,) আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু হতে দেই, যারা ঈমান অবলম্বন করে না। (যদি ঈমান মোটেই না থাকে, তবে শয়তান পুরোপুরি তাকে কাবু করে নেয়। পক্ষান্তরে যদি ঈমান থাকে অপূর্ণ, তবে তদপেক্ষা কম কাবু করে। এর বিপরীতে পূর্ণ মু'মিনের উপর শয়তানের কোন বশ চলে না। যেমন কোরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ٥

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইতিপূর্বে পূর্ণ এক রুকূতে আদম (আ) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে শয়তানী প্ররোচনার প্রথম পরিণতিতে আদম ও হাওয়া (আ)-এর জান্নাতী পোশাক খুলে গিয়েছিল এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা বৃক্ষপত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে শুরু করেছিলেন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ তোমাদের পোশাক আল্লাহ্ তা'আলার একটি মহান নিয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়নি—সমগ্র বনী আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ—এখানে يوارى শব্দটি مواراة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আবৃত করা। سَوْاٰت শব্দটি سَوْءَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ মানুষের ঐসব অঙ্গ যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবগতভাবেই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে এমন একটি পোশাক সৃষ্টি করেছি, যদ্দারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَرِيْشًا—সাজ-সজ্জার জন্য মানুষ যে পোশাক পরিধান করে, তাকে ريش বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্য তো সংক্ষিপ্ত পোশাকই যথেষ্ট হয়; কিন্তু

আমি তোমাদেরকে আরও পোশাক দিয়েছি,যাতে তোমরা তদ্দ্বারা সাজ-সজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার

কোরআন পাক এ স্থলে اَنْزَلْنَا অর্থাৎ 'অবতরণ করা' শব্দ ব্যবহার করেছে। উদ্দেশ্য, দান করা। এটা জরুরী নয় যে, আকাশ থেকে তৈরি পোশাক অবতীর্ণ হবে। যেমন অন্যত্র اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি লোহা অবতারণ করেছি। অথচ লোহা ভূগর্ভস্থ খনি থেকে বের হয়। উভয়স্থলে اَنْزَلْنَا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে যেমন মানুষের কোন কলাকৌশল ও কারিগরির প্রভাব থাকে না, তেমনি পোশাকের আসল উপাদান তুলা বা পশমের মধ্যে কোন মানবীয় কলা-কৌশলের বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই। এটা একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দান। তবে এগুলো দ্বারা শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য পছন্দসই পোশাক তৈরি করার মধ্যে মানবীয় কারিগরি অবশ্যই কাজ করে। এ কারিগরিও আল্লাহ তা'আলারই এমন দান, যার মূল সূত্র আল্লাহ্র তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়।

পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা ঃ আয়াতে পোশাকের দু'টি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। এক. গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং দুই. শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গসজ্জা। প্রথম উপকারিতাটি অগ্রে বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল লক্ষ্য। এটাই সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য। জন্তু-জানোয়ারের পোশাক সৃষ্টিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ। এ পোশাকের কাজ শুধু শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষাই নয়, অঙ্গসজ্জাও বটে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। কোথাও লেজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে।

আদম-হাওয়া এবং তাঁদের সাথে শয়তানী প্ররোচনার ঘটনা বর্ণনা করার পর পোশাকের কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা চূড়ান্ত হীনতা ও নির্লজ্জতার লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিষ্টের ভূমিকা বিশেষ।

মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা ঃ মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ঃ শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী শরীয়ত গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই স্থির করেছে। নামায, রোযা ইত্যাদি সবই এর পরবর্তী করণীয়।

হযরত ফারুকে আযম (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নতুন পোশাক পরিধান করার সময় এ দোয়া পাঠ করা উচিত ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ.

–অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক দ্বারা আমি গুপ্তাঙ্গ আবৃত করি এবং সাজসজ্জা করি।

নতুন পোশাক তৈরির সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেওয়ার সওয়াব ঃ তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকির-মিসকীনকে দান করে দেয়, সে জীবনে ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আশ্রয়ে চলে আসে।–(ইবনে কাসীর)

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় এ দু'টি উপকারিতাই স্মরণ করানো হয়েছে, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পোশাক সৃষ্টি করেছেন।

গুপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদন সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষের স্বভাবগত কর্ম। ক্রমোন্নতির নতুন দর্শন ভ্রান্ত ঃ আদম (আ)-এর ঘটনা এবং কোরআন পাকের এ বক্তব্য থেকে এ কথাও ফুটে উঠেছে যে, গুপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদন এবং পোশাক মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং জন্মগত প্রয়োজন। প্রথম দিন থেকেই এটি মানুষের সাথে রয়েছে। আজকালকার কোন কোন দার্শনিকের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন যে, মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরাফেরা করত; অতঃপর ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর পোশাক আবিষ্কৃত হয়েছে।

পোশাকের একটি তৃতীয় প্রকার ঃ গুপ্ত অঙ্গ আবৃতকরণ এবং আরাম ও সাজ সজ্জার জন্য দু'প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কোরআন পাক তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছে ঃ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ কোন কোন কিরাআতে যবর দিয়ে لِبَاسَ التَّقْوٰى পড়া হয়েছে এমতাবস্থায় انزلنا এর مفعول হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় পোশাক অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাক অবতীর্ণ করেছি, প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দু'প্রকার পোশাক তো সবাই জানে। তৃতীয় একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম পোশাক। হযরত ইবনে আব্বাস ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রা)-এর তফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোশাক বলে সৎকর্ম ও আল্লাহ্ ভীরুতাকে বোঝানো হয়েছে।–(রূহুল মা'আনী)

উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্ত অঙ্গেরজন্য আবরণ এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা ও সাজ-সজ্জার উপায় হয়, তেমনি সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌ভীরুতারও একটি অন্তরগত পোশাক রয়েছে। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের উপায়। একারণেই এটি সর্বোত্তম পোশাক।

এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ভীতি ও সৎকর্মবিহীন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি যত পর্দার ভিতরেই আত্মগোপন করুক না কেন, পরিণামে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। ইবনে জরীর হযরত উসমান (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঐ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ–যে ব্যক্তি কোন কাজ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে করে আল্লাহ তা'আলা তাকে সে কাজের চাদর পরিধান করিয়ে তা প্রমাণ করিয়ে দেন। সৎকাজ হলে সৎকাজের কথা এবং অসৎকাজ হলে অসৎকাজের কথা প্রকাশ করেন। 'চাদর পরিধান করানোর" অর্থ এই যে, দেহে পরিহিত চাদর যেমন সবার দৃষ্টির সামনে থাকে, তেমনি মানুষের কাজ যতই গোপন হোক না কেন, তার ফলাফল ও চিহ্ন তার মুখমণ্ডল ও দেহে আল্লাহ তা'আলা ফুটিয়ে দেন। এ বক্তব্যের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ ۔

বাহ্যিক পোশাকেরও আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা ঃ لِبَاسُ التَّقْوٰى শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোশাক দ্বারা গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ও সাজসজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতি। এ আল্লাহ্‌ভীতি পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত, যেন গুপ্তাঙ্গসমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। পোশাক শরীরে এমন আঁটসাটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর হয়। পোশাকে অহংকার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই। বরং নম্রতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হওয়া চাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয় না হওয়া চাই। মহিলাদের জন্য পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্য মহিলাদের পোশাক না হওয়া চাই,যা আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দনীয়। অধিকন্তু পোশাকে বিজাতির অনুসরণও না হওয়া চাই, যা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক।

এতদসত্ত্বেও পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিত্র ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ—অর্থাৎ মানুষকে এ তিন প্রকার পোশাক দান করা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম—যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে যেন আবার তোমাদেরকে ফ্যাসাদে ফেলে না দেয়; যেমন তোমাদের পিতামাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে এবং তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শত্রু। সর্বদা তার শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ।

আয়াতের শেষে বলেছেন ঃ

اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ۔

এখানে قَبِيْل শব্দের অর্থ দলবল। এক পরিবারভুক্ত দলকে قَبِيْلَة বলা হয় এবং সাধারণ দলকে قَبِيْل বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান তোমাদের এমন শত্রু যে, সে এবং তার দলবল তো তোমাদেরকে দেখে কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখ না। কাজেই তাদের চক্রান্ত ও প্রতারণা তোমাদের উপর কার্যকরী হওয়ার আশংকা বেশি।

কিন্তু অন্যান্য আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে এবং শয়তানী চক্রান্ত থেকে সাবধান থাকে, তাদের জন্য শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।

এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ আমি শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক নিযুক্ত করি, যারা ঈমান অবলম্বন করে না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈমানদারদের জন্য শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করা মোটেই কঠিন নয়।

কোন কোন মনীষী বলেছেন ঃ যে শত্রু আমাদেরকে দেখে এবং আমরা তাকে দেখি না, আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করাই তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহ্ পাক শয়তান ও তার দলবলের গতিবিধি দেখেন, কিন্তু শয়তানরা তাঁকে দেখে না।

মানুষ শয়তানকে দেখতে পায় না—একথাটি সাধারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। অলৌকিকভাবে কোন মানুষ শয়তানকে দেখলে তা এর পরিপন্থী নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জিনদের আগমন করা, প্রশ্ন করা, ইসলাম গ্রহণ করা ইত্যাদি সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে।—(রূহুল মা'আনী)

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي
بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ
عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

(২৮) তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে ঃ আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ্ মন্দ কাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহ্র প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না ? (২৯) আপনি বলে দিন ঃ আমার পালনকর্তা সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। (৩০) তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃজিত হবে। একদলকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। (৩১) তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও—খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে, (অর্থাৎ যা সুস্পষ্ট মন্দ কাজ এবং মানব স্বভাব যাকে মন্দ মনে করে; যেমন উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা) তখন বলে ঃ আমরা স্বীয় বাপ-দাদাকে এ পথে পেয়েছি এবং আল্লাহ্ তা'আলাও আমাদেরকে তাই বলেছেন। (হে রাসূল [সা] তাদের মূর্খতাসুলভ যুক্তির প্রত্যুত্তরে) আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কখনও অশ্লীল কাজ শিক্ষা দেন না। তোমরা কি (এরূপ দাবি করে) আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করছ, যার কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে নেই? আপনি (আরও) বলে দিন ঃ (তোমরা যেসব অশ্লীল ও ভ্রান্ত কাজের নির্দেশকে আল্লাহ্র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছ, সেগুলো তো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আল্লাহ্ তা'আলা বাস্তবিক কি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, এখন তাই শোন। তা এই যে) আমার পালনকর্তা সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই যে, নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা প্রত্যেক সিজদার (অর্থাৎ ইবাদতের) সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা (আল্লাহ্র দিকে) রাখ। (অর্থাৎ ইবাদতে যেন কোন সৃষ্ট বস্তুকে অংশীদার না কর) এবং আল্লাহ্র ইবাদতকে খাঁটিভাবে আল্লাহ্র জন্যেই রাখ। (এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে শরীয়তের সব আদিষ্ট বিষয় সংক্ষেপে এসে গেছে ঃ সুবিচার শব্দে বান্দার হক, اقيموا অংশে কর্ম ও ইবাদতের এবং مخلصين শব্দে ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে)। তোমাদেরকে তিনি প্রথমবার যেরূপ সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমরা (এক সময়ে) পুনরায় সৃজিত হবে। এক দলকে আল্লাহ্ তা'আলা (দুনিয়াতে) পথ প্রদর্শন করেছেন (তারা তখন প্রতিদান পাবে) এবং এক দলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে, (তারা তখন শাস্তি পাবে) নিশ্চয় তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং (এতদসত্ত্বেও নিজেদের সম্পর্কে) ধারণা করে যে, তারা সৎপথে আছে। হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় (নামাযের জন্য হোক কিংবা তওয়াফের জন্য) স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং (পোশাক বর্জন যেমন গুনাহ্ হালাল বস্তুর পানাহার অবৈধ মনে করাও তেমনি গুনাহ্। এজন্য হালাল বস্তু) তৃপ্তির সাথে খাও ও পান কর এবং শরীয়তের সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মেধ্যে একটি ছিল এই যে, কোরাইশদের ছাড়া কোন ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কাবা গৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন কোরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হতো, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো।

এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেওয়া কোরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণত রাতের অন্ধকারে তওয়াফ করত। তারা এ শয়তানী কাজের কারণ এই বর্ণনা করত যে, যেসব পোশাক পরে আমরা পাপ কাজ করি সেগুলো পরিধান করে আল্লাহ্র ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবী। (এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টিকে বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরও বেশি বেআদবীর কাজ। হেরেমের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কোরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল)।

আলোচ্য প্রথম আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করত তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলত ঃ আমাদের বাপ-দাদা ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরীকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরও বলত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে আয়াতে অশ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফকেই বোঝানো হয়েছে। فحش ,فحشاء ও فاحشة এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণ মাত্রায় সুস্পষ্ট। –(মাযহারী)

এ স্তরে ভাল ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত। –(রূহুল মা'আনী)

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্য দু'টি প্রমাণ উপস্থিত করেছে। এক. বাপ-দাদার অনুসরণ; অর্থাৎ বাপ-দাদার তরীকা কায়েম রাখার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। এর উত্তর দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। মূর্খ বাপ-দাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। সামান্য জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, কোন তরীকার বৈধতার পক্ষে এটা কোন প্রমাণ হতে পারে না যে, বাপ-দাদারা এরূপ করত। কেননা, বাপ-দাদার তরীকা হওয়া যদি কোন তরীকার বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্ন লোকের বাপ-দাদাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী তরীকা ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ভ্রান্ত তরীকাও বৈধ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা মূর্খদের এ প্রমাণ ভ্রূক্ষেপযোগ্য ছিল না বলেই কোরআন পাক এখানে এর উত্তর দেয়া জরুরী মনে করেনি। তবে অন্যান্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাপ-দাদারা কোন মূর্খতাসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য হতে পারে?

উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সর্বৈব মিথ্যা এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভ্রান্তি আরোপ। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ–অর্থাৎ আপনি বলে দিন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। কেননা এরূপ নির্দেশ দেয়া আল্লাহ্র প্রজ্ঞা ও শানের পরিপন্থী। অতঃপর তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে ঃ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্র প্রতি এমন বিষয় আরোপ কর যার জ্ঞান তোমাদের কাছে নেই? জানা কথা যে, না জেনে না শুনে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কিছুর সম্বন্ধ করে দেওয়া চরম ধৃষ্টতা ও অন্যায়। অতএব, আল্লাহ্র প্রতি এমন ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা কত অপরাধ ও অন্যায় হবে! মুজতাহিদগণ কোরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাঁরা প্রমাণের ভিত্তিতেই এসব বিধান উদ্ভাবন করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ-অর্থাৎ যেসব মূর্খ উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহ্র দিকে করে; আপনি তাদের বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা قسط-এর নির্দেশ দেন। قسط-এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ ত্রুটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমায় লংঘনও নেই।

অর্থাৎ স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত শরীয়তের সব বিধি-বিধানের অবস্থা তাই। এজন্য قسط শব্দের অর্থে যাবতীয় ইবাদত, আনুগত্য ও শরীয়তের সাকল্য বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। -(রূহুল মা'আনী)

এ আয়াতে ন্যায়বিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের পথভ্রষ্টতার উপযোগী দু'টি বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক. اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এবং দুই. وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -প্রথম বিধানটি মানুষের বাহ্যিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে প্রথম বিধানে مسجد শব্দটি সিজদা ও ইবাদতের অর্থে বর্ণিত হয়েছে।অর্থ এই যে, প্রত্যেক ইবাদত ও নামাযের সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ। এর এক উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাযের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্নবান হও এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় আননকে পালনকর্তার নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক-সেদিক যেন না হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে এ বিধানটি বিশেষভাবে নামাযের জন্য হবে না; বরং যাবতীয় ইবাদত ও লেনদেনকেও পরিব্যাপ্ত করবে।

দ্বিতীয় বিধানের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই হয়, এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না থাকে। এমনকি, গোপন শিরক অর্থাৎ লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই।

এ বিধান দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। আন্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আনুগত্য যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধু আন্তরিকতা বাহ্যিক শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত যথেষ্ট হতে পারে না।বরং বাহ্যিক অবস্থাকেও শরীয়ত অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্তরকেও আল্লাহ্র জন্য খাঁটি রাখা একান্ত জরুরী। এতে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে, যারা শরীয়ত ও তরীকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মনে করে । তাদের ধারণা এই যে, তরীকত অনুযায়ী অন্তর সংশোধন করে নেওয়াই যথেষ্ট, তাতে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোন দোষ নেই। বলাবাহুল্য, এটা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ-অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন পুনর্বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান করবেন। তাঁর অসীম শক্তির পক্ষে এটা কোন কঠিন কাজ নয়; বরং খুব সহজ। সম্ভবত এ সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য يعيدكم এর পরিবর্তে تعودون বলেছেন।অর্থাৎ পুনর্বার সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ কোন কর্মতৎপরতা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে না -(রূহুল মা'আনী)

এ বাক্যটি এখানে আনার আরও একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে শরীয়তের বিধানাবলীতে পূর্ণরূপে কায়েম থাকা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কেননা, পরকাল ও কিয়ামত এবং তথায় ভালমন্দ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্য প্রত্যেক কঠিনকে সহজ এবং কষ্টকে সুখে রূপান্তরিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের

মধ্যে এ ভীতি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোন ওয়াজ ও উপদেশ তাকে সোজা করতে পারে না এবং কোন আইনই তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ একদল লোককে তো আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়েত দান করেছেন এবং একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা, তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানদেরকে সহচর করেছে; অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র হিদায়েত যদিও সবার জন্যে ছিল; কিন্তু তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং যুলুমের উপর যুলুম এই হয়েছে যে, তারা স্বীয় অসুস্থাবস্থাকেই সুস্থতা এবং পথভ্রষ্টতাকেই হিদায়েত মনে করে নিয়েছে।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা কোন ওযর নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে, তবে সে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে সে তদ্বারা আসল ও মেকী এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জ্ঞানবুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেননি, পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাযিল করেছেন। এসবের মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যদি কারও মনে সন্দেহ জাগে যে, যে ব্যক্তি বাস্তবে নিজেকে সত্য মনে করে–যদিও সে ভ্রান্ত হয়, তাতে তার দোষ কি ? সে ক্ষমার্হ হওয়া উচিত। কারণ, সে নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাতই ছিল না। উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান, বিবেচনা অতঃপর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে কমপক্ষে তার অবলম্বিত পথের বিপরীতটির সম্ভবনা ও সন্দেহ অবশ্যই হওয়া উচিত। এখন তার দোষ এই যে, সে এসব সম্ভাবনা ও সন্দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেনি এবং যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে তাতেই অটল রয়েছে।

অবশ্য যে ব্যক্তি সত্যান্বেষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ পথ ও সত্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার ক্ষমার্হ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইমাম গাযযালী (র) "আত্তাফরেকাতু বাইনাল ইসলামে ওয়াযযিনদিকাহ্" গ্রন্থে একথা বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ হে আদম সন্তানেরা! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক উপস্থিতির সময় স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর–সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। জাহিলিয়াত যুগে আরবরা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বাগৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ ইবাদত এবং কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে মনে করত, তেমনি তারা হজ্জের দিনগুলোতে পানাহার ত্যাগ করত। এতটুকু পানাহার করত, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকতে পারে। বিশেষত ঘি, দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত। -(ইবনে জরীর)

তাদের এ অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের অসারতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নির্লজ্জতা-বেআদবী বিধায় বর্জনীয়। এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্য অহেতুক বর্জন করাও কোন ধর্ম কাজ নয়; বরং তাঁর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম করে নেওয়া ধৃষ্টতা এবং ইবাদতে সীমালংঘন। আল্লাহ্ তা'আলা একে পছন্দ

করেন না। তাই হজ্জের দিনগুলোতে তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর; তবে অপব্যয় করো না। হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, হজ্জের আসল লক্ষ্য এবং আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে পানাহারে মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতটি যদিও জাহিলিয়াত যুগের আরবদের একটি বিশেষ কুপ্রথা উলঙ্গতাকে মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের সময় আল্লাহ্র গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে করত, কিন্তু তফসীরবিদ ও ফিকহ্বিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন বিশেষ ঘটনায় কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, নির্দেশটি এ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বরং ভাষার ব্যাপকতা দেখতে হবে। যে যে বিষয় ভাষার ব্যপকতার আওতায় পড়ে সবগুলোর ক্ষেত্রে সে নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

নামাযে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ফরয ঃ তাই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম—উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়াও হারাম ও বাতিল। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ الطواف بالبيت صلوة। (বায়তুল্লাহ্র তওয়াফও এক প্রকার নামায) এছাড়া স্বয়ং এ আয়াতেই তফসীরবিদগণের মতে যখন مسجد বলে সিজদা বুঝানো হয়েছে, তখন সিজদা অবস্থায় উলঙ্গতার নিষেধাজ্ঞা আয়াতে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সিজদায় যখন নিষিদ্ধ হলো, তখন নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও অপরিহার্যরূপে নিষিদ্ধ হবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ চাদর পরিধান ব্যতীত কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামায জায়েয নয়।—(তিরমিযী)

নামায ছাড়া অন্যান্য অবস্থায়ও গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা যে ফরয, তা অন্যান্য আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে। তন্মধ্যে এ সূরারই একটি আয়াত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে ঃ يَا بَنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ—অর্থাৎ হে আদম সন্তানগণ! আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা আবরু ঢাকতে পার।

মোটকথা এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা মানুষের জন্য প্রথম মানবিক ও ইসলামী ফরয। এটা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। নামায ও তওয়াফে আরও উত্তমরূপে ফরয।

নামাযের জন্য উত্তম পোশাক ঃ আয়াতের দ্বিতীয় মাস'আলা, পোশাককে زينت (সাজসজ্জা) শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযে শুধু গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাই যথেষ্ট নয়, বরং এতদসঙ্গে সামর্থ্য অনুযায়ী সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করা কর্তব্য।

হযরত হাসান (রা) নামাযের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন তাই আমি পালনকর্তার সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন ঃ

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

অর্থাৎ তোমরা মসজিদে যাওয়ার সময় সাজসজ্জা গ্রহণ কর। বোঝা গেল, এ আয়াত দ্বারা যেমন নামাযে সতর আবৃত করা ফরয বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার ফযীলতও প্রমাণিত হয়।

নামাযের পোশাক সম্পর্কে কয়েকটি মাস'আলা ঃ আয়াতের তৃতীয় মাস'আলা, যে সতর সর্বাবস্থায় বিশেষত নামায ও তওয়াফে আবৃত করা ফরয, তার সীমা কতটুকু ? কোরআন পাক সংক্ষেপে সতর আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ দানের দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ন্যস্ত করেছে। তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের সতর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের সতর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল বাদে সমস্ত দেহ।

হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। নাভীর নিচের অংশ অথবা হাঁটু খোলা থাকলে পুরুষের জন্য এরূপ পোশাক এমনিতেও গর্হিত এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এমনিভাবে নারীর মস্তক, ঘাড় অথবা বাহু বা পায়ের গোছা খোলা থাকলে এরূপ পোশাক এমনিতেও নাজায়েয এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে গৃহে নারী খোলা মাথায় থাকে, সে গৃহে নেকীর ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

নারীর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল সতরের বাইরে রাখা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, নামাযে এসব অঙ্গ খোলা থাকলে নামাযে কোন ত্রুটি হবে না। এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সে শরীয়ত-সম্মত ওযর ব্যতীত মুখমণ্ডল খুলে ঘোরাফেরা করবে।

এ হচ্ছে সতরের ফরয সম্পর্কিত বিধান। এটি ছাড়া নামাযই হয় না। নামাযে শুধু সতর আবৃত করা কাম্য নয়; বরং সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করতেও বলা হয়েছে। তাই পুরুষের উলঙ্গ মাথায় নামায পড়া কিংবা কনুই খুলে নামায পড়া মাকরূহ! হাফসার্ট পরিহিত অবস্থায় হোক কিংবা আস্তিন গুটানো হোক—সর্বাবস্থায় মাকরূহ। এমনিভাবে এমন পোশাক পরে নামায পড়া মাকরূহ, যা পরিধান করে বন্ধু-বান্ধব কিংবা সাধারণ লোকের সামনে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করা হয়; যেমন কোর্তা ছাড়া শুধু গেঞ্জি গায়ে নামায পড়া, যদিও আস্তিন পূর্ণ হয় কিংবা টুপির পরিবর্তে মাথায় কোন কাপড় অথবা ছোট হাত-রুমাল বেঁধে নামায পড়া। কারণ, রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই এ অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব অথবা অপরের সামনে যাওয়া পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্র দরবারে যাওয়া কিরূপে পছন্দনীয় হতে পারে ? মাথা, কাঁধ, কনুই ইত্যাদি খুলে নামায পড়া যে মাকরূহ তা আয়াতে ব্যবহৃত زينت (সাজসজ্জা) শব্দ থেকে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়।

আয়াতের প্রথম বাক্য যেমন মূর্খতার যুগের আরবদের উলঙ্গতা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে তা থেকে অনেক বিধান ও মাস'আলাও জানা গেছে; এমনিভাবে দ্বিতীয় كلوا واشربوا ولا تسرفوا বাক্যটিও আরবদের হজ্জের দিনগুলোতে উৎকৃষ্ট পানাহারকে গুনাহ্ মনে করার কুপ্রথা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হলেও ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে এখানেও অনেক বিধান ও মাস'আলা প্রমাণিত হয়।

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার ফরয ঃ প্রথম, শরীয়তের দিক দিয়েও পানাহার করা মানুষের জন্য ফরয ও জরুরী। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরয কর্মও সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহ্র কাছে অপরাধী ও পাপী হবে।

নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু অবৈধ হয় না ঃ আহ্কামুল-কোরআন জাস্সাসের বর্ণনা মতে এ আয়াত থেকে একটি মাস'আলা এরূপ বোঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে আসলের দিক দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ বস্তুর অবৈধ ও নিষিদ্ধতা শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। كُلُوْا وَاشْرَبُوْا বাক্যে مفعول অর্থাৎ কি বস্তু পানাহার করবে, তা উল্লেখ করায় এ মাস'আলার প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন ঃ এরূপ স্থলে مفعول উল্লেখ না করে مفعول-এর ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পার—ঐসব দ্রব্যসামগ্রী বাদে, যেগুলো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

পানাহারে সীমালংঘন বৈধ নয় ঃ আয়াতের শেষ বাক্য وَلَا تُسْرِفُوْا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পানাহারে অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত اسراف শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা। সীমালংঘন কয়েক প্রকার হতে পারে।

এক. হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালংঘন যে হারাম তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

দুই. আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তুসমূহকে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গুনাহ্, তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও আল্লাহ্র আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গুনাহ্। —(ইবনে কাসীর, মাযহারী, রূহুল মা'আনী)

ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য। তাই ফিকহ্বিদগণ উদরপূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে না-জায়েয লিখেছেন। (আহকামুল কোরআন) এমনিভাবে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরয কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা-এটাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লিখিত উভয় প্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্য কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ ۔

অর্থাৎ অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে—প্রয়োজনের চাইতে বেশি ব্যয় করে না এবং কমও করে না।

পানাহারে মধ্যপন্থাই দীন ও দুনিয়ার জন্য উপকারী ঃ হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ বেশি পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ, অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে মুক্ত। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্থূলদেহী আলিমকে পছন্দ করেন না (অর্থাৎ যে বেশি পানাহার করে সে নিজের প্রচেষ্টায়ই স্থূলদেহী

হয়)। আরও বলেন ঃ মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্রবৃত্তিকে দীনের উপর অগ্রাধিকার দান করে।-(রূহুল মা'আনী)

মানুষ সদা-সর্বদা পানাহারের চিন্তায়ই মশগুল থাকবে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের উপর একে অগ্রাধিকার দেবে, যাতে মনে হবে যে, পানাহার করাই যেন জীবনের লক্ষ্য-পূর্ববর্তী মনীষীরা এ বিষয়টিকেও অপব্যয় হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁদেরই একজনের প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে ঃ

خوردن برائے زیستن ست * نہ زیستن برائے خوردن

অর্থাৎ খাওয়া বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে, খাওয়ার জন্য নয়।

কোন বস্তু খেতে মন চাইলে তা অবশ্যই খেতে হবে-এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) একেও অপব্যায়ের মধ্যে গণ্য করেছেন। ان من الاسراف ان تاكل كل ما اشتهيت অর্থাৎ যা মন চায়, তাই খাওয়াও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।-(ইবনে মাজাহ)

বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশাকে দিনে দু'বার খেতে দেখে বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি পছন্দ কর যে, আহার করাই তোমার একমাত্র কাজ হোক ?

এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানাহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্যপন্থা পছন্দনীয় ও কাম্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যা ইচ্ছা পানাহার এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। এক. তাতে অপব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের চাইতে বেশি না হওয়া চাই এবং দুই. গর্ব ও অহংকার না থাকা চাই।

এক আয়াত থেকে আটটি মাস'আলা ঃ মোটকথা এই যে, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا বাক্য থেকে আটটি মাস'আলার উদ্ভব হয়। এক. যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার করা ফরয। দুই. শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা কোন বস্তুর অবৈধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই হালাল। তিন. আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ। চার. যেসব বস্তু আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মহাপাপ। পাঁচ পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা নাজায়েয। ছয়. এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্দরুন দুর্বল হয়ে ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সাত. সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও অপব্যয়। আট. মনে কিছু চাইলেই তা অবশ্যই খাওয়া অপব্যয়।

এই হচ্ছে এ আয়াতের ধর্মীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চিন্তা করলে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এর চাইতে উত্তম ব্যবস্থাপত্র আর একটিও নেই। পানাহারে সমতা সকল রোগ থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত্তম পন্থা।

তফসীর রূহুল মা'আনী, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, খলীফা হারুনুর রশীদের একজন খ্রিস্টান ডাক্তার ছিল। সে আলী ইবনে হোসাইনের কাছে বলল ঃ তোমাদের কোরআনে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন বিষয় বর্ণিত নেই. অথচ পৃথিবীতে দু'টি শাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্র ঃ এক. ধর্মশাস্ত্র এবং দুই. দেহশাস্ত্র। দেহশাস্ত্রই হচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্র। আলী ইবনে হোসাইন বললেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা গোটা চিকিৎসাশাস্ত্রকে কোরআনের একটি আয়াতের অর্ধাংশের মধ্যে ভরে দিয়েছেন। সে অর্ধেকখানা আয়াত এই ঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (তফসীর ইবনে কাসীরে এ উক্তি জনৈক পূর্ববর্তী মনীষী থেকেও বর্ণিত আছে)। অতঃপর সে বলল ঃ আচ্ছা. তোমাদের রাসূল (সা)-এর বাণীতেও কি চিকিৎসা সম্পর্কে কোন কিছু আছে ? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকটি বাক্যে সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্র বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ পাকস্থলী রোগের আকর। ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক চিকিৎসার মূল। দেহকে সেসব বস্তু সরবরাহ কর, যাতে সে অভ্যস্ত। (কাশশাফ, রূহ) খ্রিস্টান চিকিৎসক একথা শুনে বলল ঃ তোমাদের কোরআন এবং তোমাদের রাসূল জালিনূসের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন সূত্র আর বাকি রাখেন নি।

বায়হাকী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ পাকস্থলী হলো দেহের চৌবাচ্চা। দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা এ চৌবাচ্চা থেকে সিক্ত হয়। পাকস্থলী সুস্থ হলে সমস্ত শিরা-উপশিরা এখান থেকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য নিয়ে ফিরবে এবং পাকস্থলী দূষিত হলে সমস্ত শিরা-উপশিরা রোগব্যাধি নিয়ে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়বে।

হাদীসবিদগণ এসব হাদীসের ভাষা নিয়ে কিছুটা বাদ-প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু কম আহার ও সাবধানতার প্রতি অসংখ্য হাদীসে যে জোর দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে সবাই একমত। –(রূহুল মা'আনী)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

(৩২) আপনি বলুন ঃ আল্লাহর দেয়া সাজসজ্জাকে–যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে ? আপনি বলুন ঃ এসব নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মু'মিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্য। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা বুঝে। (৩৩) আপনি বলে দিন ঃ আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন–যা

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গুনাহ্ অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না। (৩৪) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যারা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত পরিধেয়, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যসমূহকে প্রমাণহীন বরং প্রমাণ বিরুদ্ধভাবে হারাম মনে করেছে, তাদেরকে) আপনি বলে দিন ঃ (বল) আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট বস্তুসমূহকে, যেগুলো তিনি স্বীয় বান্দাদের (ব্যবহারের)জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পানাহারের হালাল বস্তুসমূহকে, (যেগুলো আল্লাহ্ হালাল করেছেন) কে হারাম করেছে ? (অর্থাৎ হালাল ও হারাম করা তো সৃষ্টিকর্তার কাজ, তোমরা নিজের পক্ষ থেকে কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণাকারী কে ? আলোচ্য আয়াতে পোশাক ও পানাহারের বস্তুসমূহকে আল্লাহ্র নিয়ামত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে কাফিররা সন্দেহ করতে পারত যে, আমরা তো এসব নিয়ামত যথেষ্ট পরিমাণেই পাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের প্রতি নারাজই হবেন এবং আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের বিরুদ্ধে থাকবেন, তবে এসব নিয়ামত আমাদের পাওয়ার কোন কথাই ছিল না। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে ঃ হে মুহাম্মদ,) আপনি বলে দিন ঃ (আল্লাহ্র নিয়ামত ব্যবহার করার অনুমতি দানই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার পরিচায়ক নয়। তবে যে ব্যবহারের পর কোন শাস্তি ভোগ করতে না হয়, সেটা অবশ্য প্রিয়পাত্র হওয়ার পরিচায়ক। এরূপ ব্যবহার একমাত্র মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট। কেননা কাফিররা যত বেশি পার্থিব নিয়ামত ভোগ করে, তার পরকালীন আযাব তত বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই বলা হয়েছে,) এ সব বস্তু (অর্থাৎ পোশাক ও পানাহারের বস্তুসমূহ) কিয়ামতের দিন (পঙ্কিলতা ও আযাব থেকে) মুক্ত থাকা অবস্থায় পার্থিব জীবনে বিশেষভাবে মু'মিনদেরই জন্য। (কাফিররা এর ব্যতিক্রম। দুনিয়াতে তারা যদিও আল্লাহ্র নিয়ামত ভোগ করে বিলাস-ব্যসনে জীবন-যাপন করে, কিন্তু ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করার কারণে কিয়ামতের দিন এগুলো শাস্তি ও আযাবে পরিণত হবে)। আমি এমনিভাবে অভিজ্ঞ লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করি। আপনি (তাদেরকে আরও) বলে দিন ঃ (তোমরা যে হালাল বস্তুকে অহেতুক হারাম মনে করে রেখেছ, সেগুলো আল্লাহ্ হারাম করেন নি)। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র সেসব বস্তু হারাম করেছেন, যেগুলোর অধিকাংশে তোমরা লিপ্ত রয়েছ (উদাহরণত) সব অশ্লীল বিষয়-তন্মধ্যে যা প্রকাশ্য তাও (যেমন উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা) এবং যা গোপন তাও। (যেমন ব্যভিচার) এবং প্রত্যেক পাপাচার (হারাম করেছেন) এবং অন্যায়ভাবে কারও প্রতি যুলুম করা(হারাম করেছেন) এবং (হারাম করেছেন) এ বিষয় যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে এমন কোন বস্তুকে (ইবাদতে) শরীক করবে, যার কোন সনদ (ও প্রমাণ) আল্লাহ্ (পূর্ণ বা আংশিক কোনভাবেই) নাযিল করেন নি। এবং (এ

বিষয় হারাম করেছেন) যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করবে, তোমাদের কাছে যার কোন প্রমাণ নেই। قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ আয়াতে যেমন সমস্ত আদিষ্ট ও শরীয়তসম্মত বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, তেমনি إِنَّمَا حَرَّمَ আয়াতে যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে সেসব লোককে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যারা ইবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে ইবাদত জ্ঞান করে। যেমন, মক্কার মুশরিকরা হজ্জের দিনগুলোতে তওয়াফ করার সময় পোশাক পরিধানকেই বৈধ মনে করত না এবং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত ও উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন করাকে ইবাদত মনে করত।

এহেন লোকদেরকে শাসানোর ভংগিতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, বান্দাদের জন্য সৃজিত আল্লাহ্র زِينَت অর্থাৎ উত্তম পোশাক এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য কে হারাম করেছে?

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয় ঃ উদ্দেশ্য এই যে, কোন বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয় যারা আল্লাহ্র হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোশাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সংগতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয়; যেমন অনেক অজ্ঞ লোক মনে করে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ্ তা'আলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। তাঁরা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। দু'জাহানের সর্দার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ির বাইরে আসেন, তখন তাঁর গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। বর্ণিত আছে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) চার শ' গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইমাম মালিক (র) সব সময় উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর জন্য জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি সারা বছরের জন্য ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিল। যে বস্ত্রজোড়া তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয়বার তা আর ব্যবহার করতেন না; মাত্র একদিন ব্যবহার করেই কোন দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন।

কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ নিয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা, নিয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছিন্নবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা অকৃতজ্ঞতা।

অবশ্য দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী ঃ এক, রিয়া ও নামযশ এবং দুই. গর্ব ও অহংকার। অর্থাৎ শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুষী প্রকাশ করার জন্য জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ দুটি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা) এবং আরও কয়েকজন সাহাবীর মামুলী পোশাক কিংবা তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার কথা বর্ণিত আছে। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, তাঁদের হাতে যে ধনসম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফকীর-মিসকীনকে দান ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, যদ্দারা উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত। সাদাসিধা ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল–যাতে সাধারণ দরিদ্র ও ফকীরদের উপর তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে। এমনিভাবে সূফী বুযুর্গগণ শিষ্যদেরকে প্রথম পর্যায়ে সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এসব বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করা সওয়াবের কাজ, বরং প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্য প্রথম পর্যায়ে আত্মার চিকিৎসা ও অহংবোধের প্রতিকারার্থ এ ধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে ফেলে এবং এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে হারাম ও নাজায়েযের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব সূফী বুযুর্গই পূর্ববর্তী সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার করেন। তখন এসব উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাঁদের জন্য অধ্যাত্ম পথে বিঘ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যায়।

খোরাক ও পোশাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত ঃ খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা), সাহাবী ও তাবেয়ীদের সুন্নাতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য। তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোন উপায়ে এমনকি কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবে না।

এমনিভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনেশুনে খারাপ করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের পেছনে লাগা যেমন লৌকিকতা তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব নিয়ামত ; উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মু'মিনদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁদের কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। কেননা, এ দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্র–প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে পার্থিব নিয়ামতের মধ্যে আসল-নকল ও ভালমন্দের পার্থক্য করা যায় না। করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দস্তরখান সবার জন্য সমভাবে বিছানো রয়েছে বরং এখানে আল্লাহ্র রীতি এই যে, মু'মিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু ত্রুটি হয়ে গেলে অন্যরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পার্থিব নিয়ামতের ভাণ্ডার অধিকার করে বসে এবং তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের করালগ্রাসে পতিত হয়।

কিন্তু এ আইন শুধু দুনিয়ারূপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরকালে সমস্ত নিয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে তাই বলা হয়েছে ঃ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ অর্থাৎ আপনি বলে দিন ঃ সব

পার্থিব নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও মু'মিনদেরই প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালে শাস্তির কারণ হবে না– এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মু'মিন বান্দাদেরই প্রাপ্য। কাফির ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয়। পার্থিব নিয়ামত তারাও পায় বরং আরও বেশি পায়, কিন্তু এসব নিয়ামত পরকালে তাদের জন্য শাস্তি ও স্থায়ী আযাবের কারণ হবে, কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নিয়ামত তাদের জন্য সম্মান ও সুখের বস্তু নয়।

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশংকা ও নানা রকম দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নিয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যাঁরা এসব নিয়ামত লাভ করবেন, তাঁরা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবেন। এগুলোর সাথে কোনরূপ পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশংকা এবং কোন চিন্তাভাবনা থাকবে না। উপরোক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের এ বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি স্বীয় অসীম শক্তির নিদর্শনাবলী জ্ঞানবানদের জন্য এমনিভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যাতে পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সবাই বুঝে নেয়। ভাল পোশাক ও ভাল খাদ্য বর্জন করলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন–এ আয়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মূর্খতাসুলভ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন করলেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা দ্বিবিধ মূর্খতায় লিপ্ত। একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার হালালকৃত উত্তম ও মনোরম বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অপরদিকে যেসব বস্তু প্রকৃতপক্ষে হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যবহারের পরিণতিতে আল্লাহ্র গযব ও পরকালের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পরকালের শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে দুকূলই হারিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ যেসব বস্তুকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছ, সেগুলো তো হারাম নয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সব নির্লজ্জ কাজ হারাম করেছেন–তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক। আরও হারাম করেছেন প্রত্যেক পাপ কাজ, অন্যায় উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার করা এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার কোন সনদ তোমাদের কাছে নেই।

এখানে اثم (পাপ কাজ) শব্দের আওতায় সেসব গুনাহ্ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং بغى (উৎপীড়ন) শব্দের আওতায় অপরের সাথে লেনদেন ও অপরের অধিকার সম্পর্কিত গুনাহ্ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ–এগুলো সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বাসগত মহাপাপ।

এ বিশেষ বিবরণ উল্লেখ করার কারণ দ্বিবিধ ঃ এক. এতে প্রায় সব রকম হারাম কাজ ও গুনাহ পুরোপুরি এসে গেছে–তা বিশ্বাসগত হোক কিংবা কর্মগত, ব্যক্তিগত কর্মের গুনাহ হোক কিংবা অপরের অধিকার হরণ সম্পর্কিত হোক। দুই. জাহিলিয়াত যুগের আরবরা এসব অপরাধ ও হারাম কাজে লিপ্ত ছিল। এভাবে তাদের মূর্খতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, তারা হালাল বস্তু থেকে বিরত থাকে এবং হারাম বস্তু ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না।

ধর্মে বাড়াবাড়ি এবং স্বকল্পিত বিদ'আতের এটাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে, যে ব্যক্তি এগুলোতে লিপ্ত হয়, সে ধর্মের মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি থেকে স্বভাবতই গাফিল হয়ে যায়। তাই বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতের ক্ষতি দ্বিমুখী হয়ে থাকে। এক, স্বয়ং বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া গুনাহ্ এবং দুই. এর বিপরীত বিশুদ্ধ ধর্ম ও সুন্নত থেকে বঞ্চিত হওয়া।

প্রথম ও দ্বিতীয়–উভয় আয়াতে মুশরিকদের দুটি ভ্রান্ত কাজ বর্ণিত হয়েছিল। এক. হালালকে হারাম করা এবং দুই. হারামকে হালাল করা। তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়াবহ পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যেসব অপরাধী সর্বপ্রকার অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের মধ্যে লালিত-পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যত তাদের উপর কোন আযাব আসতে দেখা যায় না, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার এ চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধীদেরকে কৃপাবশত অবকাশ দিতে থাকেন, যাতে কোন রকমে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয় ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে এ অবকাশেরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ শেষ হয়ে আসে, তখন এক মুহূর্তও আগপাছ হয় না এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কখনও দুনিয়াতেই আযাব এসে যায় এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, তবে মৃত্যুর সাথে সাথেই আযাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

এ আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেপিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা দোকানদারকে বলে ঃ মূল্য কিছু কম-বেশি হতে পারবে কি না ? এখানে জানা কথা যে, বেশি মূল্য তার কাম্য নয়–কম হবে কি না, তাই জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কমের অনুগামী করে বেশিও উল্লেখ করা হয়। এমনিভাবে এখানে আসল উদ্দেশ্য এই যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্তু সাধারণের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথে আগে হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى ۙ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ

وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا

وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ

مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ
مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا
كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿৩৭﴾ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا
جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا
ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ۬ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿৩৮﴾ وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ
لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿৩৯﴾

(৩৫) হে বনী আদম ! যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন করে–তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনায় তবে যে ব্যক্তি সংযত হয় এবং সৎকাজ অবলম্বন করে, তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৩৬) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তার প্রতি অহংকার করবে, তারাই দোযখী এবং তথায় চিরকাল থাকবে। (৩৭) অতঃপর ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে ? তারা তাদের আমলনামায় লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমনকি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নেওয়ার জন্য পৌঁছে, তখন তারা বলে ঃ তারা কোথায় গেল, যাদেরকে তোমার আল্লাহ্ ব্যতীত আহবান করতে ? তারা উত্তর দিবে ঃ আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে। তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা অবশ্যই কাফির ছিল। (৩৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে, তখন তারা অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমনকি যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা ! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ্ বলবেনঃ প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ ; কিন্তু

তোমরা জান না। (৩৯) পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবেঃ তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, শাস্তি আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের কারণে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি আত্মাজগতেই বলে দিয়েছিলাম ঃ) হে আদম সন্তানরা ! যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন করে তোমাদেরকে আমার নির্দেশাবলী বর্ণনা করে, তবে (তাদের আগমনে) যে ব্যক্তি (তোমাদের মধ্যে নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলা থেকে) সংযত হবে এবং (কাজকর্ম) সংশোধন করে নেবে(অর্থাৎ পূর্ণরূপে অনুসরণ করবে), তাদের (পরকালে) কোনরূপ আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না এবং যারা (তোমাদের মধ্য থেকে) আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলবে এবং তা (কবূল করা) থেকে অহংকার করবে, তারা দোযখী হবে (অর্থাৎ দোযখের অধিবাসী হবে) এবং তারা তথায় চিরকাল থাকবে। মিথ্যারোপকারীদের কঠোর শাস্তিযোগ্য হওয়ার কথা যখন সংক্ষেপে জানা গেল, তখন বিস্তারিত বিবরণ শোন যে, ঐ ব্যক্তির চাইতে কে অধিক যালিম হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে (অর্থাৎ যে কথা আল্লাহ্ বলেন নি, তা আল্লাহ্ বলেছেন বলে), অথবা তাঁর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ যে কথা আল্লাহ্ বলেছেন তা আল্লাহ্ বলেন নি বলে), তাদের অংশের যা কিছু (রিযিক ও বয়স) আছে, তা তারা (দুনিয়াতে) পেয়ে যাবে (কিন্তু পরকালে বিপদই বিপদ রয়েছে)। এমনকি, (মৃত্যুর সময় বরযখে তাদের অবস্থা হবে এই যে,) যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করতে আসবে, তখন (তাদেরকে) বলবে ঃ (বল) তারা কোথায় গেল, আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের তোমরা আরাধনা করতে ? (এ বিপদ মুহূর্তে তারা কাজে আসে না কেন) ? তারা (কাফিররা) বলবে ঃ আমাদের কাছ থেকে সব উধাও হয়ে গেছে (অর্থাৎ বাস্তবিকই তারা উপকারে আসেনি)। এবং (তখন) তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা কাফির ছিল। (কিন্তু তখনকার স্বীকারোক্তি হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কোন কোন আয়াতে এ ধরনেরই প্রশ্নোত্তর কিয়ামতেও হবে বলে বর্ণিত আছে। অতএব, উভয় ক্ষেত্রে হওয়াও সম্ভবপর। কিয়ামতে তাদের অবস্থা হবে এই যে,) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব (কাফির) সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও (আগে-পিছে সব কাফির তাতে প্রবেশ করবে এবং অবস্থা হবে এই যে,) যখনই (কাফিরদের) কোন সম্প্রদায় (দোযখে) প্রবেশ করবে, তাদের মত অন্য সম্প্রদায়কে (যারা তাদের মতই কাফির হবে এবং তাদের পূর্বে দোযখে প্রবিষ্ট হবে) অভিসম্পাত করবে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি থাকবে না ; সবকিছুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার কারণে একে অন্যকে কুনজরে দেখবে এবং মন্দ বলবে) এমনকি, যখন তাতে (অর্থাৎ সেই দোযখে সবাই একত্রিত হয়ে যাবে, তখন পরবর্তীরা (যারা পরে প্রবেশ করে থাকবে এবং এরা হবে ঐ লোক, যারা কুফরে অন্যের অনুসারী ছিল) পূর্ববর্তী (প্রবেশকারীদের) সম্পর্কে (অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে, যারা নেতা ও সর্দার হওয়ার কারণে পূর্বে দোযখে প্রবেশ করবে, একথা) বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা। এরা আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, তাদেরকে দোযখের শাস্তি (আমাদের চাইতে) দ্বিগুণ প্রদান করুন। আল্লাহ্ বলবেন ঃ (তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিলে তোমাদের জন্য সান্ত্বনার কি আছে ; বরং তোমাদের শাস্তিও সর্বদা পলে

পদে বৃদ্ধি পাবে। তাই তোমাদের শাস্তিও তাদের দ্বিগুণ শাস্তির মতই হবে। অতএব এই হিসাবে) সবারই (শাস্তি) দ্বিগুণ ; কিন্তু (এখনও) তোমরা (পুরোপুরি) জান না। (কারণ, এখন আযাবের মাত্র সূচনা। পরবর্তী ক্রমবৃদ্ধি তোমরা এখনও দেখনি। তাই অমন কথা বলছ। এতে বোঝা যায় যে, অন্যের শাস্তি বৃদ্ধিকে তোমরা নিজেদের জন্য ক্রোধ নিবারক ও সান্ত্বনাদায়ক মনে করছ,) এবং পূর্ববর্তী (প্রবেশকারী)–রা পরবর্তী (প্রবেশকারী)-দেরকে (আল্লাহ্ তা'আলার উত্তর অবগত হয়ে) বলবে ঃ (যখন সবার শাস্তির এ অবস্থা) তাহলে আমাদের উপর তোমাদের (লঘু শাস্তির ব্যাপারে) কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। (কেননা, আমাদের শাস্তিও লঘু নয়, তোমাদের শাস্তিও লঘু নয়)। অতএব তোমরাও স্বীয় (কু) কর্মের কারণে (অধিক শাস্তিই) আস্বাদন কর।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ
السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

(৪০) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি। (৪১) তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে যালিমদেরকে শাস্তি প্রদান করি। (৪২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে আমি কাউকে তার সামর্থ্যের চাইতে বেশি বোঝা দিই না–তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। (৪৩) তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি

তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের পালনকর্তার রাসূল আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবে ঃ এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ হচ্ছে কাফিরদের জাহান্নামে প্রবেশের অবস্থা। এখন জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা শুনুন) ঃ যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে এবং তা মেনে নিতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, ((মৃত্যুর পর) তাদের (আত্মার ঊর্ধ্বগমনের) জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না। (এ হচ্ছে মৃত্যুর পর বরযখের অবস্থা)। এবং (কিয়ামতের দিন) তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উষ্ট্র প্রবেশ করে। (এটা অসম্ভব, কাজেই তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব)। এবং আমি অপরাধীদেরকে এমনি সাজা প্রদান করি (অর্থাৎ আমার কোন শত্রুতা নেই। যেমন কর্ম, তেমনি ফল। পূর্বে তাদের দোযখে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। দোযখের আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং অবস্থা হবে এই যে,) তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা হবে এবং তাদের উপর (এরই) চাদর হবে এবং আমি যালিমদেরকে এমনি শাস্তি প্রদান করি। (এসব যালিমের কথা فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।) এবং যারা (আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, (এ সৎ কাজ মোটেই কঠিন নয়। কেননা, আমার রীতি এই যে,) আমি কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজ দিই না। (এটা মধ্যবর্তী বাক্য। মোটকথা,) তারাই জান্নাতের অধিবাসী (এবং) তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। (তাদের অবস্থা দোযখবাসীদের মত হবে না যে, সেখানেও একে অপরকে অভিসম্পাত করবে ; বরং তাদের অবস্থা হবে এই যে) যা কিছু তাদের অন্তরে (কোন কারণবশত দুনিয়াতে স্বভাবগতভাবে) মালিন্য (ও দুঃখ) ছিল, আমি তা (-ও) অপসৃত করব। (ফলে তারা পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার মধ্যে থাকবে)। তাদের (বাসগৃহের) নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে এবং তারা (আনন্দের আতিশয্যে) বলবে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার (লাখ লাখ) শুকরিয়া, যিনি আমাদেরকে এ স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও (এ পর্যন্ত) পৌঁছতে পারতাম না, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে না পৌঁছাতেন। (এতে একথাও বলা হয়ে গেছে যে, এ পর্যন্ত পৌঁছার পথ ঈমান ও সৎ কর্ম তিনিই আমাদেরকে বলে দিয়েছেন এবং তা মেনে চলার তৌফিক দিয়েছেন)। বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার পয়গম্বরগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন। (সেমতে তাঁরা এসব কাজকর্মের ফলস্বরূপ জান্নাতের যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে) এবং তাদেরকে ডেকে বলা হবে এ জান্নাত তোমাদেরকে দেওয়া হলো তোমাদের (সৎ) কর্মের প্রতিদানে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বে কতিপয় আয়াতে একটি অঙ্গীকার বর্ণিত হয়েছে। এটি প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে তার দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আত্মা-জগতে নেওয়া হয়েছিল। অঙ্গীকারটি ছিল এই ঃ যখন

আমার পয়গম্বর তোমাদের কাছে আমার নির্দেশাবলী নিয়ে আসবেন, তখন মনে-প্রাণে সেগুলো মেনে নেবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে। এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে আগমনের পর যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারে অটল থেকে তা পূর্ণ করবে, সে যাবতীয় দুঃখ ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলবে এবং তাদের নির্দেশাবলী অমান্য করবে, তাদের জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষমান রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে, যা দুনিয়াতে আগমনের পর বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষ সৃষ্টি করেছে। কেউ অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে আবার কেউ তাতে অটল রয়েছে এবং তদনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এ উভয় দলের পরিণতি এবং আযাব ও সওয়াব আলোচ্য চার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদের কথা এবং শেষ দু'আয়াতে অঙ্গীকার পূর্ণকারী মু'মিনদের কথা আলোচিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে এবং আমার নির্দেশাবলীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না।

তফসীরে বাহরে-মুহীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের এক তফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও তাদের দোয়ার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আমলকে ঐ স্থানে যেতে দেওয়া হবে না, যেখানে আল্লাহ্র নেক বান্দাগণের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কোরআনের সূরা মুতাফফিফীনে এ স্থানটির নাম 'ইল্লিয়্যীন' বলা হয়েছে। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ،

অর্থাৎ মানুষের পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উত্থিত করে। অর্থাৎ মানুষের সৎকর্মসমূহ পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্র বিশেষ দরবারে পৌছানোর কারণ হয়।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফিরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর ঐ হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা আবূ দাউদ, নাসায়ী ইবনে-মাযাহ ও ইমাম আহমদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সংক্ষেপে এই ঃ

'রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কিরামও তাঁর চারদিকে চুপ চাপ বসে যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেন ঃ মু'মিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মরোণোন্মুখ ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত আযরাঈল আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নিশ্চিন্ত আত্মা, পালনকর্তার মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির

জন্য বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে সমর্পণ করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ এ পাক আত্মা কার ? ফেরেশতারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থ ব্যবহার হতো এবং বলে ঃ ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে এবং দরজা খুলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরও ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রাখ এবং তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করে ঃ তোমার পালনকর্তা কে ? তোমার ধর্ম কি ? সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা এবং ধর্ম ইসলাম। এর পর প্রশ্ন হয় ঃ এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে ? সে বলে ঃ ইনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন একটি গায়েবী আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্য জান্নাতের শয্যা পেতে দাও, জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তার কাছে এসে যায়।

'এর বিপরীতে কাফিরের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাঁটা বিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ এ দুরাত্মাটি কার ? ফেরেশতারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যদদ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ সে অমুকের পুত্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললে তার জন্য দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মু'মিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِى (হায় হায় আমি জানি না) বলে। তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোশাক দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌঁছতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়।

মোটকথা, কাফিরদের আত্মা আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। ফলে সেখান থেকেই নিচে ফেলে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, মৃত্যুর সময় তাদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না।

আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۔

يلج শব্দটি ولوج থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ করা। جمل এর অর্থ উট এবং سم এর অর্থ সূচের ছিদ্র। অর্থ এই যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের মত বিরাট-বপু জন্তু সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবত অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও হবে অসম্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের আযাবের অধিকতর তীব্রতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ — مهاد শব্দের অর্থ বিছানা এবং غواش শব্দটি غاشية এর বহুবচন। এর অর্থ আবৃতকারী বস্তু। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের চাদর ও শয্যা সবই জাহান্নামের হবে। প্রথম আয়াতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তার শেষে كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করার পর كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ বলা হয়েছে। কেননা, এটি আগেরটির চাইতে গুরুতর।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী যারা পালন করে, তাদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতেই অনন্তকাল বসবাস করবে।

শরীয়তের নির্দেশাবলী সহজ করা হয়েছে ঃ কিন্তু তাদের জন্য সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করা ও সৎকর্ম সম্পাদন করার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কৃপাবশত এ কথাও বলা হয়েছে ঃ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দার উপর এমন বোঝা চাপান না, যা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যেসব সৎকর্ম শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন কাজ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি ক্ষেত্রেই শরীয়তের নির্দেশাবলী নরম ও সহজ করেছেন। প্রত্যেক নির্দেশ অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তফসীরে বাহ্রে-মুহীতে বলা হয়েছে ঃ সৎকর্মের আদেশ দেওয়ার সময় এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, সব সৎকর্ম সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে আদেশটি তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণার্থ বলা হয়েছে ঃ আমি মানব জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করে সর্বাবস্থায় সব সময় ও সব জায়গার জন্য উপযুক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করি। এগুলোর বাস্তবায়ন মোটেই কাঠিন কাজ নয়।

জান্নাতীদের মন থেকে পারস্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে ঃ চতুর্থ আয়াতে জান্নাতীদের দুটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এক. نَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ — অর্থাৎ জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোন মালিন্য থাকে, তবে আমি তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেব। তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস করবে।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মু'মিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারও প্রতি কারও কোন কষ্ট থাকে কিংবা কারও কাছে কারও পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা-দ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তফসীরে মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যত পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত সংলগ্ন। আল্লামা সুয়ূতী প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

এ স্থলে যেসব পাওনা দাবি করা হবে, সেগুলো টাকা-পয়সা দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কারণ, সেখানে কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকবে না। মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী সৎকর্ম দ্বারা এসব পাওনা পরিশোধ করা হবে। যদি কারও সৎকর্ম এভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার পরেও পাওনা বাকি থাকে, তবে প্রাপকের গুনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃস্ব আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনিয়াতে সৎকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের পাওনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে যাবতীয় সৎকর্ম থেকে রিক্তহস্ত হয়ে পড়বে।

এই হাদীসে পাওনা পরিশোধ ও প্রতিশোধের সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুরী নয়। ইবনে কাসীর ও তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকেই পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব। যেমন, কোন কোন হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে একটি ঝর্ণার কাছে পৌঁছবে এবং পানি পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই যে, সবার মন থেকে পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য ধুয়ে-মুছে যাবে। ইমাম কুরতুবী (র) কোরআন পাকের وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا আয়াতের তফসীরেও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানির দ্বারা সবার মনের কলহ ও মালিন্য ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রা) একবার এ আয়াত পাঠ করে বললেন ঃ আমি আশা করি, ওসমান, তালহা ও যুবায়র ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের বক্ষ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মনোমালিন্য থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। (ইবনে কাসীর) বলা বাহুল্য, দুনিয়াতে তাঁদের পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেওয়ার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জান্নাতীদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জান্নাতে পৌঁছে তারা আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলা কৃপা না করতেন, তবে এখানে পৌঁছার সাধ্য আমাদের ছিল না।

এতে বোঝা যায় যে, কোন মানুষ কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা হয়। কেননা, স্বয়ং প্রচেষ্টাটুকুও তো তার ইচ্ছাধীন নয়। এটাও শুধু আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহেই অর্জিত হয়ে থাকে।

হিদায়তের বিভিন্ন স্তর ঃ ইমাম রাগিব ইস্পাহানী 'হিদায়ত' শব্দের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা এই যে, 'হিদায়ত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সত্য এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে যাওয়ার পথ প্রাপ্তির নামই হিদায়ত। তাই আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত, তেমনি হিদায়তের স্তরও অত্যধিক বিভিন্ন। কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি এবং ঈমান-এর সর্বনিম্ন স্তর। এরই মাধ্যমে মানুষের গতিধারা ভ্রান্ত পথ থেকে সরে আল্লাহ্‌মুখী হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা অতিক্রম করার প্রত্যেক স্তর হিদায়ত। তাই হিদায়ত অন্বেষণ থেকে কখনও কোন মানব এমনকি নবী-রাসূল পর্যন্ত নির্লিপ্ত হতে পারেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনের শেষ পর্যন্ত اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দোয়াটি যেমন উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি নিজেও যত্ন সহকারে অব্যাহত রেখেছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তরের কোন শেষ নেই। এমনকি, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতে প্রবেশকেও হিদায়ত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এটা হচ্ছে হিদায়তের সর্বশেষ স্তর।

وَنَادَىٰٓ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ أَصْحٰبَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا
فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ أَنْ
لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا
عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ
رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّۢا بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ
يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحٰبِ النَّارِ ۙ
قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَنَادَىٰٓ أَصْحٰبُ الْأَعْرَافِ
رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ أَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ أَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۚ اُدْخُلُوا
الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

(৪৪) জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমাদের সাথে আমাদের পালনকর্তা যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি তোমাদের পালনকর্তার

ওয়াদা সত্য পেয়েছ ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ,। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহ্র অভিসম্পাত যালিমদের উপর, (৪৫) যারা আল্লাহ্র পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত, তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল। (৪৬) উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আ'রাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। (৪৭) যখন তাদের দৃষ্টি দোযখীদের উপর পড়বে, তখন বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে এ যালিমদের সাথী করো না। (৪৮) আ'রাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে তাদেরকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের দলবল ও ঔদ্ধত্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি। (৪৯) এরা কি তারাই, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। প্রবেশ কর জান্নাতে। তোমাদের কোন আশংকা নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (যখন জান্নাতীরা জান্নাতে পৌঁছে যাবে তখন) জান্নাতীরা দোযখীদেরকে(নিজেদের অবস্থায় আনন্দ প্রকাশ করার জন্য ও তাদের পরিতাপ বৃদ্ধির জন্য) ডেকে বলবে ঃ আমাদের সাথে আমাদের পালনকর্তা যে ওয়াদা করেছিলেন (যে, ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করলে জান্নাত দেব) তা আমরা বাস্তব সত্য পেয়েছি। অতএব (তোমরা বল) তোমাদের সাথে তোমাদের পালনকর্তা যে ওয়াদা করেছিলেন (যে, কুফরের কারণে দোযখে পতিত হবে) তা তোমরাও সত্য পেয়েছ কি ? (অর্থাৎ এখন আল্লাহ্ ও রাসূলের সত্যতা এবং স্বীয় পথভ্রষ্টতার স্বরূপ জেনে ফেলেছ তো) ? তারা (দোযখীরা উত্তরে) বলবে ঃ হ্যাঁ। (বাস্তবিকই আল্লাহ্ ও রাসূলের সব কথা ঠিক হয়েছে)। অতঃপর (দোযখীদের পরিতাপ ও জান্নাতীদের আনন্দ বৃদ্ধিকল্পে) একজন ঘোষক (অর্থাৎ কোন ফেরেশতা) উভয়ের (অর্থাৎ উভয় দলের) মাঝখানে (দাঁড়িয়ে) ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহ্ তা আলার অভিসম্পাত হোক ঐ যালিমদের উপর যারা আল্লাহ্র পথ (অর্থাৎ সত্য ধর্ম) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত এবং তাতে (অর্থাৎ সত্যধর্মে সর্বদা স্বকল্পিতভাবে) বক্রতা (অর্থাৎ বক্রতার বিষয়বস্তু) অন্বেষণ করত (যেন তাতে দোষ ও আপত্তি উত্থাপন করতে পারে) এবং তারা (এতদসহ) পরকালেও অবিশ্বাসী ছিল (যার ফল আজ ভোগ করছে। এসব কথাবার্তা হচ্ছে জান্নাতীদের এবং তাদের সমর্থনে ঐশী ঘোষকের। অতঃপর আ'রাফবাসীদের কথা বলা হয়েছে)। এবং উভয়ের (অর্থাৎ জান্নাতী ও দোযখী উভয় দলের) মাঝখানে আড়াল (অর্থাৎ প্রাচীর) থাকবে। (সূরা হাদীদে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে فضرب بينهم بسور এর বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, জান্নাতের প্রতিক্রিয়া দোযখে এবং দোযখের প্রতিক্রিয়া জান্নাতে যেতে দেবে না। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাহলে এসব কথাবার্তা কিরূপে হবে ? অতএব, সম্ভবত এ প্রাচীরে যে দরজা থাকবে, তা দিয়ে কথাবার্তা হবে ; যেমন সূরা হাদীদে আছে بسور له باب অথবা এমনিতেই আওয়াজ পৌঁছে যাবে)। এবং (এ প্রাচীর কিংবা এর উপরিভাগের

নামই আ'রাফ। এখান থেকে সব জান্নাতী ও দোযখী দৃষ্টিগোচর হবে) আ'রাফের উপর অনেক লোক থাকবে, (যাদের নেকী ও গুনাহ দাঁড়িপাল্লায় সমান সমান হয়েছে)। তারা (জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্য থেকে) প্রত্যেককে (জান্নাত ও দোযখের অভ্যন্তরে থাকার লক্ষণ ছাড়াও) তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে। চিহ্ন এই যে, জান্নাতীদের চেহারায় ঔজ্জ্বল্য এবং দোযখীদের চেহারায় মলিনতা ও অন্ধকার থাকবে। যেমন, অন্য আয়াতে আছে ঃ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ الخ এবং আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তখনও তারা জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে না বরং প্রবেশ প্রার্থী হবে (হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তাদের এ প্রার্থনা পূরণ করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হবে) এবং যখন তাদের দৃষ্টি দোযখীদের উপর পতিত হবে, (তখন ভীত হয়ে) বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ যালিমদের সাথে (আযাবের অন্তর্ভুক্ত) করো না। এবং (আ'রাফবাসীরা পূর্বে যেমন জান্নাতীদের সাথে সালাম ও বাক্যালাপ করেছে, তেমনি) আ'রাফবাসীরা (দোযখীদের মধ্য থেকে) অনেককে (যারা কাফির) যাদেরকে তাদের চিহ্ন (চেহারার অন্ধকার ও মলিনতা) দ্বারা চিনবে, (যে, এরা কাফির) ডেকে বলবে ঃ তোমাদের দলবল ও তোমাদের ঔদ্ধত্য (এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ না করা) তোমাদের কোন কাজে আসেনি (এবং তোমরা এ ঔদ্ধত্যের কারণে মুসলমানদেরকে ঘৃণিত মনে করে একথাও বলতে যে, এরা কি অনুগ্রহ ও কৃপার অধিকারী হবে! যেমন, اَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا থেকেও এ বিষয়বস্তু বোঝা যায়। এখন এই মুসলমানদেরকে দেখ তো যারা জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করছে) এরা কি তারাই, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে খেয়ে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করবেন না। (এখন তো তাদের প্রতি এত বিরাট অনুগ্রহ হয়েছে যে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ) প্রবেশ কর জান্নাতে (তথায়) তোমাদের জন্য কোন আশংকা নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (এ বাক্যে বিশেষ করে رجالا, 'অনেককে' বলার কারণ সম্ভবত এত যে, সে সময় পর্যন্ত পাপী মু'মিনরাও দোযখে পড়ে থাকবে। এর ইঙ্গিত এই যে, আ'রাফবাসীরা যখন জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে না, তখন পাপী মু'মিনরা যাদের পাপ আ'রাফবাসীদের পাপের চাইতে বেশি, কিছুতেই তখন দোযখ থেকে বের হবে না। কিন্তু তাদেরকে সম্বোধন করে উপরোক্ত কথা বলা হবে না। তাই তাদেরকে বাদ রাখার জন্য 'অনেককে' বলা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে গেলে বাহ্যতই উভয় স্থানের মধ্যে সবদিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় স্থানের মাঝখানে এমন কিছু রাস্তা থাকবে যার ফলে একে অপরকে দেখতে পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর হবে।

সূরা সাফফাতে দু'ব্যক্তির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা দুনিয়াতে একে অপরের সঙ্গী ছিল; কিন্তু একজন ছিল মু'মিন আর অপরজন ছিল কাফির। পরকালে যখন

মু'মিন জান্নাত এবং কাফির দোযখে চলে যাবে, তখন তারা একে অপরকে দেখবে এবং কথাবার্তা বলবে। বলা হয়েছে ঃ

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَاۤءِ الْجَحِيْمِ . قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ . اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ اِلاَّ مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ .

এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এই ঃ জান্নাতী সাথী উঁকি দিয়ে দোযখী সাথীকে দেখবে এবং তাকে দোযখের মধ্যস্থলে পতিত পাবে। সে বলবে ঃ হতভাগা, তোর ইচ্ছা ছিল আমিও তোর মত বরবাদ হয়ে যাই। যদি আল্লাহ্র কৃপা না হতো, তবে আজ আমিও তোর সাথে জাহান্নামে পড়ে থাকতাম। তুই আমাকে বলতিস যে, এ দুনিয়ার মৃত্যুর পর কোন জীবন, কোন হিসাব-কিতাব বা সওয়াব-আযাব হবে না। এখন দেখলি এসব কি হচ্ছে ?

আলোচ্য আয়াতসমূহ ও পরবর্তী প্রায় এক রুকূ পর্যন্ত এ ধরনেরই কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে, যা জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যে হবে।

জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে একে অপরকে দেখা ও কথাবার্তা বলার পথও প্রকৃতপক্ষে দোযখীদের জন্য এক প্রকার আযাব হবে। চতুর্দিক থেকে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। জান্নাতীদের নিয়ামত ও সুখ দেখে দোযখের আগুনের সাথে সাথে অনুতাপের আগুনেও তারা দগ্ধ হবে। অপরপক্ষে জান্নাতীদের নিয়ামত ও সুখে এক নতুন সংযোজন হবে। কেননা, প্রতিপক্ষের বিপদ দেখে নিজ সুখ ও নিয়ামতের মূল্য বেড়ে যাবে। যারা দুনিয়াতে ধার্মিকদের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করত এবং তারা কোনরূপ প্রতিশোধ নিত না, আজ তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় আযাবে পতিত দেখে তারা হাসবে যে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তারা পেয়ে গেছে। কোরআন পাকে এ বিষয়টি সূরা 'মুতাফফিফীনে' এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ . هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .

দোযখীদের তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য হুঁশিয়ারি এবং বোকাসুলভ কথাবার্তার জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও তিরস্কার করা হবে। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ . اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ .

এ হচ্ছে ঐ আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এখন দেখ এটা যাদু, না তোমরা চোখে দেখ না ?

এমনিভাবে আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা দোযখীদের প্রশ্ন করবে ঃ আমাদের পালনকর্তা আমাদের সাথে যেসব নিয়ামত ও সুখের ওয়াদা করেছিলেন, আমরা সেগুলো সম্পূর্ণ সঠিক পেয়েছি। তোমরা বল, তোমাদের যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা তোমাদের সামনে এসেছে কি না ? তারা স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।

তাদের এ প্রশ্নোত্তরের সমর্থনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা ঘোষণা করবে যে, যালিমদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত হোক। তারা মানুষকে আল্লাহ্র পথে আসতে বাধা দিত এবং পরকালে অবিশ্বাস করত।

আ'রাফবাসী কারা ? ঃ জান্নাতী ও দোযখীদের পারস্পরিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় আয়াতে আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা দোযখ থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়।

আ'রাফ কি ঃ সূরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। এক. সুস্পষ্ট কাফির ও মুশরিক। এদের পুলসিরাত চলার প্রশ্নই উঠবে না। এর আগে জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। দুই. মু'মিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে। তিন. মুনাফিকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলমানদের সাথে সংযুক্ত থাকত। সেখানেও প্রথম দিকে তাদের সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং পুলসিরাতে চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মু'মিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে অগ্রসর হবে। মুনাফিকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে ঃ একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই। এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা বলবে ঃ পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলোর তালাশ কর। উদ্দেশ্য এই যে, এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎ কর্মের। এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টনী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মু'মিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহ্র রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু তাই ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ.

এই আয়াতে জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীকে سور শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি আসলে শহর-প্রাচীরের অর্থে বলা হয়। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বড় বড় শহরের চারদিকে খুব মজবুত ও অজেয় করে এ প্রাচীর তৈরি করা হয়। এসব প্রাচীরে রক্ষী সেনাদলের গোপন অবস্থানও তৈরি করা হয়। তারা আক্রমণকারীদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ.

ইবনে জারীর ও অন্যান্য তফসীরবিদদের মতে এ আয়াতে حجاب বলে ঐ প্রাচীর বেষ্টনীকেই বোঝানো হয়েছে, যা সূরা হাদীদে سور শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রাচীর

বেষ্টনীর উপরিভাগের নাম আ'রাফ। কেননা আ'রাফ 'ওরফে'র বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ। কারণ দূর থেকে এ ভাগই 'মারূফ' তথা খ্যাত হয়ে থাকে। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছু সংখ্যক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও দোযখ উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয় পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা বলবে।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, এরা কারা এবং এ মধ্যবর্তী স্থানে এদেরকে কেন আটক করা হবে ? এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের বিভিন্ন উক্তি এবং একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে। তবে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য উক্তি এই যে–এরা ঐ সব লোক, যাদের পাপ ও পুণ্য ওযনে সমান সমান হবে। তারা পুণ্যের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, কিন্তু পাপের কারণে তখনও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। তবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে তারাও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত হুযায়ফা, ইবনে মসউদ, ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর অভিমত তাই। এ অর্থে বর্ণিত সব হাদীসের মধ্যেও বিরোধ থাকে না। ইবনে জারীর হুযায়ফার বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ তাদের পাপ ও পুণ্য ওযনে সমান সমান হবে। তাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে আ'রাফ নামক স্থানে থামিয়ে রাখা হবে এবং সব জান্নাতী ও দোযখীর হিসাব-নিকাশ ও ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং অবশেষে তাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। –(ইবনে কাসীর)

ইবনে মরদুবিয়াহ্ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বাচনিক বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ তারা ঐ সব লোক, যারা পিতামাতার ইচ্ছা ও অনুমতির বিপক্ষে জিহাদে যোগদান করে শহীদ হয়েছে। পিতামাতার অবাধ্যতা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণ জাহান্নামে প্রবেশে বাধা দেয়।

উপরোক্ত উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ নেই। বরং শেষোক্ত হাদীসটি পাপ ও পুণ্য যাদের সমান সমান হবে, তাদের একটি দৃষ্টান্ত। এক দিকে আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণ এবং অপর দিকে পিতামাতার অবাধ্যতা; দাঁড়িপাল্লায় উভয়টি সমান হয়ে যাবে।--(ইবনে কাসীর)

সালামের মসনূন শব্দ ঃ আ'রাফবাসীদের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা জ্ঞাত হওয়ার পর এখন আয়াতের বিষয়বস্তু দেখুন। বলা হয়েছে ঃ আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে ঃ সালামুন আলায়কুম। এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থ বলা হয় এবং বলা সুন্নত। মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতের সময় এবং হাশর ও কিয়ামতেও বলা হবে। কিন্তু আয়াত ও হাদীস দৃষ্টে জানা যায় যে, দুনিয়াতে 'আসসালামু আলায়কুম' বলা সুন্নত। কবর যিয়ারতের জন্য কোরআন পাকে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ উল্লিখিত হয়েছে।

ফেরেশতারা যখন জান্নাতীদের অভ্যর্থনা করবে, তখনও বাক্যটি এভাবেই বলা হবে ঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ আলোচ্য আয়াতেও আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে।

অতঃপর আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু এ ব্যাপারে আগ্রহী। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আ'রাফবাসীদের দৃষ্টি যখন দোযখীদের উপর পতিত হবে এবং তারাও তাদের শাস্তি ও বিপদ প্রত্যক্ষ করবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে যে, আমাদেরকে এসব যালিমের সাথী করবেন না।

পঞ্চম আয়াতেও বলা হয়েছে যে, আ'রাফবাসীরা দোযখীদের সম্বোধন করে তিরস্কার করবে এবং বলবে ঃ দুনিয়াতে তোমরা স্বীয় ধনসম্পদ, দলবল ও লোকজনের উপর ভরসা করে খুব গর্বিত ছিলে। আজ সেগুলো কোন উপকারে আসেনি।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۔

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখন জান্নাতী ও দোযখী এবং উভয় দলের সাথে আ'রাফবাসীদের প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত হবে, তখন রাব্বুল আলামীন দোযখীদের সম্বোধন করে আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলবেন ঃ তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, এদের মাগফিরাত হবে না এবং আল্লাহ্ এদের প্রতি করুণা করবেন না; এখন আমার করুণা দেখে নাও। সাথে সাথে আ'রাফবাসীদের সম্বোধন করে বলবেন ঃ যাও তোমরা জান্নাতে চলে যাও; বিগত বিষয়াদির জন্য তোমাদের কোন শংকা নেই এবং ভবিষ্যতেরও কোন চিন্তাভাবনা নেই।--(ইবনে কাসীর)

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا
دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ
يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ
فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ

إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ
فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

(৫০) দোযখীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে ঃ আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ্ তোমাদের যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে ঃ আল্লাহ্ এই উভয় বস্তু কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, (৫১) তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব আমি আজকে তাদের ভুলে যাব, যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত। (৫২) আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌঁছিয়েছি, যা আমি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা পথপ্রদর্শক এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। (৫৩) তারা কি এখন এ অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হোক ? যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে, সেদিন পূর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে ঃ বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার পয়গম্বরগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন। অতএব, আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে কি, যে সুপারিশ করবে অথবা আমাদের পুনঃপ্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে যা করতাম, তার বিপরীত কাজ করে আসতাম। নিশ্চয় তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া যা বলত, তা উধাও হয়ে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (পূর্বে জান্নাতীরা যেমন দোযখীদের সাথে কথা বলেছে, তেমনি) দোযখীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে ঃ (আমরা ক্ষুধা, পিপাসা ও উত্তাপের যন্ত্রণায় ছটফট করছি, আল্লাহ্র ওয়াস্তে) আমাদের উপর সামান্য পানিই নিক্ষেপ কর (সম্ভবত কিছু শান্তি হবে) কিংবা অন্য কিছুই দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন। (এতে জরুরী নয় যে, তারা আশা করে তা চাইবে। কেননা, অধিক অস্থিরতার সময় আশাতীত কথাবার্তাও মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে)। জান্নাতীরা (উত্তরে) বলবে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এতদুভয় বস্তু (অর্থাৎ জান্নাতের আহার্য ও পানীয়) কাফিরদের জন্য হারাম করে রেখেছেন, যারা দুনিয়াতে স্বীয় ধর্মকে (যা কবূল করা তাদের জন্য ফরয ছিল) ক্রীড়া ও কৌতুক বানিয়ে রেখেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় (ও অমনোযোগীতায়) ফেলে রেখেছিল (তাই তারা ধর্মের পরোয়াই করেনি। এটা প্রতিদান জগত। যখন ধর্মই নেই, তখন তার ফল কোথা থেকে আসবে ? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের

এ উত্তর সমর্থন করে বলবেনঃ) অতএব (যখন দুনিয়াতে তাদের এ অবস্থা ছিল, তখন) আমিও আজকের (কিয়ামতের) দিন তাদেরকে ভুলে যাব। (এবং আহার্য ও পানীয় কিছুই দেব না) যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎ ভুলে গিয়েছিল এবং যেরূপে তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করত এবং আমি তাদের কাছে একটি গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরআন) পৌছিয়েছি, যাকে আমি স্বীয় অসীম জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি; (সবাইকে শোনানোর জন্য এটি বর্ণনা করেছি, কিন্তু এটি) হিদায়ত ও রহমতের মাধ্যম তাদেরই জন্য (হয়েছে), যারা (একে শুনে) বিশ্বাস স্থাপন করে। (এবং যারা পূর্ণ প্রমাণ সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে,) তারা আর কোন কিছুর অপেক্ষা করে না,--শুধু এর (কোরআনের) বর্ণিত শেষ পরিণতির (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি শাস্তির) অপেক্ষা করে। (অর্থাৎ শাস্তির পূর্বে শাস্তির ওয়াদাকে যখন ভয় করে না, তখন শাস্তিই তাদের কাম্য হয়ে থাকবে)। অতএব, যে দিন এর (বর্ণিত) শেষ পরিণাম ফল আসবে (অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত দোযখে ইত্যাদি) সেদিন পূর্বে যারা একে বিস্মৃত হয়েছিল, তারা (অস্থির হয়ে) বলবে ঃ বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার পয়গম্বররা (দুনিয়াতে) সত্যসহ আগমন করেছিলেন (কিন্তু আমরা বোকামি করেছি)। অতএব, আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে কি, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে ? অথবা আমরা কি আবার (দুনিয়াতে) পুন প্রেরিত হতে পারি, যাতে আমরা (আবার দুনিয়াতে গিয়ে) পূর্বে যে (কু-) কর্ম করতাম, তার বিপরীতে (সৎ) কর্ম করি ? (আল্লাহ্ বলেন ঃ এখন মুক্তির কোন পথ নেই।) নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরকে (কুফরের) ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং তারা যা যা মনগড়া বলত, (এখন) সব উধাও হয়ে গেছে (এখন শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না)।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

---

(৫৪) নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্ বরকতময়, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি সমস্ত নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে ছয় দিনে (অর্থাৎ ছয় দিনের সমান সময়ে) সৃষ্টি করেছেন--অতঃপর আরশের উপর (যা সিংহাসনের

অনুরূপ, এভাবে) অধিষ্ঠিত (ও দেদীপ্যমান) হয়েছেন (যেমনটি তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত)। তিনি সমাচ্ছন্ন করেন রাত্রি দ্বারা (অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকার দ্বারা) দিনকে (অর্থাৎ দিনের আলোকে। কারণ রাত্রির অন্ধকার এলেই দিনের আলো বিদূরিত হয়ে যায়)। এভাবে যে, রাত্রি দিনকে দ্রুত ধরে ফেলে (অর্থাৎ দিন দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং হঠাৎ রাত্রি এসে যায়)। এবং চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য তারকা সৃষ্টি করেছেন, এভাবে যে, সবাই তাঁর (সৃষ্টিগত) আদেশের অনুগামী। স্মরণ রেখ, স্রষ্টা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহ্রই জন্য নির্দিষ্ট। বড় মঙ্গলময় আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে নভোমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করা এবং একটি বিশেষ অটল ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার আহবান জানানো হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা এ বিশাল বিশ্বকে সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করতে সক্ষম, তাঁর জন্য এসব বস্তুকে ধ্বংস করে কিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ ? তাই কিয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাঁকেই স্বীয় পালনকর্তা মনে কর, তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তাঁরই ইবাদত কর এবং সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করার পঙ্কিলতা থেকে বের হয়ে সত্যকে চেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কোরআন পাকেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বারবার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে ঃ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ অর্থাৎ এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়। কোথাও বলা হয়েছে ঃ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন 'হয়ে যা'। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কি ?

তফসীরবিদ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সবকিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্কতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, চিন্তা-ভাবনা, ধীরস্থিরতা ও ধারাবাহিকতা সহকারে কাজ করা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়; আর তড়িঘড়ি কাজ করা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে।—(মাযহারী)

উদ্দেশ্য এই যে, তড়িঘড়ি কাজ করলে মানুষ কাজের সব দিক সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারে না। ফলে প্রায়ই সে কাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং অনুতাপ করতে হয়। পক্ষান্তরে যে কাজ চিন্তাভাবনা ও ধীরে-সুস্থে করা হয়, তাতে বরকত হয়ে থাকে।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে দিবারাত্রির পরিচয় কি ছিল ? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হলো ?

কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন ঃ ছয়দিন বলে এতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে, যা এ জগতের হিসাবে ছয়দিন হয়। কিন্তু পরিষ্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে, যেমন জান্নাতের দিবারাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবে না।

এতে আরও জানা যাচ্ছে যে, যে ছয়দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আমাদের ছয়দিনের সমান হওয়া জরুরী নয়; বরং এর চাইতে বড়ও হতে পারে। যেমন, পরকালের দিন সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে যে, একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে।

আবু আবদুল্লাহ্ রাযী (র) বলেন ঃ সপ্তম আকাশের গতি পৃথিবীর গতির তুলনায় এত বেশি দ্রুত যে, দ্রুত ধাবমান একটি লোকের একটি পা তুলে তা পুনরায় মাটিতে রাখার পূর্বেই সপ্তম আকাশ তিন হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলে। --(বাহরে মুহীত)

সে জন্যই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুজাহিদ (র) বলেন যে, এই ছয় দিনের অর্থ পরকালের ছয় দিন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক রেওয়ায়েতেও তাই বর্ণিত রয়েছে।

সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে ছয়দিনে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে জগৎ সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোন কোন আলিম বলেন سبت এর অর্থ কর্তন করা। এ দিনে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এ দিনকে يوم السبت (শনিবার) বলা হয়।--(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয়দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরা হা-মীম-সিজদার নবম ও দশম আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভূমণ্ডল, দু'দিনে ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের পানাহারের বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হলো। বলা হয়েছে ঃ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ আবার বলা হয়েছেঃ قَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ যে, দু'দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দু'দিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজসরঞ্জাম পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছে ঃ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ--অর্থাৎ অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দু'দিনে। বাহ্যত এ দু'দিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয়দিন হলো।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনের কথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। استوى-এর শাব্দিক অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া। আরশ রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহ্র আরশ কিরূপ এবং কি-এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই বা কি ? এ সম্পর্কে নির্মল, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবী ও তাবেয়ীদের

কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে সূফী বুযুর্গদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মানব জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অর্থহীন; বরং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দিষ্ট, তাই শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোন অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করাও অনুচিত।

হযরত ইমাম মালিক (র)-কে কেউ استواء على العرش-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, استواء শব্দের অর্থ তো জানাই আছে, কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানববুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। --এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করেন নি। সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযায়ী, লায়স ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রা) প্রমুখ বলেছেন ঃ যে সব আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে ; কোনরূপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।--(মাযহারী)

এরপর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবারাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহ্র কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়—মোটেই দেরী হয় না।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী।

এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড় বিশেষজ্ঞের তৈরি মেশিনসমূহে প্রথমত কিছু না কিছু দোষত্রুটি থাকে। যদি দোষত্রুটি নাও থাকে, তবুও যত কঠিন ইস্পাতের মেশিন ও কল-কব্জাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এক সময় ঢিলে হয়ে পড়ে। ফলে মেরামত দরকার হয়। এ জন্য কয়েকদিন শুধু নয়, অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকেজো পড়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নির্মিত মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রথম দিন যেভাবে এগুলো চালু করা হয়েছিল আজো তেমনি চালু রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। কখনও এগুলোর কোন কলকব্জা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও কোথাও মেরামতের জন্য পাঠাতে হয় না। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্র আদেশে চলছে। অর্থাৎ এগুলো চালানোর জন্য না বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়, না কোন ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়, বরং শুধু আল্লাহ্র আদেশের শক্তি বলেই চলছে। চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও সম্ভব নয়। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর এরই নাম হলো কিয়ামত।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা একটি সামগ্রিক বিধির আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ — خلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং امر শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, আর না কাউকে আদেশ করার অধিকার রাখে। তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কাউকে কোন বিশেষ বিভাগ বা কার্যভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশ। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি করাও তাঁরই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কর্মে নিয়োগ করাও অন্য কারও সাধ্যের বিষয় নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলারই অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

সূফী বুযুর্গরা বলেন ঃ خلق ও امر দুটি জগৎ। خلق—এর সম্পর্ক বস্তুজগতের সাথে এবং امر এর সম্পর্ক সূক্ষ্ম ও অজড় বিষয়াদির সাথে। قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ আয়াতে 'আত্মাকে পালনকর্তার 'আদেশ' বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। خلق ও اَمر দুই-ই আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ তখন এই হবে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই বস্তুজগৎ। এগুলোর সৃষ্টিকেই خلق বলা হয়েছে এবং নভোমণ্ডলের উর্ধ্বে যা কিছু আছে, সব অবস্তু জগৎ। এগুলোর সৃষ্টিকে امر শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ এখানে تبارك শব্দটি بركة (বরকত) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া, কায়েম থাকা ইত্যাদি। তবে এখানে تبارك শব্দের অর্থ উচ্চ ও মহান হওয়া। এটা বৃদ্ধি প্রাপ্তি এবং কায়েম থাকা উভয় অর্থেই হতে পারে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যেমন কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত, তেমনি মহান ও উচ্চও বটেন। হাদীসের এক বাক্যেও উচ্চ হওয়া অর্থের দিকেই করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

تبارکت وتعاليت يا ذالجلال والاكرام এখানে تبارکت শব্দের তফসীর تعاليت শব্দ দ্বারা করা হয়েছে।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝٥٥ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٦

---

(৫৫) তোমরা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। (৫৬) পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহ্র করুনা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা (সর্বাবস্থায় ও যাবতীয় প্রয়োজনে) স্বীয় পালনকর্তার কাছে দোয়া কর বিনীতভাবে এবং সংগোপনে। (তবে একথা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা (দোয়ার ক্ষেত্রে শিষ্টাচারের) সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। (উদাহরণত অসম্ভব ও হারাম বিষয়ের দোয়া করা)। এবং (একত্ববাদের শিক্ষা ও পয়গম্বর প্রেরণের মাধ্যমে) পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ উৎপাদন করো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, একমাত্র বিশ্ব পালনকর্তাই যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নিয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও অভাব-অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত। তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা এবং বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর।

এতদসহ আলোচ্য আয়াতসমূহে দোয়ার কতিপয় আদবও ব্যক্ত করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে দোয়া কবূল হওয়ার আশা বেড়ে যায়।

আরবী ভাষায় دعاء (দোয়া) শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ। এক, বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্য কাউকে ডাকা এবং দুই. যে কোন অবস্থায় কাউকে স্মরণ করা। এ আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে। বলা হয়েছে ঃ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ অভাব পূরণের জন্য স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার ইবাদত কর।

প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব-অনটন একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই ব্যক্ত কর। আর দ্বিতীয়াবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই কর। উভয় তফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী ও তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً تضرع শব্দের অর্থ অক্ষমতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং خفية শব্দের অর্থ গোপন।

এ দু'টি শব্দে দোয়া ও স্মরণের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত অপারকতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দোয়া করা, এটা কবূল হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত। দোয়ার ভাষাও অক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বলার ভঙ্গি এবং দোয়ার আকার-আকৃতিও বিনয় ও নম্রতাসূচক হওয়া চাই। এতে বোঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমত একে দোয়া-প্রর্থনা বলাই যায় না, বরং দোয়া পাঠ করা উচিত। কেননা, প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যেসব শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে, সেগুলোর অর্থ কি ঃ আজকাল সাধারণ মসজিদসমূহে এটি ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের কতিপয় আরবী বাক্য মুখস্থ থাকে এবং নামায শেষে সেগুলোই আবৃত্তি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না। তাদের জানা থাকলেও মুক্তাদীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। তারা অর্থ না বুঝেই ইমামের আবৃত্তি করা বাক্যাবলীর সাথে সাথে 'আমীন' আমীন' বলতে থকে। এই আগাগোড়া প্রহসনের সারমর্ম কতিপয় বাক্যের

আবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। দোয়া প্রার্থনার যে স্বরূপ, তা এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় এসব নিষ্প্রাণ বাক্যগুলোও কবূল করে নিতে পারেন। কিন্তু একথা বোঝা দরকার যে, দোয়া প্রার্থনার বিষয়, পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার যথার্থ রীতি অনুযায়ীই চাইতে হবে।

এছাড়া যদি কারও নিজের উচ্চারিত বাক্যাবলীর অর্থও জানা থাকে এবং তা বুঝেসুঝে বলে, তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ দোয়াও দাবিতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোন বান্দারই নেই।

মোটকথা, প্রথম শব্দে দোয়ার প্রাণ এরূপ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা, দীনতা-হীনতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহ্র কাছে অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় শব্দে আরও একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপি চুপি ও সংগোপনে দোয়া করা। এটাই উত্তম এবং কবূলের নিকটবর্তী। কারণ, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমত বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়ত, এতে রিয়া ও সুখ্যাতির আকাঙ্খা থাকার আশংকাও রয়েছে। তৃতীয়ত, এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খয়বর যুদ্ধের সময় দোয়া করতে গিয়ে সাহাবায়ে-কিরামের আওয়ায উচ্চ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা কোন বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে ; বরং একজন সূক্ষ্ম শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে, তাই সজোরে বলা অর্থহীন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা জনৈক সৎকর্মীর দোয়া উল্লেখ করে বলেন : إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا। অর্থাৎ যখন সে পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল। এতে বোঝা যায় যে, অনুচ্চস্বরে দোয়া করা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : প্রকাশ্যে ও সজোরে দোয়া করা এবং নীরবে ও অনুচ্চ স্বরে দোয়া করা—এতদুভয়ের ফযীলতে ৭০ ডিগ্রী তফাত রয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র স্মরণে ও দোয়ায় মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাঁদের আওয়ায শুনতে পেত না। বরং তাঁদের দোয়া একান্তভাবে তাঁদের ও আল্লাহ্র মধ্যে সীমিত থাকত। তাঁদের অনেকেই সমগ্র কোরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করতেন, কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত না। অনেকেই প্রভূত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন, কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে বেড়াতেন না। অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় নামায পড়তেন, কিন্তু আগন্তুকরা তা বুঝতেই পারত না। হযরত হাসান বসরী (র) আরও বলেন : আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মত কোন ইবাদত কখনও প্রকাশ্যে করেন নি। দোয়ায় তাঁদের আওয়ায অত্যন্ত অনুচ্চ হতো।—(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

ইবনে জুরাইজ বলেন : দোয়ায় আওয়াযকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মাকরূহ্। আবু বকর জাস্সাস হানাফী 'আহ্কামুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নীরবে দোয়া করা জোরে দোয়া করার চাইতে উত্তম। হাসান বসরী (র) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও একথাই বর্ণিত রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, নামাযে সূরা ফাতিহার শেষে 'আমীনও' আস্তে বলা উত্তম। কারণ, এটিও একটি দোয়া।

এ যুগের পেশ ইমামদের আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়ত করুন! তাঁরা কোরআনের এ শিক্ষা ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের নির্দেশ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে বসেন। প্রত্যেক নামাযের পর দোয়ার একটি প্রহসন হয়ে থাকে। সুউচ্চ স্বরে কিছু পাঠ করা হয় যা আদব ও দোয়ার পরিপন্থী হওয়া ছাড়াও ঐ সব নামাযীর নামাযেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে, যারা মসবুক (অর্থাৎ পরে এসে শরীক) হওয়ার কারণে ইমামের নামায সমাপ্ত হওয়ার পর নিজেদের নামায আদায় করেন। এ প্রথার বহুল প্রচলনের ফলে এর অনিষ্টের দিকটি তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেছে। বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক লোক দ্বারা কোন বিশেষ দোয়া করানোর সময় একজন কিছু জোরে দোয়ার বাক্য বলবে এবং অন্যরা 'আমীন' বলবে–এতে দোষ নেই। তবে শর্ত হলো এই যে, অন্যের নামায ও ইবাদতে যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এবং একে যেন অভ্যাসে পরিণত করা না হয়, যাতে জনগণ একেই দোয়ার সঠিক পদ্ধতি মনে করে বসতে পারে। বস্তুত আজকাল সাধারণভাবে তা-ই হচ্ছে।

অভাব-অনটনের ব্যাপারে দোয়া করা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হলো। আয়াতে যদি দোয়ার অর্থ যিকির ও ইবাদত নেওয়া হয়, তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, নীরব যিকির সরব যিকির অপেক্ষা উত্তম। সূফীগণের মধ্যে চিশতিয়া তরীকার বুযুর্গরা মুরীদকে প্রথম পর্যায়ে সরব যিকির শিক্ষা দেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থার প্রতিকার হিসাবে এরূপ করেন, যাতে শব্দের মাধ্যমে অলসতা দূর হয়ে যায় এবং যিকিরের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। নতুবা সরব যিকির জায়েয হলেও তা তাঁদের কাম্য নয়। অবশ্য এর বৈধতাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এ বৈধতার জন্য রিয়া ও সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য না হওয়া শর্ত।

ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত সা'দ ইবনে আবী-ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى অর্থাৎ নীরব যিকির উত্তম এবং ঐ রিযিক উত্তম যা যথেষ্ট হয়ে যায়।

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও সময়ে সরব যিকিরও কাম্য ও উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা এসব অবস্থা ও সময় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। উদাহরণত আযান ও ইকামত উচ্চৈঃস্বরে বলা, সরব নামাযসমূহ উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করা, নামাযের তকবীর, তাশরীকের তকবীর এবং হজ্জে লাব্বাইকা উচ্চৈঃস্বরে বলা ইত্যাদি। এ কারণেই এ সম্পর্কে ফিকহ্‌বিদদের সিদ্ধান্ত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও কর্মের মাধ্যমে সরব যিকির করার শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই তা করা উচিত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব যিকিরই উত্তম ও অধিক উপকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ — معتدين শব্দটি اعتداء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। তা দোয়ার সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোন কাজে–কোনটিই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো ইবাদতের পরিবর্তে গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দোয়ায় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারে হতে পারে। এক. দোয়ায় শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়। দুই. দোয়ায় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা) স্বীয় পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে দেখলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে জান্নাতে সাদা রঙের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি।' তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেন ঃ দোয়ায় এ ধরনের শর্ত যুক্ত করা সীমা অতিক্রম, কোরআন ও হাদীসে তা নিষিদ্ধ।-(মাযহারী)

তিন. মুসলমান জনসাধারণের জন্য বদদোয়া করা কিংবা এমন কোন বিষয় কামনা করা, যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং এমনিভাবে এখানে উল্লিখিত দোয়ায় বিনা প্রয়োজনে আওয়ায উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম।-(তফসীরে-মাযহারী,আহকামুল-কুরআন)

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا এখানে فساد ও صلاح দু'টি পরস্পরবিরোধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। صلاح শব্দের অর্থ সংস্কার এবং فساد শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ। ইমাম রাগিব মুফরাদাতুল-কোরআন গ্রন্থে বলেন ঃ সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকেই فساد বলা হয় ; তা সামান্য বের হোক কিংবা বেশি। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশি বের হলে বেশি ফাসাদ হবে। فساد। শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা এবং اصلاح। শব্দের অর্থ সংস্কার করা।কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সংস্কার করার পর।

ইমাম রাগিব বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকার হতে পারে। এক. প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন, বলা হয়েছে ঃ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ দুই. অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন وَيُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ তিন. সংস্কারের নির্দেশ দান করা। আয়াতে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. বাহ্যিক সংস্কার ; অর্থাৎ পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপণের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য মাটি থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।

দুই. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। পয়গম্বর, গ্রন্থ ও হিদায়ত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমরা এতে গুনাহ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না।

ভূ-পৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম ঃ সংস্কার যেমন দু'রকম-বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, তেমনি অনর্থও দু'রকম। ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা একে এমন এক পদার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন, যা পানির মত নরমও নয় যে, যাতে কোন কিছু স্থিতাবস্থা লাভ করতে পারে না এবং পাথরের মত শক্তও নয় যে, খনন করা যাবে না। বরং এক মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখেছেন যাতে মানুষ একে চাষাবাদের মাধ্যমে নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফলফুল উৎপন্ন করতে পারে এবং খনন করে কূপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরি করতে পারে ও গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে

পারে। এরপর মাটির ভেতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে শস্য, তরিতরকারী, উদ্ভিদ ও ফলফুল উৎপন্ন হয়। বাইরে বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মেঘমালার মাধ্যমে তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার ফলে বৃক্ষ উৎপন্ন হতে পারে। বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জের শীতল ও উত্তপ্ত কিরণ নিক্ষেপ করে ফুল ও ফলে রঙ ও রস ভরে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হয়েছে , যদ্দ্বারা সে মৃত্তিকাজাত কাঁচামাল কাঠ, লোহা, তামা, পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদিকে জোড়া দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছে। এগুলো ভূ-পৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে তা সাধন করেছেন।

অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হচ্ছে আল্লাহ্র স্মরণ, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীলতা। এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে আনুগত্য ও স্মরণের একটি সূক্ষ্ম প্রেরণা নিহিত রেখেছেন ঃ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا-(আল্লাহ্ মানুষকে পাপাচার ও আল্লাহ্-ভীতি এতদুভয়েরই অনুপ্রেরণা দান করেছেন)। মানুষের চারপাশের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর কারিগরির এমন বহিঃপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো দেখে সামান্য বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও বলে উঠে ঃ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (সমুচ্চ হোন সুন্দরতম স্রষ্টা)। এ ছাড়া রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্মগ্রন্থ নাযিল করেছেন। এভাবে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এভাবে যেন ভূ-পৃষ্ঠের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়ে গেছে। এখন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ঃ আমি এ ভূ-পৃষ্ঠকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমরা একে নষ্ট করো না।

সংস্কারের যেমন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'টি রূপ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এর বিপরীতে ফাসাদ বা অনর্থ সৃষ্টিরও বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'টি প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন এবং অভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও ফাসাদের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটির ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই শরীয়ত অভ্যন্তরীণ ফাসাদের দ্বার যেমন রুদ্ধ করেছে, তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও প্রতিরোধ করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং অপরাধমূলক সকল আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপ কাজই কোথাও বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং কোথাও অভ্যন্তরীণ অনর্থের কারণ হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ ফাসাদ বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে।

বাহ্যিক ফাসাদ যে অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয়, তা বলাই বাহুল্য। কারণ বাহ্যিক ফাসাদ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ। বস্তুত আল্লাহ্র নাফরমানীরই অপর নাম অভ্যন্তরীণ ফাসাদ। তবে অভ্যন্তরীণ ফাসাদ যে বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে, তা বোঝা

কিছুটা চিন্তাসাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ, এ বিশ্বচরাচর ও এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁর আজ্ঞাধীন। মানুষ যত দিন আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন থাকে, ততদিন এসব বস্তুও মানুষের খাদেম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা করতে শুরু করে, তখন জগতের প্রত্যেকটি বস্তু অজান্তে ও পরোক্ষভাবে মানুষেরও অবাধ্য হয়ে ওঠে, যা মানুষ বাহ্যত চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এসব বস্তুর প্রভাব, বৈশিষ্ট্য, পরিণাম ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাহ্যত জগতের সব বস্তুই মানুষের ব্যবহারে এসে থাকে। পানি কণ্ঠনালীতে পৌঁছে পিপাসা নিবৃত্ত করতে অস্বীকার করে না। খাদ্য ক্ষুধা দূর করতে বিরত হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ শীত ও গ্রীষ্মে সুখ সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয় না।

কিন্তু পরিণাম চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এসবের কোন একটি বস্তুও স্বীয় কর্তব্য পুরোপুরি পালন করছে না। কেননা, এসব বস্তু ও এসবের ব্যবহারে আসল উদ্দেশ্য আরাম ও সুখ লাভ করা, অস্থিরতা ও কষ্ট দূর হওয়া এবং অসুখে-বিসুখে রোগমুক্তি অর্জিত হওয়া। অথচ তা হচ্ছে না।

এখন জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আজকাল আরাম-আয়েশ ও রোগমুক্তির উপায়-উপকরণের ধারণাতীত প্রাচুর্য সত্ত্বেও মানবগোষ্ঠী অস্থিরতা ও রোগ-ব্যাধির শিকার হচ্ছে। নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ ভিড় জমাচ্ছে। কোন ধনকুবেরও স্বস্থানে নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত নয়। বরং এসব উপায়-উপকরণ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে হারেই বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও অস্থিরতাও বেড়ে চলছে। مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواکی (যতই ঔষধ প্রয়োগ করা হতো ততই রোগ বাড়তে থাকল)।

আজ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও অন্যান্য বস্তুনিসৃত চাকচিক্যে বিমোহিত মানুষ যদি এসব বস্তুর উর্ধ্বে উঠে চিন্তা করে, তবে বোঝা যাবে যে, আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব শিল্প ও আবিষ্কারই আমাদের আসল লক্ষ্য অর্থাৎ সুখ ও শান্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে। এই অভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়া এর অন্য কোন কারণ নেই যে, আমরা স্বীয় পালনকর্তা ও প্রভুর অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছি। ফলে তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহও অলক্ষ্যে আমাদের অবাধ্যতা শুরু করেছে।

چوں از وکشتی همه چیز از تو کشت (তুমি যখন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, তখন সব বস্তুই তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।)। তারা এখন আমাদের জন্য সত্যিকার সুখ ও শান্তি সরবরাহ করছে না। মাওলানা রুমী চমৎকার বলছেন ঃ

خاك وباد وآب وآتش بنده اند ـــ با من وتو مرده با حق زنده اند

(মাটি, বাতাস, পানি ও আগুন আল্লাহ্র দাস। তারা আমার ও তোমার কাছে মৃত হলেও আল্লাহ্র কাছে জীবিত)।

অর্থাৎ জগতের এসব বস্তুকে বাহ্যত প্রাণহীন ও চেতনাহীন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রভুর আজ্ঞাধীন হয়ে কাজ করার উপলব্ধি তাদেরও রয়েছে।

সারকথা চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, প্রতিটি গুনাহ্ ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেকটি অবাধ্যতা দুনিয়াতে শুধু অভ্যন্তরীণ অনর্থই সৃষ্টি করে না, বরং বাহ্যিক অনর্থও এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে থাকে। মাওলানা রুমী বলেছেন ঃ

ابرنايد از پئے منع زكوة ــــ وززنا افتد وبا اندرجهات

এটা কোন কবির কল্পনা নয় বরং এমন একটি বাস্তব সত্য কোরআন ও হাদীস যার সাক্ষ্য। শাস্তির হালকা নমুনাই এ জগতে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, ঝড় ও বন্যার আকারে দেখা দিয়ে থাকে।

তাই لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا —বাক্যের অর্থে যেমন জগতে বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী গুনাহ্ ও অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় অবাধ্যতাই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا – অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। অর্থাৎ একদিকে দোয়া অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দুটি বাহু। এ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদমর্যাদা অর্জন করে।

এ বাক্য থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোন কোন আলিম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন ; যাতে আনুগত্যে ত্রুটি না হয়। আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। কেননা এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ।-(বাহ্‌রে-মুহীত)

কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী আলিম বলেন ঃ ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অটল থাকা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করাই প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষের মেজাজ ও স্বভাব বিভিন্ন রূপ। কেউ ভয়ের প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার দ্বারা। যার জন্য যে অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়, সে তাই হাসিল করতে সচেষ্ট হবে।

মোটকথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দু'টি আদব বর্ণিত হয়েছে। এক. বিনয় ও সম্রতা সহকারে দোয়া করা এবং দুই. মৃদু স্বরে ও সংগোপনে দোয়া করা। এদু'টি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, বিনয়ের অর্থ হলো দোয়ার সময় দৈহিক আকার-আকৃতিকে অপারক ও ফকীরের মতো করে নেওয়া, অহংকারী ও বেপরোয়ার মতো না হওয়া। দোয়া সংগোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহবার সাথে যুক্ত।

এ আয়াতে দোয়ার আরও দু'টি অভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হলো এই যে, দোয়াকারীর মনে এ অশংকা থাকা উচিত যে, সম্ভবত দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবূল হতে পারে। কেননা, পাপ ও গুনাহ্ থেকে নিশ্চিত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থী। অপরদিকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়ও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকলেই দোয়া কবূল হবে বলে আশা করা যায়।

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার করুণা সৎ কর্মীদের নিকটবর্তী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দোয়ার সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয় কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা, বিশ্ব-পালনকর্তা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে কোন ত্রুটি ও কৃপণতা

নেই। তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক, এমনকি শয়তানের দোয়াও কবূল করতে পারেন। কবূল না হওয়ার আশংকা একমাত্র স্বীয় কুকর্ম ও গুনাহ্‌র অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ আল্লাহ্‌র রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে স্বীয় বেশভূষা ফকীরের মত করে আল্লাহ্‌র সামনে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করে ; কিন্তু তাদের খাদ্য ও পোশাক সবই হারাম দ্বারা সংগৃহীত–এরূপ লোকের দোয়া কিরূপে কবূল হতে পারে ? —(মুসলিম,তিরমিযী)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বান্দা যতক্ষণ কোন গুনাহ্ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবূল হতে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি ? তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হলো এরূপ ধারণা করা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অথচ এখনো পর্যন্ত কবূল হলো না। অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা।–(মুসলিম, তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে তখন কবূল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে অবশ্যই দোয়া কবূল হবে বলে মনকে মজবুত করা। এমন মনে করা গুনাহ্‌র কারণে দোয়া কবূল না হওয়ার আশংকা অনুভব করার পরিপন্থী নয়।

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ
اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ
فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ
خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٨﴾

---

(৫৭) তিনিই বৃষ্টির আগে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন পানি পূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এগুলোকে একটি মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দিই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব–যাতে তোমরা চিন্তা কর। (৬৮) যে ভূখণ্ড উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার পালনকর্তার নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তিনিই (আল্লাহ্) স্বীয় বৃষ্টির পূর্বে বায়ু প্রেরণ করেন, তা (বৃষ্টির আশা দিয়ে মনকে) প্রফুল্ল করে দেয় ; এমনকি, যখন রায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি মেঘমালাকে কোন শুষ্ক ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফল উদগত করি। (এতে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ এবং মৃতকে জীবিত করার সর্বময় শক্তি প্রমাণিত হয়। তাই বলেছেনঃ) এমনিভাবে (কিয়ামতের দিন) আমি মৃতদেরকে (মাটির ভেতর থেকে) বের করব (এসব এজন্য শুনানো হলো) যাতে তোমরা বুঝ [এবং কোরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিদায়ত যদিও সবার জন্য ব্যাপক, কিন্তু তা থেকে কম লোকই উপকার লাভ করে। এর দৃষ্টান্ত ঐ বৃষ্টি দ্বারা বোঝা, যা সর্বত্র বর্ষিত হয়, কিন্তু ফসল ও বৃক্ষ সর্বত্র উৎপন্ন হয় না, বরং তা শুধু এমন ক্ষেত্রেই উৎপন্ন হয়, যা উর্বর। এ কারণেই বলেছেন ঃ] এবং যা উৎকৃষ্ট ভূখণ্ড, তার ফসল তো আল্লাহ্র নির্দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট, তার ফসল (যদি উৎপন্ন হয়ও, তবে) খুব অল্পই উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি (সর্বদা) প্রমাণাদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করে থাকি (অবশ্য সেগুলো) তাদেরই জন্য, (উপকারী হয়) যারা (এ গুলোকে) মর্যাদা দেয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ ও বড় নিয়ামতসমূহ উল্লিখিত করেছিলেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিবারাত্র, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি এবং মানুষের প্রয়োজনাদি সরবরাহে ও সেবায় এগুলোর নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার করেছিলেন যে, যখন এক পবিত্র সত্তাই যাবতীয় প্রয়োজন ও সুখ-শান্তির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তখন যে কোন অভাব-অনটন ও প্রয়োজনে তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকেই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করা কর্তব্য।

আলোচ্য প্রথম আয়াতেও এমনি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় নিয়ামতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এসব নিয়ামতের উপরই মানুষ ও পৃথিবীর সব সৃষ্ট জীবের জীবন স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। উদাহরণত বৃষ্টি এবং তদদ্বারা উৎপন্ন বৃক্ষ, ফসলাদি, তরিতরকারি ইত্যাদি। পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উর্ধ্ব জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল এবং আলোচ্য আয়াতে নিম্ন জগতের সাথে সম্পর্কশীল নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হচ্ছে। -(বাহ্রে-মুহীত)

দ্বিতীয় আয়াতে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, আমার এসব বিরাট নিয়ামত যদিও ভূ-খণ্ডের সর্বত্র ব্যাপক ; বৃষ্টি বর্ষিত হলে যদিও পাহাড়, সমুদ্র, উর্বর, অনুর্বর এবং উত্তম ও অনুত্তম সব রকম ভূ-খণ্ডেই সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফসল, বৃক্ষ ও তরিতরকারি একমাত্র এমন ভূ-খণ্ডের উৎপন্ন হয়, যাতে উর্বরতা রয়েছে-কঙ্কর ও বালুকাময় ভূ-খণ্ডে এ বৃষ্টির দ্বারা উপকৃত হয় না।

প্রথম আয়াতের ফলাফল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা মৃতবৎ ভূখণ্ডে ফসল উৎপাদনের মত জীবনীশক্তি দান করেন, তাঁর পক্ষে যে মানুষ পূর্বে জীবিত ছিল অতঃপর মারা যায়, তার মধ্যে পুনরায় জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। এ ফলাফলটি আয়াতে স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত থেকে এরূপ ফলাফল বের করা হয়েছে যে,

আল্লাহ্‌র হিদায়ত, ঐশী গ্রন্থসমূহ, আম্বিয়া (আ) তাঁদের প্রতিনিধি আলিম ও মাশায়েখের শিক্ষাও বৃষ্টির মত সবার জন্যই ব্যাপক, কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা যেমন সব ভূ-খণ্ডই উপকৃত হয় না তেমনি এ আধ্যাত্মিক বৃষ্টির উপকারও তারাই লাভ করে, যাদের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর কঙ্করময় কিংবা বালুকাময়–উৎপাদনের যোগ্যতা বিবর্জিত তারা যাবতীয় সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও নিজেদের পথভ্রষ্টতায় অটল থাকে।

এ ফলাফলের দিকেই দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ–অর্থাৎ আমি এমনিভাবে স্বীয় প্রমাণাদি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা এর মূল্য দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে যদিও এ বর্ণনা সবারই জন্য ব্যাপক ; কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে তাদের জন্যই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে যারা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা এর মূল্য ও মর্যাদা বুঝে। এভাবে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ইহকাল পরকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এবার উভয় আয়াতের বিস্তারিত তফসীর শুনুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا ۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ এতে رياح শব্দ ريح-এর বহুবচন। এর অর্থ বায়ু। بُشْرًا শব্দের অর্থ সুসংবাদ। এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বায়ু প্রেরণ করেন।

উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ু প্রেরণ করা আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি। এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্লতা অর্জন করে এবং তা যেন আসন্ন বৃষ্টির সংবাদও পূর্বাহ্নে প্রদান করে। অতএব, এ বায়ু দু'টি নিয়ামতের সমষ্টি। এক, স্বয়ং মানুষ ও সাধারণ সৃষ্ট জীবের জন্য উপকারী এবং দুই. বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টির আগমন বার্তা বহনকারী। কেননা, মানুষ একটি নরম ও নাজুক সৃষ্টি ; তার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির সংবাদ পূর্বে পেয়ে সে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নেয়। এছাড়া স্বয়ং তার অস্তিত্ব এবং তার আসবাবপত্র ও নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে নেয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا সحاب শব্দের অর্থ মেঘ এবং ثقال শব্দটি ثقيل-এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ বায়ু যখন ভারী মেঘমালাকে উপরে উড়িয়ে নেয়। ভারী মেঘমালার অর্থ পানিতে পরিপূর্ণ মেঘমালা–যা বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারী পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌঁছে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতে কোন মেশিন কাজ করে না এবং কোন মানুষও শ্রম নিয়োগ করে না। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপনা-আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প (মৌসুমী বায়ু) উত্থিত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে। অতঃপর হাজারো বরং লাখো গ্যালন পানি ভর্তি এ জাহাজ বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে আকাশ পানে ধাবিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ–سوق-এর অর্থ কোন জন্তুকে হাঁকানো ও চালানো, بلد–এর অর্থ শহর, বস্তি ও জনপদ। আর ميت-এর অর্থ মৃত।

অর্থাৎ বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোন মৃত শহরের দিকে পরিচালিত করি। 'মৃত শহর' বলে এমন জনপদকে বোঝানো হয়েছে, যা পানির অভাবে উজাড় প্রায়। এখানে সাধারণ ভূখণ্ডের পরিবর্তে বিশেষভাবে শহর উল্লেখ করা এ জন্য

সমীচীন হয়েছে যে, বৃষ্টি-বাদল প্রেরণ ও মাটিকে সিক্ত করার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটানো। মানুষের বাসস্থান হচ্ছে শহর। নতুবা বন-জঙ্গলের সজীবতা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয়।

এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হলো। প্রথমত বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয় ; যেমন দৃশ্যতও তাই। এতে বোঝা গেল যে, যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও 'সামা' (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বোঝানো হয়েছে। কোন সময় সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তে সরাসরি আকাশ থেকে মেঘমালা সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহ্র নির্দেশই পালন করে মাত্র।

এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোন শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোঁটা পানিও দেয় না ; বরং আল্লাহ্র নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌঁছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার সাধ্য কারো নেই।

প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীরা মৌসুমী বায়ুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্য কিছু কিছু বিধি ও মূলনীতি আবিষ্কার করে রেখেছেন। এসবের মাধ্যমে তাঁরা বলে দেন যে, অমুক সাগর থেকে যে মৌসুমী বায়ু উত্থিত হয়েছে তা কোন দিকে প্রবাহিত হবে, কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং কতটুকু বৃষ্টিপাত হবে। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করার জন্য আবহাওয়া বিভাগ কায়েম করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত খবরাদি প্রচুর পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আল্লাহর নির্দেশ তাদের বিপরীতে বলে তাদের সব নিয়ম-কানুনই অকেজো হয়ে যায় এবং মৌসুমী বায়ু তাদের প্রদত্ত খবরের বিপরীতে অন্য কোন দিকে গতি পরিবর্তন করে চলে যায়। ফলে আবহাওয়া বিভাগের নিষ্ফল তাকিয়ে থাকাই সার হয়।

এছাড়া বায়ুর গতিপ্রবাহ নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নীতিমালা ও মেঘমালা যে আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন—এ বিষয়ের পরিপন্থী নয়। কেননা, বিশ্ব চরাচরের সব কাজ-কারবার আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি এই যে, আল্লাহ্র নির্দেশ স্বাভাবিক কারণসমূহের আবরণ ভেদ করে প্রকাশ পায়। এসব স্বাভাবিক কারণ দৃষ্টেই মানুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে। নতুবা আসল সত্য তাই, যা হাফেয শিরাজী ব্যক্ত করেছেন ঃ

کار زلف تست مشك افشانی اما عاشقاں
مصلحت را تہمتے براھوئے چین بسة اند

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ আমি মৃত জনপদে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফল-ফসল উৎপন্ন করি।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ এভাবেই আমি মৃতদেহকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব যাতে তোমরা বুঝ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-ফসল নির্গত করি, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্য বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতে দু'বার শিঙ্গা ফোঁকা হবে। প্রথম ফুৎকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, কোন কিছুই জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃজিত হবে এবং সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। সূরা হাদীদে আরও বলা হয়েছে যে, উভয় বার শিঙ্গা ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্র করে পূর্ণ কাঠামো তৈরি করা হবে। অতঃপর শিঙ্গা ফোঁকার সাথে সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। এ রেওয়ায়েতের বেশির ভাগ বুখারী ও মুসলিম থেকে এবং কিছু অংশ আবূ দাউদের 'কিতাবুল-বা'ছ থেকে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نكد—نَكِدًا শব্দের অর্থ ঐ বস্তু, যা অনর্থক এবং সামান্য। অর্থাৎ বৃষ্টির কল্যাণধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে ভূখণ্ড দুপ্রকার হয়ে থাকে। এক. উর্বর ও ভাল-যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ভূখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার ফল-ফসল উৎপন্ন হয়। দুই. শক্ত ও লবণাক্ত ভূখণ্ড। এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে একে তো কিছু উৎপন্নই হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প পরিমাণে হয়। যা উৎপন্ন হয়, তাও অকেজো ও নষ্ট হয়ে থাকে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ অর্থাৎ আমি স্বীয় শক্তির প্রমাণাদি নানাভাবে বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা এগুলোর মর্যাদা দেয়।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বৃষ্টির কল্যাণধারার মত আল্লাহ্র হিদায়ত এবং নিদর্শনাবলীর কল্যাণও সব মানুষের জন্য ব্যাপক ; কিন্তু প্রতিটি ভূখণ্ডই যেমন বৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে না, তেমনি প্রতিটি মানুষই এ হিদায়ত থেকে ফায়দা হাসিল করে না। বরং একমাত্র তারাই ফায়দা হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও জ্ঞানসম্পন্ন-এসব নিদর্শনের মর্যাদা দেওয়ার মত যোগ্যতা রাখে।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۹﴾ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ

إِنَّا لَنَرٰىكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّي
رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦١﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ
اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰى
رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَأَنجَيْنٰهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا ط
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾

(৫৯) নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত আমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। (৬০) তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল ঃ আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। (৬১) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! আমি কখনও ভ্রান্ত নই ; বরং আমি বিশ্ব পালনকর্তার রাসূল। (৬২) তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদের সদুপদেশ দিই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। (৬৩) তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে—যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও। (৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় ওরা ছিল এক অন্ধ জনগোষ্ঠী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নূহ (আ)-কে (পয়গম্বররূপে) তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। সে (তাঁর সম্প্রদায়কে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা (শুধু) আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর। তিনি ছাড়া কেউ তোমাদের উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই (এবং মূর্তির আরাধনা ত্যাগ কর—যাদের নাম সূরা নূহে ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুস, ইয়ায়ুক ও নসর উল্লিখিত রয়েছে)। আমি তোমাদের জন্য (আমার কথা আমান্য করার অবস্থায়) এক মহা (কঠিন) দিনের শাস্তির আশংকা করি (অর্থাৎ

কিয়ামতের দিন অথবা তুফানের দিন)। তাঁর সম্প্রদায়ের ! প্রধানরা বলল ঃ আমরা তোমাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে (পতিত) দেখতে পাচ্ছি (যে, তুমি একত্ববাদ শিক্ষা দিচ্ছ এবং শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ)। সে (উত্তরে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে মোটেই কোন ভ্রান্তি নেই ; কিন্তু (যেহেতু) আমি মহান প্রতিপালকের (প্রেরিত) রাসূল–(তিনি আমাকে একত্ববাদ প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই স্বীয় কর্তব্য কাজ করি যে,) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম (ও বিধানাবলী) পৌছাই এবং (এ পৌছানোর মধ্যে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই ; শুধু) তোমাদেরই মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করি। (কেননা একত্ববাদে তোমাদেরই মঙ্গল)। আর মহাদিবসের শাস্তির ব্যাপারে তোমরা যে আশ্চর্য বোধ করছ, তা তোমাদের ভ্রান্তি। কেননা, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। (আল্লাহ আমাকে বলে দিয়েছেন বিশ্বাস স্থাপন না করলে মহা দিবসের শাস্তি ভোগ করতে হবে)। পক্ষান্তরে (তোমরা যে আমার রিসালতকে এ কারণেই অস্বীকার কর যে, আমি একজন মানুষ; যেমন সূরা মু'মিনুনে বলা হয়েছে ঃ

مَا هٰذَآ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ الخ

(তবে তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন (মানুষ-এর মাধ্যমে কিছু) উপদেশ এসেছে--(উপদেশ তাই, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ থেকে اِنِّىْ اَخَافُ পর্যন্ত)। যাতে সে তোমাদেরকে (আল্লাহ্র নির্দেশে শাস্তি থেকে) ভয় প্রদর্শন করে এবং যাতে তোমরা (তাঁর ভয় প্রদর্শন হেতু) ভয় কর এবং যাতে (ভয়ের কারণে বিরোধিতা ত্যাগ কর, যদ্দরুন) তোমরা অনুগৃহীত হও। অতঃপর আমি তাঁকে (নূহ্কে) এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে (তুফানের শাস্তি থেকে) উদ্ধার করলাম এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে (ঝড়ে) নিমজ্জিত করলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ সম্প্রদায়। (সত্য-মিথ্যা, লাভ- লোকসান কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হতো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আ'রাফের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন শিরোনাম ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইসলামের মূলনীতি, একত্ববাদ, রিসালত ও পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। মানুষকে তার অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি এবং এ প্রসঙ্গে শয়তানের চক্রান্ত ও প্রতারণা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। এখন অষ্টম রুকু থেকে প্রায় সূরার শেষ পর্যন্ত কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সব পয়গম্বরের সর্বসম্মতভাবে উল্লিখিত মূলনীতি, একত্ববাদ, রিসালত, পরকালের প্রতি নিজ নিজ উম্মতকে আহবান জানানো, মান্যকারীদের প্রতিদান ও পুরস্কার এবং আমান্যকারীদের উপর নানা রকম আযাব ও তাদের অশুভ পরিণাম বিস্তারিতভাবে প্রায় চৌদ্দ রুকূতে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে শত শত মৌলিক ও শাখাগত মাস'আলাও ব্যক্ত হয়েছে। এভাবে বর্তমান জাতিসমূহকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি থেকে

শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য সান্ত্বনা লাভেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের সাথেও এমনি ধরনের ব্যবহার হয়ে এসেছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহ সূরা আ'রাফের পূর্ণ অষ্টম রুকূ। এতে হযরত নূহ (আ) ও তাঁর উম্মতের অবস্থা ও সংলাপের বিবরণ রয়েছে। নবীগণের পরম্পরায় হযরত আদম (আ) যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তাঁর আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর মোকাবিলা ছিল না। তাঁর শরীয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর ও কাফিরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হযরত নূহ্ (আ)-এর আমল থেকেই শুরু হয়। রিসালত ও শরীয়তের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রাসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচেছিল, তারা হযরত নূহ (আ) ও তাঁর নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথী ; তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। এ কাননেই তাঁকে 'ছোট আদম' বলা হয়। বলা বাহুল্য, এ কারণেই পয়গম্বরদের কাহিনীর সূচনা তাঁর দ্বারাই করা হয়েছে। এ কাহিনীতে সাড়ে ন'শ বছরের সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর পয়গম্বরসুলভ চেষ্টা চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ

নূহ (আ) হযরত আদম (আ)-এর অষ্টম পুরুষ। মুস্তাদ্রাক হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মাঝখানে দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়বস্তুই তিবরানী আবূ যর (রা)-এর বাচনিক রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।-(তফসীরে মাযহারী)

এক'শ বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। ইবনে জরীর বর্ণনা করেন যে, নূহ্ (আ)-এর জন্ম হযরত আদম (আ)-এর আট'শ ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল। আর কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিল ন'শ পঞ্চাশ বছর। আদম (আ)-এর বয়স সম্পর্কে এক হাদীসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এভাবে আদম (আ)-এর জন্ম থেকে নূহ্ (আ)-এর ওফাত পর্যন্ত মোট দু'হাজার আটশ' ছাপ্পান্ন বছর হয়।-(মাযহারী)

নূহ্ (আ)-এর আসল নাম 'শাকের'। কোন কোন রেওয়ায়েতে 'সাকান' এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আবদুল গাফ্ফার বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তাঁর যুগটি হযরত ইদরিস (আ)-এর পূর্বে ছিল, না পরে ? অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে ছিলেন।-(বাহ্‌রে-মুহীত)

মুস্তাদরাক হাকেমে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)বলেন ঃ নূহ (আ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নূহ্ (আ) শুধু স্বজাতির জন্যই নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের নবী ছিলেন না। তাঁর সম্প্রদায় বর্তমান

ইরাকের এলাকায় বসবাস করত এবং বাহ্যত সভ্য হলেও শিরকে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেন ঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ .

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। এর প্রথম বাক্যে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির মূলনীতি। দ্বিতীয় বাক্যে শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বাক্যে ঐ মহাশাস্তির আশংকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর অর্থ পরকালের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং জগতে প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে।−(কবীর)

তাঁর সম্প্রদায় উত্তরে বলল ঃ

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرَاكَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ملا শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের সর্দার ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আ)-এর দাওয়াতের জবাবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল ঃ আমরা মনে করি যে, আপনি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত রয়েছেন। কারণ, আপনি আমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলছেন। কিয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদির ধারণা কুসংস্কার বৈ নয়।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে নূহ (আ) পয়গম্বরসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হিদায়ত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সরল-সহজ ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। বললেন ঃ

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلَالَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায় ! আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই ; বরং বিশ্ব-পালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর। আমি যা কিছু বলি, মহান পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ্ তা'আলার পয়গামই তোমাদের কাছে পৌঁছাই। এতে তোমাদেরই মঙ্গল। এতে না আল্লাহ্র কোন লাভ আছে এবং না আমার কোন স্বার্থ আছে। এখানে رب العالمين (বিশ্বপালক) শব্দটি শিরকের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ। এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কোন দেবদেবী কিংবা ইয়াযদাঁ ও আহরিমানই টিকতে পারে না। এরপর বলেছেন ঃ কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের যে সন্দেহ এর কারণ তোমাদের অজ্ঞতা। আমাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

এরপর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যা সূরা মু'মিনুনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে ঃ

مَا هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلاۤئِكَةً ۔

অর্থাৎ নূহ (আ)-এর দাওয়াত শুনে তাঁর কওম এমনও সন্দেহ করল যে, সে তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমাদেরই মত পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, তাঁকে আমরা কিরূপে অনুসরণীয় বলে মেনে নিতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের কাছে কোন পয়গাম পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদের প্রেরণ করতেন। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হতো। এখন এছাড়া আর কোন কিছু নয় যে, আমাদের গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

এর উত্তরে তিনি বললেন ঃ

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاۤءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۔

—অর্থাৎ তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, তোমাদের প্রতিপালকের পয়গম তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও। অর্থাৎ তাঁর ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল হয়।

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রাসূলরূপে মনোনীত করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রিসালত দান করবেন। এতে কারও টু-শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল ব্যাপারে চিন্তা করলেও বোঝা যাবে যে, মানুষের প্রতি রিসালতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

কারণ, রিসালতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর নির্দেশাবলীর বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদের দেখিয়ে দেয় যে, মানবিক কামনা-বাসনার সাথেও আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদত একত্রিত হতে পারে। ফেরেশতা এ দাওয়াত নিয়ে আসলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে মানুষের প্রকাশ্য আপত্তি থেকে যেত যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত—তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং নিদ্রা ও শ্রান্তি কিছুই নেই—আমরা তাদের মত হব কেমন করে ? কিন্তু নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে, তখন তাদের কোন অজুহাত থাকতে পারে না।

এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই বলা হয়েছে ঃ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا অর্থাৎ মানুষ ও মানবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়েই মানুষ ভীত হতে পারে—অন্য কারও ভয় প্রদর্শনে নয়। অধিকাংশ উম্মতের কাফিররা এ সন্দেহ উত্থাপন করেছে যে, কোন মানুষের পক্ষে নবী ও রাসূল হওয়া উচিত নয়। কোরআন পাক সবাইকে এ উত্তরই দিয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, কোরআনের এতসব সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও আজও কিছু লোককে 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) মোটেও মানুষ ছিলেন না'—এরূপ একটি অর্থহীন তথ্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট দেখা যায়। এরূপ ধারণা যে কোরআনে উল্লিখিত নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ও বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত—এ সরল সত্যটুকুও তারা বুঝে না। তারা কোন সমজাতীয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতেও প্রস্তুত নয়। এ কারণেই মূর্খরা সব সময়ই সমসাময়িক ওলী ও আলিমদের প্রতি সমসাময়িকতার কারণেই ঘৃণা ও বিমুখতা পোষণ করে এসেছে।

স্বজাতির দুঃখজনক কথাবার্তার জওয়াবে নূহ্ (আ)-এর দয়ার্দ্র এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবে মিথ্যারোপেই ব্যাপৃত রইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ .

অর্থাৎ নূহ (আ)-এর যালিম সম্প্রদায় তাঁর উপদেশ ও শুভেচ্ছার পরোয়াও করল না এবং যথারীতি মিথ্যারোপে অটল রইল। এর পরিণতিতে আমি নূহ্ (আ) ও তাঁর সঙ্গীদের একটি নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ জনগোষ্ঠী।

হযরত নূহ (আ)-এর কাহিনী, তাঁর সম্প্রদায়ের সলিল সমাধি লাভ এবং নৌকারোহীদের মুক্তির পূর্ণ বিবরণ সূরা নূহ্ ও সূরা হূদে বর্ণিত হবে। এ স্থলে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোটামুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন ঃ যে সময় নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের আযাব নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পার্বত্য এলাকায়ও তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিদের অবকাশ দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও ধনাঢ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব নেমে আসে।—(ইবনে কাসীর)

নূহ (আ)-এর সাথে নৌকায় কতজন লোক ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আবি হাতেমের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আশিজন লোক ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল জুরহাম। সে আরবী ভাষায় কথা বলত।—(ইবনে কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, আশি জনের মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশ জন মহিলা ছিল। প্লাবনের পর তারা মুসেলের যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'সামানুন' (অর্থাৎ আশি) নামে খ্যাত হয়ে যায়।

মোটকথা এখানে নূহ্ (আ)-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এক. পূর্বতন সব পয়গম্বরের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরদের সাহায্য ও সমর্থন কিরূপ বিস্ময়কর পন্থায় করেন যে, পাহাড়ের শৃঙ্গ পর্যন্ত সুউচ্চ প্লাবনের মধ্যেও তাঁদের নিরাপত্তা ব্যাহত হয় না। তিন. পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহ্র আযাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আযাবে নিপতিত হয়েছে, এ কালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ
فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ
بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ
رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ
عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ
قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾
قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِ
لُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن
سُلْطَانٍ ۚ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنجَيْنَاهُ

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾

(৬৫) 'আদ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হূদকে। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই; (৬৬) তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (৬৭) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব-পালকের প্রেরিত পয়গম্বর। (৬৮) তোমাদেরকে পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বস্ত। (৬৯) তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্বরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদের কওমে-নূহের পর প্রাধান্য দান করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক সৌষ্ঠবও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর–যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। (৭০) তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই ? অতএব, নিয়ে এস আমাদের কাছে যা দিয়ে আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (৭১) সে বলল ঃ অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক করছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ। আল্লাহ্ এ সবের কোন সনদ অবতীর্ন করেন নি। অতএব অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (৭২) অনন্তর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত, তাদের মূল কেটে দিলাম। বস্তুত তারা মান্যকারী ছিল না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি 'আদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের (সমাজের অথবা দেশের) ভাই (হযরত) হূদ (আ)-কে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। সে (নিজ সম্প্রদায়কে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (শুধু) আল্লাহ্রই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত কেউ তোমাদের উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। (মূর্তিপূজা ত্যাগ কর, যেমন পরবর্তী وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا বাক্য থেকে জানা যায়)। অতএব, তোমরা কি (এতবড় অপরাধ অর্থাৎ শিরক করে আল্লাহ্র শাস্তিকে) ভয় কর না? তাঁর সম্প্রদায়ের কাফির-প্রধানরা (উত্তরে) বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় (পতিত) দেখতে পাচ্ছি (কারণ, তুমি একত্ববাদের শিক্ষা দিচ্ছ এবং শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছ)। এবং আমরা

নিশ্চয় তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ্) একত্ববাদ ও শাস্তির আগমন কোনটিই সত্য নয়। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে সামান্যও নির্বুদ্ধিতা নেই, কিন্তু (যেহেতু) আমি বিশ্ব-পালকের প্রেরিত পয়গম্বর (তিনি আমাকে একত্ববাদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং ভয় প্রদর্শনের আদেশ করেছেন, তাই আমি স্বীয় কর্তব্য পালন করছি যে,) তোমাদেরকে পালনকর্তার পয়গাম (এবং নির্দেশাবলী) পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বস্ত। (কেননা, একত্ববাদ ও ঈমান তোমাদেরই মঙ্গল) এবং (তোমরা যে আমার রিসালতকে এ কারণে অস্বীকার করছ যে, আমি একজন মানুষ, যেমন সূরা ইবরাহীমে কওমে-নূহ 'আদ ও সামূদের কথা উল্লেখ করার পর قَالُوٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا এবং সূরা ফুস্‌সিলাতে 'আদ ও সামূদের কথা উল্লেখ করার পর قَالُوْا وَلَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً الخ বলা হয়েছে, তবে) তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন (মানুষ)-এর মাধ্যমে কিছু উপদেশ এসেছে-(উপদেশ তাই, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ থেকে اَفَلَا تَتَّقُوْنَ পর্যন্ত-) যাতে সে তোমাদের (আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে) ভয় প্রদর্শন করে ? (অর্থাৎ এটা কোন বিস্ময়ের কথা নয়। মানুষ হওয়া নবুয়তের পরিপন্থী নয়। পূর্বোল্লিখিত اَفَلَا تَتَّقُوْنَ বাক্যে ভীতি প্রদর্শন ছিল। এখন উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে-) এবং (হে আমার সম্প্রদায়) তোমরা স্মরণ কর, (স্মরণ করে অনুগ্রহ স্বীকার এবং আনুগত্য কর)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পর (ভূ-পৃষ্ঠে) আবাদ করেছেন এবং আকার-আকৃতিতে তোমাদেরকে বিশালতা (ও) আধিক্য দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার (এ) নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কর (এবং স্মরণ করে অনুগ্রহ স্বীকার কর এবং আনুগত্য কর) যাতে তোমরা (সর্বপ্রকার) সুফল প্রাপ্ত হও। তারা বলল ঃ (চমৎকার!) তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করি এবং আমাদের বাপদাদা যাদের (অর্থাৎ যে দেবদেবীর) পূজা (অর্চনা) করত আমরা তাদের (ইবাদত) ছেড়ে দিই ? (অর্থাৎ আমরা এরূপ করব না)। অতএব, আমাদের (অমান্য করার কারণে) যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, (যেমন اَفَلَا تَتَّقُوْنَ থেকে বোঝা যায়) তা (অর্থাৎ সে শাস্তি) আমাদের কাছে নিয়ে আস-যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। সে বলল ঃ (তোমরা যখন এমনি অবাধ্য,) সুতরাং এখন তোমাদের উপর পালনকর্তার পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ এলো বলে। (অতএব শাস্তি সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব তখনই পেয়ে যাবে। এছাড়া একত্ববাদ সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ আছে। তোমরা ঐসব প্রতিমাকে উপাস্য বলে থাক, যাদের নাম তোমরা উপাস্য রেখেছ ঃ কিন্তু বাস্তবে এসবের উপাস্য হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। অতএব) তোমরা কি আমার সাথে এমন (ভিত্তিহীন) নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ, (অর্থাৎ ঐ নামধারীরা কতিপয় নামের পর্যায়ভুক্ত) যাদেরকে তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা (নিজেরাই) নামকরণ করেছে, (কিন্তু) এগুলির উপাস্য হওয়ার (যুক্তিগত কিংবা ইতিহাসগত) কোন প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করেন নি। (অর্থাৎ বিতর্কে প্রমাণ পেশ করা এবং প্রতিপক্ষের প্রমাণ নাকচ করা বাদীর দায়িত্ব। তোমরা প্রমাণও পেশ

করতে পার না। এবং আমার প্রমাণের উত্তরও দিতে পার না। এমতাবস্থায় বিতর্ক কিসের)? অতএব, তোমরা (এখন বিতর্ক খতম কর এবং আল্লাহ্র শাস্তির জন্য) প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। অনন্তর (শাস্তি এল এবং) আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের (অর্থাৎ মু'মিনদের স্বীয় অনুগ্রহে এ শাস্তি থেকে) উদ্ধার করলাম এবং তাদের মূল কেটে দিলাম (অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম,) যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা (চরম পাষণ্ড হওয়ার কারণে) বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না। (অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলেও বিশ্বাস স্থাপন করত না। তাই আমি সে সময়কার উপযোগিতা অনুসারে তাদেরকে ধ্বংসই করে দিয়েছি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ 'আদ' প্রকৃতপক্ষে নূহ (আ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তাঁর পুত্র সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। অতঃপর তাঁর বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় 'আদ' নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কোরআন পাকে 'আদের সাথে কোথাও 'আদেউলা' (প্রথম 'আদ) এবং কোথাও اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, 'আদ সম্প্রদায়কে 'ইরাম'ও বলা হয় এবং প্রথম 'আদের বিপরীতে কোন দ্বিতীয় 'আদও রয়েছে ; এ সম্পর্কে তফসীরবিদ ও ইতিহাসবেত্তাদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, 'আদের দাদার নাম ইরাম। তার এক পুত্র আওসের বংশধররাই 'আদ। তাদেরকে প্রথম 'আদ বলা হয়। অপর পুত্র জাসুর পুত্র হচ্ছে 'সামূদ'। তার বংশধরকে দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, 'আদ' ও 'সামূদ' উভয়ই ইরামের দু'শাখা। এক শাখাকে প্রথম 'আদ' এবং অপর শাখাকে 'সামূদ' অথবা দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। ইরাম শব্দটি 'আদ ও সামূদ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

'আদ সম্প্রদায়ের তেরটি বংশ-শাখা ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরামাউত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপু বিশিষ্ট। আয়াতে زَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً বাক্যের মর্ম তাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নিয়ামতই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে)? এ ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে।

যে বিশ্ব-পালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ 'আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব আসে, তখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কা গমন করেছিল। ফলে তারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়—তাদেরকে দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। —(বয়ানুল কোরআন)

'হূদ' একজন পয়গম্বরের নাম। তিনিও নূহ (আ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং সামের বংশধরের এক ব্যক্তি। 'আদ' সম্প্রদায় এবং 'হূদ' (আ)-এর বংশ-তালিকা চতুর্থ পুরুষে সাম পর্যন্ত পৌঁছে এক হয়ে যায়—তাই হূদ (আ) তাদের বংশগত ভাই। এ কারণেই আয়াতে اَخَاهُمْ هُوْدًا (তাদের ভাই হূদ) বলা হয়েছে।

হযরত হূদ (আ)-এর বংশ তালিকা ও আংশিক জীবন চরিত ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের হিদায়তের জন্য হূদ (আ)-কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তাদেরই পরিবারের একজন। আরব বংশ-বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লিখেন ঃ হূদ (আ)-এর পুত্র ইয়ারাব ইবনে কাহতান ইয়ামনে পৌঁছে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনের সব সম্প্রদায় তাঁরই বংশধর। আরবী ভাষার সূচনা তার থেকে হয়েছে এবং তার নামানুসারে ভাষার নাম আরবী এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব।--(বাহরে মুহীত)

কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবী ভাষা নূহ (আ)-এর আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। নূহ (আ)-এর নৌকার একজন আরোহী জুরহাম আরবী ভাষায় কথা বলতেন।—(বাহ্রে মুহীত)। জুরহাম থেকেই মক্কা শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্ভব যে, ইয়ামনে আরবী ভাষার সূচনা ইয়ারাব ইবনে কাহ্তান থেকে হয়েছিল। আবুল বারাকাতের বক্তব্যের উদ্দেশ্যও হয়ত তাই।

হযরত হূদ (আ) 'আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আযাব নাযিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর ঘূর্ণিঝড়ের আযাব আপতিত হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালান-কোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে 'আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ঃ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا—অর্থাৎ আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। এর মর্ম কোন কোন তফসীরকার এটাই স্থির করেছেন যে, তখন 'আদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্যও 'আদ জাতিকে নির্বংশ করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত হূদ (আ)-এর আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে যখন 'আদ জাতির উপর আযাব নাযিল হয়, তখন হূদ (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা একটি কুঁড়েঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও এ কুঁড়েঘরটিতে বাতাস খুব সমম পরিমাণে প্রবেশ করত। হযরত হূদ (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা ঠিক আযাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। তাঁদের কোন কষ্ট হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই ওফাত পান।–(বাহরে মুহীত)

'আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আযাব আসা কোরআন পাকে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। সূরা মু'মিনুনে নূহ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ اَنْشَـاْنَا مِنْ بَعْـدِهِمْ قَـرْنًا اٰخَـرِيْنَ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের পরে আরও একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। বাহ্যত এরাই হচ্ছে 'আদ জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের আচার আচরণ ও বাক্যালাপ বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে فَـاَخَـذَتْهُمُ الصَّـيْحَـةُ بِالْـحَقِّ–অর্থাৎ একটি বিকট শব্দ তাদেরকে সঠিকভাবে আচ্ছন্ন করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ 'আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাব আপতিত হয়েছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় দু'টিই হয়েছিল।

এ হচ্ছে 'আদ জাতি ও হযরত হূদ (আ)-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা। কোরআন পাকের ভাষায় এর বিবরণ এরূপ ঃ

প্রথম আয়াতে وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ আমি 'আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হূদ (আ)-কে হিদায়তের জন্য প্রেরণ করেছি। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় কর না?

'আদ জাতির পূর্বে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশাস্তির স্মৃতি তখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হূদ (আ) আযাবের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করেন নি; বরং এতটুক বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় কর না ?

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قَـالَ الْـمَـلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرَاكَ فِىْ سَـفَـاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ। অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা, তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

কথাগুলি ছিল প্রায় নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তরের মতই–শুধু কয়েকটি শব্দের পার্থক্য মাত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে এর উত্তরও প্রায় তেমনি দেওয়া হয়েছে, যেমন নূহ (আ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, আমি বিশ্বপালকের কাছ থেকে রাসূল হয়ে এসেছি। তাঁর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তোমাদের পৈতৃক মূর্খতায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপূত নয়।

পঞ্চম আয়াতে 'আদ জাতির সে আপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের পূর্বে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল অর্থাৎ আমরা নিজেদেরই মত কোন মানুষকে নেতারূপে কিভাবে মেনে নিতে পারি; কোন ফেরেশতা হলে মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল। এর উত্তরও কোরআন পাক তাই উল্লেখ করেছে, যা নূহ (আ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কোন মানুষ আল্লাহর রাসূল হয়ে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্য আসবেন। কেননা মানুষকে বোঝানোর জন্য মানুষের পয়গম্বর হওয়াই কার্যকরী হতে পারে।

এরপর 'আদ জাতিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

অর্থাৎ স্মরণ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কওমে নূহের পর ভূ-পৃষ্ঠের মালিক করে দিয়েছেন এবং দেহাবয়বে বিশালতা ও সংখ্যায় আধিক্য দিয়েছেন। আল্লাহ্র এসব নিয়ামত স্মরণ করলে তোমাদের মঙ্গল হবে।

কিন্তু এ অবাধ্য জাতি এসব উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করল না। তারা পথভ্রষ্টদের চিরাচরিত প্রথায় উত্তর দিল ঃ তুমি কি আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও ? দেবতাদের ছেড়ে আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করি—এটাই কি তোমার কাম্য ? না আমরা তা করতে পারব না। তুমি যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এস, যদি সত্যবাদী হও।

ষষ্ঠ আয়াতে হূদ (আ) উত্তর দিয়েছেন ঃ তোমরা যখন এমনি অবাধ্য ও অজ্ঞান, তখন তোমাদের উপর আল্লাহ্র গযব ও শাস্তি এল বলে তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও এখন তারই প্রতীক্ষা করছি। জাতির এ উস্কানিমূলক উত্তর শুনেও তিনি আযাব আসার সংবাদ দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু পয়গম্বরসুলভ দয়া ও শুভেচ্ছা তাঁকে সাথে সাথে একথা বলতেও বাধ্য করল ঃ পরিতাপের বিষয়, তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা জড় ও অচেতন পদার্থসমূহকে উপাস্য করে নিয়েছ। এদের উপাস্য হওয়ার না কোন যুক্তিগত প্রমাণ আছে, না ইতিহাসগত। এদের ইবাদতে তোমরা এতই পাকা হয়ে গেছ যে, এদের সমর্থনে আমার সাথে বিতর্ক করে যাচ্ছ!

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, হূদ (আ)-এর প্রচেষ্টা এবং 'আদ জাতির অবাধ্যতার সর্বশেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, আমি হূদ ও তাঁর সাথী মু'মিনদের আযাব থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং মিথ্যারোপকারীদের মূল কেটে দিয়েছি। তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না।

এ কাহিনীতে গাফিলদের জন্য আল্লাহ্র স্মরণ ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ, বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য শিক্ষার সামগ্রী এবং প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য পয়গম্বরসুলভ প্রচার ও সংস্কার পদ্ধতির শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ

اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ

لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ

فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ

بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا
وَّ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ
قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا
اِنَّا بِالَّذِىْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾

(৭৩) সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী–তোমাদের জন্য প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহ্র ভূমিতে চরে বেড়াবে। একে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে স্পর্শ করবে। (৭৪) তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদের 'আদ জাতির পরে সর্দার করেছেনঃ তোমাদের পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বতগাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব, আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (৭৫) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দারেরা ঈমানদার দরিদ্রদের জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহ্কে তার পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন ? তারা বলল ঃ তারা বলল ঃ আমরা তো তাঁর আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। (৭৬) দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা অস্বীকার করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহ্ (আ)-কে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। সে (স্বজাতিকে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (শুধু) আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। (তারা একটি বিশেষ মুজিযা চেয়ে বলল ঃ এ প্রস্তরখণ্ড থেকে একটি উষ্ট্রী পয়দা হলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব। তাঁর দোয়ায় তাই হলো। একটি প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে তার ভেতর থেকে একটি বৃহদাকার উষ্ট্রী বের হয়ে গেল। বিষয়টি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত)। সে বলল ঃ তোমাদের

কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আমার রাসূল হওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। (অতঃপর তা বর্ণনা করে বলা হচ্ছে,) এটি হলো আল্লাহ্র উষ্ট্রী, যা তোমাদের জন্য প্রমাণ (হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ্র উষ্ট্রী বলে অভিহিত হয়েছে। কেননা, এটি আল্লাহ্র প্রমাণ)। অতএব (আমার রিসালতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও স্বয়ং এরও কিছু অধিকার রয়েছে। সেগুলো এই যে,) একে ছেড়ে দাও আল্লাহ্র ভূমিতে (ঘাস-পানি) খেয়ে ফিরবে। (নিজ পালার দিন পানি পান করবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে।) এবং একে অসৎভাবে (কষ্টদানের ইচ্ছায়) স্পর্শ করবে না—অন্যথায় তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে এবং (হে আমার সম্প্রদায়) তোমরা স্মরণ কর, (এবং স্মরণ করে অনুগ্রহ স্বীকার কর এবং আনুগত্য কর)। তিনি তোমাদের 'আদ জাতির পরে (ভূপৃষ্ঠে) আবাদ করেছেন এবং তোমাদের পৃথিবীতে বসবাসের (মনমত) ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে (বৃহদাকার) অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বতগাত্র খোদাই করে তাতে (-ও) প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার (এসব) নিয়মত (এবং অন্যান্য নিয়ামতও) স্মরণ কর। (এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে) পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন কর। কিন্তু এত উপদেশ সত্ত্বেও মাত্র কয়েকজন দরিদ্র লোক বিশ্বাস স্থাপন করল। অতঃপর তাদের ও বড়লোকদের মধ্যে এরূপ কথাবার্তা হলো, অর্থাৎ) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা ঈমানদার দরিদ্রদের জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন কর যে, সালেহ (আ) স্বীয় পালনকর্তার পক্ষ থেকে (পয়গম্বররূপে) প্রেরিত (হয়ে এসেছেন)? তারা (উত্তরে) বলল ঃ নিশ্চয়, আমরা সে বিষয়ে (অর্থাৎ সে নির্দেশের) প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করি, যা দিয়ে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা অস্বীকার করি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সালেহ্ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে কওমে নূহ ও কওমে হূদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'রাফের শেষ পর্যন্ত পূববর্তী পয়গম্বরও তাঁদের উম্মতের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বর্ণিত হবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ইতিপূর্বে 'আদ জাতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, 'আদ ও সামূদ একই দাদার বংশধরের দু'ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে দু'সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। একটি 'আদ সম্প্রদায়, আর একটি সামূদ সম্প্রদায়। তারা আরবের উত্তর পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হজর'। বর্তমানে একে সাধারণত 'মাদায়েনে সালেহ বলা হয়। 'আদ' জাতির মত সামূদ জাতিও সম্পন্ন, শক্তিশালী ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশাল এলাকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বত খোদাই করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। 'আরদুল-কোরআন' গ্রন্থে মাওলানা

সাইয়্যেদ সোলায়মান লিখেছেন ঃ তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও সামূদী বর্ণমালায় শিলালিপি খোদিত রয়েছে।

পার্থিব বিত্ত ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ্ ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। সামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছে।

অথচ পূর্ববর্তী কওমে নূহের শাস্তির ঘটনাবলী তখনও লোকমুখে আলোচিত হতো। এবং 'আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেন সাম্প্রতিককালের ঘটনা বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু ঐশ্বর্য ও শক্তির নেশা এমনি জিনিস যে, একজনের ধ্বংসস্তূপের উপর অন্যজন এসে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রথমজনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। 'আদ জাতির ধ্বংসের পর সামূদ জাতি তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং যেসব জায়গায় নিজেদের বিলাসবহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে, সেখানেই যে তাদের ভাইয়েরা নিশিচহ্ন হয়েছিল তা বেমালুম ভুলে যায়। তারা 'আদ জাতির অনুরূপ কার্যকলাপও শুরু করে দেয়। আল্লাহ্ ও পরকাল বিস্মৃত হয়ে শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাদের হিদায়তের জন্য সালেহ্ (আ)-কে পয়গম্বর রূপে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে সামূদ জাতিরই একজন এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাঁকে أَخَاهُمْ صَالِحًا অর্থাৎ সামূদ জাতির ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সালেহ্ (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সে দাওয়াতই দেন, যা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বর নিয়ে এসেছিলেন। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ—(অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তারা মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত করার ও মূর্তিপূজা পরিহার করার নির্দেশ দেয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ন্যায় সালেহ্ (আ)-ও তাঁর জাতিকে একথাই বললেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রতিপালক ও স্রষ্টা মনে কর। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তাঁর ভাষায় ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

এতদসঙ্গে আরও বললেন ঃ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ—অর্থাৎ এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতেও এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এ উষ্ট্রীর ঘটনা এই যে, হযরত সালেহ্ (আ) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজ করতে করতেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বারবার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটি দাবি করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তাঁকে স্তব্ধ করে দিতে পারব। সেমতে তারা দাবি করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্র পয়গম্বর হন, তবে আমাদেরকে 'কাতেবা' পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখান।

সালেহ্ (আ) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবি পূরণ করে দিই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না ? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন সালেহ্ (আ) প্রথমে দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন, 'ইয়া পরওয়ারদিগার! আপনার জন্য কোন কাজই কঠিন নয়। তাদের দাবি পূরণ করে দিন।" দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবির অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এল।

সালেহ্ (আ)-এর এ বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরনের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। হযরত সালেহ্ (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শংকিত হলেন যে, এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন ঃ এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে ঃ

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

–অর্থাৎ এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী–তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব, একে আল্লাহ্র যমীনে চরে বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্টের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করো নাঃ নতুবা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। এ উষ্ট্রীকে 'আল্লাহ্র উষ্ট্রী' বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহ্র অসীম শক্তির নিদর্শন এবং সালেহ (আ)-এর মু'জিযা হিসাবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাঁকে রূহুল্লাহ্ (আল্লাহ্র আত্মা) বলা হয়েছে। تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ উষ্ট্রীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। যমীন আল্লাহ্র এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহ্র সৃজিত। কাজেই তাঁর উষ্ট্রীকে তাঁর যমীনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও যাতে সাধারণভাবে চারণক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে।

সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। হযরত সালেহ্ (আ) আল্লাহ্র নির্দেশে ফায়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নেবে। যেদিন উষ্ট্রী পানি পান করত সেদিন অন্যরা উষ্ট্রীর দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। কোরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বণ্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ–অর্থাৎ হে সালেহ্ তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর

মধ্যে বণ্টন হবে–একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ বণ্টন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে–যাতে কেউ এর খেলাপ করতে না পারে। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ–অর্থাৎ এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী একদিন পর পানি এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের।

দ্বিতীয় আয়াতে এ অবাধ্য ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতির প্রতি শুভেচ্ছা ও তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য পুনরায় আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হয়েছে, যাতে তারা অবাধ্যতা পরিহার করে। বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا .

–এতে خُلَفَاءَ শব্দটি خليفة-এর বহুবচন। এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি قصور শব্দটি قصر-এর বহুবচন। এর অর্থ উচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ। تنحتون শব্দটি نحت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রস্তর খোদাই করা। جبال শব্দটি جبل-এর বহুবচন। এর অর্থ পাহাড়। بيوتا শব্দটি بيت-এর বহুবচন। এর অর্থ প্রকোষ্ঠ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি 'আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদের অভিষিক্ত করেছেন, তাদের ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তি তোমাদের দান করেছেন এবং তাদের এ শিল্পকার্য শিক্ষা দিয়েছেন। যে, উন্মুক্ত জায়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরি কর। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ فَاذْكُرُوْا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ –অর্থাৎ আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর, অনুগ্রহ স্বীকার কর, তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাস'আলা জানা যায়।

এক. ধর্মের মূলবিশ্বাসসমূহে সব পয়গম্বরই একমত এবং তাঁদের সবার শরীয়তই অভিন্ন। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

দুই. পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গম্বরদের দাওয়াত কবূল করেনি। ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

তিন. তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ দুনিয়াতে কাফিরদেরকেও দান করা হয়; যেমন 'আদ ও সামূদ জাতির সামনে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ ও শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।

চার. তফসীর কুরতুবীতে আছে. এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং বৈধ।

এটা ভিন্ন কথা যে, কোন নবী-রাসূল ও ওলীগণ অট্টালিকা পছন্দ করেননি। কারণ, এগুলো মানুষকে গাফিল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বর্ণিত আছে, সেগুলো এ ধরনেরই।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামূদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল সালেহ্ (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফিরদের। বলা হয়েছে ঃ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْنَ لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ ۔

অর্থাৎ সালেহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহংকারী ছিল, তারা তাদেরকে বলল, যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হতো—অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ইমাম রাযী তফসীর কবীরে বলেন ঃ এখানে দু'দলের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাফিরদের গুণটি صيغة معروف এ اِسْتَكْبَرُوْا বলা হয়েছে এবং মু'মিনদের গুণটি صيغة مجهول এ اُسْتُضْعِفُوْا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফিরদের অহংকার গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব কাজ, যা দণ্ডনীয় ও তিরস্কৃত, পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে ঃ পক্ষান্তরে মু'মিনদের যে বিশেষণ তারা বর্ণনা করত যে, এরা নিকৃষ্ট, হীন ও দুর্বল, এটা কাফিরদেরই কথা, স্বয়ং মু'মিনদের বাস্তব অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা তিরস্কারযোগ্য হতে পারে। বরং তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও মনে করত। উভয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল এই যে, কাফিররা মু'মিনদের বলল ঃ তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, সালেহ্ (আ) তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল ?

উত্তরে মু'মিনরা বলল ঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে হিদায়তসমূহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন, আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী।

তফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে ঃ সামূদ জাতির মু'মিনরা কি চমৎকার অলংকার পূর্ণ উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রাসূল কি না। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয়; বরং জাজ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আনীত পয়গাম। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না। আল্লাহ্র ফযলে আমরা তাঁর আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী।

কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও সামূদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলল ঃ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন-সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপদ রাখুন! এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জাজ্বল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا
تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النّٰصِحِينَ ﴿٧٩﴾

(৭৭) অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল তারা বলল ঃ হে সালেহ্, নিয়ে এস যদ্দারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক! (৭৮) অতঃপর এসে আপতিত হলো তাদের উপর ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে তারা লাশ হয়ে পড়ে রইল। (৭৯) সালেহ্ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে স্বীয় পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদেরকে ভালবাস না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[মোটকথা, তারা সালেহ্ (আ)-এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করল না এবং উষ্ট্রীর নির্ধারিত হকও আদায় করল না, বরং] অতঃপর উষ্ট্রীকে (-ও) হত্যা করল এবং স্বীয় পালনকর্তার আদেশ (অর্থাৎ একত্ববাদ ও রিসালতের আদেশও) অমান্য করল এবং (তারও উপর ঔদ্ধত্য এই দেখাল যে,) তারা বলল ঃ হে সালেহ্! তুমি যে বিষয়ের (অর্থাৎ যে শাস্তির) ভয় আমাদেরকে দেখাতে তা নিয়ে এস, যদি তুমি পয়গম্বরই হয়ে থাক। কেননা, পয়গম্বরের সত্যবাদী হওয়া অপরিহার্য। অতঃপর এসে আপতিত হলো তাদের উপর ভূমিকম্প। অতএব (দেখা গেল,) ভোরবেলায় তারা নিজ নিজ গৃহে অধোমুখে পড়ে রয়েছে। [তখন সালেহ্ (আ) তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং অনুতাপ ভরে স্বগত সম্বোধন করে] বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের কাছে স্বীয় পালনকর্তার নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম। (যা পালন করলে তোমরা মুক্তি পেতে) এবং আমি তোমাদের (অনেক) মঙ্গল কামনা করেছি (কত আদর-যত্ন করে বুঝিয়েছি) কিন্তু (পরিতাপের বিষয়,) তোমরা হিতাকাঙ্ক্ষীদের পছন্দই করতে না (তাই আমার কথায় কর্ণপাত করলে না এবং পরিণামে এই অশুভ দিন দেখেছ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সালেহ (আ)-এর দোয়ায় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ

উষ্ট্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমতে সে জনপদের সব মানুষ ও জীবজন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই সালেহ্ (আ) তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা।

সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে সামূদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হতো না।

যে সুবৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সুতরাং সম্প্রদায়ের পরমা সুন্দরী কতিপয় নারী বাজি রাখল যে, যে ব্যক্তি এ উষ্ট্রীকে হত্যা করবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্প্রদায়ের দু'জন যুবক 'মিসদা' ও 'কাসার' এ নেশায় মত্ত হয়ে উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। তারা উষ্ট্রীর পথে একটি বড় প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে রইল। উষ্ট্রী সামনে আসতেই 'মিসদা' তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং 'কাসার' তরবারির আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল।

কোরআন পাক তাকেই সামূদ জাতির সর্ববৃহৎ হতভাগ্য বলে আখ্যা দিয়ে বলেছে ঃ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আযাবে পতিত হয়।

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর সালেহ (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে। فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ-অর্থাৎ আরও তিন দিন আরাম করে নাও (এরপরই আযাব নেমে আসবে)। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্য কোন উপদেশ ও হুঁশিয়ারি কার্যকর হয় না। সুতরাং সালেহ (আ)-এর একথা শুনেও তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলল ঃ এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে?

সালেহ (আ) বললেন ঃ তাহলে আযাবের লক্ষণও শুনে নাও--আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। হতভাগ্য জাতি এ কথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং সালেহ (আ)- কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দিই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। সামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কোরআন পাকের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা সালেহ (আ)- কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহপানে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে ওদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

فَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ--অর্থাৎ তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তারা তা জানতেই পারল না। বৃহস্পতিবার ভোরে সালেহ্ (আ)-এর কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও যালিমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করল না; বরং তারা সালেহ (আ)-এর প্রতি আরও চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাঁকে হত্যা করার জন্য ঘোরাফেরা করতে লাগল। আল্লাহ্ রক্ষা করুন, তাঁর গযবেরও লক্ষণাদি থাকে। মানুষের মন-মস্তিষ্ক যখন অধোমুখী হয়ে যায়, তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে।

দ্বিতীয় দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কাল হয়ে গেল, তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে, কোন্ দিক থেকে কিভাবে আযাব আসে।

এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ধরাশায়ী হলো। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লিখিত রয়েছে। فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ এখানে رجفة শব্দের অর্থ ভূমিকম্প।

অন্যান্য আয়াতে اَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ-ও বলা হয়েছে। صيحة শব্দের অর্থ ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দ। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আযাবই এসেছিল; নিচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার। ফলে তারা فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ-এ পরিণত হয়েছিল। جاثم শব্দটি جثوم ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চেতনাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বসে থাকা। (কামূস) অর্থাৎ যে যে অবস্থায় ছিল, সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

نعوذ بالله من قهره وعذابه

এ কাহিনীর প্রধান অংশগুলো স্বয়ং কোরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় এবং কিছু অংশ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমনও রয়েছে, যা তফসীরবিদরা ইসরাঈলী (অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানদের) বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সেসব বর্ণনার উপর কোন ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়।

সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির উপর আযাব এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আযাববিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যবহার না করে।-(মাযহারী)

কোন কোন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে আবূ রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কায় হেরেমের সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হেরেম থেকে বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও

মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে মক্কার বাইরে আবূ রেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেন ঃ তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্র আবূ রেগালেরই বংশধর।—(মাযহারী)

এসব আযাববিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কোরআন পাক আরবদেরকে বার বার হুঁশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও শিক্ষণীয় কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছেঃ

لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً

আযাবের ঘটনা বিবৃত করার পর বলা হয়েছে ঃ

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لاَّ تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ .

—অর্থাৎ স্বজাতির উপর আযাব নাযিল হওয়ার পর সালেহ্ (আ) ও ঈমানদাররা সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তাঁর সাথে চার হাজার মু'মিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে ইয়ামনের 'হাজরামাওতে, চলে গেলেন। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে তাঁর মক্কায় প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, সালেহ্ (আ) প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যানকামীদের পছন্দই কর না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদের সম্বোধন করে লাভ কি ? উত্তর এই যে, এক লাভ তো এই যে, এ থেকে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কোরাইশ সর্দারদের এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেছিলেন। এছাড়া সালেহ্ (আ)-এর এ সম্বোধন আযাব অবতরণের পূর্বেও হতে পারে—যদিও বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ
النِّسَآءِ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ
اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾

فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغُبِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

(৮০) এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? (৮১) তোমরা তো কামবশত পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। এতে করে তোমরা সীমা অতিক্রম করছ। (৮২) তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে জনপদ থেকে। এরা খুব পূত-পবিত্র থাকতে চায়। (৮৩) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম কিন্তু তাঁর স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৮৪) অতঃপর দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কেমন হয়েছে!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি লূত (আ)-কে (কতিপয় জনপদের দিকে পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায় (অর্থাৎ উম্মত)-কে বলল ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা দুনিয়ার কেউ করেনি ? (অর্থাৎ) তোমরা পুরুষদের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছ নারীদেরকে ছেড়ে (এবং এ কাজ তোমরা কোন ধোঁকাবশত করছ না,) বরং (এ ব্যাপারে) তোমরা (মানবতার) সীমা অতিক্রম করেছ। বস্তুত (এসব বিষয়ে) তার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এছাড়া আর কোন (যুক্তিসঙ্গত) উত্তর ছিল না যে, (অবশেষে বাজে পন্থায়) তারা পরস্পর বলতে লাগল ঃ তাদেরকে (অর্থাৎ লূত ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনদেরকে) তোমাদের (এ) জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা) তারা বড় পূত-পবিত্র সাজছে (এবং আমাদের অসাধু বলছে। কাজেই অসাধুদের মধ্যে সাধুরা কেন থাকবে ? তারা বিদ্রূপ ছলে একথা বলেছিল)। অনন্তর (ব্যাপার যখন এতদূর গড়াল, তখন) আমি (এ জাতির প্রতি আযাব নাযিল করলাম এবং) লূত (আ) ও তাঁর সাথে সম্পর্ককারীদের (অর্থাৎ পরিবারবর্গ ও অন্যান্য মু'মিনকে এ আযাব থেকে) উদ্ধার করে নিলাম (অর্থাৎ পূর্বেই তাদের সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল)। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত; সে (বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে) তাদের মধ্যেই রয়ে গেল; যারা সেখানে আযাবে রয়ে গিয়েছিল এবং (তাদের আযাব ছিল এই যে,) আমি তাদের উপর এক নতুন ধরনের (অর্থাৎ প্রস্তরের) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। অতএব (হে দর্শক,) দেখে নাও অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে! (তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখলে আশ্চর্য বোধ করবে যে, অবাধ্যতার কি পরিণাম হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী পর্বের চতুর্থ কাহিনী হচ্ছে হযরত লূত (আ)-এর কাহিনী।

লূত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল! স্বয়ং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে পয়গম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাঁকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন।

নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিণী হযরত সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত মুসলমান হন। فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) দেশ ছেড়ে শাম দেশে হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ) কেনানে গিয়ে অবস্থান করেন, যা বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরেই অবস্থিত।

লূত (আ)-কেও আল্লাহ্ তা'আলা নবুয়ত দান করে জর্দান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদুমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদুম,, আমুরা, উমা, সাবুবিম, বালে, অথবা সূগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফেকা' ও মু'তাফেকাত শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদুমকেই রাজধানী মনে করা হতো। হযরত লূত (আ) এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। (এসব ঐতিহাসিক তথ্য বাহরে মুহীত, মাযহারী, ইবনে কাসীর, আল-মানার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে)।

কোরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে ঃ

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى –অর্থাৎ মানুষ যখন দেখে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কামপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভালমন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গুনাহ্ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-কে তাদের হিদায়তের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে হুঁশিয়ার করে বলেন ঃ

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ․

অর্থাৎ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি?

যিনা তথা ব্যভিচার সম্পর্কে কোরআন পাক اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই

فاحشة শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে আলিফ-লামসহ الفاحشة বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যভিচার যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং যিনার চাইতেও কঠোর অপরাধ।

এরপর বলা হয়েছে ঃ এ নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। আমর ইবনে দীনার বলেন ঃ এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি।--(মাযহারী) সাদুমবাসীদের পূর্বে কোন ঘোরতর মন্দ ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বলেন ঃ কোরআনে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লিখিত না হলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ কাজ করতে পারে। (ইবনে কাসীর)

এতে তাদের নির্লজ্জতার কারণে দু'দিক দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এক. অনেক গুনাহে মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববর্তীদের অনুকরণের কারণে লিপ্ত হয়ে যায় যদিও তা কোন শরীয়তসম্মত ওযর নয় ; কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাকে কোন না কোন স্তরে ক্ষমাযোগ্য মনে করা যায়। কিন্তু যে গুনাহ্ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোন কারণও নেই, তা নিঃসন্দেহে অধিক শাস্তির যোগ্য। দুই. যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন করে, তার উপর তার নিজের কাজের গুনাহ্ ও শাস্তি তো চাপেই, সাথে সাথে ঐসব লোকের শাস্তিও তার গর্দানে চেপে বসে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার সে কাজে প্রভাবিত হয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একটি হালাল ও জায়েয পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদের বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক।

এ কারণে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদরা এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের চাইতে অধিক গুরুতর অপরাধ ও গুনাহ্ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ যারা এ কাজ করে, তাদের ঐ রকম শাস্তিই দেওয়া উচিত, যেমন লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোন উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মুসনাদে-আহ্মদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ فاقتلوا الفاعل والمفعول به অর্থাৎ এ কাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর। (ইবনে কাসীর)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ অর্থাৎ তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ডিঙিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ।

তৃতীয় আয়াতে লূত (আ)-এর উপদেশের জবাবে তার সম্প্রদায়ের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ তাদের দ্বারা যখন কোন যুক্তিসঙ্গত জবাব দেওয়া সম্ভবপর হলো না, তখন রাগের

বশবর্তী হয়ে পরস্পরে বলতে লাগল ঃ এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবি করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামূদ সম্প্রদায়ের বক্রতা ও বেহায়াপনার আসমানী শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হলো। শুধু লূত (আ) ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী আযাব থেকে বেঁচে রইলেন। কোরআনের ভাষায় ঃ أَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি লূত ও তাঁর পরিবারকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। 'আহ্‌ল' সন্তানাদি তথা পরিবারকে বলা হয়। এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ তাঁর পরিবারের মধ্যে দু'টি কন্যা মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী মুসলমান হয়নি। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ সমগ্র বস্তির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোন মুসলমান ছিল না। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, লূত (আ)-এর ঘরের লোকই শুধু মুসলমান ছিল। সতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আহ্‌লের অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বোঝানো হয়েছে। সারকথা এই যে, গুণা-গুণতি কয়েকজন মুসলমান ছিল। তাদের আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ)-কে নির্দেশ দেন যে, স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোকদের নিয়ে শেষরাত্রে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পেছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন বস্তি থেকে বের হয়ে যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে।

হযরত লূত (আ) এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীলদের নিয়ে শেষ রাত্রে সাদুম ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী প্রসঙ্গে দু'রকম রেওয়ায়েতই বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দূর সঙ্গে চলার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে পেছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আযাব এসে তাকেও স্পর্শ করল। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে যে, আমি লূত (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী আযাবে লিপ্ত রয়ে গেছে। শেষ রাত্রে বস্তি ত্যাগ করা এবং পিছন ফিরে না দেখার নির্দেশ কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে আযাব সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদের উপর এক অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হূদে এ আযাবের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ .

অর্থাৎ যখন আমার আযাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার পালনকর্তার নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফিরদের থেকে বেশি দূরে নয়।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নিচে থেকে জিবরাঈল (আ) গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। বর্ষিত প্রস্তরসমূহ স্তরে স্তরে একত্রিত ছিল। অর্থাৎ এমন অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল। এসব প্রস্তর চিহ্নযুক্ত ছিল। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রত্যেক পাথরে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে খতম করার জন্য পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূরা হিজরের আয়াতে এ আযাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে ঃ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ঃ– অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল।

এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চিৎকার ধ্বনি এবং এরপর অন্যান্য আযাব এসেছে। বাহ্যত বোঝা যায় যে, চিৎকার ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্য উপর থেকে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রথমে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয়, তা বাস্তবেও আগেই সংঘটিত হবে, তা অপরিহার্য নয়।

লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ, তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল।

সূরা হূদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে কোরআন পাক আরবদের হুঁশিয়ার করে একথাও বলেছে যে, وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ অর্থাৎ উল্টে দেওয়া বস্তিগুলো যালিমদের কাছ থেকে বেশি দূরে অবস্থিত নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

এ দৃশ্য শুধু কোরআন অবতরণের সময়ই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি 'লূত সাগর' অথবা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত। এর ভূভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক নিচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে আশ্চর্য ধরনের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন জন্তু, প্রাণী এমনকি মাছ, ব্যাঙ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে না। একারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত আছে, এটাই সাদুমের অবস্থান স্থল।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا
فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۚ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ
كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۠ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ
اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ
بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

(৮৫) আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব, তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হলো তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৮৬) তোমরা পথে-ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসীদের হুমকি দেবে, আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। (৮৭) আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যা আমার হাতে প্রেরিত হয়েছে এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে সবর কর যে পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মাদইয়ানের (অর্থাৎ মাদইয়ানের অধিবাসীদের) প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব (আ)-কে (পয়গম্বর করে) পাঠিয়েছি। সে (মাদইয়ানবাসীদের) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (শুধুমাত্র) আল্লাহ্র ইবাদত কর। তাঁকে ছাড়া তোমাদের উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) কেউ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (আমার নবী হওয়ার) প্রকাশ্য প্রমাণস্বরূপ মু'জিযা এসে গেছে। (যখন আমার নবুয়ত সপ্রমাণিত) অতএব, (শরীয়তের বিধি-বিধানে আমার কথা মান্য কর। সেমতে আমি বলি,) তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের (প্রাপ্য) দ্রব্যাদি কম দিয়ো না (যেমন এটাই তোমাদের অভ্যাস) এবং ভূপৃষ্ঠে, (শিক্ষা, একত্ববাদ, পয়গম্বর প্রেরণ এবং মাপ ও ওযনে ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে) তার সংস্কার সাধন করার পর অনর্থ বিস্তার করো না (অর্থাৎ এসব বিধানের

বিরোধিতা ও কুফরী করো না। এগুলোই অনর্থের কারণ)। এটি (অর্থাৎ আমি যা বলছি, তাই পালন করা) তোমাদের জন্য (ইহকাল ও পরকাল) কল্যাণকর যদি তোমরা (আমাকে) সত্য বলে বিশ্বাস কর, (যার প্রমাণ রয়েছে। যদি বিশ্বাস করে পালন কর, তবে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ইহকাল ও পরকালে তোমাদের জন্য উপকারী, পরকালে তো মুক্তি আছেই। আর ইহকালে শরীয়ত পালন করলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। বিশেষত মাপ ও ওযন পুরোপুরি দিলে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি লাভ করে)। এবং তোমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে পথে বসে থেকো না যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের (বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে) হুমকি দেবে এবং (তাদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ ঈমান) থেকে বাধা দান করবে এবং এতে (এ পথে) বক্রতা (ও সন্দেহ) অনুসন্ধান করবে। (অর্থাৎ অনর্থক আপত্তি তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। তারা উল্লিখিত পথভ্রষ্টতার সাথে সাথে অন্যকে পথভ্রষ্ট করার কাজেও লিপ্ত ছিল। পথে বসে তারা আগন্তুকদের এই বলে বিভ্রান্ত করত যে, শোয়ায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো না। তাহলে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব। অতঃপর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে উৎসাহ প্রদান এবং প্রতিশোধ স্মরণ করিয়ে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে। অর্থাৎ) এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা (সংখ্যায় অথবা অর্থ-সম্পদে) অল্প ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের (সংখ্যায় অথবা অর্থ-সম্পদে) বেশি করে দিয়েছেন (এ হচ্ছে ঈমানদারদের প্রতি উৎসাহ প্রদান।) এবং দেখ তো কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থ (অর্থাৎ কুফর, মিথ্যারোপ ও যুলুম), কারীদের। যেমন কওমে নূহ্, 'আদ ও সামূদের ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে তোমাদের উপরেও আযাব আসার আশংকা রয়েছে। এ হচ্ছে কুফরের কারণে ভীতি প্রদর্শন আর যদি (তোমরা এ কারণে আযাব না আসার সন্দেহ কর যে,) তোমাদের একদল সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যা আমার হাতে প্রেরিত হয়েছে, এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, (তবুও উভয় দল একই অবস্থায় রয়েছে, যারা বিশ্বাস করেনি, তাদের উপর কোন আযাব আসেনি। এতে বোঝা যায় যে, আপনার ভীতি প্রদর্শন অমূলক)। তবে (এ সন্দেহের উত্তর এই যে, তাৎক্ষণিক আযাব না আসায় একথা কেমন করে বোঝা গেল যে, আদৌ আযাব আসবে না)ঃ সবর কর যে পর্যন্ত আমাদের (উভয় দলের) মধ্যে আল্লাহ তা'আলা (কার্যত) মীমাংসা না করে দেন (অর্থাৎ আযাব নাযিল করে মু'মিনদের রক্ষা করবেন এবং কাফিরদের ধ্বংস করে দেবেন)। বস্তুত তিনি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী (তাঁর মীমাংসা সম্পূর্ণই সঙ্গত হয়ে থাকে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরদের কাহিনী পরম্পরার পঞ্চম কাহিনী হচ্ছে হযরত শোয়ায়েব (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কাহিনীটিই বিবৃত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত শোয়ায়েব (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশধর। হযরত লূত (আ)-এর সাথেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশধরও মাদইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। যে জনপদে তারা বসবাস করত, তাও মাদইয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। অতএব, 'মাদইয়ান' একটি জাতির ও একটি শহরের নাম।

এ শহর অদ্যাবধি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর 'মায়ানের' অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র মূসা (আ)-এর কাহিনীতে বলা হয়েছেঃ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ এতে এ জনপদটিকেই বোঝানো হয়েছে।--(ইবনে কাসীর)

হযরত শোয়ায়েব (আ)-কে চমৎকার বাগ্মিতার কারণে 'খতীবুল আম্বিয়া' বলা হয়। (ইবনে কাসীর, বাহরে মুহীত)

হযরত শোয়ায়েব (আ) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন পাকে কোথাও তাদেরকে 'আহ্লে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে মাদইয়ান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে আবার কোথাও 'আসহাবে আইকা' নামে। 'আইকা' শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ 'আসহাবে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে আইকা' পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। হযরত শোয়ায়েব (আ) প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। উভয় জাতির উপর যে আযাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। 'আসহাবে মাদইয়ানের' উপর কোথাও صيحه এবং কোথাও رجفه এবং 'আসহাবে আইকার' উপর কোথাও ظله এর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। صيحه শব্দের অর্থ বিকট চিৎকার এবং ভীষণ শব্দ। رجفه শব্দের অর্থ ভূমিকম্প এবং ظله শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আসহাবে আইকার উপর এভাবে নাযিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের এলাকায় ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে আল্লাহর অপরাধীরা কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে হেঁটে বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নিবৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নিচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ 'আসহাবে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে আইকা' একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লিখিত তিন প্রকার আযাবই তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চিৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্প হয়। ইবনে কাসীর এ অভিমতেরই প্রবক্তা।

মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একই সম্প্রদায়ের দু'নাম হোক, হযরত শোয়ায়েব (আ) তাদেরকে যে পয়গাম দেন, তা প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার পূর্বে জেনে নিন যে, ইসলামই সব পয়গম্বরের অভিন্ন দাওয়াত। এর সারমর্ম হচ্ছে হক আদায় করা। হক দু'প্রকার ঃ এক. সরাসরি আল্লাহর হক, যা করা না করার সাথে অন্য মানুষের কোন উল্লেখযোগ্য লাভ-ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয়। যেমন, ইবাদত, নামায, রোযা ইত্যাদি। দুই. বান্দার হক। এর সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে। শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায় উভয় প্রকার হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল। তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহর হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের মাপ ও ওযনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত

এবং পথিকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত এবং শোয়ায়েব (আ)-এর শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হিদায়তের জন্য শোয়ায়েব (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু'আয়াতে তাদের সংশোধনের জন্য শোয়ায়েব (আ) তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমত يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব পয়গম্বর দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী ও হক সম্পর্কে গাফিল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ পয়গাম দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ-অর্থাৎ তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ'-এর অর্থ ঐসব মু'জিযা, যা শোয়ায়েব (আ)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর মু'জিযার বিভিন্ন প্রকার তফসীর বাহরে মুহীতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ এতে كيل শব্দের অর্থ মাপ এবং ميزان শব্দের অর্থ ওযন করা। بخس শব্দের অর্থ কারও পাওনা হ্রাস করে ক্ষতি করা। অর্থাৎ তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না।

এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওযনে কম দিয়ে করা হতো। অতঃপর وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ বলে সর্ব প্রকার হকে ক্রটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরু অথবা অন্য যে কোন বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন।—(বাহরে মুহীত)

এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওযনে পাওনার চাইতে কম দেওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ক্রটি করাও হারাম। কারও ইযযত-আবরু নষ্ট করা, কারও পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরী তাদের আনুগত্যে ক্রটি করা অথবা যার সম্মান করা ওয়াজিব, তার সম্মানে ক্রটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায় করত। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের ইযযত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

কোরআন পাকে مطففين ও تطفيف-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত সব বিষয়েই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি রুকূ-সিজদা করতে দেখে বললেন ঃ قَدْ طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি মাপ ও ওযনে ক্রটি করেছ। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক) অর্থাৎ তুমি নামাযের হক পূর্ণ করনি। এখানে নামাযের হক পূর্ণ করাকে تطفيف শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا অর্থাৎ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। এ বাক্যটি সূরা আ'রাফে পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হলো, প্রত্যেকটি

বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুত তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর অভ্যন্তরীণ সংস্কার হলো, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলী পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল, তাই তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ডে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এটি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। ইহকালের মঙ্গল এ জন্য যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওযনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করার জন্য পথে-ঘাটে ওঁৎ পেতে বসে থেকো না। কোন কোন তফসীরবিদদের মতে এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক অর্থাৎ তারা রাস্তাঘাটে বসে শোয়ায়েব (আ)-এর কাছে আগমনকারীদের ভীতি প্রদর্শন করত। তাদরেকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দু'টি অপরাধ ছিল। পথে বসে লুটপাটও করত এবং শোয়ায়েব (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধা দিত। প্রথম বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। 'বাহ্‌রে মুহীত' প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থে এই অর্থই গৃহীত হয়েছে। তারা শরীয়ত বিরোধী অবৈধ কর আদায় করার জন্য রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আল্লামা কুরতুবী বলেন ঃ যারা পথে বসে শরীয়ত বিরোধী অবৈধ কর আদায় করে, তারাও শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপরাধী, বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যাচারী ও দুষ্কৃতকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا-অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বক্রতার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও অঙ্গুলি রাখার জায়গা পাওয়া গেলে আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় সৃষ্টি করে মানুষকে সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ

এখানে তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা

ধনসম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐশ্বর্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থ বলা হয়েছে ঃ পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর--কওমে নূহ্, 'আদ, সামূদ ও কওমে লূতের উপর কি ভীষণ আযাব এসেছে। তোমরা ভেবেচিন্তে কাজ করো।

পঞ্চম আয়াতে এ সম্প্রদায়ের একটি সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। শোয়ায়েব (আ)-এর দাওয়াতের পর তাঁর সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুসলমান হয় এবং কিছু সংখ্যক কাফিরই থেকে যায়। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফির হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে ঃ فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا অর্থাৎ তাড়াহুড়া কিসের ? আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেওয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফিরদের উপর চূড়ান্ত আযাব নাযিল হয়ে যাবে।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا
كٰرِهِيْنَ ﴿৮৮﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا
اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ
رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿৮৯﴾ وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿৯০﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا
فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿৯১﴾ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۛ اَلَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿৯২﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ
اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿৯৩﴾

(৮৮) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা বলল ঃ হে শোয়ায়েব ! আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শোয়ায়েব বলল ঃ আমরা অপছন্দ করলেও কি? (৮৯) আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদের এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্‌র প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন—যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। (৯০) তার সম্প্রদায়ের কাফির সর্দাররা বলল ঃ যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৯১) অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকাল বেলায় গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯২) শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোনদিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। (৯৩) অনন্তর সে তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! আমি তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি কাফিরদের জন্য কেন দুঃখ করব ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তার সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা (একথা শুনে ধৃষ্টতা সহকারে) বলল ঃ হে শোয়ায়েব! (মনে রেখো,) আমরা তোমাকে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের বস্তি থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। [তাহলে আমরা কিছুই বলব না। একথা মু'মিনদের বলার কারণ এই যে, তারাও ইতিপূর্বে কুফরী মতেই ছিল। কিন্তু শোয়ায়েব (আ) পয়গম্বর বিধায় কখনও কুফরী মতে ছিলেন না। তাঁকে বলার কারণ এই যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তিনি যে নিরপেক্ষ ছিলেন, এ থেকেই তারা বুঝে নিয়েছিল যে, তাঁর ধর্মমতও তাদের মতই হবে]। শোয়ায়েব (আ) উত্তর দিলেন ঃ আমরা কি তোমাদের ধর্মে ফিরে আসব যদিও আমরা (সপ্রমাণে ও সজ্ঞানে) একে অপছন্দনীয় (ও ঘৃণার্হ) মনে করি? (অর্থাৎ এ ধর্ম বাতিল হওয়ার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পারি)? আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী হয়ে যাব যদি (আল্লাহ্ না করুন) আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি। [কেননা প্রথমত কুফরকে সত্যধর্ম মনে করাই আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করা। বিশেষত কোন মু'মিনের কাফির হওয়া আরও বেশি অপবাদ। কেননা, তা সত্য প্রমাণকে কবূল করা ও জ্ঞান লাভের পরে হয়। এ তো গেল প্রথমোক্ত অপবাদ। দ্বিতীয় অপবাদ এই যে, এতে প্রতীয়মান হয় আল্লাহ্ তাকে যে প্রমাণ ও জ্ঞান দিয়েছিলেন, যাকে সে অবশ্য সত্য মনে করত, তা ভ্রান্ত ছিল। শোয়ায়েব (আ) 'প্রত্যাবর্তন' শব্দটি সঙ্গীয় মু'মিনদের হিসাবে বলেছেন কিংবা সর্দারদের ধারণার প্রেক্ষিতে অথবা কথার পৃষ্ঠে কথা হিসাবে]।

তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যদি আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ চান (সে চাওয়ার উপযোগিতা তিনিই জানেন)। আমাদের পালনকর্তার জ্ঞান সব বস্তুকে বেষ্টনকারী। (এ জ্ঞান দ্বারা তিনি সব বিধিলিপির উপযোগিতা জানেন; কিন্তু) আমরা আল্লাহ্র প্রতিই ভরসা রাখি [ভরসা রেখে আশা করি যে, তিনি আমাদের সত্যধর্মেই প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। এতে সন্দেহ করা উচিত নয় যে, 'খাতেমা-বিলখায়র' অর্থাৎ স্বীয় শুভ পরিণাম সম্পর্কে শোয়ায়েব (আ) নিশ্চিত ছিলেন না। অথচ পয়গম্বরদের এ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। উত্তর এই যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা এবং সবকিছু আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ করা। এটা নবুয়তের পূর্ণত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। এ বক্তব্যকে মু'মিনদের দিক দিয়ে দেখা হলে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। শোয়ায়েব (আ) এ উত্তর দিয়ে যখন দেখলেন যে, তাদের সম্বোধন করা মোটেই কার্যকর হচ্ছে না এবং তাদের ঈমানেরও কোন আশা নেই, তখন তাদেরকে ত্যাগ করে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন ঃ] হে আমাদের পালনকর্তা। আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন (যা সর্বদা) সত্যভাবে (হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ্র ফয়সালা সত্য হওয়া জরুরী। অর্থাৎ এখন কার্যক্ষেত্রে সত্যের সত্য এবং মিথ্যার মিথ্যা হওয়া সুস্পষ্ট করে দিন।) এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। পক্ষান্তরে তাঁর সম্প্রদায়ের (উপরোক্ত) কাফির সর্দাররা [শোয়ায়েব (আ)-এর এ অলংকারপূর্ণ বক্তব্য শুনে শংকিত হলো যে, শ্রোতারা না আবার এতে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। তাই তারা অবশিষ্ট কাফিরদের] বলল ঃ যদি তোমরা শোয়ায়েব (আ)-এর অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (ধর্মেরও ক্ষতি হবে এবং পার্থিব ক্ষতিও হবে। কারণ, আমাদের ধর্ম সত্য আর সত্য ধর্ম ত্যাগ করা ধর্মীয় ক্ষতি আর মাপ ও ওযন পূর্ণ করলে মুনাফা কম হবে। এটি পার্থিব ক্ষতি। মোটকথা, তারা কুফর থেকে এক ইঞ্চিও হটল না। এখন আমার আসাটা সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র)। অতঃপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল এবং তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে রইল। যারা শোয়ায়েব (আ)- কে মিথ্যা বলেছিল (এবং মুসলমানদের গৃহহারা করতে উদ্যত ছিল, স্বয়ং) তাদের অবস্থা এরূপ হয়ে গেল, যেন তারা এসব গৃহে কোনদিন বাসই করেনি। যারা শোয়ায়েব (আ)- কে মিথ্যা বলেছিল (এবং তাঁর অনুসারীদের ক্ষতিগ্রস্ত বলত, স্বয়ং) তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। অতঃপর শোয়ায়েব (আ) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চললেন (এবং পরিতাপ প্রকাশার্থ স্বাগত সম্বোধন করে বললেন ঃ) হে আমার সম্প্রদায়। আমি তোমাদের আমার পালনকর্তার বার্তা পৌঁছিয়েছিলাম (যা পালন করা সর্বপ্রকার সাফল্যের কারণ ছিল) এবং আমি তোমাদের হিত কামনা করেছি, (আপ্রাণ চেষ্টা করে বুঝিয়েছি, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তোমরা তা শোননি। ফলে এ অশুভ দিন দেখেছ। অতঃপর তাদের কুফরী ও শত্রুতা স্মরণ করে বললেন ঃ যখন তারা নিজেরাই এ বিপদ টেনে নিয়েছে, তখন) আমি কাফিরদের (ধ্বংস হওয়ার) জন্য কেন দুঃখ করব?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শোয়ায়েব (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল ঃ আপনি যদি সত্যপন্থী হতেন, তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হতো অমান্যকারীদের উপর আযাব আসত। কিন্তু হচ্ছে এই যে, উভয় দল সমভাবে আরামে দিন যাপন করছে। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সত্যপন্থী বলে

কিরূপে মেনে নিতে পারি? উত্তরে শোয়ায়েব (আ) বললেন ঃ তাড়াহুড়া কিসের? অতিসত্বর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। এরপর সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের চিরাচরিত পন্থায় বলে উঠল। হে শোয়ায়েব। হয় তুমি এবং তোমার অনুসারী মু'মিনরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হয় আমরা তোমাদেরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দেব।

তাদের ধর্মে ফিরে আসা কথাটা মু'মিনদের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। কারণ, তারা পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে শোয়ায়েব (আ)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু শোয়ায়েব (আ) একদিনও তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহ্র কোন পয়গম্বর কখনও কোন মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে ফিরে আসার কথা বলা সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত শোয়ায়েব (আ) তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চুপ থাকতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার পর তারা জানতে পারল যে, তাঁর ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন অথবা তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। শোয়ায়েব (আ) উত্তরে বললেন ঃ اَوَ لَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের উদ্দেশ্য কি এই যে, তোমাদের ধর্মকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব? অথাৎ এটা হতে পারে না। এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হলো।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, শোয়ায়েব (আ) জাতিকে বললেন ঃ তোমাদের মিথ্যা ধর্ম থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপর আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা।

কেননা, প্রথমতঃ কুফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করা এবং জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জিত হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া যেন একথা বলা যে, পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে তা-ই সত্য ও বিশুদ্ধ। এটা দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ, এতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা হয়।

হযরত শোয়ায়েব (আ)-এর এ উক্তিতে এক প্রকার দাবি ছিল যে, তোমাদের ধর্মে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবি করা বাহ্যত আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের পরিপন্থী এবং নৈকট্যশীল ও অধ্যাত্মবিদদের পক্ষে অসমীচীন, তাই পরে বলেছেন ঃ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ আমরা তোমাদের ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না। অবশ্য যদি (আল্লাহ্ না করুন) আমাদের পালনকর্তাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে ভিন্ন কথা। আমাদের পালনকর্তার জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী। আমরা তাঁর উপরই ভরসা করেছি।

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কোন কাজ করা অথবা না করার কে? কোন সৎ কাজ করা অথবা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্র মেহেরবানীতেই হয়ে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لو لا الله ما اهتدينا ولا تصد قنا ولا صلينا

অর্থাৎ আল্লাহ্র কৃপা না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না, সদকা-খয়রাত করতে পারতাম না এবং নামায পড়তেও সক্ষম হতাম না।

জাতির অহংকারী সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন শোয়ায়েব (আ) বুঝতে পারলেন যে, তারা কোন কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথাবার্তা ছেড়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন ঃ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ۔

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন, সত্যভাবে এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।" হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ فتح শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা। এ অর্থেই فاتح শব্দটি قاضى অর্থাৎ বিচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (বাহ্রে মুহীত)

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে শোয়ায়েব (আ) স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফিরদের ধ্বংস করার দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ দোয়া কবূল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

তৃতীয় আয়াতে অহংকারী সর্দারদের একটি ভ্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা পরস্পরে অথবা নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বলতে লাগল ঃ যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে অত্যন্ত বেওকুফ ও মূর্খ প্রতিপন্ন হবে। (বাহ্রে মুহীত)

চতুর্থ আয়াতে তাদের উপর আপতিত আযাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ অর্থাৎ তাদেরকে ভীষণ ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায়ের আযাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে اَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ বলা হয়েছে ; অর্থাৎ তাদেরকে ছায়া-দিবসের আযাব পাকড়াও করেছে। 'ছায়া-দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কাল মেঘের ছায়া পতিত হয়। তারা এর নিচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেন ঃ শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমনকি পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরও বেশি গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হলো। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা একটি ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নিচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নিচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হলো এবং ভূমিকম্পও এল। ফলে তারা

সবাই ভস্মস্তুপে পরিণত হলো। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আযাব দুই-ই আসে। (বাহ্‌রে মুহীত)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এটাও সম্ভব যে, তাদের বিভিন্ন অংশ ছায়ার আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে তাদের ঘটনা থেকে অন্যান্যকে শিক্ষার সবক দেওয়া হয়েছে, যা এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا — غنى শব্দের এক অর্থ কোন স্থানে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব গৃহে আরাম–আয়েশে জীবন-যাপন করত, আযাবের পর এমন অবস্থা হলো, যেন এখানে কোনদিন আরাম-আয়েশের নাম-নিশানাও ছিল না। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْاهُمُ الْخَاسِرِيْنَ অর্থাৎ যারা শোয়ায়েব (আ)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা শোয়ায়েব (আ) ও তাঁর মু'মিন সঙ্গীদের বস্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা তাদের ঘাড়েই চেপেছে।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ অর্থাৎ স্বজাতির উপর আযাব আসতে দেখে শোয়ায়েব (আ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তফসীরবিদরা বলেন যে, তারা মক্কা মুয়াযযমা চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।

জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে শোয়ায়েব (আ) বদদোয়া করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যখন আযাব এসে গেল, তখন পয়গম্বরসুলভ দয়ার কারণে তাঁর অন্তর ব্যথিত হলো। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় কোন ত্রুটি করিনি। কিন্তু আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি ?

ইফা-২০১০-২০১১–প্র/১০২৩৯(উ)–৫,০০০

তফসীরে

মা'আরেফুল

কোরআন

তৃতীয় খণ্ড



ইসলামিক ফাউন্ডেশন